A CRITICAL STUDY ON SOCIAL REALISM
IN
BENGALI NOVEL (1865 - 1935)
[BANKIMCHANDRA - RABINDRANATH - SARATCHANDRA
BY
DR. PRASANTA KUMAR MUKHOPADHYAY

প্রথম প্রকাশ : ২রা পৌষ, ১৩৬৭

গ্রন্থস্বত্ব : গ্রন্থকারের

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীঅমলসিংহ বড়ুয়া

মুদ্রণ : সরস্বতী প্রিণ্টার্স, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩

ও

রায় প্রিণ্টার্স, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩

প্রকাশক : গ্রন্থকার

দাম : পঁয়ত্রিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২

মণ্ডল এণ্ড সন্স

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

রূপকল্প, গুরুদ্বার রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-১৩

সংগ্রামী সাথী
আশিস দাসগুপ্ত স্মরণে

"Art is not concerned purely with representing apparent reality. A work of art is not intended to be taken as a 'likeness' of reality. Art's creation differ greatly from objects of the external world, for as well as absorbing impressions and concepts deriving from reality, it reflects too man's inner world, his experience, his personality and his attitude to the world around him. As a special form of spiritual and intellectual activity, and a powerful expression of man's creative powers, art, while ultimately deriving from reality, is to a certain extent independent of it"

—Boris Suchkov, A History of Realism, P-7

পরিচায়িকা ঃ

শ্রী প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার বিষয় ছিল 'বাংলা উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতা (১৮৬৫-১৯৩৫)'। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতার সীমাও বদলায় ; যেহেতু 'বাস্তবতা' সমকালীন সমাজ পরিবেশে বিচিত্র এবং জটিল দ্বন্দ্ব সম্পর্কের একটি সমগ্রতার বোধ থেকেই উপন্যাসে স্থান পায়, তাই চরিত্রের অন্তর্জগত সেই বাস্তবতার অন্তঃসারকেই ধারণ করে রাখে। ঘটনা বিস্তারেই বাস্তবতার পূর্ণতা নয়।

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ধারাবাহিক আলোচনা নয়। সবরকম পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে চলার দিকে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সজাগ দৃষ্টি খুবই প্রশংসনীয়। কাহিনীর সারাংশ সংকলনে মনোযোগ না দিয়ে বাস্তবতার স্বরূপ, তার বিকাশ, শ্রেণীভেদ এবং বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় বাস্তবতার ঔপন্যাসিক প্রতিফলন কি রকম হতে

পারে, সে বিষয়ে এই গ্রন্থে তাঁর আলোচনা মৌলিকত্ব দাবী করতে পারে।

র‍্যালফ্ ফক্সের 'নভেল এ্যাণ্ড দ্য পিপ্ল্' গ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বাস্তবতার সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক এবং ইংরেজী উপন্যাসে বাস্তব পন্থাটি কেমন তির্যকভাবে অনুসৃত হয়েছে, তারও ইঙ্গিত আছে। আর্ণল্ড কেটল্ মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের আলোচনা করেছেন। বাংলায় এই ধরণের কোন গ্রন্থ ছিল না। বর্তমান গ্রন্থটিতেই প্রথম সে প্রচেষ্টা দেখা গেল। মার্ক্সীয় দর্শনের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বাংলা উপন্যাসের তিন জন মুখ্য প্রতিনিধির রচনা বিশ্লেষণ সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। পাঠকেরা যদি লেখকের সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন, তবু 'বাংলা উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতা' গ্রন্থটি তাঁদের চিত্তে অন্ততঃ কিছু নতুন কৌতূহল জাগাবে। এখানেই গ্রন্থটির সার্থকতা।

রবীন্দ্র গুপ্ত

কলকাতা

অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের তিন বিশিষ্ট কথাশিল্পী। উপন্যাসের ইতিহাস আলোচনাতেও এই তিন-জনের রচনাই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রাক্-বঙ্কিম পর্বের কোন লেখকেরই মনে উপন্যাসের শিল্প-কাঠামো সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। তাঁরা সাধারণভাবে নীতিপ্রচারের তাগিদে বা কাহিনী বলার আবেগেই উপন্যাস-কল্প রচনা লিখেছেন। সেগুলির অধিকাংশই উপকথাধর্মী অথবা সামাজিক নক্শামাত্র (Sketches)। শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা উপন্যাস অনেকাংশে সমকালীন ইওরোপের উপন্যাসের আওতায় গড়ে উঠেছে। তার বহুধা বিকাশ এবং বিচিত্র নিরীক্ষা স্বতন্ত্র অনুধাবনের বিষয়। ১৮৬৫ এবং ১৯৩৫— এই দুটি বছর বর্তমান আলোচনায় দুই প্রান্তসীমা রূপে গৃহীত, কারণ 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ ১৮৬৫ এবং শিল্পী শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিপর্বের সার্থক ফসল ১৯৩৫ এর মধ্যে রচিত।

বর্তমান প্রসঙ্গে উল্লিখিত লেখকত্রয়ীর উপন্যাসের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও যথেষ্ট লেখা হয়েছে। অনুরূপ আর একটি গ্রন্থরচনায় আমাদের আকাঙ্ক্ষা নেই।

উপন্যাস যেহেতু বিশেষ অর্থে সমাজ-বাস্তবতার সাক্ষ্যবহ, তাই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মুখ্য উপন্যাসগুলিকে সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বাস্তবতার রূপভেদ, সমালোচনামূলক বাস্তবতা, প্রকৃতিবাদ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা প্রভৃতিও স্থান পেয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধ ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। **প্রথম** অধ্যায়ে সাহিত্যে বাস্তবতা, উপন্যাসের উদ্ভব, উপন্যাস ও বাস্তবতা, সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপ, বাস্তবতার প্রকারভেদ ইত্যাদির সাধারণ আলোচনা। **দ্বিতীয়** অধ্যায়ে প্রাক্-বঙ্কিম পর্বের উপন্যাস কল্প সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার নিদর্শন—নববাবুবিলাস, ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, আলালের ঘরের দুলাল, চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান,

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা গ্রন্থসমূহের সমাজ-বাস্তবতার মূল্যায়ন। **তৃতীয়** অধ্যায়ে বঙ্কিম-উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতার বিশ্লেষণ—নারী-ব্যক্তিত্বের মুক্তি, বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা ও স্বাদেশিকতার মূল্যায়ন। **চতুর্থ** অধ্যায়ে অনুরূপভাবে রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতার বিশ্লেষণ হিংসাত্মক রাজনীতি ও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে লেখকের মনোভাব ও উপন্যাসে তার প্রতিফলন। **পঞ্চম** অধ্যায়ে শরৎ-উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতার বিশ্লেষণ—নারীব্যক্তিত্বের সামাজিক-অর্থনৈতিক নিগ্রহ, বিধবার প্রেম, প্রেমহীন দাম্পত্য-সম্পর্কের শূন্যতা, গ্রামীণসমাজের দলাদলি, সামন্তশক্তির চক্রান্তে দরিদ্রের বঞ্চনা, মহাত্মা গান্ধীর অহিংবাদ, শ্রমিক-কৃষক সমাজের মুক্তি, অহিংস বনাম সহিংস স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ইত্যাদির রূপায়ণ। আলোচ্য তিনজন মুখ্য কথাশিল্পীর রচনাবলীর মধ্যে 'পথের দাবী'ই একমাত্র খাঁটি রাজনৈতিক উপন্যাস বলে 'পথের দাবী' সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। **ষষ্ঠ** অধ্যায়ে পূর্বের অধ্যায়-গুলির সার-সংকলন এবং সাধারণভাবে ত্রয়ী ঔপন্যাসিকের মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতার সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

উক্ত তিন লেখকের পাশাপাশি অনেকেই উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু তাঁদের এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবী বা শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কোন কোন রচনা অবশ্যই সমাজ-বাস্তবতা বিচারের ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদা পাবার যোগ্য, কিন্তু সমাজ বাস্তবতাকে আশ্রয় করে সাহিত্য বিচারে যে প্রশ্নগুলি দেখা দেয়, প্রধান লেখকদের রচনা বিচারেই সেগুলির যথার্থ পর্যালোচন হওয়া সম্ভব। বাংলা উপন্যাসের সৃজনশালায় এই ত্রয়ী শিল্পীর কাছে যাঁরা পার্শ্বচরিত্র, তাঁদের উপন্যাস আলোচনার দ্বারা আমাদের বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত কোনোটিরই হেরফের হ'ত না। তাই বাহুল্য-বোধে সে-আলোচনা পরিত্যক্ত হয়েছে।

এই গবেষণা নিবন্ধ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা

বিভাগের অধ্যাপক ও আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডঃ রবীন্দ্রনাথ গুপ্তের নির্দেশনায় সম্পন্ন হয়েছে। শেষ অবধি তাঁর নির্দেশই আমার এই কঠিন ব্রতে সিদ্ধিঅর্জনে সহায়ক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আমার পাণ্ডুলিপি পাঠ করে নিজহাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করে দিয়েছেন, ধৈর্য ধরে অনেক জটিল বিষয় আলোচনার মাধ্যমে সহজবোধ্য করে উপলব্ধিতে সাহায্য করেছেন, বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য ও গ্রন্থের অনুসন্ধান দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ পরিশোধের প্রসঙ্গ অচিন্তনীয়। তাঁকে জানাই শুধু বিনম্র প্রণতি।

গবেষণার দুর্গম ও দুস্তর পথের অভিযানে আমার প্রথম দীক্ষাদাতা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ সত্যব্রত দে। তাঁর অনিঃশেষ আশীর্বাদ, অকৃত্রিম স্নেহ ও সুচিন্তিত পরামর্শ নিয়মিতভাবে এই গ্রন্থরচনার সমগ্র পর্বে আমি পেয়েছি। তাঁকেও আমার বিনম্র প্রণতি নিবেদন করি। গবেষণা নিবন্ধটির পরীক্ষক ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, বাংলা ভাষাও সাহিত্যের মহারথী আচার্য ডঃ ক্ষুদিরাম দাস এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সমালোচক ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ ভূদেব চৌধুরী। তাঁরাও আমার প্রণম্য। তাঁদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার বহু শুভানুধ্যায়ী এই কাজে উৎসাহিত করেছেন ও হতাশাক্লিষ্ট মুহূর্তগুলিতে উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন অনুজপ্রতিম ডঃ অজয় কুমার লায়েক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকবন্ধু অমুনয় চট্টোপাধ্যায় ও কবিবন্ধু কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়। আর একজনের কথা সতত মনে পড়ে, তিনি প্রয়াত গবেষক ও সাহিত্যিক ডঃ বেলা মুখোপাধ্যায়। নানাভাবে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করেছি শ্রদ্ধেয় সহকর্মী শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীনীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীতপেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীভারতবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুহৃদ্ মধু চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁদের প্রীতির বাঁধনে আমি

চিরবন্ধ। সর্বশ্রী সুনীলচন্দ্র নাগ, অশোক দত্ত, বুধদেব চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, অসীম সরকার, অসীম রায়, বিমান মাজী প্রমুখের সহৃদয় সহায়তার জন্যও আমি কৃতজ্ঞ।
ছাত্রদের মধ্যে কল্যাণীয় শ্রীশান্তনু ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ও শ্রীমহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় সহায়তা সানন্দে স্বীকার করি। স্থানীয় সরস্বতী প্রিণ্টার্স ও রায় প্রিণ্টার্সের কর্মিবন্ধুদের কাছেও আমি ঋণী।

সর্বোপরি যাদের নাম উল্লেখ না করলে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার অসম্পূর্ণ থাকে, তাদের প্রথমজন আমার স্ত্রী শ্রীমতী মেনকা মুখোপাধ্যায়, আর দ্বিতীয়জন আমার পুত্র শ্রীমান ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রথমজন সাংসারিক দায়িত্ব পালনে আমার অনভিপ্রেত অবহেলাকে আত্মত্যাগের ভঙ্গীতে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে আমাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দিয়েছে, আর শ্রীমান ভবানীপ্রসাদ তার পড়াশুনার মধ্যে ব্যস্ত থেকেও আমার বিশাল পাণ্ডুলিপিসম্ভার তার সুদৃশ্য হস্তাক্ষরে পুনর্লিখনে সাহায্য করেছে। আমার স্নেহের কন্যাদ্বয় লক্ষ্মী ও মধুমিতার শিশুসুলভ আগ্রহ ও কৌতূহল আমার শ্রান্তমনে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। সবশেষে বাবা ও মাকে জানাই আমার প্রণাম, তাঁদের অপ্রকাশ্য উৎসাহ ও অবিরাম আশীর্বাদ আমার চলার পথে নিত্য পাথেয়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল। ত্রুটি মার্জনীয়। ইতি—

২৮/১০, রাণাপ্রতাপ রোড,
দুর্গাপুর-৪, বর্দ্ধমান

বিনীত—
প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়

সূচী

ঃ প্রথম অধ্যায় ঃ

প্রস্তাবনা

সাহিত্য সমাজ-মানসের দর্পণ। যে-কোন যুগেরই সাহিত্যে সে যুগের সমাজ স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিবিম্বিত হয়—তা প্রাচীন যুগের হোক, আর মধ্য বা আধুনিক যুগেরই হোক। চর্যাপদের মধ্যে যেমন সমকালীন সমাজ ও সামাজিক মানুষের জীবনাচরণ রূপকের আড়ালে সম্পূর্ণ চাপা পড়েনি, আবার মধ্যযুগের সাহিত্য 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন', মঙ্গলকাব্য, গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গান অথবা বৈষ্ণব পদাবলী—সবকিছুর মধ্যেই তার সন্ধান মেলে। তবে সমাজের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি চিরপরিবর্তনশীল, আর সেই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে ঐ দুই প্রকৃতির সংঘাতসৃষ্ট এক নবতর শক্তি। সমাজ যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি বিভিন্ন যুগে মানুষের মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। আবার মানুষ স্ব-সৃষ্ট সমাজে সকলযুগে সমান প্রাধান্য পায়না, তার তারতম্য ঘটে। সমাজে ব্যক্তির অবস্থানের গুরুত্ব অনুযায়ী গড়ে ওঠে ব্যক্তির মানস-সংগঠন—যা তার বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গীর উৎস ও পরিপোষক। সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সমাজ-সচেতনতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরও তাই পরিবর্তন ঘটে। কাজেই সাহিত্যে সমাজের প্রতিবিম্বন সকল যুগে পরিমাণ ও প্রকৃতির দিক থেকে সমান হয় না। সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার অন্বেষণ করার সময় এই কথা মনে রাখা প্রয়োজন। আমরা বাংলা উপন্যাসে (বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ) সমাজ-বাস্তবতার অনুসন্ধানে প্রয়াসী।

উপন্যাস মানবজীবনরসাশ্রিত সাহিত্যের এক বিশেষ শাখা। বিশেষ এক সামাজিক-প্রেক্ষাপটে এই সাহিত্য জন্ম নেয়। মানব-জীবন-ইতিহাসের বিবর্তনের ধারায় দ্বন্দ্ব-দীর্ণ এক জটিল বাস্তব আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়—যা উপন্যাসের (ব্যাপকভাবে কথা-সাহিত্যের) অঙ্কুরোদ্গম ও ক্রমবিকাশের পক্ষে একান্তই অনুকূল। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—'উপন্যাস যে সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহা অতীতকালের সমাজ হইতে অনেকগুলি গুরুতর বিষয়ে বিভিন্ন হওয়া চাই।'[১] অবশ্য এই মন্তব্যের পর তিনি আবার আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছেন। সংস্কৃত কাব্য ও আখ্যায়িকা, পঞ্চতন্ত্র ও বৌদ্ধজাতক,

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, চৈতন্যচরিতগ্রন্থ প্রভৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে এসেছেন—'যেখানেই গল্পের মধ্য দিয়া—তা সে গল্প যে উদ্দেশ্যেই লিখিত হউক না কেন—বাস্তবের প্রতি আকর্ষণের কোন লক্ষণ দেখা গিয়াছে, সাধারণ রক্ত মাংসের নর-নারীর চিত্র অস্পষ্ট ছায়া রেখাতেও চারিদিকের কুহেলিকা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই উপন্যাসের মৌলিক বীজের দর্শন লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।' (কিন্তু ঔপন্যাসিক বাস্তবতা বিশেষভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজ-সম্পৃক্ত।) এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যুদয়ে বাস্তববাদ এক বিশেষরূপে স্বতন্ত্র প্রণালী হিসেবে সাহিত্যের আঙ্গিনায় উপস্থাপিত। আর ধনতন্ত্রই মানুষকে বসিয়েছিল শিল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে। সামাজিক বিকাশের স্তরভেদে সাহিত্য ও শিল্পের এই নব নব রূপ পরিগ্রহ আকস্মিক কিছু নয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, উপন্যাসের উদ্ভবের যুগ পূর্ব-যুগের সমাপ্তির সূচনা, Walter Allen-র ভাষায়—'beginning of an end,—not a new beginning.'। ২ কার্ল মার্কসও রবিনসন্ ক্রুশো আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন – 'অষ্টাদশ শতাব্দীর এই ব্যক্তিটি দুই শক্তির যৌথ ফলাফল। প্রথমতঃ সে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অবলুপ্তির সাক্ষী। আবার একই সঙ্গে সে দেখেছে উৎপাদনের নতুন শক্তিগুলিকে যা ষোড়শ শতাব্দী থেকে গড়ে উঠেছে দ্রুতবেগে। এই চরিত্রটি যার অস্তিত্বের মূল সেই অতীতে, সে একটি আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা ইতিহাসের ফলশ্রুতি হিসেবে নয়, আরেক ইতিহাসের সূচনা হিসেবে।' ৩ বস্তুতঃ উপন্যাস সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ এক যুগ চাহিদার ফল। সেই যুগচাহিদা সৃষ্টির পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে সমাজের ধর্মীয় বা দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনশীলতা। বিশ্বের প্রতিটি দেশের সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভবের পটভূমিকায় এই সত্যের সন্ধান মেলে। ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভবের সূচনা হয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে। ডেফোর 'রবিনসন ক্রুশো'র প্রকাশ কাল ১৭৪০ খ্রীঃ, সমসাময়িক ইংরেজী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফিল্ডিং স্মলেট, স্টার্ণ প্রমুখেরা। এঁদের উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বে যেটি

মুখ্যত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সেটি হচ্ছে উপযুক্ত গদ্যভাষা। ইংলণ্ডে সেই গদ্যভাষা বলিষ্ঠতা অর্জন করে সাধারণ সমাজের ভাবপ্রকাশক্ষম হয়ে ওঠে যোড়শ শতকের শেষার্ধে। শুধু গদ্য ভাষাই নয়, মানব জীবন সম্বন্ধে বিশেষ সচেতনতা ও ঔৎসুক্যের প্রয়োজন। সাহিত্যিকের দৃষ্টি যে মুহূর্তে মধ্যযুগের দেবলোকের স্বর্ণসিংহাসন বা ঐশ্বরিক বেদীমূল থেকে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না বিজড়িত জীবনভূমিতে নিবদ্ধ হল, তখনই সমাজের নানা দ্বন্দ্ব ও জটিলতা তাঁদের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো। ইংরেজী উপন্যাসের উদ্ভবের পটভূমিকা আলোচনায় বলা হয়েছে—'Fiction was anything but a new invention. Even if legend and myth be omitted (since their religious or symbolic bearing differs from that of ordinary narrative) and the enquiry be confined to invented prose stories, abundance of them is to be found in the middle ages. The Renaissance has its classical translations, Pastoral-Arcadian romances, allegories, character-studies, and records of rascality. Yet then the main creative channels ran elsewhere, fiction's relation to life was peripheral, as idealization or moral doctrine or satire' ৪ উক্ত 'Fiction's relation to life'-ই হচ্ছে সাহিত্যের বাস্তবমুখীনতার যথার্থ রূপ।

আবার সাহিত্য সৃষ্টি করলেই হবে না, প্রয়োজন সেই সাহিত্য পাঠকের; ব্যাপক জনসাধারণের ঐ জাতীয় সাহিত্য পাঠে আগ্রহ থাকা দরকার। সমাজের অভীপ্সা বা যুগচাহিদা যা-ই বলি না কেন, সেই জনমানসের প্রকাশ মাধ্যম সাহিত্য। সমাজ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে নতুন চিন্তা-সমৃদ্ধ সাহিত্য ব্যাপকভাবে সমাজ-গ্রাহ্য হলেই তার সৃষ্টি যেমন সার্থক, তেমনি উত্তরোত্তর বিকাশও সম্ভব। এক কথায় বলা যায় যে, উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বশর্তগুলির মধ্যে জনরুচি অন্যতম। সমালোচকের মতে '.........certain

conditions were required—a reliable prose, sufficient readers ready to follow the long evolutions of an organised rendering on life, and above all, a belief that prose fiction was artistically and intellectually worthy of major talent.'[৫] উপন্যাসকে অবশ্যই পাঠক সাধারণের (Reading Public) চাহিদা পূরণের উপযোগী হতে হবে। যেহেতু ঔপন্যাসিক মানুষকে তার বস্তুগত স্বরূপে সমাজের বাস্তব পটভূমিকায় রেখে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার শিল্পরূপদানে সচেষ্ট হন, মানুষও উপন্যাসের মধ্যে আত্মানুসন্ধানে উৎসাহী হয়। সমাজের বিরুদ্ধে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংগ্রামের মহাকাব্য হিসেবে উপন্যাসও আধুনিক পাঠকের কাছে তাই সমাদৃত। অবশ্য যদি মানুষকে দেখে ঔপন্যাসিক আতঙ্কগ্রস্ত হন, মানুষের সমস্যার সম্যক উপলব্ধি না করে যুগপ্রবণতাকে এড়িয়ে যাবার প্রয়াস পান তবে সে উপন্যাস জনরুচিসম্মত যে হবে না—তা বলাই বাহুল্য।

বিশ্বের প্রায় সর্বত্র উপন্যাস সৃষ্টি হয় এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে। পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে ধ্বংস করে যখন নতুন ধনতান্ত্রিক সমাজ জন্ম নেয়, মানবচেতনায় জীবনের পুরাতন মূল্যবোধগুলির আবেদন যখন নিঃশেষিত প্রায়, নতুন চিন্তায় যখন তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মাভিমান যখন প্রচণ্ডগতিবেগ লাভ করে—সেই সময়ের সাহিত্যিক ফসল হ'ল উপন্যাস। ফরাসী-বিপ্লব ও ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব ইউরোপের জনমানসে যে পরিবর্তন সূচিত করেছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারই প্রতিক্রিয়ায় সেখানে ফিক্‌শনের (Fiction) উদ্ভব। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ক্রমবিকাশের ও অগ্রগতির মূলচালিকা শক্তি হল শ্রেণীসংগ্রাম। কোন বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থার অধীনস্থ বা শোষিত শ্রেণীই পরিণামে শোষক-শ্রেণী বা প্রভুত্বকামী শ্রেণীকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উৎখাত করে, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় যে বুর্জোয়ারা নিজেদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করল, সামন্ত প্রভুদের আমলে তারাই ছিল নিষ্পে-

ষিত। আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও বিশ্ববাজার প্রতিষ্ঠার পর তারা রাষ্ট্র ও সমাজের উপর নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অর্জন করল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্ক উচ্ছেদের মধ্য দিয়েই তাদের এই জয়যাত্রা শুরু। পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসানে ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যুষলগ্নের লেখক রাবেলেয়াস্ ও সারভেন্‌টিসের রচনায় প্রাচীনের প্রতি বিদ্রূপ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে নতুনের জন্য সাদর অভিনন্দন। অবশ্য ধনতান্ত্রিক সমাজও শ্রেণীভিত্তিক। এই সমাজে কালানুযায়ী মানুষের অভি-জ্ঞতার তারতম্য হতে বাধ্য। গতিশীল প্রত্যক্ষ বাস্তব ও মানুষের পরিবর্তনশীল বিচিত্র অভিজ্ঞতাই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়। তাই কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের বাস্তবতারও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, 'Fiction of Incident' এর স্থানে দেখা দেয় 'Fiction of Character.'

আবার ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের এক বিশেষ স্তরে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ছোট ছোট ভূমির মালিক, ব্যবসাদার, কৃষক ও কারিগর প্রভৃতি ছিল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগে তাদের এক অংশ শ্রমজীবীতে রূপান্তরিত হল। এখনকার মধ্যবিত্তশ্রেণী হল মূলতঃ বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অফিস কর্মচারী প্রভৃতি। আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা এই শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ধনতান্ত্রিক বিকাশের ধারায় এদের সঙ্গেও সংঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে এক অংশ বুর্জোয়াদের পক্ষাবলম্বন করলেও এর অপর অংশ তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চায়। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই মার্কস ও এঙ্গেলস্ 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টোতে' বলেছেন যে, মধ্যবিত্তশ্রেণী বিপ্লবী নয়। এরা সমাজের প্রগতিকে বাধা দেয়, ইতিহাসের প্রবহমান ধারাকে প্রতিরোধ করে, তবে পরিণামে এদের মধ্যেও ভাঙ্গন আরম্ভ হয় এবং একভাগ শ্রমজীবীদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। এই স্বাধিকার-প্রমত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা নতুন যুগে সৃষ্ট উপন্যাস-সাহিত্যের উল্লেখ-যোগ্য বাস্তব উপাদান। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শিল্পী-সাহিত্যিক-

দের সৃষ্টিতেও কালচেতনার সঙ্গে শ্রেণীচেতনার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। আবার ঐ শিল্পের কালজয়িতা সুচিন্তিত ও যথার্থ শিল্পসম্মত জীবনসমালোচনার উপর নির্ভরশীল। পরবর্তী সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের স্ব স্ব উপন্যাসে কিভাবে শিল্পীর মানস-প্রতিফলন ঘটেছে। সমকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, সমাজে শ্রমিক কর্মচারীর প্রভাবাধিক্য, উন্নতমানের মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন ও সংবাদপত্রের প্রকাশ উক্ত নবসৃষ্ট সাহিত্যশাখার পুষ্টিসাধনে সহায়ক হয়ে ওঠে। বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাসের উদ্ভব সম্বন্ধে এই সত্য সর্বত্র স্বীকৃত।

বাংলা উপন্যাসও আধুনিক কালের সৃষ্টি, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই এর পূর্ণ প্রকাশ। তবে ইংরেজী উপন্যাসের উদ্ভবের সামাজিক পটভূমিকার সঙ্গে আমাদের দেশের উনবিংশ শতকের সমাজ-পটভূমির পার্থক্যটুকু স্মরণীয়। উনিশ শতকের বাংলার সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা দ্বিতীয়-অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, তৃতীয় অধ্যায়েও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার যুগ-বৈশিষ্টটুকু সংক্ষেপে তুলে ধরেছি। তাই এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করতে চাই যে, শিল্প-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এখানে হয় নি। আমাদের সমাজ-পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন—পুরোপুরি সামন্ততন্ত্র বা পুরোপুরি ধনতন্ত্র নয়. ঔপনিবেশিক শাসনে সামন্ততন্ত্রের সহযো-গিতায় ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি। উনিশ শতকের বাংলার সমাজ-মানস দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতায় চঞ্চল। প্রাচীন সংস্কার ও ধ্যানধারণার প্রতি অবিশ্বাস এবং নতুন মানবিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীমনে এক প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এযুগ মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার অবক্ষয়ের যুগ, আবার এক নব চেতনার উন্মেষের যুগ। এযাবৎ সমাজ-শাসনের যে নাগপাশ ব্যক্তির স্বতন্ত্রসত্তাকে সমষ্টির স্বার্থে পাশবদ্ধ করে রেখেছিল তা থেকে ব্যক্তি মুক্তি চায়, প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার স্বাতন্ত্র্যবোধকে। সংস্কারের যূপকাষ্ঠে আত্ম-

বলিদানে সে পরাঙ্মুখ, তার দৃষ্টি আজ যুক্তিনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণভিত্তিক।

একই সময়ে সমাজে ব্যক্তিহিসেবে নারীর সামাজিক স্বতন্ত্রমূল্য ও মর্যাদার প্রশ্নও দেখা দেয়। এই প্রশ্নকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহরদের আন্দোলন ইত্যাদি, এবং ঐগুলি প্রাচীন বিশ্বাস ও মূল্যবোধে প্রচণ্ড আঘাত হানে। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ করে, ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ ও ফরাসী দার্শনিক অগাস্ত কোঁত্ (Auguste Comte)—এর 'পজিটিভিজম্' বা নিশ্চয়বাদের (যার মূলে ছিল মানবপ্রীতি) প্রভাব মধ্যবিত্ত শিক্ষিত জনমানসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করে। একদিকে এই নতুন চিন্তা ও আদর্শের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে প্রাচীন বিশ্বাস ও ধারণার সংরক্ষণ প্রয়াস—এই দুয়ের দ্বন্দ্ব তীব্রভাবে দেখা দেয়। প্রাচীনত্বের পক্ষপাতীরা যা কিছু সনাতন তার অনুসরণই কামনা করেন, নবচেতনার উন্মেষ সনাতনের স্থায়িত্ব যে বিপন্ন করে তুলেছে —সেটা তাঁদের কাম্য নয়। আবার নব্য সম্প্রদায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিরিখে, মানব-প্রীতির নতুন মূল্যায়নের পরিপেক্ষিতে সমস্ত-কিছুর বিচারের পক্ষপাতী। এই বৈশিষ্ট্যই উনিশ শতকের বাঙালী সমাজের ভাল-মন্দ সব কিছুরই মূল কারণ। ব্যক্তির উদগ্র আত্মাভিমান ও দুর্দমনীয় স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি অনেকক্ষেত্রে নিছক ভাবাবেগের প্লাবনে প্লাবিত হয়েছে—ফলে দেখা দিয়েছে দৈনন্দিন জীবনে কদাচার। পরিত্যাজ্য কি তা জানা আছে, কিন্তু গ্রাহ্যের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা তখনও অস্পষ্ট। আর তাই অস্থিরতা। এই সমাজ পরিবেশে মানবপ্রীতি প্রকাশের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হ'ল—'পাদ্রী কৃষ্ণমোহনের খ্রীষ্টধর্ম প্রচার, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব-ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মানবসেবা, অক্ষয় কুমার, রাজেন্দ্রলাল, মহেন্দ্রলাল প্রভৃতির জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, আচার্য কৃষ্ণকমলের নিরীশ্বর জ্ঞানযোগ ও মানব-পূজার মন্ত্রজপ— একদিকে এতগুলি পন্থা, এবং অপরদিকে কবি মধুসূদনের

কাব্যচ্ছন্দে মানবগৌরব-গীতির ভেরীরব—বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য আসর যেন সুসজ্জিত হইয়া আছে।'৬ এ তো গেল উনিশ শতকের বাঙালী সমাজের আন্তর অস্থিরতার কথা। উক্ত সমাজের বাহ্যিক রূপান্তরের বৈশিষ্ট্যটুকুর একটু ইঙ্গিত দেওয়া যাক।

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা তথা সমগ্র ভারতে অর্থনৈতিক শোষণ তীব্রতর আকার ধারণ করে। ইংরেজ ভারতকে তার দেশের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের কাঁচামাল যোগানের দেশ ও বৃটিশ পণ্যের বাজারে পরিণত করে। বৃটিশ শাসনের নিরাপত্তার জন্য অবলম্বিত পন্থাগুলির মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন অন্যতম। এর দ্বারা মুমূর্ষু গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন জমিদার-শ্রেণীর আধিপত্য স্বীকৃত হয়,—আবার অন্যদিকে দ্রুত কিছু কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও রেলপথ ইত্যাদি গড়ে ওঠায় শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এইভাবে নাগরিক জীবন প্রসার লাভ করে। ইংরেজ-প্রসাদপুষ্ট উদীয়মান 'বাবু' শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এরা সম্পূর্ণভাবে সামাজিক দায়িত্বহীন ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত, মদ্যপান ও পরস্ত্রী গমন বা বারাঙ্গনালয়ে গমন তাদের দৈনন্দিন জীবনাচরণের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। সমাজের একদিকে উৎকট বিলাসিতার নামে বর্বরতা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের উপর চরম পীড়ন ও শোষণ। তাই সমসাময়িক কালে নীলবিদ্রোহ ও সিপাহীবিদ্রোহের মত আন্দোলনেও সামাজিক বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে কেন্দ্র করে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৩), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা (১৮৬২) ইত্যাদি রচিত হয়। এই সামাজিক নক্শাগুলির মধ্যেই যে প্রকৃতপক্ষে বাংলা উপন্যাসের অরুণাভাস সূচিত হয় দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে আলোচনা করা হয়েছে। তবে ঐ গ্রন্থসমূহের মধ্যে মানুষকে সদাচরণে প্রবৃত্ত করার প্রয়াস যত বেশী লক্ষ্য করা যায়, লেখকের স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টির পরিচয় তত মেলে না। উপন্যাসের প্রাণবস্তু কিন্তু মূলতঃ মানুষের সামগ্রিক জীবনের পরিচয় প্রদান—'The novel is not merely

fictional prose, it is the prose of man's life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression.' ৭ পূর্বে উল্লিখিত রচনাগুলি যথার্থ উপন্যাস না হলেও ঐগুলিতে বাস্তবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত মানবজীবনের যে বিচিত্র ছবি তুলে ধরা হয়েছে তাতে বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হয়েছে—একথা বলা যায়। উনিশ শতকের উক্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনযাত্রা ও তার অভিঘাতে সৃষ্ট মানসিক অস্থিরতাবোধই বাংলা উপন্যাসের বাস্তব পটভূমি রচনা করেছে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র প্রকাশের মধ্যদিয়ে উপন্যাস সাহিত্যের যাত্রা যথার্থভাবে শুরু হয়। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়—'দুর্গেশনন্দিনী আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে একটি নতুন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ-উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।' ৮

বাস্তবতাবোধ ঔপন্যাসিকের পক্ষে যেমন একান্তই আবশ্যক, উপন্যাসের জন্যও ঠিক তেমনি বাস্তব সামাজিক পটভূমি অপরিহার্য। একথা ঠিক যে,-'সমকালের সমস্যাজর্জরিত, সংক্ষুব্ধ জীবন-প্রবাহ থেকেই ঔপন্যাসিক জীবনের শিল্পরূপদান করেন।) স্বকালের রাজনীতি-ধর্মনীতির দ্বন্দ্ব, আর্থিক সমস্যা, প্রেমচিন্তা, আদর্শ ও বাস্তবের অন্তর্বিরোধ সবই উপন্যাসের অন্তর্গত।' ৯ আর ঐ সব কিছুর মূলে রয়েছে ব্যক্তি সম্বন্ধে নতুন চিন্তা—এই চিন্তাও বাস্তবতাবোধেরই নামান্তর।

বাস্তবতাবোধ বা মানবচিন্তা আধুনিক যুগেই প্রকটভাবে দেখা দেয়। প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য ছিল মূলতঃ দেবকেন্দ্রিক—প্রাসঙ্গিকভাবে হয়তো অনেক স্থলে মানুষের বাস্তব-জীবনের অনেক কথাই এসেছে। কিন্তু তদানীন্তন সমাজে একক মানুষের ব্যক্তি হিসেবে স্বতন্ত্রমূল্য বা মর্যাদা স্বীকৃত হত না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি সমাজের বা গোষ্ঠীর স্বার্থবহ মাত্র। তার নিজস্ব চেতনার কোন মূল্য সে-সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে নি।

প্রাক্-আধুনিক যুগের সাহিত্যের বাস্তব সামাজিক প্রেক্ষাপটকেও চিহ্নিত করা হয়েছে দৈবী মহিমার প্রচারক্ষেত্র হিসেবে, আর তখনকার সৃষ্ট সাহিত্যে জীবন-জিজ্ঞাসাও আধ্যাত্মিক সংব্যাখ্যানে পরিসমাপ্ত। মানবতাবোধের ক্ষীণরশ্মির আভাস পাওয়া গেলেও তা দেবমহিমার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় আবৃত। মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের সংগ্রাম আত্মপ্রত্যয়শীল ও পুরুষকারে বিশ্বাসী বলিষ্ঠ মানুষের দৈবের তথা সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে ধরে নিলেও দৈবের বিজয়োল্লাসে সংস্কারের কাছে চাঁদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মনসামঙ্গল কাব্যের উপসংহার টানা হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের অন্তিম সুরও তাই। মধ্যযুগের শেষ পর্বে রচিত ভারতচন্দ্রের কাব্যও দৈববিভূতি ত্যাগ করতে অপারগ। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের মধ্যে যে মর্ত্ত-মুখিনতা বা বাস্তব জীবনমুখিনতা লক্ষ্য করা যায়, তা-ই আধুনিক বাস্তববোধেরই উপক্রমণিকা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজের অভ্যুত্থান—আর সেই যুগেরই বাস্তব জীবন-শিল্প হচ্ছে উপন্যাস। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের বিকাশের মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন পরোক্ষে ব্যক্ত করেন, মানুষের জীবন-সমস্যার নানা দিক বিশ্লেষণ করে স্বীয় জীবনানুভূতির প্রকাশ ঘটান। উপন্যাসের সব কিছুই-ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ বা বর্ণনা—যেন এক অখণ্ড বাস্তবতার শিল্পরূপ। কাজেই উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক আর বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। একমাত্র উপন্যাস সাহিত্যেই বাস্তব জগৎ ও জীবন ঔপন্যাসিকের বাস্তবানুভূতির রসসম্পৃক্ত হয়ে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের সুযোগ পায়। বিশ্ববিশ্রুত জনৈক বাস্তববাদী সাহিত্যিকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়— "...it is novel that enables the writer to give the fullest possible portrayal of the world of reality and to projection this portrait his own attitude to reality, to its burning issues and also the attitudes of his fellow thinkers,' ১০

এখন বাস্তবতা বলতে কি বোঝায় ও তার স্বরূপ কি—সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। উপন্যাসের বাস্তবতা মূলতঃ মানবজীবনকেন্দ্রিক হবে—তা বলা হয়েছে। সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে এক সৃষ্টিধর্মী প্রক্রিয়া হিসেবেই বস্তুবাদ দেখা দেয়। শিল্পের জন্য শৈল্পিক কল্পনা অপরিহার্য—এর যদি কোন বস্তুগত ভিত্তি না থাকে তবে তা হবে অলীক। সমাজজীবনের সঙ্গে মানবচরিত্রের পারস্পরিক জটিল সম্পর্কের পটভূমিকায় তাদের যথার্থ শিল্পগত অনুশীলন ও বিশ্লেষণ বস্তুবাদী শিল্প ও সাহিত্যেই ঘটতে পারে। সামাজিক পরিবেশ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা বাস্তববাদের বিরোধী। সমালোচকের মন্তব্যেও এর সমর্থন মেলে—"Realism does not isolate man from the social environment in which he lives and acts.' ১১ আবার Arnold Kettle র মতে—'The impulse towards realism in prose literature was part and parcel of the breakdown of feudalism and of the revolution that transformed the feudal world." ১২ সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস ও ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে উপন্যাসের উদ্ভবের যোগসূত্র রয়েছে। তাই উপন্যাস ও বাস্তবতা অবিচ্ছেদ্য। উপন্যাসের মুখ্য উপাদান ব্যক্তি। এর উদ্দেশ্য পূর্ণব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রদান এবং জটিল রহস্যময় মানবমনের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন। কাজেই প্রচলিত অর্থে দৃশ্যমান বহির্জগতের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতকে যে আমরা বাস্তবতা বলি, উপন্যাসের বাস্তবতা তা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র, বরং বেশ কিছুটা ব্যাপক। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকেই বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি। তাই বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার সার্থক শিল্পায়ন ঘটে ঐ সময় থেকেই। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় উত্তরণের যুগেই ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থের মধ্যকার দ্বন্দ্বের চরম প্রকাশ এখানে লক্ষ্য করা যায়। এই সংঘাতের শুরু বহু পূর্বেই, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সমাজ-শৃঙ্খল ছিন্ন করার ব্যক্তির যে প্রচ্ছন্ন প্রয়াস—তা তখন বাঙ্ময়রূপ পায় নি, ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সমাজের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে

পড়লো। ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব তখন পরিপক্ক হয়ে উঠে সমাজ পরিবেশকে জটিল করে তুললো। ব্যক্তির দুই সত্তা ক্রিয়াশীল— একদিকে সে সমষ্টির বা সমাজের একক, অপরদিকে তার আপন মনোরাজ্যে সে রাজাধিরাজ। তার নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগপ্রবণতা অপরের থেকে স্বতন্ত্র। এই দ্বৈত সত্তার উপলব্ধি যেমন ব্যক্তিমানবকে সমাজের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত করেছে, আবার তার নিজের মধ্যেও সম্ভব-অসম্ভব, ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নে চরম অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। তাই জটিলতা শুধুমাত্র বস্তুজগতের প্রেক্ষাপটেই সীমাবদ্ধ নয়, ব্যক্তির মনোজগতেও তা ক্রিয়াশীল। বাস্তবতার ক্ষেত্রও সেইজন্য শুধু বাস্তব জগৎ বা মানবসমাজই নয়, মানবমনও।

বাস্তবতার সম্যক উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন মানবসমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতনতা ও জটিল মানবমনের রহস্য উদ্‌ঘাটনী শক্তি। কারণ সমাজ—বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনাচরণের প্রকৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি মনের জটিলতাও বৃদ্ধি পায়। তাই বাস্তবতার প্রকৃতি স্থাণু নয়, পরিবর্তনশীল। ব্যক্তির বাহ্যিক কার্যকলাপ তার সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত। প্রতিটি মানুষ বৃহত্তর মানবসমাজের একক। 'Struggle for existence' অর্থাৎ বাঁচার জন্য সংগ্রাম তার চিরন্তন জৈবিক ধর্ম। তাই সেখানে স্বার্থবুদ্ধি ক্রিয়াশীল। বাঁচার জন্য সংগ্রাম ও তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার সকল রকম প্রচেষ্টাই ব্যক্তিজীবনে নানা জটিলতার সৃষ্টি করে, একের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসেই অন্যের সঙ্গে সংঘাতের সূত্রপাত। ব্যক্তিজীবনের কার্যকলাপ ও সমাজের উপর তার প্রভাব প্রতিক্রিয়ায় যে পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়, তাও সাহিত্যিক বাস্তবতার ক্ষেত্র। অমর বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর 'My views' গ্রন্থে 'সমাজ ও ব্যক্তিত্বে'র সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—'ব্যক্তিই কেবল চিন্তা করতে সমর্থ ও এইভাবে সে সমাজের পক্ষে নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি এমন নূতন নৈতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারে, গোষ্ঠীজীবন যাকে গ্রহণ করে সার্থক হয়। জীবনরসের আকর

গোষ্ঠীর বুনিয়াদ ছাড়া যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা চিন্তা করা যায় না, তেমনি সৃষ্টিশীল স্বাধীন চিন্তক ও বিচারক ব্যক্তি ছাড়া সমাজের উর্ধ্বগতি অকল্পনীয়।' ১৩ বস্তুতঃ এই 'স্বাধীন চিন্তক ও বিচারক ব্যক্তির' জীবন যেমন নানা জটিলতায় পরিপূর্ণ, তেমনি তার কার্যকলাপও বিচিত্র। তাই ব্যক্তির বাহ্যিক, মানসিক ও জৈবিক সর্বপ্রকার ভাবনা-চিন্তা ও কার্যকলাপ সাহিত্যের বাস্তবতায় গ্রাহ্য। মানবজীবনের এই যে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকাশ— তার এক একটি দিক এক একজন শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রাধান্য পায়। কোন ঔপন্যাসিক বাহ্যিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতকে অবলম্বন করে অগ্রসর হন, আবার কেউ চরিত্রের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের (Psycho Analysis) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, আবার অন্যে হয়ত মানুষের জৈবিক আচরণগত সমস্যাবলীর চিত্রায়ণে অধিক উৎসাহ বোধ করেন। প্রথম যুগের উপন্যাসে বাস্তবতার যে চিত্র আমরা পাই পরবর্তীকালে তার চিত্রায়ণে গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করি। তার অন্য কারণও অবশ্য আছে—সাহিত্যিকদের মধ্যে বাস্তবতা সম্বন্ধে ধারণাও যেমন বিভিন্ন, তেমনি তার শিল্পরূপদানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে শিল্প-সাহিত্যে প্রতিফলিত বাস্তবতা অনুযায়ী সামন্তসমাজ থেকে উদ্ভূত বুর্জোয়া সমাজকেই আদর্শ বলে মনে করা হত। ঐ বাস্তবতা ছিল 'স্বাভাবিক মানুষে'র (Natural man) পক্ষে প্রচার। তাই স্বাধীনতার বাহক ঐ স্বাভাবিক মানুষ তখন সাহিত্যে নায়ক হিসেবে দেখা দেয়। ঐ সময়ের বাস্তবতায় সামাজিক স্বাধীনতার নীতির সঙ্গে বুর্জোয়া সমাজে তার আবির্ভাবের মৌল দ্বন্দ্বের প্রকাশ আদৌ ছিল না। সে-দ্বন্দ্ব প্রকাশের পর বাস্তবতার ক্ষেত্র ক্রমে মনো-বৈজ্ঞানিক ধারায় প্রসারিত হল। স্টার্ণ, গ্যেটে প্রমুখের রচনায় এর সাক্ষ্য রয়েছে। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের যুগের উপন্যাসের বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথের যুগে পরিবর্তিত হয়েছে, 'চোখের বালি' উপন্যাস বাস্তবতার বিচারে যে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকে সম্পূর্ণ নতুন ধারায় প্রবাহিত—তা যথাস্থানে বিশ্লেষণ করা হবে।

অনেকে সাহিত্যে বাস্তবতার অবিকৃত প্রতিরূপদানের পক্ষপাতী। সমালোচকের মতে— '...many novels owe much of their attractiveness and literary value to their skilful portrayal of the life and manners of special classes, social groups or places.' ১৪ বাস্তবতা রূপায়ণের উদ্দেশ্যের তারতম্য অনুযায়ী তার প্রকৃতি ও পদ্ধতি পৃথক হয়। কিছু শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ধারণা যে, সামাজিক মানুষের নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সমাজের সংস্কার-সাধন সম্ভব। এই ধারণা হার্ডি, বাট্‌লার প্রমুখের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এর ফলেই জন্ম নেয় প্রকৃতিবাদ বা Naturalism. জীবনের হুবহু প্রতিকৃতি রচনায় প্রকৃতিবাদের শিল্প-সার্থকতার দাবী করা হয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃতিবাদ যে যথার্থ বাস্তববাদ নয় এবং উভয়ের মধ্যে যে মৌল পার্থক্য রয়েছে তার প্রমাণ পাই এই উদ্ধৃতিটিতে—"Naturalism imitates realism, but differs from it not only in its lack of social analysis, but also in its inability to typify." ১৫ ফরাসী দেশে জোলার সাহিত্যে ন্যাচুরালিজম ও রিয়ালিজমের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। জোলা বুর্জোয়া সমাজের ত্রুটিগুলি উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক মানের অবক্ষয় তাঁর সাহিত্যে প্রদর্শিত হয়েছে (নানা), পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব যে অবশ্যম্ভাবী তাও রয়েছে (জারমিনাল)। কিন্তু কোন জীবন-জিজ্ঞাসা সেখানে নেই, মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন থেকে কেন এই পদস্খলন—এই প্রশ্ন নিয়ে লেখকের অস্বস্তিবোধ অনুভূত হয় না। পাশবিক বৃত্তি, উদ্দাম জৈব আবেগ, জিঘাংসা ইত্যাদি যেন চিরন্তন মানবস্বভাব। জোলা ক্যামেরাম্যানের মত সব কিছুর নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন মাত্র। ফরাসী সাহিত্যে বালজাকের ও ইংলণ্ডের ফিল্ডিং-এর (টম্‌ জোন্স্‌) উপন্যাসেও বাস্তবের অবিকৃত প্রতিরূপ লক্ষ্য করা যায়। সমালোচক ফিল্ডিং-এর আলোচনায় মন্তব্য করেছেন—"Fielding probably intended to give in 'Tom Jones' a fairly complete picture
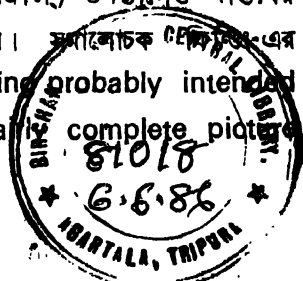
of the English life of his time. Balzac and Zola, alike attempted, not in one novel but in a series of novels, to embrace the whole of French civilisation in all its phases and ramifications.' ১৬ উপন্যাসের প্রথম পর্বে সাধারণতঃ বস্তুজগতের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতই উপন্যাসে প্রাধান্য পায়, সেখানে চরিত্রের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রায়ই লক্ষিত হয় না। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম ও ইংরেজী সাহিত্যে ডেফোর উপন্যাসে (রবিনশন্ ক্রুশো) বাহ্যিক ঘটনার চিত্রায়ণই মুখ্য, তবে ইংরেজী উপন্যাসে খুব অল্পকালের মধ্যেই মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ লক্ষিত হয়। ডেফোর 'রবিন্শন্ ক্রুশো'র প্রকাশ কাল ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে, ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দেই রিচার্ডসনের 'পামেলা'তে চরিত্রের মনোজগতের সুস্পষ্ট পরিচয় আভাসিত হয়ে উঠেছে। রিচার্ডসনের বৈশিষ্ট্য আলোচনায় বলা হয়েছে—"...he had an electrical sensitiveness to the inner world of impulse which philosophy and psychology also were exploring. ১৭

বাস্তবের হুবহু প্রতিরূপদানের প্রবণতার ফলে মানুষের জীবনের অসুন্দর দিকটা অবলম্বন করে কদর্য চিত্র সাহিত্যের মধ্যে অনেক সময় তুলে ধরা হয়। কিন্তু ভাল-মন্দ. সুন্দর-অসুন্দর এই দুয়ের সমন্বয়েই তো মানবজীবন। তাই জীবনের সুন্দর দিকটা উপেক্ষা করে বাস্তবতার নামে জীবনের খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরা সমীচীন নয়, সামগ্রিক জীবনের শিল্পায়নই তো উপন্যাসের উদ্দেশ্য। বাস্তববাদী সাহিত্যিক স্বীয় জীবনদৃষ্টি দিয়ে বাস্তব জীবনের সামগ্রিক রূপের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করবেন, তারপর সেই অভিজ্ঞতাকে স্বীয় জীবনাদর্শের মণ্ডনে মণ্ডিত করে সাহিত্যের মধ্যে তার আদর্শ রূপদান করবেন। তিনি হবেন স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষ তার মুক্তির সন্ধান পাবে। ব্যক্তি ও সমাজের চিরন্তন সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে উপন্যাসের জন্ম—"The novel deals with the individual, it is the epic of the struggle of the individual against

Society." ১৮ বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকের কর্তব্য তাঁর সাহিত্যের মধ্যে বাস্তবতার রূপদান এমনভাবে করা যাতে ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনের প্রয়াস লক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে বাস্তববাদের জনৈক বিদেশী প্রবক্তার মন্তব্য স্মরণীয়— 'The truth of an age may be expressed only by him who has a clear idea of the aspirations and aims of that age. The task of the artist and his problem, is to show not the accidental and particular, but the essence, the purpose and the ruling tendencies of his time." ১৯ সমকালীন সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার ব্যঞ্জনা বাস্তববাদী সাহিত্যের মধ্যে প্রত্যাশিত।

উপন্যাসের উদ্ভবের প্রাথমিক পর্বে অবশ্য এই প্রত্যাশা পূর্ণ হতে পারে না, তাই তখন উপন্যাসে হয় প্রকৃতিবাদ কিম্বা রোমান্স রস প্রধান হয়ে দেখা দেয়। এখানে ঔপন্যাসিক বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্সের সম্পর্ক বিষয়ে কিছু উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে মনে করি। কাল বিচারে রোমান্স উপন্যাসের অগ্রজ। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের ঈপ্সিত ও উপভোগ্য শৌর্য-বীর্যের কথা বা নিছক প্রেমকাহিনীর মণ্ডনেই রোমান্সের সৃষ্টি। অপরপক্ষে ধনতান্ত্রিক যুগের ব্যক্তি ও সমাজ-স্বার্থের সংঘাতসৃষ্ট সামাজিক পরিবেশের সাহিত্যিক ফসল হ'ল উপন্যাস। বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্সের পার্থক্যটুকু অতি সূক্ষ্ম এবং তা একান্তভাবে যুগবৈশিষ্ট্য-নির্ভর। এই অধ্যায়ের সূচনাতেই উল্লেখ করেছি যে, মধ্যযুগের সাহিত্যে বাস্তবতা থাকলেও তাকে যথার্থ ঔপন্যাসিক বাস্তবতা বলা যায় না। তাই রোমান্স আধুনিক কালের বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সমালোচকের মতে – "The Romance is an heroic fable which treats of fabulous persons and things. The Novel is a picture of real life and manners, and of times in which it is written. The Romance in lofty and elevated language, describes what never happened nor is likely to happen, The Novel

gives a familiar relation of such things, as pass everyday before our eyes, such as may happen to our friend, or to ourselves,...' ২০ রোমান্সে থাকে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক কাহিনী, অবিশ্বাস্য ঘটনা ও আকস্মিকতার মাধ্যমে চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রয়াস। উপন্যাসে এগুলি নিষিদ্ধ না হলেও যুগমানসের বিচারে আকাঙ্ক্ষিত নয়। রোমান্সের মধ্যে যেমন উপন্যাসের বাস্তবতার উপাদান থাকতে পারে, তেমনি উপন্যাসও রোমান্সাশ্রয়ী হতে পারে। বৌদ্ধজাতক, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য বা জীবনচরিতগুলিতে বাস্তবতার প্রাচুর্য সত্ত্বেও সেগুলি উপন্যাস নয়; আবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' এমনকি 'রাজসিংহ' উপন্যাসেও রোমান্সের প্রাধান্য রয়েছে। রোমান্স ও বাস্তবতার ধারণাটি আরো স্পষ্ট করার জন্য অন্য একটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য— "The adjective 'realistic' is likely to need more justification. The word 'realism' and 'realistic' are used throughout this book in a very broad sense, to indicate 'relevant to real life' as opposed to 'romance' and 'romantic' by which are indicated escapism, wishful thinking, unrealism." ২১ রোমান্সের মধ্যে বাস্তব জীবনের সমস্যা ও জটিলতার গ্রন্থিমোচনের প্রয়াস আদৌ থাকে না, কারণ, "...its underlying purpose was not to help people cope in a positive way with the business of living, but to transport them to a world different, idealised, 'nicer' than their own." ২২ তাই রোমান্সের মোহাবরণ ছিন্ন করে আধুনিক বাস্তবতার ভিত্তিতেই আবির্ভূত হয়েছে উপন্যাস।

বাস্তবতা রূপায়ণের আর একটি পদ্ধতি হল ক্রিটিকাল রিয়ালিজম (Critical realism), এটি কিছুটা সমালোচনামূলক। এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—"The realism of the bourgeois 'Prodigal sons' was critical realism. In revealing the vices of society and describing the

'life and adventures' of the individual caught in the confines of family traditions, religious dogmas and legal norms, critical realism could not show man way out of his bondage.' ২৩ ব্যক্তির জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্য, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা, ব্যক্তিত্বের অস্বীকৃতি ইত্যাদির জন্য দায়ী যে সমাজ-সম্পর্ক, তার স্বরূপ উদ্ঘাটন ও বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা এই জাতীয় বাস্তবতাসমৃদ্ধ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের মৌল দ্বন্দ্ব—পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে নির্দেশ করে, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘাতের চিত্র তুলে ধরে, এমন কি ঐ সংঘাতে ব্যক্তির পরিণামও প্রদর্শিত হয়। কিন্তু সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির সমাধান কি বা কি উপায়ে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থের সংঘাতের সমাপ্তিতে উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব—তার পরিচয় ক্রিটিকাল রিয়ালিজম-এ পাওয়া যায় না। মপাসাঁ, ডস্টভস্কি, টলস্টয় প্রমুখের সাহিত্যে এইজাতীয় বাস্তবতার নিদর্শন রয়েছে। এঁদের দৃষ্টি সমাজের আশু সমস্যার জটিলতায় নিবদ্ধ, সমাধানের ভবিষ্যত পটভূমিকায় তা প্রসারিত হয় না। হেমিংওয়ের 'ফিফ্‌থ কলাম্' (Fiffh Column) গ্রন্থের নায়ক ফিলিপ রলিংস বা 'ফর হুম্ দ্য বেল্ টোল্‌স' (For whom The Bell Toll's) গ্রন্থের নায়ক রবার্ট জর্ডন-এর মধ্যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব স্মরণীয়। কিন্তু চরম লক্ষ্য কি অর্থাৎ ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর কি হবে, কিভাবে নতুন সমাজ-সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় ইত্যাদি তাঁদের চিন্তায় ছিল না। এইখানেই ক্রিটিকাল রিয়ালিস্টদের সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতার কারণ নির্দেশ করে সমালোচক মন্তব্য করেছেন—"This is only natural, since critical realism reflects the sentiments of the broad democratic masses, thus absorbing between the strong and the weak aspects of the democratic outlook, which give rise to illusory concepts of history." ২৪ পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার দ্বন্দ্বই যে ইতিহাসের মূলে রয়েছে, ধনতান্ত্রিক সমাজে এই দ্বন্দ্বের সমাধান

যে সম্ভব নয়—এই সত্য ক্রিটিকাল রিয়ালিস্ট সাহিত্যিকরা উপলব্ধি করলেও অনেকক্ষেত্রে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ-রফার মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, এঁরা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ডস্টভস্কি তাঁর উপন্যাসে আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিসর্বস্বতার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনিও রাসকলনিকভের মতই যেন 'সুপার ম্যান'-এর অনুসন্ধানে ব্রতী। টলস্টয়ের সাহিত্যও প্রায় সমধর্মী। বাংলা-সাহিত্যে প্রাক্-বঙ্কিম পর্বের সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাস-কল্প রচনাগুলির বাস্তবতাকে সমালোচনামূলক বাস্তবতার নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের নিরিখে মানুষের নৈতিক অবনমন রোধ করাই ছিল ঐসব সাহি-ত্যিকদের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শিল্পী কেবল যুগসমালোচক বা যুগের বার্তাবহ নন, তিনি কালাতিক্রমী স্রষ্টা—"The artist cannot be the prisoner or the slave of tradition. The genuine artist accepts tradition but remains free...... The true artist always creates something of his own and takes an active part in the formation of a tradition that will be followed by succeeding generations." ২৫ তাই বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের একটা আদর্শ জীবনবোধ থাকবে—যার প্রেরণায় তিনি জীবন ও জগতের বাস্তবতাকে শিল্পীহৃদয়ের আন্তরিকতার রঙে রঞ্জিত করে রসরূপ দান করবেন। উপন্যাস নিছক তথ্য-সম্ভারও নয়, আবার মননপ্রধান সমালোচনাও নয়, সাহিত্যরস সৃষ্টিতে তা সার্থক হওয়া চাই। তবে দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাস্তবতা রূপায়ণের ইতিহাসের ধারায় এই ক্রিটিকাল রিয়ালিস্টরা বা সমালোচনামূলক বাস্তববাদী সাহিত্যিকরা যে বিশেষ যুগ-প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট প্রগতিশীল এবং বাস্তবতার শিল্পরূপদানে তাঁরা যে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন—একথা অনস্বীকার্য। টল-স্টয়ের সাহিত্যের বাস্তবতাই যে গোর্কির সাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছিল সমালোচকের মন্তব্যই

তার প্রমাণ— "without this fundamentally new method of portraying people which he (Tolstoy) was the first to introduce into world literature as someone capable of viewing society, history and the future both with the eyes of a writer who stood at the forefront of European Culture, and with the eyes of the people themselves, It is impossible to imagine how Gorky could have portrayed the popular character in the process of developing revolutionary consciousness," ২৬

সাহিত্যে ক্রিটিকাল রিয়ালিজমের ক্রমবিকাশ বাস্তবতা রূপায়ণের পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন ঘটায় এবং এর সীমাবদ্ধতা অতিক্রমণের প্রয়াস থেকেই জন্ম নেয় সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বা সোসালিস্ট রিয়ালিজম। সেদিক থেকে বিচার করলে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অগ্রদূত হ'ল সমালোচনামূলক বাস্তবতা। অবশ্য এটা কোন আকস্মিক বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠেনি। সামাজিক পরিবেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন ও সমাজ গঠনে ব্যক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকার বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুবাদী মূল্যায়ন শিল্প-সাহিত্যে বাস্তবতা রূপায়ণের শৈল্পিক পদ্ধতিতেও পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু সমালোচনামূলক বাস্তবতার সবকিছুই সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা উত্তরাধিকারসূত্রে নির্বিচারে গ্রহণ করেনি। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের সমাজসচেতনতার উৎকর্ষ ও শিল্পীর বৈপ্লবিক দায়িত্ব সম্পর্কে অবধানই এই নতুন বাস্তববাদের উদ্ভবের প্রধান কারণ, তাই বলা হয়েছে— "The formation of socialist realism is connected with the enormous growth of social consciousness in the working class and presupposes in its turn that the artist is fully aware of the historic mission of the proletariat." ২৭ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এই বাস্তববাদ বিশেষ এক বৈপ্লবিক সমাজদর্শনপুষ্ট—যা সাহিত্যের

মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে শোষিত সর্বহারার ঐতিহাসিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর সহায়ক হবে। এই দর্শনে আস্থাবান না হয়ে কোন শিল্পীর পক্ষেই যথার্থ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার রূপায়ণ সম্ভব নয়। গোর্কি এই বাস্তবতার সার্থক রূপনির্মাতা। বিংশশতকের প্রারম্ভে সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা-সমৃদ্ধ শিল্প-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন—"The art of the new world tries to show the spiritual growth of the new man, to penetrate his secrets more deeply, to see his prospects more distinctly, embrace life more fully, than the art of the past managed to do." ২৮ ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকেই জোলা, রঁমা রোঁলা প্রমুখের সাহিত্য-শিল্পে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেলেও রুশ-বিপ্লবের পরেই নতুন সমাজব্যবস্থার উপযোগী এবং নতুন মানুষ গড়ার সহায়ক শিল্পপদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়াসে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা মানুষকে তার পবিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, তার বস্তুগত পরিবেশে রেখে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিরিখেই বিচার করে। বুর্জোয়া বাস্তববাদীদের দৃষ্টিতে মানুষ অমূর্ত এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন অসহায় ক্রীড়নক মাত্র, কিন্তু এঁরা মানুষকে দেখেন ইতিহাস সৃষ্টিকারী সক্রিয় সমাজসত্তা হিসেবে। সমাজের উৎকর্ষ সাধনে সে শুধু সমাজ-পরিবেশকে নতুন করে গড়ে না, নিজেকেও পরিবর্তন করে।

১৯১৭ খ্রীঃ রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরেই সাহিত্যের মধ্যে বাস্তবতার এই ধারার প্রতিফলনে অত্যধিক ঝোঁক দেখা যায়। রুশ সাহিত্যের গোর্কি, চেকভ, ডস্টভস্কি প্রমুখের উপন্যাস সাহিত্যের প্রভাব আমাদের বাংলাসাহিত্যে শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যের অনেক সাহিত্যিকের উপর পড়েছিল। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে কল্লোল-কালিকলম গোষ্ঠীর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পরিস্ফুটনে আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে গতানুগতিকতার অচলায়তন ভাঙ্গার প্রবণতার

প্রাবল্য প্রকাশ পেয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে ব্যক্তির বিকাশের পথে অন্তরায় মূলতঃ সমাজের প্রতিকূল শ্রেণীসম্পর্ক। প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে নতুন সমাজ-সম্পর্ক এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে ব্যক্তি অনুকূল সামাজিক প্রেক্ষাপটে আপন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ পায়—এই ইঙ্গিত সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীদের উপন্যাসে থাকে। এই বাস্তববাদের ধারণার উৎপত্তিও কিন্তু আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ-সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে। সামাজিক অভিজ্ঞতার ফলে শিল্পীর যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও মানস-সংগঠন (mental set-up) গড়ে ওঠে, তার ফলেই জন্ম নেয় জীবনদর্শন, আর তার প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতির সূত্রপাত। সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা মনে করেন যে, শিল্পীর দায়িত্ব শুধু ব্যক্তির বর্তমান জীবনের অসঙ্গতি বা দুঃখ দারিদ্র্যের চিত্রায়ণ বা তার কারণ নির্দেশই নয়, তারও বেশী। বর্তমানের প্রতিকূলতার অবসানে ভবিষ্যত অনুকূল সামাজিক আবহাওয়ায় ব্যক্তির উন্নয়নের উপায়ের ইঙ্গিত দেওয়াও কর্তব্য। তার জন্যই প্রয়োজন সমাজ–বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতনতা, মানবজীবনের জটিলতার ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ-ক্ষমতা এবং তারই মাধ্যমে নিজস্ব স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি গড়ে তোলা—এর মূল ভিত্তি হচ্ছে ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা। যে কোন বাস্তববাদী সাহিত্যিকেরই অতীত সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, আর প্রয়োজন অতীতের সাহিত্যিকদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর আয়ত্তীকরণ। জনৈক সমালোচক এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—"Realism in general and the realist novel in particular are based on the artistic experience of the great masters of the past, but in the course of development they have acquired essentially new, specifically contemporary characteristics." ২৯ বাস্তববাদ গড়ে ওঠে মূলতঃ সমাজজীবনের বাস্তবতার পটভূমিকায়, আর তার রূপায়ণ নির্ভর করে শিল্পী-সাহিত্যিকের বিশেষ সমাজ-দর্শনপুষ্ট মানসিক

সংগঠনের উপর। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা কোন আকস্মিক উৎক্ষেপ নয়। এও রিয়ালিজম্ বা বাস্তববাদের ক্রমবিকাশের এক বিশেষ স্তরে সৃষ্ট; বরং বলা যায়—সামাজিক বাস্তবচেতনার এ এক উন্নততর রূপ। বাস্তববাদের যে প্রাথমিক রূপ ন্যাচুরালিজম্ বা প্রকৃতির অনুকরণবাদ—তা থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমটিতে বস্তুর বহিরঙ্গের চিত্রই মুখ্য, দ্বিতীয়টিতে অন্তরঙ্গের বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যতের উন্নতস্তরে বর্তমানের উন্নয়নের আভাসদানই প্রাধান্য পায়। তাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের দূরদৃষ্টি ও ভবিষ্যত গড়ার কল্পনা একান্ত অপরিহার্য।

সোসালিস্ট রিয়ালিজমের সঙ্গে রোমান্টিকতার কোন সম্পর্ক নেই—এমন ধারণা প্রচলিত আছে। কাজেই বিষয়টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে প্রয়োজন। প্রথমেই উল্লেখ্য যে, 'বাস্তবতা' ও 'রোমান্টিসিজম্' শব্দ দুটি সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পরীতি হিসেবে দীর্ঘদিন যাবৎ বহু বিতর্ক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটিরই সংজ্ঞাপ্রদান, স্বরূপ উপলব্ধি ও প্রয়োগ-রীতির বৈচিত্র্য বিদ্যমান। সাহিত্যতত্ত্বের সৃষ্টির আদিপর্ব থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এ-বিষয়ে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজ-দর্শনের মতই সাহিত্য-দর্শনও শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে ভাববাদী ও বস্তুবাদী মতবাদ দুটি সমান্তরাল ধারায় প্রবহমান। উভয়ধারার সমর্থকগণ স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্য অনুযায়ী বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার ব্যাখ্যা দেন এবং প্রয়োগরীতি নির্দেশ করেন। আবার 'বাস্তবতা'র মত যুগ ও সামাজিক পটভূমিকার পরিবর্তনের সঙ্গে রোমান্টিকতার ধারণাও পরিবর্তনশীল। তাই ক্লাসিক রোমান্টিসিজম্ থেকে আধুনিক রোমান্টিসিজম্ পৃথক বলে চিহ্নিত। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের বিষয়ানুগ নয়। এখানে শুধু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতার সম্পর্কের আভাসদানই আমাদের উদ্দেশ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা-সমৃদ্ধ সাহিত্য-সৌধের প্রথম সার্থক স্থপতি। তিনি রোমান্টিকতার

সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"Romanticism is not a coherent theory of man's attitude to the world, nor is it a theory of creative writing,... Romanticism is a kind of atmosphere, a complex and always more or less vague reflection of all the nuances of feeling and mood experienced by a society in a period of change; its basic feature is the expectation of something new, is an uneasiness at the newness, a nervous hastiness to become acquainted with that new," ৩০ রোমান্টিক লেখকরা বর্তমানের বাস্তবতায় অস্বস্তি বোধ করেন বলেই নতুনের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মধ্যে জাগে; কিন্তু সেই 'নতুন' এক অলীক জগৎ মাত্র। রোমান্টিকতার উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে দেখা দেয় নাটকীয়তা, অলঙ্করণ ও আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং অতিরঞ্জন প্রবণতা। ক্লাসিক রোমান্টিকতায় যেগুলি ছিল অপরিহার্য, আধুনিক বাস্তবতায় সেগুলি গ্রাহ্য নয়। রোমান্টিকতা আবার সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ঠিকভাবে করতে সক্ষম হয় না। সেইজন্য রোমান্টিকরা ব্যক্তিকে বস্তুজগৎ ও সামাজিক পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে তার মনোজগৎকেই সর্বোচ্চ স্থান দিতেন, এতে ব্যক্তিসর্বস্বতার সৃষ্টি হয়। সমালোচক বেলিনস্কির মতে, বর্তমানের বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার মানসিকতা যে উৎকল্পনার (Fantasy) জন্ম দেয় সেটাই রোমান্টিকতা, এর পরিধি সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"The sphere of romanticism is the whole inner, intimate life of man, that secret soil of soul and heart from which stem all our vague strivings for the better and the exalted. which seek to find satisfaction in ideals created by the imagination··· Life is where man is, where man is, there you will find romanticism." ৩১ রোমান্টিকতা যে বাস্তব মানব-জীবনের সঙ্গে কার্যকারণ-সম্বন্ধযুক্ত

উক্ত মন্তব্যে সেটা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। অতএব বাস্তববাদীদের সেটা বর্জন করার প্রশ্ন ওঠে না, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা বরং একে আরও পরিশীলিত ও উন্নতরূপে গ্রহণ করে থাকেন। বাস্তববাদীরা পূর্বের রোমান্টিকতার সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করে বাস্তবতার সঙ্গে এর পার্থক্যটুকু উপলব্ধি করে দেখেন যে, ৩২ (ক) সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে মানুষের জটিল সম্পর্ক ও তার অন্তর্জগতের চিত্রায়ণে বাস্তবতা যেখানে সবকিছুকেই (universality) সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে, রোমান্টিকতা সেখানে জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে একদেশদর্শী (one-sided view of the world and of man), এবং তার পদ্ধতিও নির্বাচনমূলক (selective approach)। (খ) বাস্তবতার দৃষ্টিতে ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে অচ্ছেদ্য (indissoluble oneness), অথচ স্বীয় কর্মক্ষমতা ও ধীশক্তির বলে সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সে নিত্য বিকাশমান; কিন্তু এ-বিষয়ে রোমান্টিকদের ধারণায় বেশ কিছুটা পূর্বানুমান (preconception) ক্রিয়াশীল থাকে এবং সেখানে বাস্তবের উপর দৈব বা অদৃষ্ট প্রাধান্য পায়। (গ) শিল্পরীতি হিসেবে বাস্তবতা বিষয়-নির্ভর বা তন্ময় (objectivism), পক্ষান্তরে রোমান্টিকতা বিষয়ী-নির্ভর বা মন্ময় (subjectivism)। ক্রমে রোমান্টিকতার ঐ সব ত্রুটি সংশোধন করে পরিশীলিত ও উন্নতরূপে একে আধুনিক বস্তুবাদী শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গীভূত করার ঝোঁক দেখা দিল। ইংরেজী সাহিত্যে ওয়াল্টার স্কটই প্রথম তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে ('আইভান-হো') ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ও সমাজ-দ্বন্দ্বের অন্যতম শ্রেণীভুক্ত হিসেবে চিত্রিত করলেন,— "Thus the historical novel as created by Scott was an entirely fresh departure in fiction... Scott's success as an historical novelist lay in his sturdy realism." ৩৩ এছাড়া স্কট তাঁর 'Review of Jane Austin's Emma' প্রবন্ধে উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণের বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রোমান্টিকতায় বিশ্বসংযোগ্যতা ও সম্ভাব্যতার সীমা বজায় রাখার আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

গোর্কির মতে, মহৎ শিল্পীদের রচনায় রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণ থাকে 'as two hypostases of one essence'। তাঁর নিজের রচনাতেও সেটা বিদ্যমান, 'মাদার' গ্রন্থটি এর সাক্ষ্য-বহ। গোর্কির মতের সমর্থনসূচক আর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত হল-"Realism and romanticism may be united in the works of one author in a thousand manners in all literature, and this is a thoroughly legitimate phenomenon.', ৩৪ গোর্কির সাহিত্যেই শুধু নয়, সমকালে ও তার পরেও অনেক সাহিত্যিকের রচনায় এই দুয়ের সহাবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। ইংরেজী সাহিত্যের জোসেফ কনরাড 'উইদিন্ দ্য টাইড্স' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—'...... The romantic feeling of reality was in me inborn faculty,... As such romanticism is not a sin, It is none the worse for the knowledge of truth.', ৩৫

এতক্ষণের আলোচনায় দেখা গেল যে, বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিকতার সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও কোন বিরোধ নেই, উভয়ের যথার্থ সম্মিলনে সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক বাস্তব-বাদীরা সৃজনশীল, প্রগতিশীল বা বৈপ্লবিক (creative, progressive or Revolutionary Romanticism) রোমান্টিকতার পক্ষপাতী, তাঁদের মতে ঐ রোমান্টিকতা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতারই অঙ্গ। সেইজন্য বলা হয়—"To a certain extent Socialist realism is unthinkable without an element of romanticism.... It is realism plus enthusiasm," ৩৬ বাস্তববাদী সাহিত্যিক বস্তুজগৎ থেকে আহৃত সাহিত্যের উপাদানকে স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও সৃজনীশক্তির বলে, কল্পনার রঙে-রসে সঞ্জীবিত করে নবতররূপে তাঁর সাহিত্যে পরিবেশন করেন। আবার রোমান্টিক কল্পনার উদ্দীপনও এই বস্তুজগৎ। বাস্তববিশ্লিষ্ট কোন উদ্ভট উৎকল্পনাকে সৃজনশীল মহতী কল্পনা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে কল্পনা ও কাল্পনিকতার পার্থক্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণীয়—'যথার্থ কল্পনা যুক্তি সংযম ও সত্যের দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট

আকারবদ্ধ – কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়।'

উপরে আলোচিত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার স্বরূপ থেকে এটা স্পষ্ট যে, এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল উৎক্রান্তিময়তা (sublimation) অর্থাৎ শিল্পীর বাস্তব-সচেতনতা এখানে সমকালীনতার সীমায় সীমায়িত না থেকে ভাবীকালের সীমানায় অতিক্রান্ত হয়। আবার এই অতিক্রমণ প্রয়াসও দুই বিপরীত চেতনার দ্বন্দ্বজাত। সমকালীন সমাজ-চেতনার সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিচেতনার নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সংঘাতের ফলে মুক্তি-বাসনা-বিজড়িত এক নবতর চেতনার সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যিক এমন এক সমাজ-পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়াসী হ'ন যেখানে উক্ত দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে বা ঐ দুই বিপরীত চেতনার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হবে। এই অভীপ্সার প্রকাশ ঘটে শিল্পের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে। সাহিত্যিকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী যেমন গড়ে ওঠে এক সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে, তেমনি আবাব বিশেষ যুগস্পৃষ্ট সাহিত্যও সমসাময়িক জনমানসে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করে। তাই ঔপন্যাসিক যদি যথার্থই সমাজবাদী বাস্তবতার অনুসরণে তাঁর উপন্যাসে ভাবীকালের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষের মানস প্রতিমার রূপরেখা রচনায় প্রয়াসী হ'ন, তবেই যুগবাসনার যথার্থ রূপায়ণ হবে। এর জন্যই প্রয়োজন সমাজবাদী আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও বিশ্বাস, স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি, ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি শৈল্পিক দক্ষতা ও বাস্তববাদী শিল্পীর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা। শিল্প ও শিল্পীর দায়িত্ব সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলেছেন—"The role of art is enormous. It elevates and improves people; it provokes thought; it is a powerful source of ideological and aesthetic influence. So the artist himself must be pure of heart and great of spirit." ৩৭ এই উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করলেই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী

সাহিত্যিকের দায়িত্ব কতখানি তা বোঝা যাবে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইউরোপীয় সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার ধারণার সুস্পষ্ট প্রকাশ ও প্রয়োগ-বাহুল্য লক্ষ্য করা গেছে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর। উপন্যাসের মৌলিক উপাদান যেহেতু সমাজ ও ব্যক্তি, তাই স্বাভাবিকভাবে সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ ও আভ্যন্তরীণ মানস-প্রবণতার পরিবর্তন ঘটে, তেমনি উপন্যাসের শিল্পরীতিও নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। আবার বিশ্বের যে কোন দেশের উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে আঙ্গিক পরিকল্পনা ও বিষয় উপস্থাপনার কৌশলে এক নতুন চিন্তার প্রতিফলন ঘটলে তার প্রতিঘাত অন্য দেশের ঔপন্যাসিকদের শিল্পীসত্তাকে ঐ নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে, কারণ বিশ্ব সামাজিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রিক—যে-কোন আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্ত থেকে কোন বিশেষ দেশই নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে না—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে, অল্প বা অধিকপরিমাণে হোক, সর্বত্রই তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে বাধ্য। ফরাসী বিপ্লব ও পাশ্চাত্যের শিল্প-বিপ্লব আমাদের বাংলাসাহিত্যে নতুন চিন্তার স্ফুরণ ঘটিয়েছিল—একথা উল্লেখ করেছি। তবে সেই প্রভাবকে কার্যকরী করা বা না-করা স্বতন্ত্র কথা। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাও যে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শিল্পীদের কিছুসংখ্যকের মনে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল—সেকথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না।

আমাদের আলোচ্য ঔপন্যাসিকত্রয়ের (বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ) উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার যথার্থ রূপের প্রতিফলন আশা করা যায় না, বিশেষ করে বঙ্কিম ও রবীন্দ্র উপন্যাসে তো মোটেই নয়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সৃষ্টির যুগে এখানে উক্ত বাস্তবতার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত, আবার রবীন্দ্র-উপন্যাসের মূল স্বরও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেই জন্য আমরা সমাজ-বাস্তবতার অন্বেষণে প্রয়াসী। এই বাস্তবতার স্বরূপ যেমন ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজমের মতো শুধুমাত্র সমালোচনাভিত্তিক নয়,

আবার সোশালিস্ট রিয়ালিজমের মতো বিশেষ লক্ষ্যানুসারীও নয় অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজমের অতিরিক্ত যেমন কিছু আশা করব, ঠিক তেমনি বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ উপন্যাস রচনার সমসাময়িক সমাজ কাঠামোর মধ্যে সোশালিস্ট রিয়ালিজমের নির্ভেজাল প্রয়োগ অন্বেষণের বিভ্রান্তিও আমাদের নেই। উক্ত সমাজ-বাস্তবতার মূল ভিত্তি হবে সমাজ-সচেতনতা। সাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার যথার্থ প্রয়োগ সমাজতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোতেই সার্থক হতে পারে, ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থায় বা নবোদ্ভূত ধনতান্ত্রিক সমাজে সৃষ্ট সাহিত্যে এর সার্থক প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

সমাজ-বাস্তবতা (Social Realism)-সমৃদ্ধ সাহিত্যে সমকালীন সামাজিক রীতি-নীতি, অর্থনৈতিক সংঘাত, সমাজে ব্যক্তির স্থান ও ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতির পরিমাণ, লেখকের সমাজ ও জীবন-দর্শন ইত্যাদির প্রতিফলন আশা করা যায়। এদের প্রতিফলনের পরিমাণ ও পদ্ধতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীনির্ভর। তাই বিভিন্ন সাহিত্যিকের সাহিত্যে তার তারতম্য ঘটতে বাধ্য, পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী সমাজতান্ত্রিক দর্শনানুসারী। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু মনে রেখে আমরা দেখবো সমাজ-সচেতন শিল্পী হিসেবে আলোচ্য ঔপন্যাসিকত্রয় তাঁদের উপন্যাস সমূহে সমকালীন সমাজের আকাঙ্ক্ষা-অভীপ্সাকে কতখানি তুলে ধরেছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য হেতু যুগবাসনার পরিস্ফুটনে কি ধরণের পার্থক্য ঘটেছে, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য কোথায় কতখানি রক্ষিত হয়েছে, সেই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তির নির্দেশ (suggestion) কে কী ভাবে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীতে দিয়েছেন—তাই আমাদের বিচার্য বিষয়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃঃ ১
২. Walter Allen : The Novel, Ch. I
৩ র‍্যাল্ফ ফক্স: নভেল এণ্ড দ্য পিপল (অনুবাদ সর্বজিৎ সেন ও সিদ্ধার্থ ঘোষ) পৃঃ ২৯ থেকে সংগৃহীত।

৪, ৫. A. R. Humphreys : Vide Pelican Guide to English Literature (From Dryden to Johnson), Literary Scene, P–75

৬, মোহিতলাল মজুমদার : বাংলার নবযুগ, পৃঃ ১৯

৭. Ralph Fox : The Novel and the People, P-2

৮. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৬৬

৯. ডঃ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত : উপন্যাস প্রসঙ্গে, পৃঃ ৪০

১০, Mikhail Sholokhov : Speech on Acceptance of the Nobel Prize, 1965, (From 'Socialist Realism in Literature & Art, P-86)

১১. Boris Suchkov : Realism and its historic development (From 'Problems of Modern Aesthetics' P-321)

১২ Arnold Kettle : An Introduction to the English Novel (Pt. I), P-25

১৩. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত 'আইনস্টাইন : মাই ভিউজ' পৃঃ ১২ দ্রঃ

১৪. William Henry Hudson : An Introduction to the Study of Literature, P-159

১৫. Boris Suchkov : Realism and its historic development (From 'Problems of Modern Aesthetics, P-330)

১৬. William Henry Hudson : An Introduction to the Study of Literature, P-158

১৭. A. R. Humphreys : Pelican Guide to English Literature (Pt 4), P-75

১৮. Ralph Fox : The Novel and the people, P-26

১৯. Pavel Korin : 'On Realism' (From 'Socialist Realism in Literature & Art, P-94)

২০. Clara Reeve : The Progress of Romance, Vol I from Miriam Allott : Novelists on the Novel, P-47

২১, ২২. Arnold Kettle : An Introduction to the English Novel (Pt I) P-26 & 29

২৩. Maxim Gorky : Talks with the young, 1934 (from 'Socialist Realism in Literature & Art, P-41)

২৪. Boris Suchkov : A History of Realism, P-3'8

২৫, Pavel Korin : 'On Realism', (from 'Socialist Realism in Literature & Art,' P-79)

২৬, ২৭. Boris Suchkov : Realism and its historic development, (from 'Problems of Modern Aesthetics'. P-332 & 333

২৮. A. Ovcharenko : Socialist Realism and the Modern Literary Process, P-56

২৯. Mikhail Solokhov : Speech on Acceptance of the Nobel Prize, 1965 (from 'Socialist Realism in Literature & Art, P-86

৩০. Maxim Gorky : A History of Russian Literature, P-42

৩১, V. G. Belinsky ; Collected Works, Vol. VII, P, 145–46

৩২. A. Ovcharenko : Socialist Realism and the Modern Literary process, P-154

৩৩. Compton Rickett : A History of English Literature, P. 326–27

৩৪. Lessia Ukrainka : Works, Vol. 5, P-442 (Taken from A, Ovcharenko's 'Socialist Realism and the Modern Literary Process,' P–204

৩৫. Miriam Allott : Novelists on the Novel, P-55

৩৬, Anatoly Lunacharsky : 'Socialist Realism in Literature and Art.' P-57

৩৭. Pavel Korin : The Demand of the Age and Questions of creation (From 'Socialist Realism in Literature and Art,' P-102)

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

প্রস্তুতি পর্ব্ব

‘প্রাক্-বঙ্কিম-যুগের উপন্যাস কল্প-সাহিত্যে
সমাজ-বাস্তবতার নিদর্শন’

প্রথম অধ্যায়ে উপন্যাসের উদ্ভবের অনুকূল সামাজিক প্রেক্ষাপটের বৈশিষ্ট্য, উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক, উপন্যাসে বাস্তবতা রূপায়ণের নানা পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখন প্রাক্-বঙ্কিমযুগের যে সমস্ত উপন্যাস-কল্প রচনা বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছিল তাদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে সমাজ-বাস্তবতার (বা বাস্তব-সচেতনতার) প্রতিফলনের পরিমাণ ও তার গভীরতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের পূর্বে সমাজ-কথা-ভিত্তিক রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩), হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), রেভা. লালবিহারী দে'র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (১৮৫৯) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (১৮৬২)। যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের কথা পূর্বাহ্ণে স্মরণ করা যেতে পারে।

নবাবী আমলের শেষ ও কোম্পানীর আমলের শুরু হতেই বাংলার সমাজে একটি সার্বিক পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ্য করা যায়।১ মধ্যযুগের স্থিতিশীল জীবনকেন্দ্রে আধুনিক যুগের গতিশীলতা সঞ্চারিত হ'ল, নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো, গ্রামীণ ভূমি-নির্ভর অর্থনীতিকে গ্রাস করে বাণিজ্যিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপিত হ'ল ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার (৩১ শে ডিসেম্বর, ১৬০০ খৃীঃ) লাভের পর।২ ভারতের সামাজিক ইতিহাসে ঐ আসন্ন পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ্য করেই সেদিন কার্ল্ মার্ক্স বলেছিলেন যে, ইংলণ্ডকে ভারতে একই সঙ্গে দ্বিবিধ লক্ষ্য পূরণ করতে হবে— একটি ধ্বংসমূলক, অপরটি পুনরুজ্জীবনমূলক। একদিকে এখানে প্রাচীন এশীয় সমাজ ব্যবস্থার উৎসাদন, অপরদিকে তার পরিবর্তে এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের অনুরূপ সামাজিক অবস্থার বাস্তব-ভিত্তিস্থাপন। ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর ঐ কাজের ফলশ্রুতি সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন—

"All the English bourgeoisie may be forced to do will neither emancipate nor materially mend the Social condition of the mass of the people, depending not only on the development of the productive powers, but on their appropriation by the people. But what they will not fail to do is to lay down the material premises for both. Has the bourgeoisie ever done more?"৩ জনসাধারণের সামাজিক দুরবস্থার অবসান ও তা থেকে পূর্ণ মুক্তি এর ফলে সম্ভব নয়, কিন্তু ঐ মুক্তি বা সামাজিক উন্নতির জন্য প্রাথমিকভাবে যে বাস্তব অবস্থার প্রয়োজন, তার সূচনা যে হবে মার্ক্‌স সে বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। বস্তুতঃ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি পরিবর্তনের ঝোঁক ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। ব্রিটিশযুগের ঐ বিদেশী বাণিজ্যিক অর্থনীতি ক্রমে রূপান্তরিত হল পুঁজি-নির্ভর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে। শেষ বিচারে অর্থনীতিই সমাজের গতিনিয়ামক, তাই বিশেষ এক সমাজের সাংস্কৃতিক ভাবপরিমণ্ডল (cultural environment) গড়ে ওঠার পিছনেও বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্কটি সংশ্লিষ্ট থাকে। স্বভাবতই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত আগমন ও ক্রমে ব্রিটিশ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনের ধারা ও মানবতাভিত্তিক দার্শনিক মননশীলতা ধীরে ধীরে বাংলার সমাজে আমদানি হল। তাতেই শুরু হল সংস্কৃতির রূপান্তর, বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসলোকে দেখা দিল ভাববিপ্লব। পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির ভাবপ্লাবনের প্রচণ্ডতায় নব্য-শিক্ষিত নাগরিক যুব-সম্প্রদায়ের মানসলোক উত্তাল হয়ে উঠল, জাগ্রত হয়ে উঠল আত্মসচেতনতায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় তারা আগ্রহী হল। সংঘাত সৃষ্টি হল প্রথাসিদ্ধ সামাজিক সংস্কারের সঙ্গে নবচেতনার, দীর্ঘদিনের গতিহীন সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কারাচ্ছন্ন গোষ্ঠীচেতনার অন্ধকার সুড়ঙ্গ হতে যেন ব্যক্তিচেতনা মুক্তি পেতে চায়।৪ এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আপাতঃদৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবহমানতাকে ত্রিধা বলে মনে হয়।৫ —ক) রক্ষণশীল দলের প্রাচীনত্বের সংরক্ষণ প্রয়াস, (খ) ইয়ং

বেঙ্গল দলের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আবেগময় অনুচিকীর্ষার আত্যন্তিকতা এবং (গ) রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের সংস্কার-প্রচেষ্টা। কিন্তু সে সময় দ্বন্দ্ব মূলতঃ দুটি ধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—প্রাচীন ধারার পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে নবচেতনার সামাজিক প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্বই মৌলিক দ্বন্দ্ব। ইয়ং বেঙ্গল দল ও রামমোহন প্রমুখেরা-উভয় গোষ্ঠীই নবভাবধারায় উদ্বুদ্ধ; প্রথম দলের মানসিকতার প্রকাশ ভাবাবেগসর্বস্ব, কিন্তু দ্বিতীয় গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ সংযম ও দৃঢ়তাপূর্ণ সংস্কারমূলক কর্ম-পরিকল্পনায়। একদিকে তীব্র স্বাজাত্যভিমান, অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও মানবিক যুক্তিবাদ-এই দুই ভাবপ্রবাহ যেমন সেদিন পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী যুবসম্প্রদায়কে উদ্বেলিত করেছিল, তেমনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মূলেও তা ক্রিয়াশীল ছিল; ফলে সমকালীন বাংলা কাব্য-নাটক-প্রহসন-ব্যঙ্গ-রচনা সবকিছুতেই তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এর মূলে ছিল সামাজিক প্রয়োজনবোধ। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দীনবন্ধু প্রমুখের সাহিত্যসাধনায় এই প্রয়োজনবোধেরই প্রকাশ ঘটেছে। রামমোহনের সংস্কারচিন্তা ও সাহিত্যচিন্তা ছিল একে অপরের পরিপূরক। তাঁর 'বিচার' জাতীয় গ্রন্থসমূহে (ভট্টাচার্যের সহিত বিচার; গোস্বামীর সহিত বিচার ইত্যাদি), বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার ইত্যাদিতে যেমন তাঁর ধর্মচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ (১ম ও ২য়) গ্রন্থে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামেরই প্রতিফলন ঘটেছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য তাঁর প্রয়াস উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র (১৮১৭) সঙ্গে যুক্ত থেকে '(গৌড়ীয় ব্যাকরণ', বাংলা ও ইংরাজীতে ভূগোল রচনা করে শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থাকে বজায় রাখার প্রতিবাদে ১৮২৩ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে এক পত্রে লেখেন, '........ the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness'.৬ প্রকৃতপক্ষে রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বাংলার সমাজমানসকে আলোকিত

করতে চেয়েছিলেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, যথার্থ শিক্ষা ব্যতীত সংস্কার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের ইতিহাসে লর্ড আমহার্ষ্টকে লেখা উল্লিখিত পত্রটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ৭

অনুরূপভাবে বিদ্যাসাগর সৃষ্ট সাহিত্যকর্মও সামাজিক প্রয়োজনবোধ সমুদ্ভুত। তিনি ছিলেন মূলতঃ সমাজকর্মী। রামমোহনের আদর্শবাদ ও ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মানসিক উত্তালতা বিদ্যাসাগরের চেতনায় ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তায় সমাজ-বাস্তবতার প্রগতিমূলক উপাদান হিসেবে যথার্থই সমন্বিত হল। জনৈক সমালোচক বলেছেন—'উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিদ্যাসাগর চরিত্রে এই সমাজ-চেতনা ও ব্যক্তিচেতনার সংযোগের ফলে নবযুগের বাংলার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। তিনিই প্রথম সেই সমাজ-চেতনাকে, প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্রিয়ার ভিতরদিয়ে Social reality-তে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন'। ৮ শিশুদের বোধের উন্মেষ ঘটানোর জন্য 'বোধোদয়' রচনা হতে আরম্ভ করে যাবতীয় রচনা তাঁর সমাজ-চিন্তার ধারক, মানব-মুক্তির ইঙ্গিতধর্মী। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে এদেশে যাতে আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা উত্তরোত্তর জনমুখী হতে পারে বিদ্যাসাগর আজীবন তার প্রয়াসী ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তাঁর ছাত্রাবস্থায় ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজী শিক্ষা চালু করার জন্য শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী জি, টী, মার্শালকে যে আবেদন পত্র পাঠায়, সেখানে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার নাম ছিল। ৯ পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পর (২২ জানুয়ারী, ১৮৫১) ঐ কলেজের পুনর্গঠন ও শিক্ষা সংস্কারে তাঁর প্রচেষ্টার কথা সুবিদিত, ইংরেজী বিভাগের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর অবসান ঘটাতেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। রামমোহনের মতই বিদ্যাসাগরও সরকারী শিক্ষাপরিষদের তদানীন্তন সেক্রেটারী ডাঃময়েটকে (F. I. Mouat) লেখা একটী দীর্ঘ পত্রে (৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩) সংস্কৃত কলেজের পঠনপাঠন সম্পর্কে ডাঃ জে, আর, ব্যালেন্টাইনের সুপারিশের প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন।১০ বিদ্যাসাগর সম-

কালীন সমাজের আবহাওয়ায় অস্বস্তিবোধ করতেন বলে কখনও তাঁর মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় নি, বরং সংযত ভাবেই ভবিষ্যতের সুস্থ সমাজ-পরিকল্পনার কথাই তিনি চিন্তা করেছেন, তাই শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর চরিত্র আলোচনার সময় মন্তব্য করেছেন, 'বর্ত-মানের বিষয়ে কথা উপস্থিত হইলে তিনি সহিষ্ণুতা হারাইতেন।... বর্তমানের অতৃপ্তির ন্যায়, ভবিষ্যত রচনার শক্তিও তাঁহার ছিল।' ১১ এই 'ভবিষ্যত রচনার শক্তি'র জন্যই বিদ্যাসাগর সমাজ-বিপ্লবী, যদিও এই চিন্তার বিপরীত সিদ্ধান্তও আজকাল প্রচলিত। ১২ অবশ্য সমাজে বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বিদ্যাসাগরের মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, সদ্যোজাত এক নতুন পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর বাংলার সমাজ যখন গড়ে উঠ্ছে, প্রাচীন উৎপাদন-সম্পর্কও যখন নিঃশেষ হয়ে যায়নি, সেই অবস্থায় নতুন করে ভাবনার আর কি থাকতে পারে ? বরং এটাই তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটবে, আধুনিক মানবমুখীন চেতনার বিকাশ হবে। ফলে মধ্যযুগের কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর সমাজের বুক হতে অপসৃত হবে, সমাজ নতুন ভাবে গড়ে উঠবে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ তখন বাধাপ্রাপ্ত হবে না।

নবোদ্ভূত পরিস্থিতিতে এঁরা অনেকের মত ব্যক্তিগত মুনাফা-লাভের চেষ্টা করেননি, বরং নিজেরা সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছেন, তাই তাঁরা নতুন সমাজ-পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রখ্যাত সমাজ-বিজ্ঞানী র‍্যাল্‌ফ্‌ লিণ্টনের (Ralf Linton) উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"New Social inventions are made by those who suffer from the current conditions, not by those who profit from them."১৩ রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রকৃতই বাংলার আধুনিক সমাজের রূপকার।

দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসন, মধুসূদনের কাব্য ও প্রহসন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য ইত্যাদি—সমকালীন সমস্ত রচনায়

সেদিনের সমাজ-চেতনা যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি মুমুক্ষু ব্যক্তি-মানসের অভীপ্সাও প্রকাশিত।

ইয়ং বেঙ্গল্ গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মাদনা এত প্রবল যে, তাদের আচার-আচরণ উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অন্যদিকে সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ধর্মের নামে কুৎসিত রীতিনীতি ও সংস্কার এবং নববাবু-সম্প্রদায়ের উৎকট বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপনের ফলে সমাজের সাংস্কৃতিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঐ নববাবু-শ্রেণীর ব্যক্তিচরিত্রে দেখা দেয় নানা অসংগতি। সুস্থ ও সুস্থিত জীবনাদর্শের অভাবে সেদিনের সমাজে দেখা দিয়েছিল স্থৈর্যহীনতা, আভ্যন্তরীণ অস্থিরতা। এই 'নবযুগের সমাজে অহং-সর্বস্ব ব্যক্তির আবির্ভাব হল যখন, তখন তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপের পাত্র হয়ে উঠলেন তাঁরা। সাহিত্যেও তার প্রকাশ ঘটল। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ভবানীচরণ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ পর্যন্ত তার একটানা স্রোত বয়ে গেছে। এই বিদ্রূপের জোয়ারের মধ্যেই প্রথম বাংলা গল্প-উপন্যাসের জন্ম হয়েছে।'১৪ সমাজের উক্ত আবহাওয়ায় সামাজিক কাহিনী অবলম্বনে নানা ব্যঙ্গজাতীয় রচনা ও নক্সার আবির্ভাবে প্রকৃতপক্ষে বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির পথ আরও সুগম হল। আর ঐ সব রচনার মূলে যে স্রষ্টার সমাজ-চিন্তা কোন-না-কোন প্রকারে ক্রিয়াশীল ছিল তা বলাই বাহুল্য। যুগবিবর্তনের ইতিহাসে যখন কোন সমাজ এক বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়, সুপ্ত জাতির চৈতন্যলোকে নতুন জীবনাদর্শের আলোক-রশ্মি যখন বিচ্ছুরিত হয়, তখনই আসে সুপ্তিভঙ্গের পর্ব। এই পর্বে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তায় সমাজ-সচেতনতার প্রতিফলন স্বাভাবিক-ভাবেই ঘটে। ইংরেজী সাহিত্যেও উপন্যাস সৃষ্টির আদি পর্বে এটা লক্ষ্য করা যায়। এর উদ্দেশ্য সমাজ-সংস্কার ও চিত্তশুদ্ধি। ডেফো (Defoe) যখন 'দি রিভিয়্যু' (The Review) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অষ্টাদশ শতকের প্রথমে, তখন ঐ পত্রিকায় সমাজ-জীবনের বিতর্কমূলক দিকগুলো সম্বন্ধে হাস্যরসাত্মক রচনা প্রকাশ করতেন এই শিরোনামায়—'Advice from the Scandalous Club,' রচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক বলেছেন—'which

dealt humorously with controversial aspects of social life of the day."১৫

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের সমাজ-আর্থনীতিক কাঠামোয় যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা করা যায়। সমাজে বণিক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা, ধনতন্ত্রের প্রসার, নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে নতুন শ্রেণীবিন্যাস ঘটল এবং সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উন্মেষিত হল। এই সমাজ পরিবর্তনের পটভূমিকায় শহরগুলিতে ও শিল্পাঞ্চলে অসংখ্য কফিহাউস, ক্লাব ইত্যাদি গড়ে ওঠে যেখানে বিচিত্র মানুষের ভীড় দেখা যেতে লাগল, 'Journalists, Poets and novelists dealt with this world of coffee-house and tavern, of church, theatre, and club, of book and printshop, of street market, pleasure-garden, and residential square, until no territory seems more familiar;······ London's special significance was as the symbol of national life; the popular pulse beat strongest there, in the turbulance of mobs, the enterprises of trade, the schemes of politics, the curiosity of intellect, the pursuit of amusement."১৬ এই নানা ধরণের মানুষের চিন্তা-ভাবনা, আশা-নিরাশার ও আচার-আচরণের উপযুক্ত সাহিত্যিক বাহন হয়ে দাঁড়াল গদ্যে রচিত ব্যঙ্গ-কৌতুক ও রূপকাশ্রয়ী রচনা। ডেফোর 'রবিনশন্ ক্রুশো' (১৭১৯), সুইফ্‌ট এর 'গালিভার্‌স্ ট্রাভল্‌স্' (১৭২৬), হেনরি ফিল্ডিং এর 'টম্‌জোনস্' (১৭৪৯) ইত্যাদি ঐ সময়ের সৃষ্টি। ডেফো তাঁর নিজের রচনাকে 'উপন্যাস' বলেন নি; সাংবাদিকতার দৃষ্টিতে তিনি নিজের সমাজে যা দেখেছেন, তাকেই সহজভাবে পরিবেশন করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় বলা যায়— 'a downright plainness, and to speak home both in fact and in style.' ডেফোর 'মল্ ফ্লাণ্ডার্স' (১৭২২) আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন—'Defoe was as admirably fitted to tell the inside truth about human rougery and rascality as

to iilustrate the vigor and toughness of the human spirit.'১৭ সমকালীন ইংলণ্ডের সমাজের প্রগতির সপক্ষে ডেফোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষ স্মর্তব্য, 'দি উইক্‌লি রিভিয়্যু' পত্রিকায় লিখিত তাঁর প্রবন্ধগুলি উল্লেখ করে উক্ত সমালোচক মন্তব্য করেছেন—'Some of this writing shows Defoe to have been a most progressive thinker for his time. He urged education for woman, a University of London, a founding hospital, religious tolerance, the same law for the rich and the poor······'১৮ ডেফোর রবিন্‌শন্ প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের অন্যদেশে প্রভূত্ব-কামী বণিক সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি। আবার স্যুইফ্‌ট ছিলেন সমকালের মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষের সামাজিক অধিকারের দাবিকেই ব্যঙ্গ-শিল্পের আধারে পরিবেশন করেছেন। সমাজের নীচতা, হীনতা, উচ্চশ্রেণীর মানুষের কুৎসিত স্বরূপ ইত্যাদি সবকিছুকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ক্ষুদ্রাকৃতি লিলিপুটদের রূপকে তিনি নীচুমনের মানুষের কথাই তুলে ধরেছেন। ব্যক্তিজীবনে প্রচলিত সমাজ থেকে পাওয়া লাঞ্ছনা-অবমাননার প্রতিশোধ তিনি নিয়েছিলেন তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলিতে। টমাস্ কার্লাইলের স্যুইফ্‌ট সম্পর্কে মন্তব্য এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে—'By far the greatest man of that time, I think ; was Jonathan Swift··············· He saw himseit in a world, of confusion and falsehood, no eyes were clearer to see it than his."১৯ হেন্‌রি ফিল্ডিং তাঁর 'টম্ জোন্‌স'-এ ঐ শতাব্দীর ইংলণ্ডের সমাজ ও মানুষকে হুবহু আঁকলেন। সমকালীন সমাজ-পটভূমিতে টম্‌কে রেখে বিচিত্র চরিত্রের মানুষের (ব্লিফিল্, ব্ল্যাক জর্জ, অলওয়ার্থি স্কোয়ার ওয়েস্টার্ণ, লেডি বেল্লাস্‌টন্ মলি সিগ্রিম্ ইত্যাদি) আবির্ভাব ঘটিয়ে এপিকধর্মী সমাজচিত্র রচনা করলেন এবং টম্-সোফিয়া-ব্লিফিলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র তুলে ধরে আধুনিক বাস্তবতাভিত্তিক উপন্যাসের পথও প্রশস্ত করলেন। ফিল্ডিং-এর চিত্রিত সমাজ ও

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় এই উদ্ধৃতিতে— 'The Society that Fielding painted was a coarse and noisy one, but Fielding draws attention to the fact that 'its bark is worse than its bite', that it is more frivolous and thoughtless than deliberately bad. His genial humour playing over its rough surface, easily and spaciously irradiates everyone who is not a hypocrite or a muff. The essential humanity of his characters is their most attractive asset and this it is that gives such vitality to his work·········
Fielding's attitude was not merely a negative one; his object was to replace a morbid by a healthy, common sense morality.'[২০] তারপর উপন্যাসের শিল্প-রূপকে স্মলেট্, ডিকেন্স্, থ্যাকারে প্রমুখেরা আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এখানে সেসবের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, শুধু এইটুকু মনে রাখা দরকার যে, ঐ সময়ের ইংলণ্ডে আরও বহু স্যাটা-য়ারধর্মী রচনা লেখা হয়েছিল যেগুলির মধ্যে লেখকদের তির্যক মনোভঙ্গীর পশ্চাতে সমাজ-সংস্কার প্রবণতাই প্রধান ছিল। গদ্য ভাষায় সমাজের নানা অসঙ্গতির ব্যঙ্গ চিত্র-রচনার নৈতিক উদ্দেশ্যই হল সমাজের মানুষকে সচেতন করার মাধ্যমে নতুন সমাজ-পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। আর এই জাতীয় রচনার উদ্ভবের সাহিত্যিক ফলশ্রুতি হল কথাসাহিত্যের জন্ম। পরিশেষে উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা ও অধিকারের প্রশ্ন এবং স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টিও বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল, যার ফলে ঐ শতাব্দীর শেষে জেন্ অস্টেন্, হান্না মোর ফ্যানি বারনি প্রমুখ লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটেছিল।

উনবিংশ শতকের বাংলার সমাজ-পটভূমিকায় অনুরূপ এক বাস্তব পরিস্থিতিতে এ দেশের গদ্যভাষায় ব্যঙ্গাত্মক ও উপন্যাস-কল্প রচনাগুলি সৃষ্টি হল। আমাদের দেশে প্রাক্-উনিশ শতকের সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রসাত্মক বা সমাজ-সমস্যামূলক রচনা যে ছিল না, তা

নয়। সেগুলি ছিল মূলতঃ পদ্যের ভাষায় ও কবিওয়ালাদের গানে বা টপ্পায়। উপযুক্ত গদ্যভাষা, মুদ্রণযন্ত্র, সাময়িক পত্র ও নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব না হওয়ায় সে যুগে গদ্যে রচিত নক্শা ও ব্যঙ্গ সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা গদ্যের বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিল। তারপর ১৮১৮ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে সমাচার-দর্পণ, বাঙ্গাল গেজেটি, দিগ্‌দর্শন, সম্বাদ-কৌমুদী, সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-প্রভাকর ইত্যাদি পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়, এবং সেই সঙ্গে মুদ্রণশিল্পেরও ক্রমশঃ উন্নতি হয়, ঠিক যেমনটি ইংলণ্ডে হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে। অপরদিকে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবে সমাজের প্রাচীন মূল্যবোধগুলোর প্রতি যেমন সংশয় দেখা দিল, তেমনি ব্রিটিশ কোম্পানীর অনুগ্রহপুষ্ট বেনিয়াবৃত্তিধারী ও নতুন ভূস্বামী সম্প্রদায় সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করার পর অত্যধিক বিলাস-ব্যসনে জীবন কাটাতে থাকে। এরাই প্রকৃতপক্ষে 'বাবু' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। 'বাবু' সমাজে মদ্যপান, বেশ্যাসক্তি, সন্ধ্যায় বাঈজীনাচের আয়োজন, দিনের বেলায় পায়রা ও বুলবুল নিয়ে খেলা ইত্যাদি আভিজাত্যের লক্ষণ বলে বিবেচিত হত। শিবনাথ শাস্ত্রী এই 'বাবু' সম্প্রদায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

> 'তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থা-বিহীন হইয়া ভোগ-সুখেই দিন কাটাইত।·········মুখে, ভ্রুপার্শ্বে ও নেত্রকোলে নৈশ অত্যাচারের চিহ্ন-স্বরূপ কালিমা-রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিন্‌-ফিনে কালোপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মস্‌লিন বা কেম্‌ব্রিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগ্‌লস্ সমন্বিত চিনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ, আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীত বাদ্য ও আমোদ করিয়া দিন কাটাইত···'২১

এই বাবু-সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণের প্রভাব সমাজে; বিশেষ করে কলকাতার যুবসম্প্রদায়কে সংক্রমিত করেছিল। শিক্ষালাভের আশায় শহরে এসে যে সমস্ত বালক অভিভাবকহীন অবস্থায় অপরের বাসায় বাস করত, তাদের অধিকাংশেরই চারিত্রিক অবনতি যে কি পরিমাণে ঘটত তার পরিচয় পাওয়া যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষ্যে: 'বালকদিগের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিত হইয়া যাইত।······ অনেকে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি পড়িয়া, বুট পায়ে দিয়া, দাঁতে মিশি লাগাইয়া ও বাঁকা সিতে কাটিয়া সহরের বাবুদের অনুকরণের প্রয়াস পাইত; চরস গাঁজা প্রভৃতি খাইতে শিখিত; এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইত।'২২ শুধু তাই নয়, সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও 'বাবু'-সম্প্রদায়ের চারিত্রিক দোষগুলি ক্রমে দেখা দিতে লাগল - 'তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল।··· যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন।'২৩

সংক্ষেপে বলা যায় যে, কোম্পানীর অর্থানুকূল্যে স্ফীতকায় ঐ আধুনিক কালের বিত্তবান বাবু-সমাজের উৎকট ও রুচিবিগর্হিত জীবনাচরণের মধ্যে তখনকার সাহিত্যিকরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের প্রচুর উপাদান খুঁজে পেলেন—যার ভিত্তিতে স্যাটায়ারধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি করলে একদিকে যেমন পাঠকের অভাব হত না, অপরদিকে সে-গুলি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পেত। এ ছাড়া, রক্ষণশীল হিন্দুরা তখন সংস্কারপন্থীদের ও ইয়ংবেঙ্গলদের কার্যকলাপও পছন্দ করত না, আবার ব্রাহ্ম, হিন্দু ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বিরোধ ছিল তীব্র; ফলে একে অপরকে আক্রমণ করবার জন্য স্যাটায়ারের আশ্রয় নিত এবং স্ব স্ব গোষ্ঠীর পত্রিকায় নানা ধরণের ব্যঙ্গরচনায় বিরোধী মতকে আক্রমণ করে স্বমতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে চাইত। এই ধরণের এক জটিল সামাজিক

পরিস্থিতিই ব্যঙ্গ ও নক্সা-জাতীয় রচনার অনুকুল আবহাওয়া সৃষ্টি করে এবং ঐ জাতীয় রচনার ক্রমপরিণতি হল উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম, পূর্বেও আমরা সেকথা উল্লেখ করেছি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবের পূর্ববর্তী স্তরের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : 'দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া অনুসৃত ধর্মানুষ্ঠান ও আচার-ব্যবহার যথন আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়, তখন আলোচনার ধারা যুক্তিতর্কের মন্থর প্রণালী ছাড়াইয়া হৃদয়াবেগের বেগবান প্রবাহের সহিত সংযুক্ত হয়--তথ্যবিচার সাহিত্য পদবীতে উন্নীত হয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপশ্লেষের মার্জিত দীপ্তি ও শাণিত তীক্ষ্ণতা এই মানস-উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ-স্বরূপ যুক্তিতর্কের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোকপৃষ্ট বর্ষাফলকের মত ঝলকিত হয়। এই শ্লেষপ্রধান মনোভাব ক্রমশঃ আশু প্রয়োজনীয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়াইয়া নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সমাজ-জীবনের উপর বিস্তৃত হয়। সমাজ-জীবনের ব্যাধি-বিকার, আতিশয্য-অসঙ্গতির প্রতি মন সহসা সচেতন হইয়া ওঠে-এই নবজাগ্রত দেবতার জন্য বলি খুঁজিয়া বেড়ায়। সম-সাময়িক সামাজিক অবস্থার শ্লেষাত্মক পর্যবেক্ষণ ও ইহার হাস্যোদ্দীপক, বিসদৃশ দিকগুলির ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন উপন্যাস রচনার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর।' (পৃঃ ২১-২২) আবার অপর একজন সমালোচকের মতে—'নূতন ও পুরাতনের সংঘাতে প্রাচীন ও নবীন উভয় দলই বিদ্রূপাত্মক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং উহার ফলে শুধু যে বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনার বিশেষ বিকাশ হইল তাহাই নয়, পূর্বেকার যুগে যে বিদ্রূপ সহজ পরিহাস মাত্র ছিল, পরবর্তী যুগে ধর্ম ও সমাজ-সংক্রান্ত একটা বিবাদের মধ্যে পড়িয়া উহা তীক্ষ্ণ 'সেটায়ারে' পরিণত হইল। এই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের সাময়িক পত্রাদিতে ব্যঙ্গ-রচনার বহু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।'[২৪]

আমাদের তৎকালীন বাঙালী সমাজে নবোদ্ভূত 'বাবু' সমাজের চরিত্রের অন্তঃসারশূন্যতা ও বাহ্যিক আচরণের হাস্যকর অসঙ্গতির প্রথম পরিচয় লাভ করি ১৮২১ খ্রীঃ (২৪ ফেব্রুয়ারী ও ৯ জুন) 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় তিলকচন্দ্র চরিত্র আলোচনায়।[২৫]

শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ধনীর দুলালের চারিত্রিক অধঃপতন ও চাটুকার পরিবেষ্টিত হয়ে নানা অসঙ্গত আচরণ পাঠকের মনে নিঃসন্দেহে বিদ্রূপাত্মক হাসির উদ্রেক করে। ১৮২১-২২ এর মধ্যে 'বাবুর উপাখ্যান' ছাড়াও শৌকীনবাবু, বৃদ্ধের বিবাহ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ইত্যাদি নামে আরও কিছু ব্যঙ্গাত্মক কৌতুকপূর্ণ আলোচনা 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এগুলি খুব সম্ভব ভবানী চরণেরই (বন্দ্যোপাধ্যায়) রচনা'।২৬

॥ দুই ॥

নববাবু বিলাস—১৮২৩খ্রীঃ 'প্রমথ নাথ শর্মণ' এই ছদ্ম-নামে ভবানীচরণ 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন, এবং এই গ্রন্থই প্রথম বাস্তব-ভিত্তিক উপন্যাসের দাবিদার।২৭ আবার কেউ ভবানীচরণকে 'বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম প্রবর্তক'ও বলেছেন। সমসাময়িক আরও তিনটি রচনা এখানে উল্লেখ্য—দূতীবিলাস, নববিবিবিলাস ও কলিকাতা-কমলালয়। দূতীবিলাস ও কলিকাতা কমলালয়-এর রচয়িতা যে ভবানীচরণ তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ এ দুটি তাঁর স্বনামেই বার হয়। কিন্তু 'নব-বাবু বিলাস' যেমন ছদ্মনামে বার হয়েছিল, তেমনি 'নববিবি-বিলাস'ও বার হয় ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। ভবানীচরণ, প্রমথনাথ ও ভোলানাথ একই ব্যক্তি কিনা বা উপরোক্ত গ্রন্থ চারটি এক ব্যক্তির অর্থাৎ ভবানীচরণের লেখা কিনা সে বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'নববাবু-বিলাস' ভবানীচরণেরই রচনা,২৮ এবং বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও সমালোচকেরা প্রায় সকলেই ঐ সিদ্ধান্তে একমত।২৯ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমাদের বিষয়ানুগ নয়, আমাদের বিচার্য গ্রন্থের বাস্তবতা বিচার ও বিশ্লেষণ এবং উপন্যাসের পরিণত বাস্তবতার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে সেগুলির মূল্যায়ণ। এই বিচারের সময়ে আমরা পূর্বে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যানের উদ্ধৃতিও কোথাও কোথাও দেব,

কারণ 'নববাবুবিলাস'কে ঐ উপাখ্যানেরই পরিণত রূপ ও 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর পূর্বরূপ বলা হয়ে থাকে।৩০ নগর-বাংলার আধুনিক ধনী সমাজের গ্লানিময় ও কদর্য পারিবারিক জীবনের বাস্তবচিত্র কৌতুকপূর্ণ কাহিনীর মাধ্যমে 'নববাবুবিলাসে'ই প্রথম সার্থকভাবে পরিবেশিত হয়েছে। অন্তঃসারশূন্যতা, পরমুখাপেক্ষিতা ও তোষামোদপ্রিয়তার পরিণাম যে কত মর্মান্তিক হতে পারে, উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী 'বাবু'র জীবনের পরিণতিই তার প্রমাণ। তবে লেখক মূলতঃ ছিলেন সাংবাদিক, তাই সাংবাদিকের দৃষ্টিতে ঐ সমাজকে যে ভাবে দেখেছেন তারই নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। ঔপন্যাসিকের শিল্পকুশলতা তাঁর পক্ষে সেকালে আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না, তাই চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন, ব্যষ্টি-সমষ্টির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নানা উপকাহিনীর অবতারণায় জটিলতা সৃষ্টি এবং বক্তির কালোপযোগী অভীপ্সার স্ফুরণ ঘটিয়ে সম্পূর্ণতাদানের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটানো বোধ হয় তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না।

একদা রামমোহন-সহযোগী ভবানীচরণ ছিলেন মূলতঃ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ, কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রগতিবাদীদের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে তাঁর চিন্তার বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। স্ত্রী-শিক্ষা, সতীদাহ নিবারণ, বিধবা-বিবাহ-প্রচলন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সমাজে যে সব আন্দোলন ধীরে ধীরে তীব্রতর হয়ে ওঠে, তার সঙ্গেও নিজেকে যেমন যুক্ত করতে পারছিলেন না, আবার নববাবু-সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ স্বাভাবিক ভাবে তাঁর মানস-বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। সেই বিক্ষোভকেই গ্রন্থটির ব্যঙ্গ-কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন।

সমগ্র রচনাটি চিত্রধর্মী, অবশ্য এই চিত্রে বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজ সামগ্রিকতায় উদ্ভাসিত হয় নি, খণ্ডিতচিত্র মাত্র; 'বাবু' শ্রেণীর পারিবারিক জীবনের নৈতিক অধঃপতনের গ্লানিময় চিত্র। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত কাহিনী হতে আমরা জানতে পারি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে মুনাফাকারী ব্যবসায়ীদল ভেজাল দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা লুটত।

আমাদের দেশ হতে চীনে আফিম রপ্তানি করা হত। ভেজাল আফিম চালান করে ধনবৃদ্ধির একটি চিত্র পাই ঐ কাহিনীর মধ্যে—'দেওয়ান চক্রবর্ত্তী দেখিলেন যে আকাঙ্ক্ষামত ধনবৃদ্ধি হয় না অতএব কৃত্রিম অকৃত্রিম আফীম প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন।'৩১ এই দেওয়ানজী-রাজচক্রবর্ত্তীর পুত্রই বাবু তিলকচন্দ্র বা 'নববাবু'। নববাবুর লক্ষণ সম্বন্ধে কাহিনীর ১ম পরিচ্ছেদে লেখক বলেছেন—

'ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান্।
অষ্টাহে বনভোজন এ নবধা বাবুর লক্ষণ'॥

নববাবুর সর্বাঙ্গে 'দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার, বাজুবন্দ উপলক্ষে ইষ্টকবচ গোটাচাবির শিকলি' ইত্যাদি গহনা এবং পরিধানে—'কাল-পেড়ে রাঙ্গাপেড়ে শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে ছাইপেড়ে ধুতি। ইহলোকের সর্বপ্রকার ঐহিক সুখভোগই যে বাবুজীবনের চরমলক্ষ্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই উক্তির মধ্যে—'এই অনিত্য সংসারে কেবল শারীরিক সুখভোগই সত্য, কোনদিন মরিয়া যাইব যত সুখ করিয়া লইতে পারি……।'৩২ এই কারণে সারাদিন চাটুকার পরিবেষ্টিত হয়ে নির্গুণের গুণ-কীর্তন শ্রবণ করে বুঁদ হয়ে থাকেন, আবার কখনও ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলতে মত্ত থাকেন, আর রাত্রি যাপন করেন বেশ্যালয়ে। এঁরা যেন বাদশাহী আমলের আত্মসুখান্বেষী বিলাসী স্বেচ্ছাচারী বাদশাহের আধুনিক সংস্করণ। এঁদের ব্যক্তিগত খেয়াল ও সুখান্বেষণের সামাজিক প্রতিক্রিয়া হ'ল এই যে, সেদিনের সমাজে বেশ কিছু সংখ্যক অলস চাটুকারের সৃষ্টি হয়েছিল। অসহায় দায়গ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের সতীত্ব রক্ষা করা হয়ে উঠেছিল দুষ্কর, কারণ—'বাবুর নিকট যদি কোন লোক আসিয়া কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত, বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া কহেন যে এ তোমার কোন দায় আমি সকল উদ্ধার করিব…………বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রীলোক কোনদিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।'৩৩ কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ঐ বাবুসম্প্রদায়

যে সমাজের দুস্থ দরিদ্রশ্রেণীকে কোন সাহায্যই করতো না তার প্রমাণস্বরূপ লেখক বলেছেন,—'বাবুর নিকট অনেক লোক গমনাগমন করে তাহাতে ব্যবহার প্রায় প্রকাশ আছে যদি কোন ভিক্ষুক বাবুর নিকটে যায় ও আপন পিতৃমাতৃ বিয়োগাদি দুঃখ জানায় তাহাতে কহেন আমি কিছু দিব না যাও আর দিক করিও না···।'৩৪ বরং দুর্বল শ্রেণীর উপর, এমনকি দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের উপরও অত্যাচার করতে তাঁরা দ্বিধা করতেন না—'বাবুর অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাসদাসীর প্রতি যদি রাগ হয় তবে সেই প্রকার ইংরাজী ঘুঁশা মারেন এবং কহেন যে হামারা পিট্টল লেআও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন তাহাতে পুরুষার্থ বিবেচনা করেন।'৩৫

সমাজে সেদিন ইংরেজের অধীনে চাকুরিজীবীরাই বিত্তবান ও মান্য-গণ্য হয়ে উঠেছিলেন। তিলকচন্দ্রের ভাবনার দর্পণে তার প্রতিবিম্ব'—আমার পিতা চাকরি করিয়া এত বিষয় করিয়াছিলেন তাহাতে আমি মান্য অতএব আমার চাকরি কর্ত্তব্য চাকরি না করিলে লোকে মানে না ও দশজন প্রতিপালন হয় না।'৩৬ বাবুশ্রেণীর দ্বারা 'দশজন প্রতিপালন' হত কিনা সন্দেহ থাকলেও তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী ও খেয়াল-খুশি চরিতার্থের জন্য যে অর্থব্যয় হত তাতেই সমাজে অনেকের উপার্জনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। চাকুরীজীবীদের অধিকাংশই ছিল মুহুরী কিম্বা মুনসী অথবা কেরানী, আর সেই জন্যই তাদের 'ইংরাজী পারশী আরবী নাগরী ফিরিঙ্গী আরমানি ইত্যাদি ভাষা শিখতে হত, কিন্তু বাবুরা এসব কিছু উত্তমরূপে না শিখেই নিজেদের পণ্ডিত ভাবতেন। মঙ্গলানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে বাড়ীতে 'টিকটিকির নাচ ও ভেকের গান' ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত পরিবারেও যে অনুষ্ঠিত হত—তিলকচন্দ্রের জন্মের পর দেওয়ানজীর বাড়ীতে ঐ জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনই তা প্রমাণ করে।

নববাবুবিলাসে যেমন বাংলার বৃহত্তর সমাজের কথা নেই, তেমনি নেই বাবুপরিবারের অন্তঃপুরচারিণীদের কথা, তারা যেন উপেক্ষিতা। ভবানীচরণ বোধ হয় এই ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যেই

পরে 'নববিবিবিলাস' (১৮৩০) গ্রন্থ প্রকাশ করেন, অবশ্য এর অন্য লক্ষ্যও ছিল। লেখকের মন্তব্য এখানে উদ্ধারযোগ্য :

"যদ্যপি 'নববাবু-বিলাসে' নববাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু সে গ্রন্থের ফলখণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবু-দিগের বিবি। সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই। এই নিমিত্তে তৎপ্রকাশে প্রয়াসপূর্ব্বক 'নববিবিবিলাস' নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।'৩৭ কাজেই 'নববিবিবিলাস' গ্রন্থখানি 'নববাবুবিলাসেরই পরিপূরক। এখন ভবানীচরণের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণে রেখেই তাঁর সমাজ-চেতনার প্রকৃতি বিচার্য। সমকালীন সমাজের প্রগতিশীল সমাজ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাঁর ভূমিকা নিঃস-ন্দেহে প্রতিক্রিয়াশীল। সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে 'ধর্মসভা' (১৮৩০) গঠনে তাঁর উদ্যোগ স্মরণীয়। নবযুগের নবচেতনার সঙ্গে প্রথাসিদ্ধ চিন্তা ও সংস্কারের যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল তাতে ভবানীচরণ ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন নি সত্য, কিন্তু নববাবু-দের অসুস্থ জীবনাচরণ যে সুস্থ সমাজের পক্ষে ক্ষতস্বরূপ সে উপলব্ধি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। তাই তিনি যথেচ্ছচারী ধনীসম্প্রদায়ের মত-পথ, ধ্যান-ধারণার প্রতি বিদ্রূপের কশাঘাত হেনেছেন, নৈতিক অধঃপতনের স্তর হতে লুপ্তচেতন সম্প্রদায়ের চৈতন্যোদয়ের প্রয়াসেই 'নববাবুবিলাসের' সৃষ্টি করেছেন। এর আগেও অনেকে নানাভাবে জাতীয়-চেতনা উন্মেষের চেষ্টা করেছেন, সুস্থ ও আদর্শজীবনবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির গ্লানিময় কদর্যতাকে বর্জন করার উপদেশ দিয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে, কি তাকে গদ্য-ভাষায় কাহিনীর মধ্যদিয়ে সরস ব্যঙ্গচ্ছলে পরিবেশনের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থাকারে প্রকা-শের পর ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (ত্রৈমাসিক) পত্রিকায় এর প্রশংসা করে লেখা* হয় 'It is a Satirical view of the education and habits of the rich, and more especially of those families which have very recently acquired wealth and risen

into notice······ With all its defects, 'it is a valuable document, it illustrates the habits and economy of rich native families, and affords us a glance behind the scenes.'৩৮ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পাদরী লংসাহেবও এই গ্রন্থটির প্রশংসা করেছিলেন: 'One of the ablest Satires on the Calcutta Babu, as he was 30 years ago.''৩৯ কাহিনী উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ, অতএব সেই হিসেবেও ভবানীচরণ উপন্যাস-শিল্পের অবয়ব নির্মাতাদের পথিকৃৎ। জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন: 'স্যাটায়ারধর্মী এই সব রচনা নীতিশিক্ষা এবং সামাজিক চৈতন্য-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লিখিত বলিয়া গল্প বা উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই; উপন্যাস বা গল্পের কাঠামোতে রচিত হইলেও এগুলি সূত্রাকারে গ্রথিত বিচ্ছিন্ন চিহ্ন মাত্র।'৪০ কিন্তু এই চিত্রধর্মী গভরচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—এখানে কাহিনী রূপকথা-উপকথার কল্পলোক থেকে নেমে এসে বাস্তব সমাজের উপাদান-সমৃদ্ধ হয়ে মানবজীবনকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে—তাই বলা যায় উপন্যাস-সাহিত্যের অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছে এই গ্রন্থের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই।

ভবানীচরণের 'বিলাস' চিহ্নিত ব্যঙ্গরচনা তিনটির (নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস ও দূতীবিলাস) মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য সুস্পষ্ট, এতে যে বিলাস- ব্যসনে অভ্যস্ত এক বিশেষ শ্রেণীর জীবন প্রতিফলিত হয়েছে তা নামকরণেই বোঝা যায়। তাছাড়া, স্বয়ং লেখকও 'নববিবিবিলাসে' (১৮৩০) প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন যে, নববাবুবিলাস ও দূতিবিলাস নববিবিবিলাসেরই যথাক্রমে পূর্বখণ্ড ও উত্তরখণ্ড।৪১ কোন ব্যক্তি-বিশেষের নয়, সমাজের একাংশের শ্রেণীবিশেষের জীবনাচরণই ব্যঙ্গের প্রধান লক্ষ্য। তাই নববাবুবিলাসের 'বাবু' বা নবরিবিবিলাসের 'বিবি' নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিচরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে না। 'নববাবুবিলাসে' যেমন ধনীর মূর্খ ও উচ্ছৃঙ্খল সন্তানদের কদর্য জীবনাচরণ ও তার পরিণতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরে সমাজের মানুষকে তা থেকে নিবৃত্ত করার বাসনা

ফুটে উঠেছে, তেমনি 'নববিবিবিলাসে' কলকাতার বারাঙ্গনাদের আচরণ ও তাদের জীবনের চরম পরিণতির বস্তুনিষ্ঠ পরিচয়-প্রদানের মাধ্যমে গৃহস্থবধূ ও কন্যাদের সমাজের কুটনী ও লম্পটদের সম্পর্কে লেখকের সতর্কীকরণের প্রয়াস স্পষ্ট। তাই এতে একই সঙ্গে সমাজের বাস্তবচিত্র ও লেখকের সংস্কার-প্রবণতা দুই-ই রয়েছে। আবার শ্রেণীবিশেষের জীবনকথা নির্দিষ্ট বাবু ও বিবির ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় উপন্যাসের কাহিনী গঠনের অস্পষ্ট রূপটিও ফুটে উঠেছে। ভাষাগত দুর্বলতা ছাড়া সমাজ-বাস্তবতাপূর্ণ উপন্যাসের উপাদানগুলি বিক্ষিপ্তভাবে এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সামাজিক সমস্যার চিত্র আছে, সমস্যা সম্পর্কে লেখকের মনোভঙ্গীটিও ফুটে উঠেছে, সমাধানের ইঙ্গিতও প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। সামাজিক সমস্যা একটি বিশেষ ঘটনার অবলম্বনে সুনির্দিষ্ট পাত্র-পাত্রীর জীবনে আরোপিত হয়ে এবং নানা ঘটনার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও চরিত্রের সক্রিয়তার মধ্যদিয়ে ক্রমপরিণতির দিকে পরিচালিত হয় উপন্যাসে। সেযুগে ভবানীচরণের কাছে ঐ ধরনের সুষ্ঠ শিল্পরীতি আশা করা সমীচীন নয়। তবে তাঁর গভীর বস্তুনিষ্ঠা ও চিত্রনৈপুণ্য প্রশংসনীয়, সর্বোপরি 'নববিবি-বিলাসে' বেশ্যাসক্ত স্বামীর সাহচর্যবিহীনতায় কুলবধূর অন্তর্বেদনা ও মানসিক প্রতিক্রিয়া উদ্‌ঘাটনে মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তাই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য বিকশিত হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্বে এই জাতীয় গ্রন্থ রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

গ্রন্থখানির আলোচনার শেষ পর্বে উল্লেখ্য যে, ঊনবিংশ শতকের সমাজ-বাস্তবতার চিত্রায়ণই শুধু নয়, এ গ্রন্থটি পরবর্তী-কালে সমজাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির পথিকৃৎ-স্বরূপ। যদিও এসম্পর্কে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, তবু এগ্রন্থের সাহিত্যিক ফল-শ্রুতির প্রসঙ্গেই দুচার কথা বলা প্রয়োজন কারণ বাংলার সমাজে ঐ 'বাবু' শ্রেণীর উদ্ভব, কালক্রমে তাদের নানা রূপান্তর ও তাদের অনুসৃত জীবনধারাকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির প্রবণতা বহুদিন যাবৎ অব্যাহত ছিল এবং তথাকথিত 'বাবুকালচার' (Babu

Culture) বাংলার এক অস্থির ও দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ সামাজিক পটভূমি-কায় সমাজ-কাহিনী ভিত্তিক গদ্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও পরি-পুষ্টি সাধনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। সম্প্রতি কোন কোন গবেষক 'বাবু' শ্রেণীর উৎপত্তি, তাদের বংশ ও গোত্রবিচার ইত্যাদিতে প্রয়াসী হয়েছেন।৪২ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা ছাড়াও সমকালের পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় 'বাবু'দের সম্পর্কে আলোচনাই যে প্রধান স্থান পেত তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।৪৩ শিবনাথশাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে (পৃঃ ৫৬), রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে (পৃঃ ৭৮), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকরহস্যে' (হনুমদ্বাবু সংবাদ ও বাবু-নিবন্ধ) ও 'অধঃপতন সঙ্গীতে' নববাবু ও নব্য-বাবুদের কথাই রয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), মহেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা' (১৮৫৮), মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), কালীপ্রসন্ন সিংহের (?) 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২-৬৪), দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী (১৮৬৫), হরিশচন্দ্র মিত্রের 'ঘর থাক্তে' বাবুই ভেজে' (১৮৭২), প্রিয়নাথ পালিতের 'টাইটেল দর্পণ' (১৮৮৫) ইত্যাদি গ্রন্থ কোন-না-কোন শ্রেণীর 'বাবুদেরই জীবনাচরণের দর্পণ। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বিক্রমোর্বশী নাটক' (১৮৫৭) অনুবাদ করার আগে 'বাবু নাটক' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়, তবে গ্রন্থটির কোন নিদর্শন বর্তমানে পাওয়া যায়নি বলে 'সেটি কি বস্তু—প্রহসন অথবা নকৃশা তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নেই'।৪৪ যা হোক, উল্লিখিত তথ্য ও গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা হল শুধুমাত্র এটুকু তুলে ধরার জন্য যে কিভাবে 'নববাবু-বিলাসের' ঐ বাবু সম্প্রদায় প্রায় একশতাব্দী ধরে নানা পর্যায়ে বিভিন্ন রূপে বাংলা আখ্যানমূলক সাহিত্য-সৃষ্টির খোরাক যুগিয়েছিল।

॥ তিন ॥

ফুলমনি ও করুণার বিবরণ ঃ-

'নববাবুবিলাসের' পর আলোচ্য পর্বের যে গ্রন্থটি আলোচনার

দাবী রাখে সেটি হল হ্যানাক্যাথারিন্‌ ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২)। গ্রন্থটিকে 'প্রথম বাংলা উপন্যাস' বলে যেমন দাবী করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি আবার এর মৌলিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে।৪৫ ঐ বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বঙ্কিম-উপন্যাস প্রকাশ হওয়ার পূর্বে সৃষ্ট এই গ্রন্থটির সমাজ-বাস্তবতার বিচারের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। একথা ঠিক যে, বাংলার সমাজের সাধারণ বাঙালী পরিবারের কাহিনী নিয়েই এই গ্রন্থ গড়ে উঠেছে। সমসাময়িক বাঙালী সমাজে ধর্মের প্রতি সংশয় যেমন ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল, তেমনি আবার উৎকট ধর্মান্ধতাও নবতরবেশে প্রাবল্য লাভ করেছিল। একদিকে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ, অপরদিকে ধর্মের নব-ব্যাখ্যান, একদিকে হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে সরব প্রচার, অপরদিকে খ্রীষ্টানধর্মের উদারতার প্রতি ব্যাপকভাবে জনগণকে মোহাবিষ্ট করার প্রাণপণ প্রয়াস—এই ধরণের নানা বিরুদ্ধশক্তির টানা-পোড়েনে সেদিনের বাঙালী সমাজে মানস-সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। সেই বাস্তব সংকটের প্রতিবিম্বনই লক্ষিত হয় 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে'র কাহিনীগুচ্ছে। গ্রন্থখানি একাধিক পরিবারের একান্তভাবে ঘরোয়া জীবনভিত্তিক কাহিনীনির্ভর, কাহিনী গুলিও ধারাবাহিকতাবিহীন ও পরস্পর বিপরীতমুখী চিত্রসমৃদ্ধ। গ্রন্থখানি যে উদ্দেশ্যমূলক লেখিকা তা প্রকাশককে লিখিত এক পত্রে ব্যক্ত করেছিলেন—'It is a book specially intended for native christian women. I have endeavoured to show in it the practical influence of christianity on the various details of domestic life.'৪৬ গ্রাম-বাংলার দরিদ্র পরিবারের গার্হস্থ্য জীবনে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও অবিশ্বাস যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার নিখুঁত চিত্র আমরা পাই এই গ্রন্থে। আবার যেহেতু একান্তভাবে পারিবারিক জীবন-কাহিনীই এর ভিত্তি, তাই স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রকৃতির নারী-চরিত্রগুলি গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে। তারাই রয়েছে পরিবারের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের কেন্দ্রবিন্দুতে, পুরুষ চরিত্রগুলি তাদের কেন্দ্র

করেই আবর্তিত। মূলতঃ গ্রন্থটি বাংলার পল্লীঅঞ্চলের সংস্কারাচ্ছন্ন গৃহিণীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে নীতিশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত। তবে লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গী খৃষ্টান ধর্মের সংকীর্ণতায় সীমিত থাকায় অ-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সবকিছুই মন্দ- এরকম সিদ্ধান্ত বাস্তবতার দিক হতে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়। লেখিকা নিজে এই গ্রন্থে একটি চরিত্র, তিনিই উত্তমপুরুষে কাহিনীর উপস্থাপনা, বিস্তার ও সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তিনি প্যারীকে দিয়ে একস্থানে বলিয়েছেন—'আমি আয়াকে কেবল মুসলমান ধর্মের দোষ দেখাইয়াছি, অতএব এখন আমাকে খ্রীষ্টীয় ধর্মের মহৎগুণ প্রকাশ করিতে দিউন' (পৃঃ ৭৬ ষষ্ঠ অধ্যায়), আবার অন্যত্র ফুলমণিকে লেখিকা স্বয়ং বলেছেন 'হিন্দুদের সহিত আমাদের প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয়, অতএব তাহাদিগকে কিছু শিক্ষা দেওয়া খ্রীষ্টিয়ান স্ত্রীলোকদের উচিত' (পৃঃ ৭৯ ষষ্ঠ অধ্যায়) – খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি লেখিকার পক্ষপাতিত্ব ও অ-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি উন্নাসিক অবজ্ঞা গ্রন্থের সমাজ-বাস্তবতার বিচারে কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি করে, কারণ এ-ক্ষেত্রে উপস্থাপিত বাস্তবতা একদেশদর্শী হতে বাধ্য—গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত ফুলমণির গ্রামের বর্ণনাই তার প্রমাণ—'গ্রামে প্রবেশ করিয়া প্রথমে চারি পাঁচখানা কুঁড়েঘর দেখিতে পাইলাম। তাহাদের উঠান অপরিষ্কার এবং তাহাদের সম্মুখে উলঙ্গ বালকেরা কাদা ও ধূলা দিয়া খেলা করত পুত্তলাদি গড়িতেছিল। সেই সকল ঘর যে খ্রীষ্টিয়ান লোকদের বাসস্থান তাহার একটিও চিহ্ন দেখিলাম না,······ এই কারণ আমি তাহাদের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া অগ্রে চলিয়া গেলাম' (পৃঃ ২) এর পরই ফুলমণির বাড়ীর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে ঃ—'উঠান সুন্দররূপে পরিষ্কৃত ছিল, তাহাতে যেমন প্রায় সকল ঘরে রীতি আছে তেমন কোনে কোনে জঞ্জালের রাশি দেখিতে পাইলাম না; সকল সমান পরিষ্কার ছিল। দাবার সম্মুখে ঘরের ছাঁচীর নীচে দশবারটি চারাগাছ গামলাতে সাজান দেখিলাম; তাহার মধ্যে তিন চারিটি ঔষধের গাছ ছিল, অন্য সকল গাঁদা তুলসী, গন্ধরাজ ইত্যাদি' (পৃঃ ৪)। তখনকার গ্রাম- বাংলার মানুষের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা হেতু দৈনন্দিন

জীবন যাত্রার মানের বাস্তব অবস্থার পার্থক্য যে এতখানি ছিল—তা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা কঠিন। তবে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' এর বিভিন্ন অধ্যায়ে পল্লীপ্রকৃতির যে আলেখ্য, গ্রামীন জীবন-যাত্রার যে নিরাবরণ প্রকাশ লক্ষ্য করি, তাতে লেখিকার বাস্তব-সচেতনতা – তা অতিরঞ্জন সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য, লেখিকার আন্ত-রিকতা সম্বন্ধেও কোন সংশয় থাকে না। আবার লেখিকার বাস্তব-' বোধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সংযোগের পরিচয় পাই গ্রন্থের ভূমিকায়...... for many of the incidents related in it have come under my own notice,'৪৭ আলোচ্য গ্রন্থে সমগ্র সমাজ তার রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই যেন এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। তৎকালীন এদেশীয় জীবন যাত্রার নানা খুঁটি-নাটি বিষয়েও লেখিকা সচেতন ছিলেন। গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেরা অধিকাং-শই উলঙ্গ থাকত, খুব বেশী হলে এক টুকরো ন্যাকড়া কোমরে জড়িয়ে রাখতো, নবীনের বর্ণনায় তার পরিচয় পাই – " সে প্রায় উলঙ্গ, কেবল তাহার কোমরে একখানি ছেঁড়া কানি বাঁধা ছিল।" (পৃঃ ৩১ তৃতীয় অধ্যায়)। পুরুষেরা যেমন মদ্যপান করত, জুয়ো খেলত, বেশ্যাসক্ত ছিল, তেমনি মহিলারাও তামাক খেত; করুণার মুখে তাই শুনি- 'কাপড়ের দুই একদিন বিলম্ব হলে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমরা তামাক না খাইলে মারা পড়ি' (পৃঃ ২৯ তৃতীয় অধ্যায়)। তখনকার দিনে দরিদ্র পরিবারেও পশু-পক্ষি পোষার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, লেখিকা ফুলমণির বাড়ীর সামনে গাছের ডালের উপরে লোহার দাঁড়ে শিকল দিয়ে বাঁধা সবুজ টিয়া পাখী দেখেছেন, করুণার বাড়ীতেও নেড়ি কুকুর পোষা ছিল—' যদ্যপি করুণা এমত দুঃখিতা ছিল, যে প্রায় আপনার পরিবারের আহারাদি যোগাইতে পারিত না, তথাপি তাহাদের ঘরে একটি নেড়ি কুকুর পোষা ছিল।' (পৃঃ২৯)

দারিদ্র্যের তাড়ণায় বা স্বভাব দোষে নিম্নশ্রেণীর পরিবারের পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের গালিগালাজ, এমন কি মারধোর পর্যন্ত করত, কৈশোর পার হলেই ছেলেরাও মদ্যপ ও জুয়াড়ি হয়ে উঠত, ফলে ঐ সব মহিলাদের জীবন (যারা একাধারে ঐ ধরণের সন্তান-

দের জননী, আবার লম্পট স্বামীর স্ত্রী) যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট; দুর্ভর হয়ে উঠত। গৃহবধূরা অপরিচিত অতিথির সামনে বের হয়ে কথা বলতেন না—এই অহেতুক লজ্জা দেখে লেখিকা ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে লজ্জার প্রয়োজন আছে 'কিন্তু সেই লজ্জা ঘোমটা দ্বারা নয়, বরং মনের শুদ্ধতা দ্বারা প্রকাশ' পাওয়া উচিত (পৃঃ ১২৮, ৯ম অধ্যায়)। লেখিকার মতে বাঙালী স্ত্রীদের ঐ জাতীয় লজ্জা 'কপট লজ্জা' 'কেননা তাহারা স্বামীর ঘরে একপ্রকার ও মাতাপিতার ঘরে অন্যপ্রকার ব্যবহার করে' (পৃঃ ১৩১)। লেখিকার বাস্তব অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় তখনই যখন তিনি বাঙালী মেয়েদের নিভৃত অন্তঃপুরের অপবিত্র কৌতুকাদির পর্যন্ত উল্লেখ করেন বা যে বধূ স্বামীর বন্ধুর সম্মুখে আসে না, অথচ বাপের বাড়ীতে মাথার কাপড় খুলে অপরিচিত ব্যক্তির সামনে হেসে গল্প করে, তার চিত্র তুলে ধরেন।

তখন গ্রামের লোকেরা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, অলৌকিক শক্তি, ডাইনী, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদিতে তারা যে বিশ্বাস করত তার প্রমাণ মেলে—মধুর স্ত্রী রাণীর সন্তান প্রসব হওয়ার দৃশ্য বর্ণনায় (৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য); আবার ঐ দৃশ্যেই বধূদের প্রতি শাশুড়ির স্নেহশূন্য নির্মম দৃষ্টিভঙ্গী ও হৃদয়হীন আচরণের মধ্য দিয়ে। রাণী যখন প্রসব যন্ত্রণায় ও ক্ষুধায় মুমূর্ষু তখন লেখিকা তাকে কিছু খাবার দিতে বলায় তার শাশুড়ী বলে— 'তাহার খাওয়ার বিষয় পশ্চাৎ হইবে, প্রথমে আমাকে ছেল্যা দিউক' (পৃঃ ৪৪)। লেখিকা মন্তব্য করেছেন- 'কিন্তু তার বউর কি গতি হয়, তাহাতে সে কিছুমাত্র ভাবিতা হইল না' (পৃঃ ৪৩)। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী মধ্যযুগের বাঙালীর একান্ন পরিবারভুক্ত শাশুড়ী-দের মধ্যে দেখা যেত, মধুর মা যেন তাদেরই উত্তরসূরী। সে সময়ে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হলেও সমাজ ব্যাপকভাবে তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি, কারণ অনেকের ধারণা ছিল শিক্ষিতা মেয়েরা স্বেচ্ছাচারী হতে ওঠে, তবে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের মধ্যেই যে সীমিত ছিল, ফুলমণি বলেছে—'আমাদের রমানাথ বাবুর স্ত্রীকে দেখ, এবং কোমল সরকারের স্ত্রী ও শশিভুষণ

মুখোপাধ্যায়ের দুই বউ, ইহারা সকলেই স্কুলের মেয়া,... ... ...
রাণী সকল মেয়াদের মধ্যে লেখাপড়াতে বড় নিপুণা.' (পৃঃ ৭)।
মেয়েরা কেউ কেউ জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় চাকুরি করতে যেত,
অবশ্য গ্রামের লোকেদের ধারণা ছিল বাইরে যাওয়ায় ঐ সব মেয়েদের
চারিত্রিক অধঃপতন ঘটে। লেখিকা ফুলমণির পঞ্চদশী কন্যা
সুন্দরীকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলে ফুলমণি বলেছে—
'বাঙ্গালীদের মধ্যে যুবতী মেয়া যে আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া
দূরদেশে চলিয়া যায়, তাহা প্রায় ভাল বুঝি না। কারণ যুবতীরা
অতিশয় চঞ্চলা এবং নির্বোধ হইয়া থাকে, ও দুষ্ট লোকেরা তাহা-
দিগকে যে পরামর্শ দেয় সেই পরামর্শ মত চলে' (পৃঃ ১২) সাহেব-
দের খানসামারা ছিল খুব প্রভাবশালী। তারা নবীনের মত
ছেলেমানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে যেমন কম পয়সা দিত, আবার
প্রলোভন দেখিয়ে যুবতী মেয়েদের চরিত্র নষ্ট করত। কলকাতায়
থাকাকালীন সুন্দরীর চরিত্র যে নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছিল- তা
সুন্দরী নিজেই স্বীকার করেছে- 'একজন যুব খিদ্‌মৎগার আমাকে
ভ্রষ্টা করতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে আমি তাহার কথা
সহ্য করিতে না পারিয়া মেমসাহেবকে জ্ঞাত করিলাম' (পৃঃ ১২৪)।
যে সমাজের চিত্র এখানে পাই সেখানকার মানুষেরা অধিকাংশই
ছিল ঈর্ষা-পরায়ণ ও অলস, অবশ্য দরিদ্র পরিবারের অনেক মেয়ে
অন্যের বাড়ীতে, এমন কি খ্রীষ্টান পরিবারেও রাঁধুনি বা আয়ার
কাজ করত, অবসর সময়ে আবার তারা বোনা-গাঁথা করে দু পয়সা
উপার্জন করত।

বিলাসিতা এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তখনও দেখা যায় নি।
তাই দেখি সাবানের পরিবর্তে সপ্তাহে একদিন বেসন দিয়ে মেয়েরা
চুল পরিষ্কার করে। পাঁচ টাকায় গোরুর ঘর বানানো যেত, নার-
কেল তেলের মন ছিল দশ টাকা, একখানি কাপড় কাচতে ধোপাকে
দিতে হত এক পয়সা, ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন
ছিল দশ টাকা, মোটা দেশী শাড়ীর দাম ছিল দশ আনা ইত্যাদি।
সব কিছুই যেন খুঁটিয়ে দেখে আলোচ্য গ্রন্থে লেখিকা এমন ভাবে
পরিবেশন করেছেন যাতে সুদূর ভবিষ্যতেও যে কোন পাঠকের মানস-

চক্ষে যেন তখনকার সমাজ অবিকল ভেসে ওঠে।

'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে' যে সমাজ বিধৃত হয়েছে তা যে বাংলা দেশের বৃহত্তর সমাজের সমসাময়িক ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনেও আন্দোলিত হয়েছিল তার পরিচয় স্পষ্টই রয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মের ব্যাপক প্রসার তখনও অব্যাহত ছিল না, এমন কি যেসব হিন্দু খ্রীষ্টান হয়েছিল তাদেরও আন্তরিক বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তাই লেখিকা একস্থানে খেদোক্তি করেছেন— 'কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে অনেকে ভক্ত খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা হিন্দু ও মুসলমানদের ন্যায় মন্দ আচার ব্যবহার করিয়া খ্রীষ্টের নামে কলঙ্ক দেয়' (পৃঃ ২৪)।

নারী-স্বাধীনতার আন্দোলনও সমাজে অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত ছিল, তাই দেখি সুন্দরী আপন অভিরুচি অনুযায়ী তার মেম-সাহেবার মালির পুত্র চন্দ্রকান্তকে প্রেমবশে স্বামীত্বে বরণ করেছে। তার পিতামাতার নির্ধারিত কলকাতার শিক্ষিত যুবক-টিকে সে বিবাহ করে নি, তার কারণ সে নিজেই বলেছে—'আমি তাঁহাকে চিনি না, এবং তিনিও আমার মনকে জানেন না; অতএব বিবাহ করিলে পশ্চাতে আমাদের সুখ কি দুঃখ হইবে তাহা নিশ্চয় নাই' (পৃঃ ১৩৫)। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বিবাহ করাকে সুন্দরী 'গুলিবাট' করা (অর্থাৎ লটারী বা পাশার সাহায্যে ভাগ্য নির্ণয় করা) বলে কটাক্ষ করেছে। এ কটাক্ষ সুন্দরীর নয়, স্বয়ং লেখিকার। সুন্দরী যদিও বাঙালী হিন্দু পরিবারভুক্ত নয়, তবে লেখিকা উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিবাহোত্তর জীবনে যে দাম্পত্য সংকট দেখা দেয় তার অন্যতম কারণ ঐ স্ত্রী ও পুরুষের পারস্পরিক পরিচয়ের অভাব। তাই বিবাহ বিষয়ে বাঙালী মেয়েদের স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতার দাবীকে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরে-ছেন আলোচ্য গ্রন্থে— 'বাঙ্গালী মেয়্যারা ইংরাজদের মত বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষদের সহিত আলাপ করিতে পায় না, এবং আলাপ না করিলে তাহাদের মনের ভাব কেমন তাহা তাহারা কি প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারিবে?......... এই দেশীয় মেয়্যারা যখন বিবাহের বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিবে, তখন আমি বড়

আহ্লাদিত হইব…' (পৃঃ ১৩৫) বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনেরও যে একজন বলিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন শ্রীমতি ম্যলেন্স, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে (পৃঃ ১৪১ দ্রঃ)। সুন্দরীর পাণিগ্রহণেচ্ছু কলিকাতার সেই যুবকটির সঙ্গে সুন্দরীর বিধবা বোন রাণীর বিবাহ দিয়েছেন লেখিকা; আর এই গ্রন্থ প্রকাশের ঠিক ৪ বৎসর পরেই বাংলাদেশে সত্যই প্রথম বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।৪৮ এই দিক দিয়ে বিচার করলেও গ্রন্থ-খানির ঐতিহাসিক মূল্যও প্রচুর।

উপরের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' একখানি সার্থক ও বলিষ্ঠ রচনা। সমকালীন সমাজের দোষত্রুটি যেমন লেখিকা তুলে ধরেছেন, তেমনি সমাজ-আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতে সমাজে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও দিয়েছেন। 'নববাবুবিলাস' অপেক্ষা আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনী-নির্বাচনে ও তার উপস্থাপনায় অভিনবত্ব লক্ষণীয়। পাঠক যেন এখানে উপাখ্যানের স্তর হতে উপন্যাসের কাছাকাছি এসে পৌঁছাল। সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্র হতে কাহিনীকে একান্তভাবে গৃহকোণে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং সেখানে প্রত্যেকটি চরিত্র আপন বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্টতা অর্জ্জন করেছে। করুণা চরিত্রের ক্রমবিবর্তন সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পেয়েছে, আবার মধু ও প্যারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অনুশোচনা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। উচ্ছৃ-ঙ্খল ও লাম্পট্যপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে মৃত্যুশয্যায় মধুর কাতরোক্তি অত্যন্ত মর্মান্তিক— 'হায় ২ ফুলমণি মা! আমার পরিত্রাণের দিবস বহিয়া গিয়াছে। শয়তান কালসর্পের মত আমাকে দংশন করিয়াছে। তাহাতে আমার মরণ অতি সন্নিকট,… হে প্রিয় রাণি, আমি তোমার বিরুদ্ধে অনেকবার বড় দোষ করিয়াছি, কিন্তু আমি মরিতেছি, আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে' (পৃঃ ৩৭)। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার সময় প্যারীর মধ্যেও যে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল, তাও লেখিকা সুনিপুণভাবে তার সংলাপের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন— 'স্বামীর সকল শক্ত কথা ও নিন্দা

আমি স্বচ্ছন্দে সহ্য করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু সন্তানদের এরূপ প্রেমিক ব্যবহার দেখিয়া আমার মন অতি ব্যাকুল হইল। আমি একবার মনে করিলাম যদি ঘরে যাইয়া স্বামীর সাক্ষাতে ঠাকুরপূজা করি, ও সন্তানদিগকে গোপনে খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা দিই, তবে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি সন্তানসুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হইতে পারিব' (পৃঃ ৫৩)। একদিকে কর্তব্যবোধ অন্যদিকে পুত্রস্নেহ—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে প্যারির যেমন অন্তর্দাহ দেখা গিয়েছিল, ঠিক তেমনি করুণার হৃদয়ও ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল বংশীকে নিয়ে। অবাধ্য দুশ্চরিত্র জুয়াড়ী বংশীকে শাসন করার শক্তিও যে তখন করুণা হারিয়ে ফেলেছিল, তার এই উক্তিই প্রমাণ— 'তাহাকে একেবারে দুর করিয়া দিলে তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইত বটে; কিন্তু সে তো আমার গর্ভজাত সন্তান, অতএব আমি এমত শাস্তি তাহাকে কি প্রকারে দিই ?··· ঐ বংশী আমার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং পাঁচ বৎসর পর্যন্ত আমার আর ছেল্যা হইল না, অতএব আমি স্নেহ প্রযুক্ত তাহাকে কখন শাসন করিতে পারিতাম না, এই নিমিত্তে সে এমত অবাধ্য বালক হইয়াছে (পৃঃ ৬৪)। মাতৃহৃদয়ের দ্বন্দ্বজাত যন্ত্রণা এখানে সুস্পষ্ট। অতএব বলা যায়, চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত— যা আধুনিক উপন্যাসের বাস্তবতার (Psychological- Realism) অন্যতম প্রধান উপাদান তার আভাস ফুলমণি ও করুণার বিবরণে রয়েছে। উপন্যাস হিসাবে গ্রন্থটি সার্থক কিনা তা আমাদের বিচার্য বিষয়ের বহির্ভুত, সমাজ-বাস্তবতার বিচারে প্রাক্-বঙ্কিম-উপন্যাস পর্বে গ্রন্থটির গুরুত্ব যে রয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

॥ চার ॥

আলালের ঘরের দুলাল

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা গদ্যে নক্শা জাতীয় দ্বিতীয় গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর বিচারে গ্রন্থখানি নববাবু-বিলাসের অনুগামী, এমনকি উপস্থাপিত সমাজ-চিত্রও ভবানীচরণের 'বাবুর উপাখ্যানের' সমকালীন বলেই মনে হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় বলেছেন······ 'ইহা যে কালে রচিত হইয়াছিল, সেই কালের অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর

প্রারম্ভ ভাগে গল্পের সূচনা' ।৪৯ তাই ভাবগত বিচারে 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণের' পূর্বেই 'আলালের' বাস্তবতা বিচার হওয়া উচিত। যা হোক, এই গ্রন্থে বাংলার সমাজ কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ কতখানি ছিল, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব কি ভাবে প্রকাশিত হয়েছে ইত্যাদির অনুসন্ধানই আমাদের উদ্দেশ্য।

গ্রন্থমধ্যে চিত্রিত সমাজ মূলতঃ নাগরিক-সমাজ, গ্রাম-বাংলার বৃহত্তর সমাজের চিত্র এখানে প্রায় অনুপস্থিত। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেমন বালী, বৈদ্যবাটী, চন্দননগর, চুঁচুড়া, আগড়পাড়া, যশোর-সোনাগাজি ইত্যাদি জায়গার বর্ণনাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এর কারণ মধ্যযুগীয় গ্রামীণ অর্থনীতি-নির্ভর জীবন যাত্রার প্রতি মোহছিন্ন করে নবসৃষ্ট নাগরিক-সমাজ ও সভ্যতার প্রতিই সেদিন মানুষের মন বেশী আকৃষ্ট হয়েছিল; তাছাড়া কলকাতার নাগরিক পরিবেশ যেমন বিত্তবান নব-বাবুদের লীলা-ক্ষেত্র, তেমনি আবার নবযুগের নবসংস্কৃতির পরিপোষক। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বিধৃত সমাজচিত্রে সমকালীন গ্রাম-বাংলার মানস-প্রতিফলন যে একেবারে ঘটেনি তা নয়। মূল গ্রন্থের ইংরাজীতে সংক্ষিপ্ত যে ভূমিকা ছিল তার এক অংশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—
It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education, on self-formation and religious culture and is illustrative of the condition of Hindu society, manners, customs, & c. and partly of the state of things in the Moffussil.' ৫০

একদিকে ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ সামন্ত-তান্ত্রিক অর্থনীতি, অন্যদিকে ধনতন্ত্রী বিদেশী বণিক শ্রেণীর (চন্দননগর তখন ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল) আনুকূল্যে দেশের আধুনিক ধনিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয়—এক মিশ্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা সেদিনকার সমাজ নিয়ন্ত্রিত ছিল। অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বহিরঙ্গের

যেমন পরিবর্তন হয়, তেমনি অন্তরঙ্গও পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই মানস-পরিবর্তন সূচিত হয়। অবশ্য অন্তরঙ্গের পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে; প্রাচীন ভাব-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন ধারণাকে গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে ব্যক্তিকে সংগ্রাম করেই নবচেতনার অংশীদার হতে হয়।৫১ ১৮শ শতাব্দীর শেষ হতেই আমাদের সমাজের প্রাচীন মানবিক মূল্য-বোধগুলো প্রায় মুল্যহীন হয়ে পড়েছিল, অর্থের মাপকাঠিতেই পারস্পরিক সম্পর্কের বিচার হতো—আলোচ্য গ্রন্থের কয়েকটি উদ্ধৃতিতে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ঃ-

i) 'এক্ষণে টাকার যতমান বিদ্যারও নাই ধর্মেরও নাই ,' (পৃঃ ২৬)

ii) 'টাকা বড় চিজ-টাকাতে বাপকেও বিশ্বাস নাই।' (পৃঃ ৮২)

iii) 'কলিকাতার লোক চেনাভার—অনেকেই বর্ণচোরা আঁব, তাহাদিগের প্রথমে একরকম মূর্ত্তি দেখা যায় পরে আর একরকম মূর্ত্তি প্রকাশ হয়। ইহার মূল টাকা—টাকার খাতিরেই অনেক ফেরফার হয়। মনুষ্যের দুর্বল স্বভাবহেতুই ধনকে অসাধারণরূপে পূজ্য করে।'(পৃঃ ৯৪)

ঐ সমাজে বিবাহের অন্যতম লক্ষ্যও যে ছিল ধন উপার্জন নীচের উদ্ধৃতি তার প্রমাণ ঃ—

i) বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে লোকে অমনি বলে বসে- কেমন গো রূপর ঘড়া দেব তো ? মুক্ত মালা দেবে তো ?' (পৃঃ ৪৬)

ii) 'ধনের খাতির অবশ্য রাখতে হয়। নির্ধন লোকের সহিত আলাপে ফল কি ? সে আলাপে কি পেট ভরে ?' (পৃঃ ৪৬)

iii) 'আমরা কুলীন মানুষ,- আমাদিগের প্রাণ দিয়ে কুল রক্ষা করিতে হয়, আর যে স্থলে অর্থের অনুরোধ সে স্থলে তো কথাই নাই।' (পৃঃ ৭৩) কৌলীন্যের অজুহাতে বহু-বিবাহ-প্রথা তখনকারদিনে বিশেষ এক পুণ্য কর্ম বলে বিবেচিত হত। বাবুরামবাবু দ্বিতীয়বার বিবাহের যুক্তি এইভাবে দেখিয়েছেন—'আমি বে না করলে কনের বাপের জাত যায় তাহাদিগের আর ঘর নাই' (পৃঃ ৭২)। অথচ এই প্রথার পরিণামে নারীর জীবন যে কত মর্মান্তিক হ'ত তার বাস্তব

চিত্র ফুটে উঠেছে জলের ঘাটে মহিলাদের কথোপকথনে (১৮শ অনুচ্ছেদ), তার একাংশ নীচে উদ্ধৃত হল ঃ—

'…… তাহাদের মধ্যে একজন বলিল-বুড়ো হউক ছুড়ি হউক তবু একে মেয়ে মানুষটা চক্ষে দেখতে পাবে তো? সেও তো অনেক ভাল। আমার যেমন পোড়া কপাল এমন যেন আর কারো হয় না, ছয় বৎসরের সময় বে হয় কিন্তু স্বামী কেমন চক্ষে দেখনু না, শুনেছি তাঁর পঞ্চাশ যাটটি বিয়ে, বয়স আশী বচ্ছরের উপর, থুরথুরে বুড় কিন্তু টাকা পেলে বে করতে আলেন না।…… আর একজন বলিল…… তোর তবু স্বামী বেঁচে আছে আমার যার সঙ্গে বে হয় তার তখন অন্তর্জ্জলী হচ্ছিল' (পৃঃ ৭৫)। তাই তখনকার সমাজে নারী-স্বাধীনতা তো দূরে থাকুক, কুলীনের ঘরে জন্ম হওয়াটাও তারা অভিশাপ ও অধর্ম বলে মনে করত। আবার যে সব নারী বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ী যাবার সৌভাগ্য অর্জন করত তারাও স্বামী কিংবা পুত্রের নির্যাতনে জীবন্মৃত অবস্থায় থাকত, তারও প্রমাণ মেলে বৈদ্যবাটীর বাড়ীতে মতিলালের দুই বোন মোক্ষদা ও প্রমদার কথোপকথনে। স্বামী প্রমদার হাতের বালা খুলে দিতে বলায় প্রমদা মায়ের অনুমতি নিতে চায়, তারই পরিণতি কি হয়েছিল তা প্রমদার মুখে শুনি— 'আমি একটু হাত বাগড়াবাগড়ি করেছিনু, আমাকে একটা লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন তাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিনু, তারপর মা আসিয়া আমাকে অনেক্ষণ বাতাস করাতে চেতনা হয়, (পৃঃ ২৫)। আর মতিলাল তো নিজেই মাকে মেরেছে- 'আমার আবার কুকথা কি? এই বলিয়া মাতাকে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল' (পৃঃ ৮৯)। সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারেরই নারীজীবনের এই অবস্থা, কাজেই নারীর মূল্য যে সে সমাজে কতটুকু ছিল তা সহজেই অনুমেয়, তবে চির-উপেক্ষিতা নারী-মনে চিরন্তন কর্তব্যবোধ ও বিশ্বাসে যে তখন সংশয় দেখা দিয়েছিল তার প্রমাণও কোথাও কোথাও আভাসিত হয়েছে। পতিভক্তি প্রদর্শন সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য—তা প্রমদা মানতে রাজী নয়, তাই তার মুখে শুনি—'পতি কতশত স্থানে বিয়ে করেছেন, আর তাঁহার যেরূপ চরিত্র তাতে তাঁহার মুখ দেখতে ইচ্ছা হয় না।

অমন স্বামী না থাকা ভাল' (পৃঃ ২৪)। বহু-বিবাহ রদের আন্দোলনকে রুখতে রক্ষণশীল গোষ্ঠী শাস্ত্রের দোহাই দিতেন, তা নিয়েও সমাজে যে সংশয় দেখা দিয়েছিল—বেণীবাবুর উক্তিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় - 'এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর পাপ··· এজন্য শাস্ত্রে বিধি থাকিলেও সে বিধি অগ্রাহ্য' (পৃঃ ৭৩)।

সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলনের ক্ষীণ রশ্মিটুকু পাওয়া যায় একমাত্র প্রমদার সংক্ষিপ্ত উক্তিতে--'ভাগ্যে কিছুদিন মামার বাড়ী ছিলাম তাই একটু লেখাপড়া ও 'হুনুরি' কর্ম শিখিয়াছি' (পৃঃ ২৫)। কিন্তু সমাজে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সর্বস্তরে তখনও ঘটেনি, সরকারী স্কুলে শিক্ষাদানের ত্রুটি উল্লেখ করে গ্রন্থমধ্যে ঐ শিক্ষাকে 'ভড়ুঙ্গে' শিক্ষা বলা হয়েছে-- 'ভারি ২ বহি পড়িবার অগ্রে সহজ ২ বহি ভালরূপে বুঝিতে পারে কিনা, তাহার অনুসন্ধান হইত না-অধিক বহি ও অনেক করিয়া পড়া দিলেই স্কুলের গৌরব হইবে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল— ছেলেরা মুখস্থ বলে গেলেই হইল, বুঝুক বা না-বুঝুক জানা আবশ্যক হইত না··· বালকদিগকে কেবল মথন পড়াইতেন–মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন ডিক্সনেরি দেখ' (পৃঃ ১৪) সাধারণ মানুষও ছেলেদের স্কুলে পাঠাতে দ্বিধাবোধ করত, পাছে সঙ্গ দোষে ছেলে খারাপ হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ এই ধারণাও ছিল যে, অনেক ছেলে একসঙ্গে শ্রেণীতে বসালে কারো প্রকৃত শিক্ষা হয় না। ধনী পরিবারের ছেলেরা ছিল একেবারেই শিক্ষা বিমুখ, কারণ তাদের ধারণা ছিল 'আমার বাপের অতুল বিষয় আমার লেখা পড়ায় কাজ কি? কেবল নাম সহি করিতে পারিলেই হইল' (পৃঃ ৩)। সেকালে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল চাকুরী সংগ্রহ ও অর্থ উপার্জন, সেই জন্য যেমন ফার্সি, কিছু ব্যাকরণ শিখতে হত, আবার কিছু কিছু ইংরাজী শেখার প্রবণতাও তখন দেখা দিয়েছিল। বাবুরাম বাবু প্রথমে একজন মুন্‌সিকে (হবিবল হোসেন) দিয়ে মতিলালকে কিছু ফার্সি শেখাতে লাগলেন, কিন্তু 'পরে ভাবিলেন যে ফার্সির চলন উঠিয়া যাইতেছে। এখন ইংরাজী পড়ান ভাল' (পৃঃ ৪)। শিক্ষার এই অবস্থায় পেশা হিসেবে শিক্ষকতাও অনেকে

অর্থ :–১) হুনুরি কর্ম :–হাতের কাজ, (২) মথন :–মূল পাঠ

পছন্দ করতেন না, কারণ তখনকার দিনে গুরুমশায়ের ভাগ্যে জুটতো কেবল মাসে দুটো টাকা, কিছু সিধে, দু'খানা কাপড়, 'কিন্তু বাজার সরকারী কর্ম্মে নিত্য কাঁচা কড়ি' (পৃঃ ২)

আর্থিক সাচ্ছল্য ও কৃত্রিম সাহেবিয়ানা শিক্ষাবিহীন ধনীর দুলালের জীবনে সেকালে এনে দিয়েছিল চরম উচ্ছৃঙ্খলতা। তাদের আচার-অচরণে সমাজ সেদিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বেশ্যালয়ে টপ্পা, খেয়ুড়, কবিগানের মজলিসে মজে থাকতেন বাবুরা আর তাঁদের সন্তানেরা সঙ্গী-সাথী নিয়ে তামাক, গাঁজা, চরস খেয়ে পথচারিণীদের উপর অত্যাচার করতো—'বাবুরা পালকি খুলিয়া দেখিল একটি পরমা সুন্দরি কন্যা তাহার ভিতরে আছেন—মতিলাল তেড়ে গিয়া কন্যার হাত ধরিয়া পাল্‌কি থেকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল,······ সকলে টানাটানি করাতে কন্যাটি ভুমিতে পড়িয়া গেলেন তবু তাহারা হিঁচুড়ে জোরে বাটীর ভিতর লইয়া গেল,' (পৃঃ ৪৩)। নববাবুদের অত্যাচার হতে সেদিন সমাজে স্ত্রীলোক পর্যন্ত যে পরিত্রাণ পেত না তারই বাস্তবচিত্র সামনে ভেসে ওঠে উপরের উদ্ধৃতিটি পাঠ করলে; তারা যখন রাস্তায় বার হত, সাধারণ পথযাত্রীরা প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। একদিন বৈদ্য-বাটীর রাস্তায় মতিলাল ও তার সঙ্গীরা যখন যাচ্ছিল, তখনকার দৃশ্য— 'কেহ কাহার ঘাড়ের উপর পড়িতেছে কেহ কাহার ভার ভাঙ্গিয়া দিতেছে, কেহ কাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে - কেহ কাহার খাদ্য দ্রব্য কাড়িয়া লইতেছে··· রাস্তার দোধারি লোক পালাই ২ ত্রাহি ২ করিতেছে—সকলেই ভয়ে জড়সড় ও কেঁচো মনে করিতেছে আজ বাঁচলে অনেকদিন বাঁচবো যেমন ঝড় চারি-দিগে তোলপাড় করিয়া হু ২ শব্দে বেগে বয়, নববাবুদিগের দঙ্গল সেইমত চলিয়াছে, (পৃঃ ৭৪)। এই হল নববাবুদের আচরণের সামাজিক প্রতিক্রিয়া।

একদিকে দেশীয় ধনিকগোষ্ঠীর অত্যাচার, অন্যদিকে ইংরেজদের শোষণে সাধারণ লোকের চরম আর্থিক সংকট। আবার দেশীয় জমিদার ও নীলকর সাহেবদের মধ্যেও স্বার্থের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে ঐ সময়। সাধারণ মানুষের কাছে উভয়ই শোষক, কিন্তু

শোষণের তারতম্য অনুসারে দেশীয় জমিদারেরা তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত সহনীয়; কারণ— 'জমিদারেরা জুলুম করে বটে কিন্তু প্রজাকে ওতনে বজায় রেখে করে, প্রজা জমিদারের বেগুনক্ষেত, নীলকর সে রকমে চলে না - প্রজা মরুক বা বাঁচুক তাহাতে তাহার বড় এসে যায় না—নীলের চাস বেড়ে গেলেই সব হইল—প্রজা নীলকরের প্রকৃত মূলার ক্ষেত' (পৃঃ ১০৭)।

আবার জমিদারেরা অধিকাংশই ছিল মতিলালের মত। কাজেই নায়েবরা প্রজাদের উপর দ্বিগুণ অত্যাচার করত; শুধু প্রজারাই নয়, অনেক জমিদারও সর্বস্বান্ত হয়েছে ঐ নায়েবদের বুদ্ধিতে, মতিলাল তার প্রমাণ। ঠকচাচা, বাঞ্ছারাম প্রমুখের পরামর্শেই তো মতিলাল পথে বসেছে। ঐ সব ধনীদের যখন আর্থিক সংকট দেখা দিত তখন পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রাখতে নানা মিথ্যা অজুহাতে কর্জ করত, মহাজন সে টাকা তাদের কাছ হতে কোনদিন আদায় করতে পারত না।

'বাঙ্গালী বড় মানুষ বাবুরা দেশশুদ্ধ লোকের জিনিষধারে লন··· গরীব দুঃখী মহাজন বাঁচিলো কি মরিলো তাহাতে কিছু এসে যায় না, এরূপে বড়মানুষি করিলে, বাপ পিতামহের নাম বজায় থাকে··· কেবল চটক দেখাইয়া মহাজনের চক্ষে ধুলা দেয় বড় পেড়াপিড়ি হইলে এর নিয়ে ওকে দেয় অবশেষে সমন ওয়ারিণ বাহির হইলে বিষয় আশয় বেনামি করিয়া গা ঢাকা হয়' (পৃঃ ১৭)।

এইসব অত্যাচার প্রবঞ্চনার ন্যায়-বিচার সাধারণ মানুষের কাছে ছিল দুরাশা, এমন কি বাঙালী ধনীরাও যে ইংরেজের আদালতে ধর্ণা দিয়ে হতোদ্যম হয়ে ফিরে আসতো—তারই প্রমাণ এই উদ্ধৃতিটি :-

'কালা লোক খুন অথবা অন্যপ্রকার গুরুতর দোষ করিলে মফঃস্বল আদালতে তাহাদিগের সত্ত্ববিচার হইয়া সাজা হয়—গোরা লোক ঐ সকল দোষ করিলে সুপ্রিম কোর্টে চালান হয় তাহাতে

অর্থ—ওতন—পৈতৃক ভিটা

সাক্ষী অথবা ফৈরাদিরা ব্যয়, ক্লেশ ও কর্ম্মক্ষতি জন্য নাচার হইয়া অস্পষ্ট হয় সুতরাং বড় আদালতে উক্ত ব্যক্তিদের মকদ্দমা বিচার হইলেও ফেসে যায়' (পৃঃ ১০৬)।

বিচারের নামে প্রহসন সে যুগেও ছিল, আসামীর জাতি ও দেশভেদে যেমন আদালতের প্রকারভেদ ছিল, তেমনি আবার মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে অর্থশক্তিতে সেরেস্তাদারকে হাত করে মামলার রায় অনুকুলে নিয়ে আসাও যেত। সেদিনের সমাজে নানাধরণের শোষণ ও আইনের প্রহসনের চাপে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল।

এতক্ষণ তখনকার সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ও তার প্রতিক্রিয়ার বাস্তবচিত্র বিশ্লেষণ করা হল। এখন দেখা যাক্ ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার তৎকালীন সমাজ-মানসে কি পরিমাণ ক্রিয়াশীল ছিল। বর্তমানের মতই তখনকার দিনেও সাধারণ মানুষের মনে অলৌকিক শক্তি, দৈববিদ্যা ভুত-প্রেতাদির ক্রিয়াকলাপ, মন্ত্র-তন্ত্র, বশীকরণ, তুক্‌তাক্ ইত্যাদিতে বিশ্বাস ছিল। ঠক্‌চাচী এইসব জানতো বলে পাড়ার মেয়ে মহলে 'বড় মান্যা' ছিলেন, মেয়েরা এসে তাঁর কাছে নানা পরামর্শ করে যেত, আর ঠক্‌চাচীরও এইভাবে দু'-পয়সা রোজগার হত। এছাড়া মতিলাল ও তার সঙ্গীদের দেখে লোকেরা 'আঙ্গুল মট্‌কাইয়া সর্বদা বলে তোরা ত্বরায় নিপাত হ' (পৃঃ ৪২)। এতে মেয়েলি প্রাচীন অভিশাপ-দানের রীতির কথাই মনে আসে। এসব সত্ত্বেও বলা যায় যে, সে যুগটা ছিল বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংঘাতের যুগ। একদিকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের বিরোধ, অন্যদিকে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসার- এই ধরণের সংঘাতে সমাজ তখন আলোড়িত। দেব-দেবীর প্রতি যুব-সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসের প্রমাণ পাই—বেচারামের উক্তিতে— 'আমি জ্বালাতন হইয়াছি রাত্রে ঠাকুর-ঘরের ভিতর যাইয়া বোতল ২ মদ খায় চরস গাঁজার ধোঁয়াতে কড়ি-কাঠ কাল করিয়াছে, সোনা রূপার জিনিস চুরি করিয়া বিক্রি করি-য়াছে—আবার বলে একদিন শালগ্রামকে পোড়াইয়া চুণ করিয়া পানের সঙ্গে খাইয়া ফেলিব' (পৃঃ ২১)। এ ছাড়া দেখা যায় গঙ্গারঘাটে যখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আহ্নিক করছিল, তখন কিছু

যুবক তাদের গায়ে কাদা, ঝামা. এমন কি থুথু পর্যন্ত ছুড়েছে। অপরদিকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি সেদিন যুবকেরা যে আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রমাণ পাই রামলালের আচরণে, সে 'হিন্দুয়ানি বিষয়ে আলগা ২ রকম— তিলকসেবা করে না—কোশাকুশি লইয়া পূজা করে না—হরিনামের মালাও জপে না, অথচ আপন মত অনুসারে উপাসনা করে ও কোন অধর্মে রত নহে··· ' (পৃঃ ৫৮) ধর্ম-বিষয়ে রামলালের এই ধরণের স্বাধীন আচরণ বাবুরাম বাবু সমেত অনেকে মেনে নিতে পারেননি, তাঁদের চিন্তা—এরকম করলে দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপ টিক্‌বে কীভাবে। ওঁদের চোখে মতিলাল ভাল, কেননা তার 'হিন্দুয়ানি' আছে। আবার খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি সেদিন বাঙালীদের আকর্ষণ যে আদৌ আন্তরিক ছিল না, তা ছিল সম্পূর্ণ স্বার্থ-সম্বন্ধযুক্ত তারও প্রমাণ রয়েছে— 'সকল প্রজা যে মনের সহিত খ্রীষ্টিয়ান হয় তা নয় কিন্তু পাদরীর মণ্ডলীতে যে যায় সে নানা উপকার পায়। মাল-মকদ্দমায় পাদরীর চিঠি বড় কর্ম্মে লাগে' (পৃঃ ১১৩)। আবার অনেকের ধারণা ছিল হিন্দু ছেলেদের যে অধঃপতন, খ্রীষ্টানদের মধ্যে তা দেখা যায় না। খ্রীষ্টানরা তাদের সন্তানদের নীতিজ্ঞান সমেত সুশিক্ষার দ্বারা যথার্থই মানুষ করে তোলে। এই উদ্দেশ্যেও অনেকে খ্রীষ্টান হয়েছিল। মোটকথা সে যুগে ধর্ম—আন্দোলনের যে তিনটি ধারা স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত ছিল তাদের প্রত্যেকটির সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত 'আলালের ঘরের দুলাল' - এ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্যারীচাঁদ মিত্রের ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও গভীর বাস্তবতাবোধের জন্যই গ্রন্থটি সমকালীন বাংলার সমাজের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। সমাজের সবকিছুই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।

চরিত্র সৃষ্টিতে ভবানীচরণের তুলনায় প্যারীচাঁদ অধিকতর নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। মতিলালের চারিত্রিক বিবর্তন গ্রন্থটির কেন্দ্রীয় ঘটনা বলেই মনে হয়। লেখক যেভাবে ধীরে ধীরে মতিলালকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, যেভাবে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অনুশোচনার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন তা

নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মৃত্যুশয্যায় বাবুরাম বাবু যখন বরদা বাবুকে বলেন, '……আমি এক্ষণে জানলুম যে তোমার বাড়া জগতে আমার আর বন্ধু নাই—আমি লোকের কুমন্ত্রণায় ভারি ২ কুকর্ম্ম করিয়াছি, সেই সকল আমার এক ২ বার স্মরণ হয় আর প্রাণটা যেন আগুনে জ্বলিয়া ওঠে— আমি ঘোর নারকী—আমি কি জবাব দিব? আর তুমি কি আমাকে ক্ষমা করিবে?' (পৃঃ ৮১) বা বারানসীতে মতিলালের মুখে যখন শুনি—'মা! তোমার সেই কুসন্তান আবার এল—সে আজো বেঁচে আছে—মরে নাই—আমি যে ব্যবহার করিয়াছি তারপর যে তোমার নিকট মুখ দেখাই এমন ইচ্ছা করে না—এক্ষণে আমার বাসনা এই যে একবার তোমার চরণ দর্শন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করি।… আমার শীঘ্র মৃত্যু হইলে মনে যে দাবানল জ্বলিতেছে তাহা হইতে নিস্কৃতি পাই' (পৃঃ ১৩৩-১৩৪), তখন পাঠক তাদের প্রতি সহানুভূতি না জানিয়ে পারে না। ঠকচাচার চরিত্রের শঠতা ও ক্রুরতার সঙ্গে তার দৈহিক আকৃতির বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তব ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে— 'বগলে একটা কাগজের পোটলা মুখে কাপড়, চোক দুটি মিট্ ২ করিতেছে-দাড়িটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেছে' (পৃঃ ৬৭)। গারদে থাকাকালীন ঠকচাচার মনেও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল—'কখন ২ ভাবেন আমি চিরকালটা জুয়াচুরি ও ফেরেরি মতলবে কেন ফিরিলাম-ইহাতে যে টাকাকড়ি রোজগার হইয়াছিল তাহা কোথায়? পাপের কড়ি হাতে থাকে না……' (পৃঃ ১০৮)। এই পাপবোধ জাগ্রত হওয়ায় চরিত্রটিও অত্যন্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে। মতিলালের মায়ের চরিত্রটিও জীবন্ত, গৃহ-বিতাড়িতা হলেও অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সন্তানের প্রতি মমত্ববোধের ঊর্ধ্বে তিনি উঠতে পারেন নি, দিবারাত্র সন্তানের চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্না— 'আমার দুটি পুত্র কোথায়? বৌটি বা কেমন আছে? কেনই বা রাগ করে এলাম? মতি আমাকে মেরেছিল— মেরেইছিল, ছেলেতে আব্দার করে কিনা বলে - কিনা করে?'—ইত্যাদি নানা চিন্তায় তিনি আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন, রাত্রে স্বপ্নে পুত্রদ্বয়ের পুনঃপ্রাপ্তির আশ্বাস পেয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এছাড়া বাঞ্ছারাম,

বেচারাম, বেনীবাবু, ঠকচাচী প্রত্যেকেই আপন আপন বৈশিষ্ট্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, বরং আদর্শবাদে মণ্ডিত হওয়ায় রামলাল ও বরোদাবাবু চরিত্র দুটির স্বাভাবিকতা কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে।

'আলালের ঘরের দুলাল' এর ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাভাবিকতার প্রশংসা অনেকেই করেছেন, সমাজ-বাস্তবতার বিচারে ভাষা আলোচনার বাহুল্য বর্জন করে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, উপন্যাসের সংলাপের উপযোগী ভাষা প্যারীচাঁদ এই গ্রন্থে ব্যবহার করে উপন্যাসের উদ্ভবের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছেন। তবে গ্রন্থমধ্যে বহু বিদেশী শব্দের, বিশেষ করে ফার্সী আরবী ইত্যাদির প্রয়োগে কোথাও কোথাও অর্থবোধে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কাহিনীর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। আগেই বলা হয়েছে যে নীতিশিক্ষাদানই এজাতীয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য, কিন্তু গল্প বলার নবতর ভঙ্গীতে লেখক যেন পাঠকের চিত্তহরণ করেছেন, এবং গল্পও পর্যায়ক্রমে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। তাই প্যারীচাঁদ নীতিবেত্তা না হয়ে প্রকৃত কথাসাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন।

॥ পাঁচ ॥

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান ঃ-

আলালের ঘরের দুলালের (১৮৫৮) সমসাময়িক আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'। গ্রন্থাকারে এটির প্রথম প্রকাশ ১৮৫৯ (১২৬৬ বঙ্গাব্দ) সালে, তার আগে লালবিহারী দে সম্পাদিত 'সম্বাদ অরুণোদয় পাক্ষিক পত্রিকায়' ১৮৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হতে এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কোথাও লেখকের নাম না থাকায় উপাখ্যানটি কার রচনা তা অজ্ঞাত ছিল। বোধ হয় এই কারণেই বইটির কোন উল্লেখ বা আলোচনা বাংলা সাহিত্যের কোন ইতিহাসে বা সমালোচনা-গ্রন্থে দেখা যায় নি। বেশ কয়েক বৎসর আগে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য উপাখ্যানটি উদ্ধার করেন, এবং নানা তথ্যসহযোগে প্রমাণ করেন যে, 'গোবিন্দ সামন্তের' 'লেখক ও ফোক্ টেল্স্ অব্ বেঙ্গলের কথক লালবিহারী দে এই 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'

রচয়িতা ৫২ এবং এটি লেখার সময় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' যে লেখকের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে-বিষয়েও তিনি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ডঃ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থটি 'মৌলিক বাংলা উপন্যাস'। এখন আমরা 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' সেদিনের সমাজের বাস্তবচিত্র কতখানি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে তা যেমন দেখব, তেমনি লেখকের বাস্তব-বোধের পরিচয়ও নেব।

চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানটি যে উদ্দেশ্যমূলক রচনা—তার প্রমাণ পাওয়া যায় উপাখ্যানের পরিচয় পত্রে সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে—

'THIS BOOK IS INTENDED FOR THE INSTRUCTION AND ENTERTAINMENT OF YOUNG PERSONS' ৫৩। শুধু আমাদের সাহিত্যেই নয়, সবদেশেই প্রথম যুগের উপন্যাসে উদ্দেশ্যমূলকতা, বিশেষ করে সমাজ-সংস্কার-প্রয়াস ও নীতি শিক্ষাদানের অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এই প্রসঙ্গে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের প্রথম উপন্যাস 'Pamela or Virtue Rewarded' (1740) গ্রন্থের শিরোনামায় লেখকের মন্তব্য স্মরণীয় ৫৪। উদ্দেশ্যমূলকতা সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে দূষণীয় নয়, বরং উদ্দেশ্যবিহীন সাহিত্য অর্থাৎ শিল্পের জন্য শিল্পসৃষ্টি—এই তত্ত্বের বিরোধী অনেকেই। এক্ষেত্রে বিচার্য - লেখকের অভিপ্রায় সংরক্ষণকামী, না প্রগতিবাদী? প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় অমানবিক শাস্ত্রীয় সংস্কার ও মূঢ়তার সপক্ষে লেখক মত প্রকাশ করেছেন, না, সেগুলির উচ্ছেদের জন্য প্রয়াসী হয়েছেন? এই মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' লেখক একদিকে আমাদের সমাজের কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা, নানা ধরণের কুসংস্কার, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যজনিত ত্রুটিগুলি যেমন স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দিয়েছেন, তেমনি স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলন, বাল্য–বিবাহরদ, বিধবা বিবাহ ও স্বামী নির্বাচনে নারীর স্বাধীনতা ইত্যাদির প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ সমর্থনও প্রকাশ পেয়েছে। কৌলীন্য সংস্কার ও পণ-প্রথার দীর্ঘ অনুসৃতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে যে কত নির্মম-নিষ্ঠুর করে তোলে হিন্দুর ঘরে কন্যা-সন্তান

জন্মগ্রহণ করার পরই সেই নবজাতক উদ্বেগাকুল পিতা-মাতার কাছে যে কত দুর্ভর, দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তা গ্রাম-বাংলার সন্তান বলেই লালবিহারী দে'র পক্ষে সেদিন উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছিল। আখ্যানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনায় তিনি মন্তব্য করেছেন ঃ 'এতদ্দেশের এই একটি অতি অসভ্য ব্যবহার, যে কুলীনেরা স্বীয় দুহিতাদের প্রতি বড় প্রসন্ন নহেন। তাহার প্রধান কারণ কি এই, যে ঐ অভাগিনীদের বিবাহেতে অধিক ব্যয় হয় এবং তাহা-দিগকে ও তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে আজন্মকাল প্রতিপালন করিতে হয়··· এইরূপ ভারগ্রস্ত হইবার আশঙ্কাতে সুকুলীন মহাশয়েরা কন্যা জন্মিলে সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত হন' (পৃঃ ৩) এছাড়া, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কুমুদিনী, প্যারী ও হেমচন্দ্রের কথোপ-কথনের মধ্যদিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে, কৌলীন্যসংস্কার থাকায় ও বিধবার পুনর্বিবাহ না হওয়ায় আমাদের সমাজে যুবতী বিধবা-দের মধ্যে ব্যাভিচার ও ভ্রূণহত্যার প্রকোপ কিভাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মল্লিকা নাম্নী এক বিধবার শোচনীয় পরি-ণামের কাহিনীও তিনি হেমচন্দ্রকে দিয়ে বলিয়েছেন (পৃঃ ৫৭-৬১)। এই সামাজিক ব্যাধির অন্যতম প্রধান কারণ বাল্য-বিবাহ, লেখক যে বাল্যবিবাহ রদের পক্ষপাতী ও বিধবা-বিবাহের সমর্থক তার পরিচয় গ্রন্থে স্পষ্টই রয়েছে। চন্দ্রমুখীর দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখি চন্দ্রমুখীর পিতার কাছে রামভদ্র ঘটক যখন বৈবাহিক সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে, লেখক মন্তব্য করেছেন ঃ

'······ পরিণয়ের পূর্বে অন্তঃকরণ মধ্যে অকৃত্রিম প্রেমের উদয় হওয়া আবশ্যক, যেহেতু বিবাহ প্রেমোৎসব। বালক-বালিকা সে প্রেমের স্বাদপ্রাপ্ত হওনে অক্ষম; প্রীতিপদ্ম তাহাদের হৃদয় সরোবরে প্রস্ফুটিত হয় নাই, অতএব তাহারা পরিণয়ের যোগ্য নহে।··· ভারতবর্ষের মনুষ্যদের অধিক দুঃখ অকালবিবাহ হইতে উৎপন্ন হয়। কুলীন মহাশয়েরা কেবল পাণিগ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন, আর তাঁহারা অনেক স্ত্রী গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহা-দিগকে প্রতিপালন করেন না, সুতরাং ঐ সকল অভাগিনী

তরুণীগণ চিরদুঃখিনী হইয়া কালযাপন করেন……। আর পরিণয়ের পূর্বে রীতি, চরিত্র, ব্যবহার, স্বভাব, জ্ঞান ও ধর্ম ইত্যাদি জ্ঞাত না হইয়া পাণিগ্রহণ, বা প্রদান করা অতি অসভ্য 'প্রথা' (পৃঃ ২১)। বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহ সামাজিক প্রতিক্রিয়া যে কি, লেখক সেটা যে সেদিন শুধু গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তা নয়, ঐ প্রথার অবসানের জন্য তাঁর ঐকান্তিক বাসনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই মন্তব্যে— '….. এমন ইচ্ছা হয় যে এক দ্বিতীয় পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়া এই দেশকে একেবারে নিষ্কুলীন করুক।' প্রাচীন সংস্কার ও শাস্ত্রীয় বিধিপ্রসূত সামাজিক ক্ষতের কারণ ও ফলশ্রুতি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে তাকে নির্মূল করার জন্য লেখকের অভিপ্রায় এখানে ফুটে উঠেছে। লেখকের সেই অভিপ্রায় কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে কোথাও বাস্তবতার সীমা অতিক্রম করেনি। লালবিহারী দে জোর করে কোন বিধবার বিবাহ-দৃশ্য দেখান নি বা বাল্য-বিবাহ রদের চিত্র চাপিয়ে দেননি। সাহিত্যে প্রগতিশীল মনোভঙ্গীর পরিচয় দিতে গিয়ে যদি প্রচলিত সমাজ-পরিবেশের মধ্যে সম্ভাব্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়, এবং বাস্তবে যা ঘটছে বা বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে যা সচরাচর ঘটে থাকে তার পরিচয় না দেওয়া হয়, তবে তাকে সঠিক বস্তুনিষ্ঠা বলা যায় না, যথার্থ সমাজ–বাস্তবতাও সেখানে প্রতিফলিত হয় না। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) উপন্যাস দুটির কথা মনে আসে। ৫৫ দুটি গ্রন্থেই লেখকের সমাজ-সংস্কার-প্রবণতা স্পষ্ট—'সংসারে' বিধবা-বিবাহ ও 'সমাজে' অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনসূচক চিত্র রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে রমেশচন্দ্র নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রগতিশীল ও সংস্কার-মুক্ত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন এবং বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহ নীতিগতভাবেই তিনি সমর্থন করতেন, ৫৬ কিন্তু সে-যুগের সমাজে বিধবা-বিবাহ বা অসবর্ণ-বিবাহের প্রচলনে বাধা কোথায়, প্রচলিত হলে প্রতিক্রিয়া কি হওয়া স্বাভাবিক—সেচিত্র তিনি তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেন নি, তাই মনে হয়েছে সব কিছুই যেন সমাজ মেনে নিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তা আদৌ হয়নি। কাজেই সেখানে

সমাজ-বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এবং লেখকের সংস্কার—প্রচেষ্টা ও আদর্শবাদ প্রকটভাবে আরোপিত বলে মনে হয়েছে। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুটা রক্ষণশীল ছিলেন ঠিকই ('বঙ্কিম' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে), কিন্তু তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ প্রদর্শন করতে গিয়ে সামাজিক বাধা-নিষেধ ও মানব-মনের আভ্যন্তরীণ সংস্কার যে কিভাবে এবিষয়ে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে তা স্পষ্টই তুলে ধরেছেন। যা ঘটা উচিত তার ইঙ্গিত যেমন থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে তা ঘট্‌তে গেলে বা ঘটাতে হলে প্রচলিত সামাজিক পটভূমিকায় সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার চিত্রও সাহিত্যে তুলে ধরতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহ সমর্থন করতেন না, কিন্তু তাঁর উপন্যাসে যুগচেতনা ও সমাজ-অভীপ্সার স্ফূরণ ঘটিয়ে নগেন্দ্র-কুন্দের বিবাহ যেমন দেখিয়েছেন, আবার সে প্রচেষ্টায় সামাজিক প্রতিবন্ধকতার বিশ্লেষণও করেছেন। হয়ত সমস্যার নেতিবাচক সমাধানে লেখকের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীটি ফুটে উঠেছে, তবু বাস্তবতা চিত্রায়নে তাঁর নিষ্ঠা প্রশংসনীয়।

লালবিহারী দে 'চন্দ্রমুখীর উপ্যাখানে' হিন্দুসমাজের ক্ষত—স্থানগুলি যেন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ ক্ষত নিরাময়ের পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে একটু সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন 'বোধহয় এদেশের সকল লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ না করলে অকাল বিবাহ লুপ্ত ও প্রকৃত বিবাহ প্রচলিত হইবে না'—এই জাতীয় মন্তব্য না করে যদি এদেশে পাশ্চাত্যের যুক্তিভিত্তিক ও আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও প্রাচীন সংস্কার হতে মুক্ত হওয়ার উপর গুরুত্ব দিতেন, তাহলে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাদোষে দুষ্ট হত না। যা হোক, এতে তাঁর সমাজ-সচেতনতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার কাম্য হলেও তাঁর মনোভঙ্গীটি মুলতঃ সমাজপ্রগতির সপক্ষেই ছিল। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে—লেখক বাল্যবিবাহের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও হেমচন্দ্র-চন্দ্রমুখীর বাল্য-বিবাহ গ্রন্থে প্রদর্শিত হল কেন? যে কালের বাংলার সমাজ-পটভূমিকায় এই কাহিনী রচিত হয়েছে, সেখানে পিতৃ-নির্ধারিত বিবাহে অসম্মতি

জ্ঞাপন করে বিবাহ না করাই বরং হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রে অবাস্তব বলে মনে হত। হেমচন্দ্র কিছুটা শিক্ষিত, সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দশমবর্ষীয়া চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেছে পিতার আদেশানুসারে ঠিকই, কিন্তু এই বিবাহ প্রদর্শনের মাধ্যমে লেখকের দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলে মনে হয়। **প্রথমতঃ** এই বিবাহকে উপলক্ষ করেই লেখক বাল্য-বিবাহ সম্পর্কে তাঁর মতামত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করার সুযোগ করে নিয়েছেন এবং এদেশীয় বিবাহ-রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিবাহ-রীতির তুলনামূলক একটি চিত্রই তুলে ধরেছেন। **দ্বিতীয়তঃ** বিবাহের পূর্বে হেমচন্দ্রের (যদিও গোপনে) পাত্রী দেখার ঘটনাটি বিবাহ-ব্যাপারে স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচনে ব্যক্তি-স্বাধীনতারই ইঙ্গিতবহ। লেখক সুকৌশলে এই যে ইঙ্গিতটি দিয়েছেন তা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে অভিনব। সেদিক থেকেও তাঁর মানসপ্রবণতা কোন্‌-দিকে তা বুঝতে আমাদের আদৌ অসুবিধা হয় না।

লেখক লালবিহারী দে সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও বিধবাবিবাহের যে সমর্থক ছিলেন তার পরিচয়ও 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' রয়েছে। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের প্রধান অন্তরায় ছিল সংস্কার। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যই দীর্ঘদিন যাবৎ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে স্ত্রীশিক্ষাকে যথাসম্ভব ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তার ফলেই নারীমনেও সংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল যে, শিক্ষিতা হলেই নারী স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে ও পরিণামে বিধবা হয়। চন্দ্রমুখীর শিক্ষার ব্যাপারে তার মা ও ঠাকুরমার মন্তব্যগুলি পাঠ করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। চন্দ্রমুখীর মা তাঁর শাশুড়ীকে বলেছে—'ঠাক্‌রুণ গো, তোমার বেটা আমার মেয়েটিকে অল্পবয়সে বিধবা করিবার চেষ্টায় আছে,······ শুনতে পাওনা, চন্দ্রমুখীকে লেখাপড়া শিখাইবার পরামর্শ হইতেছে' (পৃঃ ১৬)। এই কথা শুনে শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ তার ছেলে মুলুক চাঁদকে বলেছে— 'ভাল মুলুক একে তোর একটি মেয়ে, তাকে তুই রাড় করিতে চাস, লেখাপড়া শিখে কোন্‌ মেয়ে ভাগ্যবতী হয়েছে ? না, এমন কর্ম্ম করো না, তোমার বেটাদিগকে

ভাল শিখাও, চন্দ্রা তুই কাল অবধি আর পাঠশালে যাসনে'। (পৃঃ ১৬)

এরপর মুলুক চাঁদ নানা যুক্তির সাহায্যে তার স্ত্রীকে বুঝিয়েছে যে, স্ত্রীশিক্ষা অশাস্ত্রীয় নয়, মেয়েদের বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গেও তার স্বামীর পরমায়ুর কোন সম্পর্ক নেই; তাছাড়া স্ত্রীশিক্ষা শুধু স্ত্রীলোকদের নিজেদের জন্যই নয়, ভবিষ্যত বংশধরদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও জননীর শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। অবশেষে লেখক চন্দ্রমুখীর শিক্ষারম্ভের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলনে খ্রীস্টান মিশনারীদের অগ্রণী ভূমিকা স্মরণীয় এবং আরো স্মরণীয় যে, তাঁদের সে প্রচেষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাধাকান্তদেব প্রমুখ এদেশীয় মনীষীদের সহযোগিতায় অনেকখানি সার্থকতা লাভ করেছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনকে কেন্দ্র করে সমকালীন বাংলার সমাজ, বিশেষ করে কলকাতার হিন্দুসমাজ কিভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় এই উদ্ধৃতিটিতে :— 'এই স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন লইয়া কলিকাতার হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী-শিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করিবার জন্য যে কেবল গ্রন্থ রচনা করিলেন তাহা নহে, স্বীয় কন্যাকে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি লাহিড়ী মহাশয়ের (রামতনু লাহিড়ী) যৌবন সুহৃদগণ স্বীয় স্বীয় ভবনের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। স্ত্রীশিক্ষা লইয়া সমাজ মধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হইল। 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ' মহানির্বাণ-তন্ত্রের এই বচনালংকৃত নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত। লোকে বলিতে লাগিল 'এইবার কলির বাকি যা ছিল হয়ে গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না'। ৫৭ – নাটুকে রামনারায়ণ ও রসিক কবি ঈশ্বরগুপ্ত প্রমুখেরা সেদিন স্ত্রী-শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং এ বিষয়ে নানা

রসিকতা করে কবিতা রচনা করতেন এবং বাবুদের মজলিসে বসে এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেন। যদিও বহুপূর্ব থেকেই এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের জন্য নানাভাবে অনেকেই সচেষ্ট ছিলেন তবু এই প্রচেষ্টার সার্থকতার প্রথম সোপান তখনকার শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বীট্‌ন (বা বেথুন) কর্তৃক কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (৭ মে, ১৮৪৯) এবং তার পরেই ১৮৫৬ সালের মার্চ মাস থেকে ভারতবর্ষে নারীদের শিক্ষা প্রদান সরকারী কর্তব্য বলে পরিগণিত হয় ও 'বীটন-নারী-বিদ্যালয়' সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।৫৮ 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানের' পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখি চন্দ্রপুর গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে নিতাই দাসের পাঠশালায় চন্দ্রমুখী তার ভাইদের সঙ্গে যাতায়াত করত, কিন্তু গুরুমশাই তাকে ছাত্রী বলে গণ্য করতেন না, কারণ 'তিনি স্ত্রীশিক্ষায় বিরত ছিলেন, আর কর্তাও তাহাকে কন্যার শিক্ষার বিষয়ে কোন বিশেষ আদেশ করেন নাই।' এই চিত্রটি একটি বাস্তব ঘটনার প্রতিচ্ছবি এবং মনে হয় ঐ করুণ ঘটনাটি সম্পর্কে লেখক লালবিহারী দে অবহিত ছিলেন। ঘটনাটির বর্ণনা উদ্ধৃত করা হল – 'তিনি (কুমারী কুক্‌) কার্যারম্ভ করিবার অগ্রে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাতে মনোনিবেশ করিলেন। যখন মনোযোগ সহকারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, তখন একদিন শিশু-দের বাঙ্গালা শুনিবার জন্য স্কুল সোসাইটির স্থাপিত কোনও পাঠ-শালাতে গিয়া দেখেন একটি বালিকা পাঠশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, গুরুমহাশয় তাহাকে বালকদিগের সহিত পড়িতে দিবেন না। অনুসন্ধানে জানিলেন সে বালিকাটির ভ্রাতা ঐ পাঠশালে পড়ে; শিশু বালিকাটি স্বীয় ভ্রাতার সহিত পড়িবার জন্য গুরু-মহাশয়কে মাসাধিক কাল বিরক্ত করিতেছে।'৫৯ এই ঘটনার পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ১০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হল এবং প্রায় ২৭৭টি বালিকা পড়াশুনা করতে শুরু করল। অনুরূপভাবে আমরা 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানের' শেষ অধ্যায়ে দেখি হেমচন্দ্রের ভাই নবকুমার খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করে চন্দ্রপুরে মিশন স্থাপন করেছে এবং সেখানে বালক-বালিকাদের জন্য দুটি পৃথক

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রসারে মনোযোগী হয়েছে। এসবের ভিত্তিতে নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে'র রচয়িতা লালবিহারী দে ছিলেন আমাদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের একনিষ্ঠ সমর্থক।

বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যে আরও স্পষ্ট, আখ্যানের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে লেখকের নিজের মন্তব্যটিই তার প্রমাণ- 'হে বঙ্গদেশীয় মহাশয়েরা! অকাল-বিবাহ-লোপ ও বিধবাদের পরিণয় প্রচলিত করিয়া স্বদেশের মঙ্গল কর।' এছাড়া, ১৩ অধ্যায়ে হেমচন্দ্র বলেছেন,' ...... বিধবাদের বিবাহ প্রচলিত হইলে অনেক অত্যাচার লুপ্ত ও প্রচুর মঙ্গল হইবে। আর এ বিষয়ে অনেক সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞব্যক্তিগণ মনোযোগী হইতেছেন। অল্পদিন গত হইল এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল যাহাতে বিধবাদের বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা অতি প্রসিদ্ধরূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে।' (পৃঃ ৫৩)

লক্ষণীয় যে, উদ্ধৃতিটিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের' বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ও ২য় যথাক্রমে জানুয়ারী ১৮৫৫ ও অক্টোবর ১৮৫৫) গ্রন্থ দুটির উল্লেখ রয়েছে। ঐ গ্রন্থ দুটি ১৮৫৬ সালেই 'Marriage of Hindu Widows' নামে ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ৬০ 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' লেখক লালবিহারী দে'র বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাবের যে পরিচয় পাই তার সমর্থন মেলে তাঁর রচিত Govinda Samanta গ্রন্থে (Pt. I. Chapter XX, The Hindu Widow)। সেখানে আদুরীর বৈধব্যের পর হিন্দু বিধবাদের অবস্থা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া, লেখক এই উপাখ্যানে হিন্দুসমাজের কিছু কিছু অমানবিক প্রথা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। যেমন, মুমূর্ষুকে গঙ্গাবাস দেওয়া ও অন্তর্জলি যাত্রা প্রথার মত অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথা শাস্ত্রীয় অনুশাসনের নামে বহুদিন এদেশে প্রচলিত ছিল। লালবিহারী দে এই প্রথার বিরুদ্ধে সমাজকে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় আলোচ্য গ্রন্থের ১৪

অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ভারতচন্দ্রের মাতার অন্তর্জলি যাত্রার মর্মান্তিক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন এবং হেমচন্দ্রের চিন্তার মধ্য দিয়ে লেখক আপন চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এইভাবে—'হায়! মৃতকল্পদের গঙ্গাবাস ও এই ভয়ানক অন্তর্জলি আর কতকাল এ দেশে প্রচলিত থাকিবে' (পৃঃ ৬৪)। আবার ঐ অধ্যায়েই দেখানো হয়েছে আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় মুহ্যমান ও শোক-সন্তপ্ত পরিবার যখন মুমূর্ষুকে ঘিরে কাঁদছে, ঠিক তাদেরই পাশে গৃধ্নু ব্রাহ্মণের দল লুব্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে দানপ্রাপ্তির আশায়। ঐ সব ধর্মধ্বজী হৃদয়হীনের দল আবার দানগ্রহণের শাস্ত্রীয়রীতি বিচারে প্রবৃত্ত, কারণ তাদের বিবেচনায় 'গঙ্গার গর্ভে দান গ্রহণ করিলে হিন্দুশাস্ত্রের মতে পতিত হইতে হয়'। এই মন্তব্যের মধ্যে লেখকের বিদ্রূপাত্মক তির্যক মনোভঙ্গিটি ফুটে উঠেছে। দান-কার্যের ফলে সমাজের একটি শ্রেণীকে যে সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে দূরে রেখে শ্রমবিমুখ অলস করে দেওয়া হয় এবং তার পরোক্ষ ফলশ্রুতি যে ঐ শ্রেণীর অভাব ও দুঃখকে চিরস্থায়ী ও তীব্রতর করে তোলা—লালবিহারী দে তা যথার্থই সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্য তিনি সমাজের তথাকথিত দাতাদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গের সুরে বলেছেন— 'হে ধর্মাঢ্য বিজ্ঞবর সকল! তোমরা আর কতকাল যশোলোভে যৎকিঞ্চিৎমাত্র ভিক্ষাপ্রদানে অলস-দিগের আলস্য বৃদ্ধি করিবে ও ক্ষীণ, খঞ্জ, আতুর ও অক্ষম দীন-হীন দরিদ্রদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিবে?' (১৫ অধ্যায় পৃঃ ৬৬)। আর এই সব কাজের শাস্ত্রীয় অনুশাসনের আসল উদ্দেশ্য যে কি তা তিনি স্পষ্টই তুলে ধরেছেন জনৈক যুবকের মন্তব্যে — 'শাস্ত্র-ব্যবসায়িরা আপামর সাধারণকে কেবল অন্ধকার কূপে নিমগ্ন রাখেন, আপনাদের প্রভুত্ব ও দেবত্ব চিরস্থায়ী করিতে সাতিশয় যত্নবান হয়েন……' (১৫ অধ্যায় পৃঃ ৬৬–৬৭)। এইসব উপলব্ধি নিঃসন্দেহে লেখকের তীব্র সমাজসচেতনতা ও বস্তুনিষ্ঠার পরিচয়বাহী। আমাদের সমাজে এমন কিছু কিছু সংস্কার সেদিন ছিল, যা আজও আছে, (যেমন হাঁচি-টিকটিকিকে বাধা হিসেবে মান্যকরা, বিষধর সর্প বাড়ীতে থাকলে সে হচ্ছে বাস্তুদেবতা, একের উচ্ছিষ্ট পাত্রে

অন্যকে খাওয়ানো ইত্যাদিকে) সেগুলিকে লেখক এই উপাখ্যানে চরম ধিক্কার জানিয়েছেন। এতেও তাঁর সংস্কার-মুক্ত মানসিকতাটি ফুটে উঠেছে।

লেখক আমাদের পারিবারিক জীবনে তথা সমাজে ব্যক্তি হিসাবে নারীর যথার্থ মর্যাদাদানের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাই ৪র্থ অধ্যায়ে স্ত্রী-পুরুষের একসাথে আহার সম্পর্কে বৃদ্ধ ঘটক মশাই ও ছটু ভট্টের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথনের মধ্যদিয়ে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন যে, আহারে-বিহারে সর্বক্ষেত্রে নারী যদি পুরুষের সমমর্যাদা লাভ করে, তবেই সমাজে সভ্যতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। আলোচ্য উপাখ্যানের দশম অধ্যায়ে হেমচন্দ্রও শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে খাবার সময় একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে, এবং সেখানে পাশ্চাত্যের সমাজে নারীর আচার-আচরণ-শিক্ষা ইত্যাদির তুলনায় এদেশীয় নারী-সমাজ যে কত পশ্চাদ্‌পর তার একটি নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এর আগে সপ্তম অধ্যায়ে বাসরঘরে হেমচন্দ্র চন্দ্রমুখীর সহচরীদের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে বলেছে 'দেখ মনোনীত স্ত্রীকে কে না ভালবাসে, অতিমূঢ় ব্যক্তিই আপন ভার্য্যাকে ঘৃণা করে' (পৃঃ ২৭)। এই সব-কিছুকে খ্রীষ্টান লেখকের খ্রীষ্টিয় সমাজের প্রচার-প্রবণতা বলে মনে করা ভুল হবে, এদেশীয় নারী-মনে দৃঢ়মুল সংস্কার ও বিশ্বাসের মুলোৎপাটনের জন্য ঐ জাতীয় তুলনামূলক আবেদন যে অত্যন্ত বাস্তব-সম্মত কার্যকরী পন্থা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ে বাঙালী হিন্দু-পরিবারে কুলবধূদের অবস্থানের বর্ণনা লেখক যে ভাবে দিয়েছেন তাও স্মরণীয় — 'এতদ্দেশীয় রামাগণ রজনী ব্যতীত ভর্ত্তার সহিত নিশ্চিন্তে কথা কহিবার আর সুযোগ পান না। দিবসে পাকাদি ও গৃহকার্যে নিযুক্তা থাকেন আর অবসর পাইলেও লজ্জা প্রযুক্ত স্বামীর সহিত একত্রে বসেন না ও অধিক কথাও কহেন না। যে তরুণী দিবাভাগে পতির সহিত কথোপকথন করেন তাহাকে প্রতিবাসীরা বিশেষতঃ স্থবিরাগণ শিথিলা কহেন।... যেহেতু তাহারা বিদ্যারসে অরসিকা ও শিল্পকার্যাদিতে অক্ষমা সুতরাং গৃহকার্য না থাকিলে হয় নিদ্রা যান কিম্বা সমবয়স্কা ললনাদের

সমভিব্যাহারে গল্প বা গ্লানির অপার সমুদ্রে বিমগ্না হয়েন। এইজন্য স্ত্রী শিক্ষা প্রথা স্থাপন অত্যাবশ্যক' (পৃঃ ৫-৬)। এই সব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, লালবিহারী দে একান্তভাবে সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।

এখন নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, লালবিহারী দে 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' ঊনবিংশ শতকের বাংলার সমাজকে যথা-যথভাবে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। সে দিনের সমাজ-মানসের অভীপ্সাও যে ভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে, তাতে লেখকের স্বাজাত্যবোধ ও সমাজসচেতনতা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। আলোচ্য উপা-খ্যানের প্রথম অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে লেখক মুলুকচাঁদের আর্থিক অবস্থার বিবরণ দেওয়ার পরিসমাপ্তি টেনেছেন এই মন্তব্য করে— 'অন্যের দাসত্ব অপেক্ষা আপনার ক্ষেত্রের শস্য ও উদ্যানের ফল বিক্রয় দ্বারা স্বীয় পরিবার প্রতিপালন করা উত্তম। ইহাতে স্বাধীনতার ও মর্যাদার বাহুল্য প্রকাশ হয়।' এই উক্তিতে বক্তার স্বাধীনতা-স্পৃহা ও স্বাতন্ত্র্য যেমন তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এই অধ্যায়েই পূর্বে আলোচিত হানা ক্যাথারিণ ম্যলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে' যে বাস্তবতাবোধের ও সমাজ-সচেতনতার পরিচয় আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে লালবিহারী দে'র সমাজসচেতনতার পার্থক্যটিও এখানে লক্ষ্যণীয়। যদিও উভয়ের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এক এবং উভয়ের রচিত স্ব স্ব গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রবণতাই লক্ষিত হয়, তবু এদেশে উভয়ের সমাজ অভিজ্ঞতার প্রকৃতি ও পরিমাণে পার্থক্য সুপ্রচুর। এই পার্থক্যের কারণ স্বভাবগত ও উপলব্ধিগত। একজন সম্পূর্ণভাবে এ-দেশীয় গ্রাম্য-সমাজ-পরিপুষ্ট মানসিকতার অধিকারী, অন্যজনের তা ছিল না; একজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে স্বদেশিকতা ও স্বাজাত্যের প্রাধর্য উপস্থিত, অন্যের মধ্যে তার একান্ত অভাব; এদেশের সমাজ-সম্পর্কে একজনের অভিজ্ঞতা আশৈশব দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে লব্ধ, অন্যজন তা লাভ করেছেন পর্যটক মিশনারীর মানসিকতা নিয়ে, খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের মাধ্যমে হোক, আর অন্য যে কোন উপায়েই হোক সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রগতি

ও সংস্কার-মুক্তিই ছিল একজনের জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত, অন্যজনের কাছে খৃষ্টধর্মের প্রসারই ছিল মুখ্য। তাই গ্রাম-বাংলার সন্তান লালবিহারী দে'র সমাজ-অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও গভীরতা শ্রীমতি ম্যালেন্সের মধ্যে আশা করা যায় না। ধর্মে খৃস্টান হলেও চিন্তা ও চেতনায় লালবিহারীর বাঙালীত্ব ছিল তাঁর গর্বের বস্তু। তাই তিনি যেমন খৃস্টান মিশনারীদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য-নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন, তেমনি মিশন-কাউন্সিল এর নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে এদেশের নিজস্ব জাতীয় চার্চ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে লিখেছিলেন, 'I would construct the United National Church of Bengal on the broadest possible basis, so as to include in its communion a great variety of opinions.' ৬১ সমালোচক তাঁর সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, 'ঊনবিংশ শতকের নবজাগ্রত বাংলার জাতিগর্ব ও দেশগর্ব তাঁর চরিত্রে পরিব্যাপ্ত ছিল।...... অবশ্য লালবিহারী বৃটিশ রাজত্বের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর গভীর দেশপ্রীতি, ভারত ও বঙ্গপ্রীতি ছিল।...... তিনি সাদা ও কালো চামড়ার মধ্যে বৈষম্যরক্ষা নীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন। অপরদিকে দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি, তাঁদের অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন করে তুলবার জন্য প্রবল আগ্রহ, তাদের জীবনরূপকে সাহিত্যে প্রতিফলনের জন্য গ্রন্থরচনা, তাদের মুখে-মুখে বেঁচে-থাকা উপকথাকে সংরক্ষণ প্রচেষ্টা—সবই লালবিহারীর দেশপ্রেমের সাক্ষ্যবহ। বাংলার মাটি ও মানুষের প্রতি এই প্রাণের টান লালবিহারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।' ৬২ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর ও অকৃত্রিম মমত্বই তাঁর সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার সার্থক রূপায়ণে সহায়ক হয়েছে। সমকালের অধিকাংশ প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে চিন্তা ও কর্মে সাযুজ্য রেখে বিশেষ বিশেষ সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানে যেভাবে দ্ব্যর্থহীন ও ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাতে লালবিহারী দে'কে একজন বাস্তববাদী ও সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক বলতে আর দ্বিধা থাকে না। সব শেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন

যে, পূর্বে আলোচিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণে' যে কাহিনী-গ্রন্থনে শৈথিল্য রয়েছে, লালবিহারী দে তাঁর 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' সেই দুর্বলতা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছেন, মূলতঃ মুলুকচাঁদ ও ভারতচন্দ্রের পরিবারের কাহিনীকে বৈবাহিক সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে সমকালীন বাংলার সমাজ-পটভূমিকায় রেখেই উপাখ্যানটি রচিত হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলেও বলা যায় যে, 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' উপন্যাসের যথার্থ কাহিনী-গ্রন্থন-বৈশিষ্ট্যটিও আভাসিত হয়েছে।

॥ ছয় ॥

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা

প্রাক্-বঙ্কিম পর্বের সমাজ-বাস্তবতা-ভিত্তিক আখ্যানমূলক গদ্যরচনার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি হল 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-এর সম্পূর্ণ অংশের প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৬৪ খ্রীঃ (১ম ভাগ-১৮৬২, সম্পূর্ণ ১৮৬৪) আর ১৮৬৫ খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী' প্রকাশিত হয়। এই নক্‌শার রচয়িতা কে সে নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রচলিত ধারণা অনুসারে মহাভারত ('পুরাণ সংগ্রহ') অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহই 'হুতোম' ছদ্মনামে এই নক্‌শার স্রষ্টা, আবার কেউ মনে করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎ-সাহিনী সভা'র অন্যতম লিপিকর ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এটি রচনা করেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ তা প্রকাশ করেন মাত্র।৬৩ যাহোক আমাদের উদ্দেশ্য গ্রন্থে উপস্থাপিত কাহিনী সমূহের বাস্তবতা ও লেখকের বাস্তব-সচেতনতার পরিমাণ ও গভীরতা নিরূপণ, তাই গ্রন্থ রচয়িতা কে বা গ্রন্থ রচনার কাল সম্পর্কিত বিতর্কের বিষয় আপাততঃ স্থগিত রাখছি।

গ্রন্থটির প্রকাশ-কাল যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, তবু এর আলোচিত বিষয়বস্তুর পটভূমিকা আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পর থেকেই এর সূত্রপাত। নবাবী আমলের শেষ ও কোম্পানীর শাসনের শুরু— এই যুগসন্ধিক্ষণের বাংলার সামাজিক অবস্থা, ধর্মভিত্তিক সামাজিক

আচরণ সমূহ, পাশ্চাত্য আচার-আচরণের সংস্পর্শে বাঙালীর মানস-লোকে নবচেতনার স্ফুরণ ইত্যাদির পরিচয় এই গ্রন্থের চিত্রমুহে লক্ষ্য করা যায়, এমন কি লেখক স্বীয় শ্রেণীভুক্ত মানুষদের, যারা সমকালে সমাজপতি হিসেবে পরিচিত তাদেরও স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যকলাপের শ্লেষাত্মক সমালোচনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য যে সমাজ ও ব্যক্তির শুদ্ধিকরণ তা লেখক নিজেই দ্বিতীয়বারের গৌর-চন্দ্রিকায় স্বীকার করেছেন – 'যাঁরা সহৃদয়, সর্ব্বসময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা হুতোমের নক্‌শা আদর করে পড়ে সর্ব্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন।' এছাড়া, গ্রন্থখানি সম্পর্কে কালী প্রসন্নের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন – 'ইহা কেবল নক্‌সা বলিয়াই তৎকালে আদৃত হয় নাই, অনেক ভণ্ড সমাজদ্রোহীর পৃষ্ঠে ইহা যে তীব্র কশাঘাত-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সৎপথে প্রবৃত্ত করিয়া সমাজ সংস্কার সাধন করিয়াছিল, তজ্জন্যও ইহা কম প্রশংসা লাভ করে নাই' ৬৪।
মূলতঃ গ্রন্থটিতে ব্যঙ্গচ্ছলে সমাজ-সচেতন শিল্পী-হৃদয়ের বেদনাবোধ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি আবার অবক্ষয়ের মধ্যেই যে নতুন সমাজ-সৃষ্টির উপাদান জন্ম নিচ্ছে তার ইঙ্গিতও রয়েছে। লেখকের তীব্র স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রীতি ছিল বলেই তিনি দেশ ও জাতির আদর্শ-চ্যুতিতে যে কত গভীর বেদনা অনুভব করতেন, নীচের কয়েকটি উদ্ধৃতি তার প্রমাণ—

(ক) 'হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে? আজ একশ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এদেশে এসেছেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে?'। (পৃঃ ৯০, হঠাৎ অবতার)

(খ) যে দেশের বড়লোকের চরিত্র এইরকম ভয়ানক, এইরকম বিষময়, সেদেশের উন্নতি প্রার্থনা করা নিরর্থক!.........জন্মভূমি-

হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন করবার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলই নিরর্থক হবে।' (পৃঃ ৯৬-৯৭, 'হঠাৎ অবতার')

(গ) 'হা হতভাগ্য জন্মভূমি! তোমার সন্তানেরা বিদেশীয় সন্তান-দের নিকটে এত অপদস্থ কেন?' (পৃঃ ১৫৪ আলীপুরের কৃষি-প্রদর্শন)।

(ঘ) 'হা! বাঙ্গালা দেশের সঙ্গীত শাস্ত্রের কি দুর্দশা! এই মনোহর ও লোক প্রীতিকর সঙ্গীত বিদ্যা যেন এদেশকে এক কালে পরিত্যাগ করে গিয়েছে' (পৃঃ ১৬৬, সরস্বতী পূজা)।

(ঙ) 'হে যুবকগণ! উঠো উঠো একবার। কত নিদ্রা যাবে? সে কি, জাগিবে না আর? ব্যভিচার স্রোত ঊর্ম্মি সলিলে নেয়ে, ভেসে যান জন্মভূমি, দেখিবে না চেয়ে?' (পৃঃ ১৯১, উপসংহার) এছাড়া 'কলকাতার চড়কপার্ব্বণ' রচনাটির শেষে লেখক পাঠকদের কাছে 'কলিকাতার বর্তমান সমাজের ইন্‌সাইট' জানার আবেদন রেখেছেন। আবার সিপাহী-বিদ্রোহ ('মিউটিনি), নীল-বিদ্রোহ, রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখদের সংস্কারআন্দোলন, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, ইয়ং বেঙ্গলদের আবির্ভাব, দেশে রেলওয়ে বিস্তার, আলীপুরে কৃষিপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে-সে সম্বন্ধেও লেখক সচেতন ছিলেন।

কোম্পানীর শাসনের শুরু থেকেই কলকাতার সামাজিক পট পরিবর্তন লক্ষণীয়। গ্রামের জমিদারশ্রেণী সহরে এসে ভিড় জমায় – একদিকে তারা ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত, অপরদিকে কোম্পানীর নানা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে যুক্ত থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করত। সেই সঙ্গে নিজেদের বনেদীয়ানা বজায় রাখতে তাঁদের এক একটি গোষ্ঠী থাকত– 'বাবুদের নিজেদের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ–পণ্ডিত-কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেনে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত— বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম ফাঁক যায় না,'...

(পৃঃ ১) বাবু সহরে পা দিলেই একশ্রেণীর মানুষ দালাল হিসেবে তাদের কাছে হাজির হত. বাবুদের বাড়ী-গাড়ী ভাড়া করা থেকে আরম্ভ করে আমোদ—প্রমোদের ব্যবস্থা করা-সব কিছুর দায়িত্ব ছিল ঐ দালালদের উপর। কিছু ধনী এই ভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করার পর পরিণামে প্রচণ্ড অর্থসংকটে পড়ে কোম্পানীর এজেন্ট বা দালাল হিসেবে কাজ করত। পক্ষান্তরে নীচের তলার সাধারণ মানুষ ঐ সব ধনীদের সংস্পর্শে এসে তাদেরই বিলাস-ব্যসনের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হত। বেশ্যাপল্লীগুলো ছিল তাদের নৈশবিচরণ-ক্ষেত্র; এছাড়া ধনীপরিবারে খ্যামটা নাচ ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। চড়ক পার্বণে দুলে-বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা শিবের মাহাত্ম্য প্রদর্শনে নিজেদের দৈহিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও কাঁটা-ঝাঁপ বান-ফোঁড়া, তরোয়াল-ফোঁড়া ইত্যাদি দেখাতে অভ্যস্ত ছিল। 'কলকাতার বারোইয়ারি পূজা' অধ্যায়ে লেখক ধর্মীয় উৎসবের নামে ব্যভিচারের চরম প্রকাশ দেখিয়েছেন; যা এযুগের দৃষ্টিতে নৈতিকতার বিচারে অশ্লীল ও অভব্য, তাই তখনকার কলকাতার ভদ্র সমাজে যে অবশ্য আচরণীয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নীচের উদ্ধৃতি-দুটিতে-

(ক) 'কি ইয়া. গোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইন্‌ভেলিড, সকলেই হাফআখড়াই শুনতে পাগল' (পৃঃ ২৮)।

(খ) 'অনেক ছেলেপুলে, ভাগ্নে ও জামাই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে একত্রে বসে খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান' (পৃঃ ৩৮)।

ঐ সব কুৎসিত উৎসব-প্রিয় ধনীসম্প্রদায়-শাসিত সমাজে ধর্মের নামে গোঁসাইগিরি, ভাগবতলীলাপ্রদর্শন, গুরুপ্রসাদী প্রথা ইত্যাদি নানাধরণের বীভৎস রীতি প্রচলিত ছিল।

সমাজের এই পঙ্কিল অবস্থায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হওয়ার পর ধীরে ধীরে একদল যুবকের উদ্যোগে সংস্কার-প্রচেষ্টা শুরু হয়। সংঘাত সৃষ্টি হল প্রবীন ও নবীনের মধ্যে। খৃষ্টান ধর্মগ্রহণের মাদকতা থেকে বাঙালীকে রক্ষা করতে ও হিন্দুধর্মের উৎকট রক্ষণশীলতার ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে একেশ্বরবাদের

উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করা হল। সতীদাহপ্রথা বন্ধ হল, বিধবা-বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রদ সম্পর্কিত আন্দোলনই শুধু গড়ে উঠল না, বাস্তবক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা তা কার্যকরী করতে শুরু করেন। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রসারের দিকেও ঝোঁক দেখা গেল। এ ব্যাপারে ইংরেজরাও যে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তার প্রমাণও প্রচুর। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার কিছু সংবাদ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—৬৫

কলিকাতা জর্নেলে ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাদরি শ্রী যুত করি সাহেব এক পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবরণ আছে যে মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকা পাঠশালা ছিল তাহাতে এগার পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে।" (৮ মার্চ, ১৮২৩)

'কলিকাতা নেটিব ফিমেল স্কুলের নিমিত্ত যে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবেক তাহার প্রস্তর সংস্থাপনার্থ গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার সময় শ্রীমতী লেডী আমহর্ষ্ট স্বয়ং সেখানে গিয়া অতি সমারোহপূর্ব্বক প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন' (২০মে ১৮২৬)

নবযুগের এইসব উদ্যোক্তাদের সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায়, তখন নানাভাবে তাঁরা এসবের বিরোধিতা করতে অবতীর্ণ হন। আলোচ্য গ্রন্থে 'হঠাৎ অবতার' অধ্যায়ে পদ্মলোচন বাবুর ভুমিকা সম্পর্কে হুতোম বলেছেন-- 'ইংরাজি লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্মগ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দুধর্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হইলেন' (পৃঃ ৯৫)······ 'তিনি যামন হিন্দুধর্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অন্যান্য সৎকর্ম্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল; বিধবা বিবাহের নাম শুনলে তিনি কানে হাতদিতেন-ইংরাজি পড়লে পাছে খানা খেয়ে কৃশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলিকে ইংরাজি পড়ান নি, অথচ বিদ্দেসাগরের উপর ভয়ানক বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই (পৃঃ ৯৬)।··········

এই দ্বন্দ্ব-দীর্ণ সমাজে অবস্থান ও ভূমিকা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীকে এইভাবে বিন্যস্ত করা যায়— (ক) হিন্দু সমাজের শিরোমণি ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী- 'উঁচু কেতার খাস হিন্দু' (পৃঃ ৯৭), হুতোম বলেছেন 'এই মহাপুরুষেরাই রিফর্ম্মেশনের প্রবল প্রতিবাদী' (পৃঃ ৯৮), (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় বিলাসী বিত্তবানদের—যারা শাসকের রীতি-নীতিকে সাদরে গ্রহণ করে আত্মসুখে ও স্বীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে ব্যস্ত থাকত। এই শ্রেণীর ধর্ম-রীতি-নীতি সব কিছুই রাজমুকুটের অনুগামী। এরাই ছিল বৃটিশ শাসনের স্তম্ভসদৃশ, লেখকের ভাষায় এরা 'সুপারিশওয়ালা বাবু ও সোনার বেনে বড় মানুষ' (পৃঃ ৬৪), এই শ্রেণী বৃহত্তর সমাজ থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলত, বিশেষ করে সংস্কার-মূলক আন্দোলন থেকে নিজেরা যে দূরে সরে থাকত তার প্রমাণ নক্শায় পাওয়া যায়। রাজা রাধাকান্তদেবের নাটমন্দিরে ওয়েলসের বিপক্ষে যে সভা হয় সে সম্পর্কে লেখক বলেছেন, 'সুপারিসওয়ালা বাবুরা ও সহরের সোনার বেনে বড় মানুষেরা কেবল এই সভায় আসেন নাই······ বেনে বাবুরা কোন কাজেই মেশেন না (পৃঃ ৬৪)। (গ) পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত ও সংস্কারমুক্ত নব-চেতনার ধারক ও প্রচারকদের তৃতীয় গোষ্ঠীতে ফেলা যায়। রাম-মোহন, দ্বারকানাথ, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ, এমনকি কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এঁরা শ্রেণীগত দিক থেকে যদিও ধনী ও উচ্চবিত্তবানদের সগোত্রীয়, কিন্তু পাশ্চাত্যের যুক্তি-ভিত্তিক আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে তাঁদের ব্যক্তিগত মানস-সংগঠণ এমন ভাবে গড়ে ওঠে যার দ্বারা চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের শ্রেণী বিচ্যুতি ঘটেছিল। এদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ শ্রেণীগত ব্যক্তিত্বের (class personality) উর্ধ্বে, সেই ব্যক্তিত্ব বিচার করতে হবে ব্যক্তির বিকাশের স্বতন্ত্র ধারার নিরিখে, সংস্কৃতি বিজ্ঞানী র‍্যালফ্ লিণ্টনের ভাষায় 'by his deviations from the cultural pattern' ৬৬। রামমোহনের পারিবারিক সম্পর্ক যে কত তিক্ত ও জটিল হয়ে উঠেছিল তা সুবিদিত, ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা ও সেদিনের সমাজ-পতিরা

গ্রহণ করেনি। কিন্তু সেদিন বাংলার সমাজে নবযুগের প্রবর্তক ছিলেন এই শ্রেণী—তাঁরা তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও সমর্থনও পেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই। সরকারী ও আংশিকভাবে সামাজিক সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেদিন তাঁরা বাংলার তথা ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন-যাত্রার ধ্যানধারণার পরিসমাপ্তি ঘটাতে ব্রতী হয়েছিলেন। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক—সকল বিষয়েই বাংলার সমাজে উনবিংশ শতাব্দীতে যে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয় তার মূলে ছিল এই সম্প্রদায়ভুক্ত মনীষীদের বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা।

(ঘ) সমাজের সংখ্যাধিক সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের সর্বশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) আইনে জমিদারদের ভূমির স্বত্ব দেওয়া হলে প্রজা সাধারণের উপর অত্যাচার নিপীড়ন তীব্রতর হয়। তার ফলে অনেকে ভূমিহীন হয়ে পড়ে। তখন গ্রামের মানুষ অনেকে শহরাঞ্চলে জীবিকার সন্ধানে এসে ভীড় জমায়, কিন্তু সেখানেও ঐ উচ্ছেদ অনুপাতে কলকারখানা বিশেষ গড়ে ওঠেনি। কাজেই বাঁচার তাগিদে কেউ কেউ শহরে এসে চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি ইত্যাদিকে অবলম্বন করেছে, ৬৭ আবার কিছু সংখ্যক মানুষ ধনীপরিবারের সংস্পর্শে থেকে কিছু রোজগারের পথ পেয়েছে। তখনকার জমিদারেরা পাইক-বরকন্দাজ, লাঠিয়াল ইত্যাদি পুষত; এইসব কাজে কেউ কেউ নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে বহাল হল। একদিকে শোষণ, অন্যদিকে অশিক্ষা—এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ আত্মরক্ষা করতে ও অস্তিত্ব বজায় রাখতেই একান্তভাবে ধনী-সম্প্রদায়ের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে উঠেছিল। এর উপর ছিল ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাস। কাজেই সমকালীন প্রগতিশীল সংস্কারমূলক আন্দোলনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য তারা যেমন স্বাভাবিকভাবেই উপলব্ধি করতে পারেনি, তেমনি গণবিক্ষোভ মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে সন্ন্যাসীবিদ্রোহ বা নীলবিদ্রোহের আকারে প্রকাশিত হলেও তাঁকে বৈপ্লবিক স্তরে উন্নীত করাও সম্ভব হয় নি শোষণের বিরুদ্ধে

উপযুক্ত শ্রেণী-সচেতনতার অভাবের জন্যই। তাই সমাজ আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী গোঁড়া ও রক্ষণশীল সমাজ-প্রধানদের ব্যাপক প্রচারের শিকার হয়ে নানা মিথ্যাসংবাদ ও গুজবে সাধারণ মানুষ যে বিভ্রান্ত হত তার প্রমাণ পাওয়া যায় হুতোমের নক্শায় 'হুজুক' অধ্যায়ে 'মিউটিনি' শিরোনামায়—'খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের বেলায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, বিধবা বিবাহের আইন পাস ও বিধবা বিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে ক্ষেপেচে। গবর্ণমেণ্ট বিধবা বিবাহের আইন তুলে দিয়েছেন বিদ্যাসাগরের কর্ম্ম গিয়েচে-প্রথম বিধবা বিবাহ বর গিরীশের ফাঁসি হবে ··· ··· ··· কোথাও হুজুক উঠলো 'দলিপ সিং কে কৃশ্চান করাতে, নাগপুরের রাণীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লক্ষ্মৌয়ের বাদসাই যাওয়াতেই মিউটিনি হল' (পৃঃ ৫৫)। সমাজে সেদিন এই জাতীয় মিথ্যা রটনা সম্ভব হত একমাত্র স্বচ্ছ ও যুক্তিসিদ্ধ গণচেতনার অভাবের জন্যই। হুতোম গণচেতনার অভাববশতঃ হুজুকে বিশ্বাস করাকে সেদিনের বাঙালীর জাতীয় দোষ বলে গণ্য করেছেন এবং এই দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন— যতদিন বাঙ্গালীর বেটর অকুপেশন না হচ্ছে, যতদিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালীর বর্ত্তমান গার্হস্থ্য প্রণালীর রিফর্ম্মেশন না হচ্ছে, ততদিন এই মহান দোষের মূলোচ্ছেদের উপায় নাই' (পৃঃ ৪৮)। এই মন্তব্যের মধ্যেই লেখকের সমাজ-সচেতনতার ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে যে সামাজিক আচরণের পরিবর্তন ঘটে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে উপরের মন্তব্যে, আবার সমাজ-কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-মানসও যে পরিবর্তিত হয়, আর সামাজিক আচার-আচরণ সমাজ-মনেরই যে বহিঃপ্রকাশ তাও লেখক বলেছেন—'লোকের মনই সমাজের লোকোমোটিবের মত, ব্যবহার কেবল ওয়েদরককের কাজ করে' (পৃঃ ১২৩)। বৃটিশ পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষে নিজেদের স্বার্থেই যানবাহনের উন্নতি করবে, যন্ত্রচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আগ্রহী হবে—তারপরই 'বাঙ্গালীর বেটর অকুপেশন' মিলবে—এর আভাসও নক্শায় রয়েছে। 'রেলওয়ে' শীর্ষক নক্শটিতে একজায়গায় লেখক

লিখেছেন — 'যেসকল মহাত্মারা ছেলেবেলা কলকেতার চীনে বাজারে 'কম্ স্যার। গুড্ শপ্ স্যার! টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক্ একবার তো সি' বলে সমস্তদিন চীৎকার করে থাকেন, যে মহাত্মারা সেলর ও গোরাদের গাড়ি ভাড়া করে মদের দোকান, এম্‌টি হাউস, সাতপুকুর ও দমদমায় নিয়ে বেড়ান ও ক্লয়েন্টের অবস্থা বুঝে বিনা অনুমতিতে পকেট হাতড়ান, আরশোলার কাঁচপোকার রূপান্তরের মত তাঁদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদলে 'দি এষ্টেশন মাস্টার' হয়ে পড়েচেন' (পৃঃ ১৪৩)। দেশে পুঁজিবাদের সূচনায় ও ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার পর দেশী ও বিদেশী মূলধনে গড়ে ওঠা নানা শিল্প-প্রতিষ্ঠানে গ্রামের ভূমি থেকে উৎখাত মানুষেরা শ্রমিক ও চাকুরীজীবীতে রূপান্তরিত হল। লর্ড ডালহৌসির যুগে ১৮৫৬ সালের মধ্যে দেশে রেলপথের প্রবর্তন হল এবং পাব্‌লিক ওয়ার্কস খাতে প্রায় ২৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দের ফলে তখন কর্মসংস্থানের সুযোগও বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। ৬৮ আর অন্যদিকে গ্রামের ধনী ভূস্বামীরা তাদের ভূমি থেকে উপার্জিত সম্পদকে শিল্পে মূলধন হিসেবে নিয়োগ করে নিজেদের গোত্রান্তর ঘটাল সামন্ত থেকে পুঁজিপতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে,—ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার সমাজে যে পরিবর্তন দেখা গেল তা থেকেই একথা প্রমাণ হয়। আর বাংলার এই পরিবর্তনোন্মুখ সমাজ-দেহের মস্তিষ্ক-স্বরূপ ছিল এই কলকাতা শহর, সেইজন্য জনৈক সমাজ-বিজ্ঞানী যথার্থই মন্তব্য করেছেন— 'নতুন শ্রমশিল্পের যুগে বাংলার ভূমিকা এবং বাংলার নতুন রাজধানী কলিকাতা মহানগরের প্রাধান্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার প্রাধান্যের জন্যই বাঙলার প্রাধান্য। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কলিকাতার দুর্নিবার অগ্রগতি বাঙলার অগ্রগতির কারণ।' ৬৯ বি, আর রায়ের 'অরগানাইজড্ ব্যাঙ্কিং ইন্ দি ডেজ্ অফ্ জন্ কোম্পানী' ৭০ (১৮০০-১৮৫৭) নামক তথ্যমূলক গ্রন্থখানি থেকে জানা যায় যে, ১৮৪৬ থেকে ১৮৫০ এর মধ্যে লণ্ডনের ৯টি ব্যাঙ্কের শাখা এবং বিভিন্ন ভারতীয় ব্যাঙ্কের ৭টি শাখা কলকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়; আর বিদেশীদের উদ্যোগে শিল্প-

প্রতিষ্ঠান ছাড়া ১৮৫৮ সালের মধ্যে বাঙালী পরিচালক (আশুতোষ দে, চন্দ্রকুমার চ্যাটার্জ্জী, গোবিন্দ চন্দ্র দে, রামগোপাল ঘোষ, পীতাম্বর দত্ত, রাধানাথ দত্ত, ত্রৈলক্যনাথ মুখার্জ্জী, মতিলাল শীল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা নবকৃষ্ণ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখদের পরিচালিত) প্রায় শতাধিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায় 'দি বেঙ্গল ডাইরেকটারি এণ্ড অ্যানুয়েল রেজিস্টার ফর্ ১৮৫৮' গ্রন্থে।৭১ এইভাবে বাংলার সমাজ যে ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় স্থিতিশীলতাকে অতিক্রম করে এক নতুন যুগে—ধনতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করে সচল ও সক্রিয় হয়ে উঠ্ছে তা হুতোম উপলব্ধি করেছিলেন বলেই মন্তব্য করেছেন— 'টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্দী, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকেতার কায়েত মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো।' (পৃঃ ২২) সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে বংশানুক্রমিক ও পরিবারভিত্তিক সামাজিক বৈষম্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ল, তখন অর্থই সামাজিক মর্যাদার তৌল। সমালোচকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়— 'স্বাধীন অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে তাদের নিম্ন থেকে মধ্য এবং মধ্য থেকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নতির পথে আর কোন বাধা থাকবে না। প্রভাব প্রতিপত্তি ও শ্রেণীমর্যাদার অবাধ অধিকারও সকলের স্বীকৃত হ'ল। বংশগৌরব, কৌলীন্য ও রক্ত-সম্পর্কের আভিজাত্যকে জয় করল সচল সক্রিয় সর্বশক্তিমান মুদ্রা' ৭২। এই সামাজিক গতিশীলতাই যা ভাবী সমাজ-গঠনের পক্ষে অপরিহার্য— তারই সূচনা আভাসিত হয়েছে হুতোমের নক্শায়। হুতোমের নক্শার বাস্তবতার মূল্যায়ণে এই কথাই বলা যায় যে, গ্রন্থখানি ব্যঙ্গচিত্রের আধারে বাংলার সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণের নিখুঁত বাস্তবচিত্র; নিছক ভাষার অশ্লীলতা ও অভব্য শব্দ-প্রয়োগের অজুহাতে এর বাস্তবতার পরিচয় না নেওয়া সমীচীন নয়।

তাছাড়া, নক্শাটির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যেভাবে তার প্রতিক্রিয়া দেখাগিয়েছিল—তাও আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকায় 'হুতোম' নিজেই সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—'যে সময়ে এই বইখানি বাহির হয়, সে সময়ে লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙ্গালী-সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশ্যে) পড়বেন। যাঁরা সহৃদয়, যাঁরা সর্বসময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী-সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা হুতোমের নক্সা আদর করে পড়েন…, অনেকে শুধরেচেন; সমাজের উন্নতি হয়েছে ও প্রকাশ্যে বেলাল্লাগিরি, বদ্‌মাইসী বজ্জাতীর অনেক লাঘব হয়েছে!… হুতোমের নক্সা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি।…… হুতোমের নক্সার অনুকরণ করে বটতলার ছাপাখানাওয়ালারা প্রায় দুইশত রকমারী চটী বই ছাপান' ৭৩। প্রথমতঃ এই নক্‌শার প্রথমভাগ প্রকাশিত হওয়ার পরই (১৮৬২) হুতোমকে প্রচ্ছন্নভাবে আক্রমণ করে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'আপনার মুখ আপনি দেখ' (১৮৬৩) গ্রন্থটি রচনা করেন, এর ইংরেজী নাম ছিল 'Look to your face or amusing sketches of Life and Manners' ৭৪। অবশ্য এতে সামাজিক আচার-ব্যবহারকে লক্ষ্য করেও কটাক্ষ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ হুতোমের নক্‌শার অনু-করণে সেই সময় বটতলা ছাপাখানা থেকে অতি নীচুমানের বহু ছোট ছোট বই ছাপান হয়েছিল। ৭৫ ঐগুলির মধ্যে ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল হরিমোহন কর্মকারের 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে', শ্যামাচরণ সান্যালের 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ', রাজকুমার চন্দ্রের 'দেক্‌কে শুনে আকেল গুড়ুম', সুরেশচন্দ্র দাসঘোষের 'কি মজার ভেকেশন', নন্দলাল দত্তের 'অবাক কলি পাপে ভরা' ও 'আপনার মান আপনি রাখি'। এছাড়া রয়েছে গোলাম হোসেনের 'কলির বৌ হাড়-জ্বালানী' (১৮৬৭) ও শেখ আজিমুদ্দীনের 'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮)। আর একটি সামাজিক নক্‌শা 'নিশাচর' প্রণীত 'সমাজকুচিত্র' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৫ সালে, প্রকাশকের নাম ছিল এইভাবে – 'Published by B. Mook. Pen & Co.' এই 'B. Mook' ভুবন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলে

অনুমান করা হয় এবং এই অনুমানের ভিত্তি 'জন্মভূমি' পত্রিকার (ভাদ্র, ১৩১০) সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ দত্ত রচিত ভুবনচন্দ্রের একটি জীবন বৃত্তান্ত। যতীন্দ্রনাথ ভুবনচন্দ্রের মুখ থেকে শোনা কাহিনীর উপর নির্ভর করে ঐ বৃত্তান্তে লিখেছিলেন—'১৮৭০—৭১ সনে খণ্ডশঃ প্রকাশিত 'গুপ্তকথা' লিখিবার অগ্রে সমাজকুচিত্র নামে তিনি একখানি সামাজিক নক্শা প্রণয়ন করেন, সেখানি হুতোমের ভাষার অনুকরণ, বিজ্ঞলোক তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃতচিত্র বলেন, হুতোম নিজেও প্রশংসা করিয়াছিলেন' ৭৬। হুতোমের নক্শার অনেক পরে এই জাতীয় রচনার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্যারী-চাঁদ মিত্রের আত্মীয় প্রাণনাথ দত্ত ও গিরীন্দ্র নাথ দত্ত পরিচালিত সচিত্র ব্যঙ্গ-পত্রিকা 'বসন্তক' (১২৮০ সনে বসন্ত পঞ্চমীর দিন প্রথম প্রকাশিত হয় এবং মাত্র দুই বৎসর চলে)। এটি ইংরেজী পাঞ্চের (Punch) অনুকরণে এদেশে ইংরেজ সরকারের ধামাধরাদের লক্ষ্য করে লেখা হ'ত। ৭৭ যেহেতু আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বস্তুর সময়সীমা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত, তাই প্রধান প্রধান সমাজ-সমস্যামূলক উপাখ্যানধর্মী গদ্য রচনাগুলি ছাড়া অন্যগুলির বিস্তারিত আলোচনা না করে উল্লেখ করা হল মাত্র। তবে এটুকু উল্লেখের মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে, 'নববাবু-বিলাস' গ্রন্থটির মতই সেকালের বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে হুতোমের নক্শারও এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল।

সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে উপরে যে আলোচনা করা হ'ল তার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, হুতোম প্যাঁচার নক্শায় উত্থাপিত বাস্তবতা অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক, লেখকের বাস্তবতাবোধও সুতীব্র। তবে কাহিনীর বৈচিত্র্য এবং তা বিন্যাসে পরস্পর সম্পর্ক-হীনতা ও শিথিলতার জন্য সঠিক উপন্যাস হয়ে উঠ্তে পারেনি। এই দিক দিয়ে বরং 'আলালের ঘরের দুলাল' শ্রেষ্ঠ। কারণ সেখানে মূল কাহিনীর একমুখীনতা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, গ্রন্থখানির আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন : 'নায়ক মতিলালের মনুষ্যত্ব উপলব্ধি শেষপর্যন্ত কেমন করে ঘটল সেটা উপন্যাসের গল্প। এই গল্পের অন্তরালে যে বক্তব্য ক্রিয়াশীল তা হল মানুষের

ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলে সুখ ও শান্তি মেলেনা। ফুলমণি ও করুণায় যেখানে শ্রীমতী ম্যলেন্স ধর্মের মানুষকে খুঁজেছেন, প্যারীচাঁদ মিত্র সেখানে মানুষের ধর্মকে সন্ধান করেছেন। উনিশ-শতকের মানবময় চেতনার সঙ্গে এবোধের নিবিড় সংযোগ বিদ্যমান' ৭৮। আবার 'আলালের ঘরের দুলাল' অপেক্ষা 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' কাহিনীবিন্যাসে লেখক যেন আরও সংযত ও অনেকাংশে ঔপন্যাসিকের রীতি-অনুসারী। কাহিনীগত দিক থেকেও 'আলালের ঘরের দুলালে' অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নেই, এটি 'নববাবুবিলাসের' পরিণত রূপ মাত্র। লালবিহারী দে বরং 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে' কাহিনীর পটভূমিকাকে নাগরিক পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে গ্রামীন জীবনের বাস্তবতায় স্থাপন করেছেন এবং সেখানকার সাধারণ নর-মারীর সুখ-দুঃখ মিশ্রিত দৈনন্দিন জীবনালেখ্য ও তাদের চিন্তা–ভাবনার পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। শ্রীমতী ম্যলেন্সের মত পুরোপুরি ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাও তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিতে পারেনি। তিনিও যেন 'ধর্মের মানুষকে' না খুঁজে 'মানুষের ধর্মকেই' খুঁজেছেন। এ গ্রন্থটিকে সেইজন্য 'মৌলিক বাংলা উপন্যাস' ৭৯ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। নববাবু-বিলাস, আলালের ঘরের দুলাল ও হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা—এই তিনটিতে বাস্তবতা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আধারে পরিবেশিত হয়েছে, আর ফুলমণি ও করুণার বিবরণ এবং চন্দ্রমুখীর উপাখ্যানে তার নিরাবরণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ের রচনার বৈশিষ্ট্য—কাহিনী এখানে গৌণ, মুখ্য হচ্ছে সমাজ-সচেতনতা। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমাজ-সচেতনতাকেই প্রকাশ করেছেন রূপকের অন্তরালে, কাহিনীই সেখানে মুখ্য। বঙ্কিম-উপন্যাসের বাস্তবতা ও সমাজ-সচেতনতা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিচার করব।

এই অধ্যায়ের আলোচনার উপসংহারে আর একটি দিকের উপর কিছু বলা দরকার। সার্থকভাবে বাংলা উপন্যাসের আবির্ভাবের এই প্রস্তুতি-পর্বে ব্যঙ্গ ও নক্‌শা জাতীয় সামাজিক আখ্যানগুলি ছাড়া আরও কিছু সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল যে গুলির অধিকাংশেরই সাহিত্যিক মূল্য স্বীকৃত না হলেও উপন্যাসের রূপ-

-রীতি ও অবয়ব-নির্মাণের প্রয়াসের ফলশ্রুতি হিসেবে ঐতিহাসিক মূল্য নিঃসন্দেহে প্রাপ্য। দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) প্রকাশের পূর্বে অনেকেই যে উপন্যাস রচনার নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন তার প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া যায় ৮০।

এই পর্বে ইংরেজী উপাখ্যানের অনুবাদ বা তার ভাবালম্বনে গ্রন্থরচনারও যথেষ্ট উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে অনুবাদ-মূলক আখ্যায়িকাগুলির অধিকাংশের রচনা কাল উনবিংশ শতকের সাত ও আটের দশকে। প্রাক্-দুর্গেশনন্দিনী পর্বে বঙ্গভাষানু-বাদক দুজন বাঙালী লেখক রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন 'গোপাল কামিনী' (১৮৫৬) ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 'সুশীলার উপাখ্যান' (তিন ভাগ) (১৮৫৯–৬০) গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, 'সুশীলার উপাখ্যান' যে বৎসর প্রকাশিত হয়, ঐ বৎসরেই লালবিহারী দে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান'। 'সুশীলার উপাখ্যান' গ্রন্থটিও যে উদ্দেশ্যমূলক লেখকের উক্তিই তার প্রমাণ— 'পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি যেন অল্পবয়স্কা বালিকারা ইহা পাঠ করিয়া ঐ বালিকার ন্যায় পরিশ্রমী, ধর্মপরায়ণা এবং সচ্চরিত্রা হইতে যত্নবতী হয়।' ৮১ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য রচিত 'দুরাকাঙ্ক্ষার বৃথাভ্রমণ' (১৮৫৮) গ্রন্থটিও সমকালের রচনা। কেউ কেউ মনে করেন এটি কন্‌টারের (Hobert Caunter) 'দি রোমান্স্ অফ্ হিস্টরি'র অনুসৃতি, আবার এর বিপরীত মতও আছে। ৮২ যা হোক, এই গ্রন্থে ছয়টি খণ্ডে ছয়টি স্বতন্ত্র গল্প রয়েছে এবং নামহীন নায়ক এক দুরাকাঙ্ক্ষী যুবকের ভূমিকাসূত্রেই একমাত্র ঐ গল্পগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ভ্রাম্যমান ঐ নায়কের বিচিত্র স্থান পরিভ্রমণ ও নানা মানুষের সংসগজনিত বিপুল চাঞ্চল্যকর অভি-জ্ঞতা-সমৃদ্ধ এই কাহিনী। দুরাকাঙ্ক্ষার সমুদ্রযাত্রা, জাহাজে ফরাসী যুবতী জুলিয়ার সঙ্গে তার প্রেম, সামুদ্রিক ঝড়ে বিপর্যয় ও জুলিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ, আবার ত্রিবাঙ্কুরের তটে কমলাদির সঙ্গে প্রেম ও পরে পরিণয়, আবার সেখান থেকে পলায়ন, মহীশূরে হায়দার আলীর সৈন্যদলে যোগদান, মালোয়ায় সিন্ধিয়ার সঙ্গে যোগ-দান, রাজকুমারীর সঙ্গে প্রণয় ও পরে বিচ্ছেদ, সবশেষে উড়িষ্যার

পার্বত্য এলাকায় এক পারিয়ার কুটিরে পারিয়ার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করে তার ভ্রাম্যমানতার সমাপ্তি ঘটেছে—এই কাহিনীর মধ্যে নিঃসন্দেহে রোমান্স ও রোমাঞ্চ দুই-ই আছে, কিন্তু ঐতিহাসিক উপাদানের সামান্য অস্তিত্ব (হায়দার আলীর সঙ্গে ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধ ইত্যাদি) লক্ষিত হলেও সমাজ-বাস্তবতার প্রতিফলন এখানে ঘটেনি বলা চলে। শুধু এটুকু বলা যায় যে, নায়ক দুরাকাঙ্ক্ষীর মধ্যে ঊনবিংশ শতকের যুবসম্প্রদায়ের একাংশের বিক্ষিপ্ত মানসিকতা ও স্থৈর্য্যহীনতার প্রতিফলন কিছুটা ঘটেছে, স্বয়ং লেখকের দার্শনিক বিশ্বাস বা যৌবনের চরিত্রধর্মের কিছু প্রভাব এক্ষেত্রে পড়েছে বলেও মনে হয়।৮৩ তবে উপ-ন্যাসের উপযোগী ভাষা ব্যবহারের জন্য গ্রন্থটির গুরুত্ব রয়েছে। সমাজ-বাস্তবতার আলোচনায় ভাষা-প্রসঙ্গ না আনাই বাঞ্ছনীয় বলে সে বিচারে যাচ্ছিনা। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'জয়াবতীর উপাখ্যান'ও (১২৭০ সন) সমসাময়িক রচনা। এছাড়া ঐ সময়ে বিপ্রচরণ চক্রবর্তী নামে জনৈক বাঙালী খ্রীষ্টান 'শিববৃত্তান্ত' (১৮৫৭) ও 'সত্যগুরু' (১৮৫৭) নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন, প্রথমটির উদ্দেশ্য হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর কুৎসা রটনা করা।৮৪ আরও জানা যায় যে, সুজাত আলী নামে একজন মুসলমান খ্রীষ্টান 'দুঃখিনী কন্যা,' (১৮৬৩) নামে একটি আখ্যায়িকা ঐ সময় লিখেছিলেন।৮৫

বাংলা উপন্যাসের কাঠামোয় রূপকথার কাহিনীকে পরি-বেশন করতে চেয়েছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গোপীমোহন ঘোষ, তিনি তাঁর 'বিজয়বল্লভ' (১৮৬৩) গ্রন্থে বিজয়-বল্লভের আজন্ম বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এক-দিকে চিকিৎসক পাতঙ্গির সহযোগিতায় বিমাতার ষড়যন্ত্র ও পরে বিন্ধ্যাচলে তান্ত্রিকের ছলনা, অন্যদিকে বিজয়বল্লভের রক্ষাকর্ত্তা বুড়ো জেলের বারবার আবির্ভাব, তারই প্রচেষ্টায় পরিণামে মৃত্যু-দণ্ডপ্রাপ্ত বিজয়বল্লভের প্রাণরক্ষা ও রাজকুমারী চম্পকলতার সঙ্গে তার বিবাহ ইত্যাদি ঘটনাগুলি রূপকথার মত অবিশ্বাস্য হলেও রীতিমত উপভোগ্য। তবে রচনারীতি আদৌ উপন্যাসের উপযোগী নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় কাপালিক চরিত্র-

পরিকল্পনা ও বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন এই গ্রন্থের তান্ত্রিকের ও বিজয়বল্লভের স্বপ্নদর্শনের প্রভাবজাত বলে অনেকে মনে করেন। ৮৬ আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ভুদের মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৬-৫৭), এতে দুটি আখ্যান আছে—'সফল স্বপ্ন' ৮৭ ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়।' গ্রন্থকার স্বয়ং প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে এদুটিকে উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন—'ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে।' কাহিনী দুটি কন্‌টারের 'রোমান্‌স্ অব্ হিস্টরি—ইণ্ডিয়া' হতে নেওয়া। 'সফলস্বপ্নের' ক্রীতদাসের রাজকন্যাসহ রাজত্ব লাভের কাহিনী যে বাস্তবতাবর্জিত – তা বলাই বাহুল্য। তবে এই আখ্যানে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনীর সেই অশ্বারূঢ় যুবার অশ্বের পদধ্বনি পূর্বেই শ্রুত হয়েছে বলে মনে হয়, অর্থাৎ গ্রন্থটি বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের আকাশে দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাবের শুকতারাস্বরূপ। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয় আখ্যান 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' কিছুটা উপন্যাসের কাছাকাছি এসেছে। ঔরঙ্গজীব-শিবাজীর বিরোধের ঐতিহাসিক কাহিনীকে ভুদেব মুখোপাধ্যায় নিজস্ব কল্পনার রঙে রঞ্জিত করে পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থটিতে ঐতিহাসিক পরিবেশসৃষ্টিতে লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য, সর্বোপরি সেই যুগে লেখকের মানবচরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনীশক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; কারণ তিনি এখানে বাহ্যিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে মানব-মনের দ্বন্দ্ব সংঘাতের সুষ্ঠ সংযোগ ঘটিয়েছেন। ঔরঙ্গীবের শত্রু শিবাজীর ঔরঙ্গজীব-দুহিতা রোসেনারার হৃদয় জয় করার কৌশলই তার প্রমাণ, আবার উভয়ে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হওয়া সত্ত্বেও শিবাজী-রোসেনারার মিলনে প্রধান বাধা ছিল সেদিনের সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কার। তাই এ ক্ষেত্রেও নারীর ব্যক্তি—স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে সমাজের। সেবিচারেও আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার প্রতিফলন এখানে দুর্লক্ষ্য নয়। তবে রচনাটির ভাষার ও বর্ণনার দ্রুততার জন্য সুখপাঠ্য হয়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও জনৈক সমালোচক মনে করেন এটি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস জাতীয় রচনার সাধারণ আঙ্গিক ও মূলসুর প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী তাহা

নিঃসন্দেহে দাবী করা যাইতে পারে।' ৮৮

সবশেষে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য সময়ে কতকগুলি আদিরসাত্মক রোমান্টিক ও কিছু নীতিমূলক আখ্যায়িকা রচিত হয়েছিল। ৮৯ সেগুলির মধ্যে রয়েছে রামসদয় ভট্টাচার্যের 'অদ্ভুত উপন্যাস' (১৮৬১) কেদারনাথ দত্তের 'নলিনী কান্ত' (১৮৫৮) ও 'প্রিয়ম্বদ' (১৮৫৫), জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পারিজাত বিকাশ' (১৮৬৩), দ্বারকানাথ রায়ের 'সুশীল মন্ত্রী' (১৮৫৬), জগদীশ তর্কালঙ্কারের 'বাসন্তিকা' (১৮৬০), কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলাঞ্জন' (১৮৬০), অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পুরঞ্জন' (১৮৬১) ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাঙালী পাঠকসমাজের হাতে আসার আগে অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময় ধরে কি ভাবে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল তা সংক্ষেপে তুলে ধরার জন্যই শেষের গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা হল। এই অধ্যায়ে মূলতঃ 'নববাবু-বিলাস' 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ;' 'আলালের ঘরের দুলাল', 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' এই মোট পাঁচটি গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং সেগুলির মধ্যে প্রতিফলিত সমাজ-বাস্তবতার মূল্যায়নেও যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বঙ্কিম-উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতার পরিমান নিরূপণে প্রয়াসী হব।

প্রসঙ্গ–নির্দ্দেশ

১. সুশোভন সরকার : 'সমাজ ও ইতিহাস পৃঃ ১৫১

'সমাজের জীবনে যখন আত্মবিকাশ থেমে যায় তখন আসে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের যুগ, আমাদের সাহিত্যে যাকে মৎস্যন্যায় বলা হত আর টয়েন্‌বি যার নাম দিয়েছেন 'times of trouble.'

২. R. C. Mazumdar, Dutta & Roy Choudhury, An Advanced History of India (1961 Edn.): It was on the 31st December, 1600, that the first important step towards Englands' Commercial prosperity was taken. On that memorable day the East India Company received a charter from Queen Elegabeth granting it the monopoly of eastern trade for fifteen years.' (P. 636)

৩. Karl Marx : The First Indian War of Independence (1857-1859) P.-34

৪. অমিত সেন : ইতিহাসের ধারা (সংশোধিত ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৫৭) :

'ইতিহাসের প্রথম কথাই হইল পরিবর্তন।...... সকল রকমের সনাতনী রক্ষণশীলতার সাধারণ লক্ষণ এই গতিকে অস্বীকার করা, ইহাকে দেখিয়াও না দেখিবার চেষ্টা।... অন্যদিকে পরিবর্তনের অর্থ পুরাতনের সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন হওয়া নয়। আগের অবস্থা রূপান্তরিত হইয়া চলে, কিন্তু নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে পুরাতনের কিছু সম্পর্ক থাকিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নহে। উগ্র চরম-পন্থীরা এই সহজ কথাটা বুঝিতে চাহে না।' (পৃঃ ৯)

৫. শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সুশোভন সরকারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৬. ডঃ অজিত কুমার ঘোষ সম্পাদিত 'রামমোহন রচনাবলী' (দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী সংখ্যা) ভূমিকা, পৃঃ ২১ দ্রঃ

৭. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ : 'রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন

তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ফিরাইয়া দিলেন।' পৃঃ ৯৫

৮. বিনয় ঘোষ ঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (১ম) ভূমিকা পৃঃ ১৮

৯. ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা (পৃঃ ৩৪দ্রঃ) সম্বলিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী (১ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ ২৯শে জুলাই, ১৯৬৬, দ্রষ্টব্য। ঐ আবেদনপত্রের উপসংহারটুকু হচ্ছে ঃ '...... অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে, অনুগ্রহপূর্ব্বক রীত্যনুসারে আমারদিগের ইংরাজি ভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য ও শিল্পাদিবিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্যনির্বাহে সমর্থ হইতে পারি।'

১০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' পৃঃ ৩৪-৩৫, ৩৮-৩৯

ডঃ ময়েট্‌কে লেখা বিদ্যাসাগরের পত্রের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি ঃ-

'ডাঃ ব্যালেন্টাইনের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকপ্রচলন বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। ......ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য-দর্শনের তিনখানি পাঠ্যপুস্তক প্রবর্ত্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। 'বেদান্তসার' পূর্ব হইতেই পাঠ্যরূপে সংস্কৃত কলেজে গৃহীত; ইহার ইংরেজী অনুবাদ পড়ান যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত ন্যায়-সম্বন্ধীয় 'তর্ক সংগ্রহ' এবং সাংখ্য-সম্পর্কিত 'তত্ত্বসমাস' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ। আমাদের পাঠ্যসূচীতে উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তকের নির্দেশ আছে। ......বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে যখন এগুলি শিখাতেই হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ান দরকার।...... হিন্দু শিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে, বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের মত একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের অনুরূপ, তখন এই দুই দর্শনের

প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক, বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। …দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পণ্ডিতদের মনস্তুষ্টি না করিয়াও আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন।'

১১. বিনয় ঘোষ: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১২. সৈয়দ বদরুদ্দীন ওমর: 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' দ্রঃ

১৩. Ralph Linton: 'The Cultural Background of Personality, Ch. I. P-15

১৪. বিনয় ঘোষ: 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, (১ম) পৃঃ ৬৩

১৫. Iwan Watt.—'Defoe As Novelist' P-204 of 'The Pelican Guide to English Literature 'Bk-4.

১৬. A. R. Humphreys: 'The Social Setting' vide The Pelican Guide To English Literature, Book–4, P-23

১৭. Elizabeth Drew: 'The Novel' : A modern guide to fifteen English Masterpieces, P-26-27

১৮. ঐ ঐ

১৯. Compton Rickett: A History of English Literature, P-215

২০ ঐ ঐ P–252–253

২১ শিবনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃঃ ৫৬

২২. ঐ ঐ পৃঃ ৫১

২৩. ঐ ঐ পৃঃ ৪২

২৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—১ (নব-সংস্করণ) পৃঃ ৯ 'নববাবুবিলাসের' ভূমিকা

২৫. ঐ : 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম) পৃঃ ১০৮-১১৩ বাবুর উপাখ্যান ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ।

২৬ ঐ : সাহিত্য সাধক চরিত মালা; সংখ্যা-৪

২৭. অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়) পৃঃ ৩৯২

২৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১ (নবম-সংস্করণ) ভূমিকা দ্রঃ

২৯. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) পৃঃ ১৯৫

৩০. ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য : উপন্যাসের কথা, পৃঃ ১৫০

৩১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম) পৃঃ ১০৮

৩২. ঐ ঐ পৃঃ ১০৯

৩৩. ঐ ঐ পৃঃ ১১৩

৩৪. ঐ ঐ ঐ

৩৫. ঐ ঐ ঐ

৩৬. ঐ ঐ পৃঃ ১০৮

৩৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'-১, নবসংস্করণ পৃঃ ৪০ (ভূমিকা)

৩৮. ঐ ঐ পৃঃ ২৪-২৫

৩৯. ঐ ঐ ঐ

৪০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'আলালের ঘরের দুলাল' (৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮১) ভূমিকা দ্রঃ

৪১. সজনীকান্ত দাস : দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা—১ (নব সংস্করণ, ১৯৭৯) 'নিবেদন' অংশ দ্রঃ

৪২. অধ্যাপক অবন্তী কুমার সান্যাল : 'বাবুর বংশ বিচার' প্রবন্ধ দ্রঃ (শারদীয় 'এক্ষণ' ১৩৮৩, পত্রিকায় প্রকাশিত)

৪৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম খণ্ড পৃঃ ১১৫-১১৬, ১২৩-১২৪, ১২৮ দ্রঃ), পঞ্চানন মণ্ডলের 'চিঠিপত্রে সমাজ-চিত্র (১ম খণ্ড পৃ ২০১), মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' (মাসিক) পত্রিকার চৈত্র, ১২৮০ সংখ্যা ও

'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' (এপ্রিল, ১৮৭৪) পত্রিকা দ্রঃ

৪৪. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) পৃঃ ৬৩। এছাড়া বিংশ শতকের প্রথমার্ধের শেষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাজ-পটভূমিকায় সমাজ-বিজ্ঞানী ও গবেষক বিনয় ঘোষও 'নববাবু-চরিত' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

৪৫. 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (নতুন সংস্করণ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের ভুমিকায় সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যার মন্তব্য করেছেন যে এটি প্রথম বাংলা উপন্যাস। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা কথা সহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বাংলা উপ-ন্যাসের উদ্ভবে কেবলমাত্র গ্রন্থটির গুরুত্ব-স্বীকার করেছেন; অপরপক্ষে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থটি 'দি উইক' নামে একট ইংরেজী গল্পের অনুকরণে রচিত। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্যারীচাঁদ রচনাবলী (১৯৪১) ভুমিকা দ্রঃ।

৪৬. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (নতুন সংস্করণ) ভূমিকা দ্রঃ

৪৭. ঐ ঐ

দ্রঃ 'Brief memorials of Mrs. Mullens' by her Sister.

৪৮. ১৮৫৬ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর – ১২ সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যা-রত্নের সঙ্গে দশম বর্ষীয়া বিধবা কালীমতী দেবীর বিবাহ হয়। (বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'বিদ্যা-সাগর রচনা সংগ্রহ' (২য়) পৃ ৫৭৪ দ্রঃ)।

৪৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত আলালের ঘরের দুলাল (৪র্থ সং) দ্রঃ

৫০. ঐ ঐ ভূমিকা দ্রঃ

৫১. Ralph Fox : The Novel and The People :

'The changes take place, men become conscious of them, they fight out the conflict between old and new in their minds, but they do so unevenly, burdened by all kinds of past heritage, often unclearly, and always in such a way that it is not easy to trace the changes in men's minds.' (P-11)

৫২. ডঃ সুকুমার সেনের সিদ্ধান্ত স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান যে পাদরী লালবিহারী দের রচনা সে বিষয়ে আমি বইটির উদ্ধারকর্তা ও সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমান দেবীপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক মত।··· চন্দ্রমুখী উপন্যাস নয়, বড় গল্পও নয়। চন্দ্রমুখী বিগত শতাব্দীর বাংলাদেশের এক অঞ্চলের ক্ষণদীপ্ত চিত্রমালিকা। তাঁর গাঁথনিতে মুনশিয়ানা নেই কিন্তু সে চিত্রগুলির অকৃত্রিমতা সংশয়াতীত। খ্রীষ্টানের পত্রিকায় প্রকাশিত, সুতরাং অবশ্যই তা খ্রীষ্টান বই মনে করে তখনকার (ও পরবর্তী কালের) পাঠকেরা (ও লেখকেরা) চন্দ্রমুখীকে উপেক্ষা করেছিলেন এবং সেইহেতু চন্দ্রমুখী রচয়িতার বাস্তব রসবোধের পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।'

ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' অধিবচন, পৃঃ ৭ দ্রঃ।

৫৩. ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য ঃ রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান 'বিচার ও সিদ্ধান্ত' পর্ব দ্রঃ

৫৪. Compton Rickett : A History of English Literature, P-247

দ্রঃ 'Pamela, or Virtue Rewarded. In a series of familiar letters from a beautiful young damsel to her parents, now first published in order to cultivate the principles of virtue and Religion in the minds of the youth of both sexes. A narrative which has its foundations in Truth

and Nature and at the same time that it agreeably entertains by a variety of curious and affecting incidents is entirely divested of all those images, which in too many pieces calculated by Amusement only tend to inflame the minds they should instruct.'

৫৫. ডঃ সুকুমার সেন : 'সংসার' উপন্যাসের উৎসর্গপত্রের বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এ উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গের পল্লী-অঞ্চলের পারিবারিক চিত্র অঙ্কনে রমেশচন্দ্রের পথপ্রদর্শক ছিলেন লালবিহারী দে। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (২য় খণ্ড) পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৪০, পৃঃ ২৪৩ পাদটীকাসহ দ্রঃ।

৫৬. ডঃ প্রবোধ রাম চক্রবর্তী : 'সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত', (পৃঃ ৭০-৭১) গ্রন্থে উদ্ধৃত : 'সমাজ রচনা কালে অসবর্ণ বিবাহের সমস্যার সমাধান ঘটনাচক্রে স্বয়ং রমেশচন্দ্রকেই করতে হয়েছিল। তাঁর ন' মেয়ের সঙ্গে রমেশ—জীবনীকার গুপ্ত-মহাশয় (জে. এন্. গুপ্ত) যখন তাঁর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন তিনি সানন্দে লিখে পাঠান—,I cordially give the consent you have asked for......... I cannot tell you how deeply I have felt this for years past ; of my last two novels, 'Sansar' goes in for widow marriage, and 'Samaj', of which the first few chapters have gone to 'Sahitya' goes in for inter-caste marriage.' (Letter by R. C. Dutt to J. N. Gupta, dt. 10-2-94)

৫৭. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (২য় সংস্করণ) পৃ ১৭২-১৭৩

৫৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড পৃ: ৬৩-৬৪

৫৯. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (২য় সংস্করণ) পৃ ১৭১ কুমারী কুক্ ১৮২১ সালের নভেম্বর

মাসে এদেশে আসেন এবং স্ত্রীশিক্ষাপ্রসারে তাঁর ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

৬০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড) পৃঃ ১১৪, পাদটীকা দ্রঃ।

৬১. ম্যাক্‌ফারসন ঃ লাইফ্‌ অফ্‌ লালবিহারী দে', (ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' গ্রন্থে উদ্ধৃত)

৬২. ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' গ্রন্থে 'জীবনবৃত্ত' অংশে পৃঃ ১২ ও২৮ দ্রঃ।

৬৩. ডঃ সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) পৃঃ ১৯৭, ডঃ সেন গ্রন্থটির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিচারের দ্বারা ও ভুবনচন্দ্রের 'হরিদাশের গুপ্ত-কথা'র সঙ্গে হুতোম প্যাঁচার নক্‌শার সাদৃশ্য প্রদর্শন করে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, এই নক্‌শা কালীপ্রসন্ন সিংহের নয়। তবে বিষয়টি আজও বিতর্কিত, সম্প্রতি একটি বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে—এতে অংশ নিয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী।

৬৪. মন্মথ নাথ ঘোষ ঃ 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' গ্রন্থ দ্রঃ

৬৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম) পৃঃ ১৫, ১৭।

৬৬, Ralph Linton : The Cultural Background of Personality (ch. I)

৬৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম) পৃঃ ১৯৩ 'সমাচার দর্পণ' (১৫.১২.১৮২৭) পত্রিকায় প্রকাশিত 'এতদ্দেশীয় ডাকাতি' শীর্ষক সংবাদে জানা যায় যে, এক কৃষ্ণনগর জেলায় ১৮০৩ সালে ১৬২, ১৮০৪ সালে ১৩০, ১৮০৫ সালে ১৬২, ১৮০৬ সালে ২৭৩, ১৮০৭ সালে ১৫৪ ও ১৮০৮ সালে ৩২৯টি ডাকাতি হয়।

৬৮. বিনয় ঘোষ ঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৯

৬৯. বিনয় ঘোষ ঃ বাঙলার নবজাগৃতি (১ম খণ্ড) পৃঃ ৫৪

৭০. ঐ ঐ পৃঃ ৫৫, ১৮৬।

৭১. বিনয় ঘোষ : বাঙলার নবজাগৃতি (১ম) পৃঃ ৮৩, ১৮৭

৭২. ঐ ঐ পৃঃ ৬৪

৭৩. প্যারীচাঁদ মিত্র : হুতোম প্যাঁচার নক্শা : বসুমতী সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত সৎ-সাহিত্য গ্রন্থাবলী (১ম ভাগ) পৃঃ ৭-৮

৭৪. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) পৃঃ ২০০, পাদটীকা দ্রষ্টব্য

৭৫. ঐ ঐ পৃঃ ১৯৪

৭৬. অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য়) পৃঃ ৪০৪

৭৭. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) পৃঃ ২০১, পাদটীকা দ্রষ্টব্য

৭৮. অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর পৃঃ ৯২

৭৯. ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' বিচার ও সিদ্ধান্ত পর্ব দ্রষ্টব্য।

৮০. ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' গ্রন্থের পৃঃ ৬৪-৬৮ তে প্রদত্ত গ্রন্থ-তালিকা দ্রষ্টব্য।

৮১. ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' গ্রন্থে বিচার ও সিদ্ধান্ত পর্বে উদ্ধৃত।

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত : 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (২য় পর্ব ১৩ অধ্যায়) পৃঃ ১৫০ দ্রঃ। ডঃ গুপ্ত মনে করেন যে, ম্যালেন্সের ফুলমণি মধুসূদন মুখোপাধ্যায়কে সদৃশ উপদেশধর্মী কাহিনী লিখতে প্ররোচিত করেছিল। গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে জজসাহেবের বিবির সঙ্গে সুশীলার সাক্ষাৎকারের দৃশ্যে 'বাঙালীর সমাজ-জীবনের ও পারিবারিক গঠনের বিশিষ্টতার মধ্যেই কি ভাবে আদর্শ নৈতিক জীবন সম্ভব তার সমাধান সুশীলা নিজেই করেছে।··· এ প্রসঙ্গটি ম্যালেন্সের একরকম জবাবও বটে'।

৮২. ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস : পৃঃ ১৩২ দ্রঃ

৮৩. ঐ ঐ পৃঃ ১৩৯ দ্রঃ

'কৃষ্ণকমল ছিলেন [১] নিরীশ্বরবাদী পজিটিভিস্ট, [২] মিলপন্থী হিতবাদী, [৩] একজন 'terrible fellow' যিনি জানতেন 'how to fight,' [৪] জীবনের অন্ততঃ কোনো পর্বে উৎকেন্দ্রিক (বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার ঘটনা স্মরণ করা যায়)'।

৮৪. ডঃ সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) পৃ: ১৯৩ পাদটীকা দ্র: ।

৮৫. ঐ ঐ

৮৬. ঐ ঐ পৃ: ১৯২

৮৭. ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' পৃ: ১২২ (দ্বিতীয় পর্ব ১০ অধ্যায়।)

দ্র: 'সেটি (সফল স্বপ্ন) হোবার্ট কন্টের এর 'The Traveller's Dream' গল্পের হুবহু সম্পূর্ণ অনুবাদ'।

৮৮. ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ) পৃ: ৩৫

৮৯. ড: সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) পৃ: ১৮৪

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

বঙ্কিম-উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতা

এক

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাউপন্যাস সাহিত্যের ধারাকে সার্থকতার খাতে প্রবাহিত করার ভগীরথ। ১৮৬৫ খ্রীঃ 'দুর্গেশনন্দিনী'র গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরই আমরা যথার্থভাবে বাংলা উপন্যাস পাই, অবশ্য এ বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত বঙ্গসাহিত্যসেবীদের প্রচেষ্টা ও অবদান অনস্বীকার্য। এখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতার অনুসন্ধিৎসু। বঙ্কিম-উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতা অন্বেষণের পূর্বে বাস্তবতা সম্পর্কে ও সাহিত্যে তার রূপায়ণের পদ্ধতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ধারণা কি ছিল—তার একটু পরিচয় নেওয়া আবশ্যক। সম্প্রতি জনৈক বঙ্কিম-সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'নানা দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও, মেজাজের একটা বিশেষ দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ এম্‌পিরিসিস্ট্‌ দার্শনিকদের সগোত্র—তাঁর মন বিশেষে সংসক্ত, বস্তুঘেঁষা, কার্যকারণবাদী।...... সমাজের ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে, ইতিহাসের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব কার্যকারণে বিশ্বাসী, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সমাজ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আস্থাশীল।' ১ কাজেই বাস্তবতা সম্পর্কে বঙ্কিম-চন্দ্রের মতামত জানার কৌতূহল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, বরং এটা আমাদের বিষয়ানুগ। তবে তা জানার পক্ষে প্রধান অসুবিধা এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র সুনির্দিষ্টভাবে এবং স্পষ্টতঃ কোথাও এ বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করেননি। তাঁর সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকদের জীবনী, কবিত্ব ও গ্রন্থাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য বিশ্লেষণের সাহায্যেই একমাত্র এ সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। বাংলাসাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক হিসেবে উপন্যাস রচনার কোন পূর্বপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ তাঁর সম্মুখে না থাকায় এক্ষেত্রে তাঁকেই একাধারে স্রষ্টা ও তাত্ত্বিক -সমালোচকের ভুমিকা নিতে হয়েছে। আমরা তাই প্রথমে সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তার মূলসূত্র-গুলির অনুধাবন করার জন্যই তাঁর সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলির সাহায্য নেব। কারণ সমালোচকের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রবন্ধগুলো দুরারোহ গিরিমালা আর সেই গিরিশিখর

থেকে নির্গত হয়েছে উপন্যাসের ধারা।...... প্রবন্ধগুলো সম্যকরূপে আয়ত্ত করতে না পারলে উপন্যাসের পূর্ণ তাৎপর্য আদায় সম্ভব নহে ' ১(ক)

বঙ্কিমচন্দ্রের সংব্যাখ্যানে আধুনিক উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সবকিছুই কাব্য—'কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য।......স্কটের উপন্যাসগুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি;' ২ আবার ভবভূতির 'উত্তরচরিত' আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটিও স্মরণীয়—'বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্য...... (বিশেষতঃ গদ্যকাব্য বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না;...... কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য যাইতে পারে না।' ৩ এই উদ্ধৃতিতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিছক শিল্পের জন্য শিল্প-অর্থাৎ কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাহিত্য-শিল্পের উদ্দেশ্য কি?–'সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধানই' ৪ কাব্যের উদ্দেশ্য। সাহিত্যের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা এখানে স্পষ্টই স্বীকৃত। সাহিত্যের সৌন্দর্য কি এবং তা কিভাবে সৃষ্টি করা যাবে সে সম্পর্কেও তিনি বলেছেন, 'সৌন্দর্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য বুঝিতে হইবেক। যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এই জন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্য্যের একটি গুণ মাত্র, স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য জন্মে না।............... যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই। তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র— তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। যাহা সত্যের প্রতিকৃতিমাত্র নহে— তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষসংস্পৃষ্ট,

পুরাতন এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট।' ৫ এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তায় প্রকৃত সৃষ্টিশীল সাহিত্যকে বাস্তব-ভিত্তিক হয়েও বাস্তবাতিশয়ী হতে হবে অর্থাৎ তা 'স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত' হবে। Naturalist বা প্রকৃতিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের পার্থক্যটা এখানে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। সাহিত্যে বাস্তবের হুবহু অনুকরণ বা প্রতিকৃতিকে তিনি সৎসাহিত্যের লক্ষণ বলে মানেননি।

সাহিত্যে বাস্তবতা রূপায়ণের পদ্ধতির তারতম্য অনুসারে তিনি সাহিত্যিকদের মূলতঃ দুটি শ্রেণীভুক্ত করেছেন—এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁরা বহিঃপ্রকৃতির বাস্তবের সুন্দর ও অসুন্দর নির্বিশেষে সবকিছুরই নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেন, বঙ্কিমচন্দ্র এর নাম দিয়েছেন 'বর্ণন', আর অন্য শ্রেণীর সাহিত্যিকরা বাহ্যবস্তুর অসুন্দরকে বর্জন করে বাস্তবের সংশোধন করে নেন এবং কেবল-মাত্র সুন্দরকে সাহিত্যে রূপায়িত করেন, এর নাম 'শোধন'। বঙ্কিম-চন্দ্রের ভাষায়—'জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত; অনেক সুন্দরের বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা……জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃতি চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।'

'আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর তাহাই বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন।' ৬ এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কোন্ শ্রেণীর পক্ষ-পাতী অর্থাৎ বাস্তবতা-রূপায়ণে বঙ্কিমী-রীতি কি তার পরিচয় কিন্তু ঐ উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট নয়। সেইজন্য অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধার-যোগ্য—'সংসারে সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাহা কিছু এত ভাল নহে যে, তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করিনা। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী'। ৭

এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তবতা রূপায়ণে বঙ্কিমচন্দ্র এক-দিকে যেমন বস্তুর নির্বাচন (selection) ও বাস্তবকে (Idealisation) করার পক্ষপাতী ছিলেন, অপরদিকে বাস্তবতার উৎকর্ষ সাধনেও (betterment) তিনি অভিলাষী। এই দৃষ্টিভঙ্গী আদর্শ-বাদ-সঞ্জাত হলেও নিঃসন্দেহে প্রগতি-অভিমুখী। 'সকল বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা অপেক্ষা উৎকর্ষ' কামনা শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাগ্র-সরতারই লক্ষণ বলে বিবেচ্য। কিন্তু বাস্তবতা-রূপায়ণের ক্ষেত্রে বঙ্কিম-ব্যাখ্যাত এই তত্ত্ব যে তাঁরই উপন্যাসে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়নি এবং অনেক ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক বঙ্কিম উক্ত উৎকর্ষ-কামনা পরিত্যাগ করে পিছন ফিরে তাকিয়েছেন তার পরিচয় পাব যথাস্থানে উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণের সময়ে। চিন্তা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই জাতীয় দ্বন্দ্ব বঙ্কিম- মানসের দোদুল্যমানতারই প্রকাশ; এমন কি অনেক ক্ষেত্রে শুধু তাঁর সাহিত্য-চিন্তার মধ্যেই স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা গেছে। সাহিত্য-রচনায় তিনি যে Pragmatist তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির সামাজিক প্রয়োজনীয়তা কি সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট দ্বিধান্বিত ছিলেন। 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' (প্রচার ১২৯১ মাঘ) শীর্ষক নিবন্ধের তৃতীয় সূত্রে 'বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে'। ৮ 'দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন' অর্থে সামাজিক কল্যাণ সাধন যদি সাহিত্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে তিনি মনে করে থাকেন, তবে সমাজ-সংস্কারে সাহিত্যিকের গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক আলোচনার সময়ে মন্তব্য করেছেন, 'বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য

উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি! তাহা ছাড়িয়া সমাজ-সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়।'[৯] প্রথমে বলেছেন 'দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য-সৃষ্টি করিতে পারেন', পরে বললেন, 'কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি! তাহা ছাড়িয়া, সমাজ সংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়।'—এই দুই মন্তব্যে স্ববিরোধিতা (Contradicton) অত্যন্ত স্বচ্ছ।[১০] এবং এও বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে সামাজিক প্রয়োজনবোধ অপেক্ষা সৌন্দর্য সৃষ্টির উপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আবার পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'উত্তর চরিত' আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, কেবলমাত্র 'চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তি'ই উৎকৃষ্ট কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। কাজেই মনে হয় সাহিত্যিকের সামাজিক কর্তব্য ও সাহিত্যের সমাজমূল্য স্থিরীকরণে বঙ্কিমচন্দ্র কোন স্থির মানদণ্ডে আস্থা রাখতে পারেননি, আর সেই জন্যই তাঁর মনের দোদুল্যমানতার প্রতিফলন ঘটেছে বিশেষভাবে তাঁর সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাস বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণ-কান্তের উইলে। পরে এ বিষয়ে আলোচনা করব। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তায় ঐ স্ববিরোধিতার কারণ নিরূপণ করতে গিয়ে সমা-লোচক বলেছেন—'মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধন ও সৌন্দর্য সৃষ্টির দ্বন্দ্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের একটি প্রধান সমস্যা। সে যুগের কোন সাহিত্যিক নিছক সাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় লেখনী ধারণ করেননি। একটা Sense of destiny বা নিয়তির নির্দেশ তাঁদের চালিত করেছিল সাহিত্যসাধনার পথে। তাঁদের কাছে মসী ছিল অসির বিকল্প। এই ব্যাপারটাই একটা মস্ত Contradiction, কাজেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যে Contradiction আছে, আর থাকতে বাধ্য। শুধু বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষ দিলে চলবে কেন?'[১১]

যাহোক, বঙ্কিমের মতে 'কাব্যগ্রন্থ, মনুষ্য-জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র.' (বঙ্গদর্শন: মাঘ ১২৮৪ পৃঃ ৪৬৬)। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই মতবাদেও বস্তুবাদী চিন্তার স্ফুরণ ঘটেছে বলে মনে হয়। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্যে জীবনের অধ্যাত্ম-প্রতিষ্ঠিত

নৈতিক মূল্যবোধের উপর মাত্রাধিক গুরুত্ব আরোপ করায়, জীবন-সমস্যা উদঘাটন-প্রয়াসে নৈতিক ও ধর্মীয় ব্যঞ্জনা প্রকট হওয়ায়, এবং সর্বোপরি সমস্যার সমাধান-চিন্তায় ধর্ম-নীতি, পাপ-পুণ্য বোধের প্রভাবাধিক্য ঘটায় ঐ মতবাদ প্রচলিত ভাববাদেরই অঙ্কাশ্রয়ী। তাই বাস্তবতার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে পুরোপুরি সফল হয়েছেন এ সিদ্ধান্ত করা কঠিন। সমাজে নিত্য যা ঘট্‌ছে শুধু তাই অবলম্বন করে যিনি সাহিত্য রচনা করেন—তাঁকেও বঙ্কিমচন্দ্র realist বলেছেন, (ঈশ্বরগুপ্ত Realist·········) আবার যিনি বাস্তবকে Idealise করার পক্ষপাতী তিনিও বঙ্কিম-দৃষ্টিতে realist. ১২ (দীনবন্ধুমিত্রের গ্রন্থসমালোচনা দ্রঃ)। কিন্তু কিভাবে বাস্তবতা idealised হয়ে উঠবে, বঙ্কিম তার সূত্রসন্ধান দিতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের উক্তি উদ্ধারযোগ্য: 'দেখা যায় যে অনেক সময়ই তাঁহার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা, উক্তি দ্বিধাগ্রস্ত। দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব-বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, 'এটুকু গেল তাঁহার Realism, তাহার উপর idealise করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল।' কিন্তু কবি বাস্তবের উপর আদর্শবাদের প্রলেপ যোগ করিয়া দেননা' ১২(ক)। বস্তুতঃপক্ষে সবদেশের সাহিত্যেই উপন্যাসে বাস্তবতার প্রতিফলনের প্রাথমিক পর্বে সাহিত্যিকদের মধ্যে এই জাতীয় সংশয় দেখা যায়, ইংরাজী সাহিত্যের জনৈক সমালোচকের মন্তব্য এখানে স্মরণীয়— 'In the struggle between 'what reality offers' and 'what he himself desires to make of it.' the novelist's sense of moral purpose plays an important part ·········· The English novel······has suffered actually in the past from the didactic zeal of middle class puritanism: it is only with the advent of Hardy, Conrad and James in the later nineteenth century that the question of the ethics of the novel is posed more subtly.' ১৩ বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। সাহিত্যে বাস্তবতার রূপদানের জন্য

সাহিত্যিকের ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ও গভীর সহানুভূতি যে অপরিহার্য, দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থ সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ১৪। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাহিত্যে বাস্তবতার প্রতিফলনের অন্যতম লক্ষণ সাহিত্যের মধ্যে সমাজচেতনা ও কালচেতনার স্ফুরণ। বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য : 'সাহিত্য দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজ-বিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।' ১৫ আবার সাহিত্য যে সাময়িকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে কালাতিক্রমী হবে সে কথাও বলেছেন ('সাময়িক সাহিত্য লেখকের পক্ষে অবনতিকর'—'নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধ দ্রঃ)। এমনকি চরিত্রসৃষ্টিতেও সমাজের বাস্তব অবস্থা ও যুগপরিবেশ যে কি ভাবে ও কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তাও বিশ্লেষণ করেছেন 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে রামচরিত্র ব্যাখ্যানের সময়। এতে তাঁর ঐতিহাসিক বিবর্তন—নির্ভর সমাজ-সচেতনতার (Social consciousness based on histori-cal evolution) পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৬ 'সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল' ('বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধ দ্রঃ) – বঙ্কিমচন্দ্রের এই মতের সঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক তেইন্-এর পরিবেশ-তত্ত্বের সাদৃশ্যের কথা অনেকে বললেও বিশেষ একটি বৈসাদৃশ্যের প্রতি জনৈক সমালোচক যথার্থভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৭ তেইন্ সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির উপর সামাজিক ভাব পরিমণ্ডলের (Race, Milieu and moment) প্রভাবের কথা বলেছেন, কিন্তু সাহিত্যিকের আত্মস্বভাবের দিকটি তিনি উল্লেখ করেননি, অথচ বঙ্কিমচন্দ্র এটির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, 'যিনি কবিতা লেখেন, তিনি জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন, এবং আত্মস্বভাবের অধীন।' তবে শেষ পর্যন্ত সব কিছুকেই তিনি দেখেছেন ধর্মতত্ত্ব ও অনুশীলন-তত্ত্বের আলোকে ১৭ (ক) ('ধর্মই তৃষ্ণা ধর্মই আলোচনা, ধর্মই

সাহিত্যের বিষয়।'—'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধ দ্রঃ)। তাই বলা যায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বস্তুবাদী বঙ্কিমচন্দ্র পরিণামে যেন আধ্যাত্মিক হিতবাদীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অবশ্য জনৈক সমালোচকের মতে তাঁর 'হিতসাধনের অর্থ জগতের Moral Order এর রহস্য উদ্ঘাটন ও সমর্থন'। ১৮

সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা বিষয়ে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল তা সংক্ষেপে সূত্রাকারে এই ভাবে প্রকাশ করা যায়:

১) সাহিত্য স্বভাবানুকারী হয়েও স্বভাবাতিরিক্ত হবে।

২) স্বভাবানুকরণে অর্থাৎ বাস্তবতা-রূপায়ণে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর নির্বাচন করতে হবে এবং অসুন্দরকে বর্জন করে কেবলমাত্র বাস্তবের সুন্দর দিকই সাহিত্যে রূপায়িত হবে।

৩) বাস্তবের সুন্দরবোধ যে আপক্ষিক তাও বঙ্কিমচন্দ্র মানতেন।

৪) বাস্তবকে আদর্শায়িত করা আবশ্যক। যা আছে, তার চেয়ে 'উৎকর্ষ-কামনা'র পরিস্ফুরণ সাহিত্যে থাকা চাই। সাহিত্য হবে সাময়িকতার সীমাতিক্রমী।

৫) বাস্তবতা রূপায়ণে লেখকের প্রয়োজন ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও তীব্র সহানুভূতি।

৬) সাহিত্যের বাস্তবতাকে অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। বাস্তবের হুবহু অনুকরণকে যেমন "Realism" বলে বঙ্কিমচন্দ্র মানতেন না, আবার প্রত্যক্ষ বস্তুর অতীত উদ্ভট কল্পনাশ্রয়ীকেও তিনি Realist বলে মনে করেন নি।

৭) বাস্তববাদী সাহিত্যিক সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা সমাজের মঙ্গল বা হিতসাধন করবেন, তবে সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ-সংস্করণ-প্রয়াস ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবিরুদ্ধ।

৮) বঙ্কিমের মতে সাহিত্যে সৌন্দর্যসৃষ্টি মুখ্য, সমাজ-সংস্করণ গৌণ—তাঁর এই ধারণাকে আধুনিক নন্দন-তত্ত্বের পরিভাষায় 'বিশুদ্ধ ও ফলিত সাহিত্য' অথবা 'সাহিত্যের চরম ও উপকরণ মূল্য' বলা হয়েছে ('পরিচয়' ফাল্গুন, ১৩৫৪ পৃঃ ১৪৩-৬২, ও ঐ চৈত্র ১৩৫৪ পৃঃ ২৪৯-৫৬ দ্রঃ)।

সাহিত্যের বাস্তবতা ও তার রূপায়ণ সম্পর্কিত বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণার যে পরিচয় আমরা পেলাম, তাতে দেখা গেল যে, তাঁর চিন্তার মধ্যে বৈপরীত্য আছে, দ্বন্দ্ব আছে, কিন্তু সামঞ্জস্য-বিধান লক্ষিত হয় না। তিনি বলেছেন যে, বাস্তবকে আশ্রয় করে বা বাস্তবে লব্ধ উপাদানের অবলম্বনে সাহিত্য-সৃষ্টির কাজ শুরু হলেও সাহিত্যকে বাস্তাতিরিক্ত হতে হবে, কিন্তু কি ভাবে তা হওয়া সম্ভব এবং কিভাবে সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজের মঙ্গলবিধান ঘটতে পারে; সমাজ-সংস্কার প্রয়াস যদি সাহিত্যে গ্রাহ্য না হয়, তবে সমাজের কোন মঙ্গলবিধান সম্ভব কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর তাঁর সাহিত্য-চিন্তায় মেলে না। সমালোচকের মতও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : 'বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যে কোন উচ্চতর প্রত্যয়ের আভাস নেই। সাহিত্য যে কেমন করে বাস্তবাতিরিক্ত হয়েও বাস্তবের মর্মসত্যবাহী হতে পারে, অবাস্তব হয়েও বাস্তবের থেকেও সত্যতর হতে পারে সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ নীরব।'[১৯]

প্রশ্ন ওঠে— এই 'নীরবতা' কি তাঁর ইচ্ছাকৃত এড়িয়ে চলার প্রয়াস, না, অন্যকিছু? আমাদের মনে হয় যে, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসেবে উপন্যাস রচনার সময় অনেকক্ষেত্রে আধুনিক মননশীলতাকে গ্রহণ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হয়ে উঠেছেন তবুও সেই সঙ্গে শিল্পীর আধুনিক মননের অন্তরালে অবস্থিত তাঁর রক্ষণশীল ও সনাতন সমাজধর্মে আস্থাবান সত্তা বারবার আবির্ভূত হয়ে চিন্তার অগ্রগমনকে পশ্চাদভিমুখী করে দিয়েছে। ফলে এক-দিকে তাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিম যা বলেন, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা ভিন্নতাপ্রাপ্ত হয়। আবার অন্যদিকে উনিশ শতকের সংকটময় যুগপরিবেশে চিন্তা ও ভাবরাজ্যে টানাপোড়েনের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সাহিত্য-তত্ত্বের দিক থেকেও সঠিক ও সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পোঁছানো বেশ দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। সেই জন্যই উক্ত বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে এবং তার সমাধানও সেযুগে সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ—পরিবেশের প্রভাব ও তাঁর মানস-সংগঠনও অনেকাংশে দায়ী। অতএব এ-সম্পর্কে আর বেশী আলোচনায় না গিয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের-বাস্তববোধ

ক্লাসিক অনুকরণবাদেরই নবব্যাখ্যান যার মূলকথা হল—'স্বভাবের অবিকল স্বরূপ নহে,' 'অপ্রাকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে' প্রকৃতির সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তবের আদর্শায়ণই (idealisation) মুখ্য উদ্দেশ্য। এই অর্থেই তিনি আদর্শবাদী। আবার তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত আদর্শবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন, 'বঙ্কিমের উপন্যাসে আদর্শবাদিতার দুটি দিক। একদিকে বিশেষ ব্যক্তিচরিত্র বিশেষ ঘটনার সাহায্যেই নির্বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করেছে। বঙ্কিমের নিজের সৃষ্টি একটি উপলক্ষ মাত্র সমগ্র পাঠক-চেতনাকে লগ্ন করে রাখে না, সে চেতনা ছাড়িয়ে যায় মানব-ভাগ্য ও মানব-চরিত্রের সামগ্রিক অনুভূতিতে। এই অর্থে নিশ্চয়ই তিনি আদর্শবাদী। আর একদিকে বঙ্কিম জীবনজ্বালা থেকে উদ্ধারের জন্য মেলে দিয়েছেন এক অপ্রাপ্য নৈতিক সত্যের স্বপ্নকে। সে-স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয় নি, কিন্তু সে-স্বপ্ন দুঃখহত নায়ক ও বেদনাবিদ্ধ নায়িকাকে উতলা করে তুলে রসকে ঘনীভূত করে তোলে।' ২০

দুই

এবার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসরচনার যুগ-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা যাক। ঐ কালকে বাংলার তথা ভারতের সমাজ-ইতিহাসে যুগসন্ধির কাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, কারণ ১৮৫৮ সালের ২রা আগষ্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লর্ড স্ট্যান্‌লীর আনীত বিল পাশ হওয়ার পর ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসানে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ক্রমে এদেশীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন পরিবর্তিত হতে শুরু করে, আবার ঠিক একই কারণে বাংলার চিন্তাশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশের মনে এযাবৎ আনুসৃত ব্রিটিশ আনুগত্যের পরিবর্তে দেখা দেয় আত্মসমীক্ষার প্রবণতা, তাঁদের স্বদেশানুরাগও প্রাবল্য লাভ করে। একদিকে এই মোহভঙ্গ, অন্যদিকে আবার রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি নতুন মোহ জাগ্রত হওয়ার প্রমাণও ঐ সময়ে লক্ষ্য করা গেছে। এ-প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক—

দের রচিত সমকালের ভিক্টোরিয়া-প্রশস্তিমূলক রচনাগুলি স্মরণীয়। এই নব-জাগ্রত মোহের বশবর্তী হয়েই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সে সময় বলেছিলেন—'We are the citizens of a great and free Empire, and we live under the protecting shadow of one of the noblest constitutions the world has ever seen. The rights of Englishmen are ours, their constitution is ours.' ২১ তবে অধিকাংশই তখন ইংরেজকে আর মিত্র-শক্তিরূপে নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে পারল না; নব-চেতনার বাহক হিসেবে ইংরেজশক্তি দেশের সামাজিক উন্নতিবিধানের সহায়ক বিবেচনায় যে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছিল বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ক্রমে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উন্মোচিত হওয়ার পর পূর্বের মোহান্ধতা নিঃসন্দেহে কিছু পরিমাণে অপসৃত হল। জনৈক সমালোচকের মন্তব্যেও তার প্রমাণ রয়েছে :—'১৮৫০ সাল হইতেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। এযাবৎ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাঁহারা যে পিতৃস্নেহ লাভ করিতেছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের পর এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবলুপ্তিতে ভারতবর্ষকে সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার পর এই স্নেহের প্রভাবে ভাঁটা পড়িতে থাকে।' ২২ সেই কারণে সংকট দেখা দিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানস-লোকে। এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যা প্রত্যাশিত ছিল, সেটা আদৌ হল না, অর্থাৎ ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের চাপে দেশীয় সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস এবং ভারতীয় ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ দেখা গেল না, বরং সামন্তবাদের সঙ্গে ধনবাদের সহাবস্থান চলতে লাগল। ফলে ভারতীয় জনগণকে একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও পুরানো সামন্তবাদী অত্যাচারের শিকার হতে হল। এই দ্বৈতশোষণ-জাত সামাজিক-চেতনায় দেখা দিল দুই বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য— একদিকে দেশীয় সামন্ত-সমাজের প্রাচীন মূল্যবোধগুলির প্রতি বিতৃষ্ণা ও আধুনিক ধনবাদী চেতনার প্রতি অনুরক্তি, অন্যদিকে স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশানুরাগের প্রেরণায় ব্রিটিশ বিরোধিতা। এই প্রসঙ্গে অপর এক সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

'এই দ্বৈতরূপের ফলে ভারতীয় চিন্তানায়কগণের সামাজিক চেতনা-তেও দেখাদেয় দ্বৈতরূপ : একদিকে সমৃদ্ধতর ধনবাদী সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধা ও দেশীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি বিরাগ, অন্যদিকে বিজাতীয় শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশ।' ২৩ এমতাবস্থায় ঐশ্রেণীর উপলব্ধি হল যে, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীক ব্যবস্থার সংস্কার ভিন্ন সমাজ-সংস্কার সম্পূর্ণভাবে অস্থায়ী ও অর্থহীন। জাতীয়স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নও এই পর্যায়ে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছিল, কারণ 'অকস্মাৎ তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে ইংরেজের ধারণায় তাঁরা মনুষ্যপদবাচ্যই নন। তাঁরা জন্মসূত্রে হীন : হীনতাই তাঁদের বিধিলিপি।' ২৪ এই হীন-মন্যতাই সেদিন বাঙালীকে আত্মসচেতন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ করে তুলেছিল। রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ ও ন্যায্য সামাজিক অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৮৫১ সালে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশন' গড়ে ওঠে। আরও পরে ১৮৬৭ সালে 'হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠা, ১৮৭২ সালে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ স্থাপন, ১৮৮৩ সালে কল-কাতার 'এলবার্ট হলে' ভারতের জাতীয় সম্মেলন (Indian National Conference) ও ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সবকিছুই বাঙালীর উক্ত পরিবর্তিত মানসিকতার বহিঃ-প্রকাশ। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৬০ এ প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' যেমন বাংলার কৃষক-সমাজের বিদ্রোহী মনোভাবের প্রচারক, তেমনি মধুসূদনও একদিকে দেশাত্মবোধ ও মানবতাবাদের পরাকাষ্ঠা ঘোষণা করলেন তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে' (১৮৬১), অন্যদিকে নারী-স্বাধীনতার কাব্যকার রূপে 'নারীর মুখে ভাষা দিলেন, চোখে আগুন ছিটিয়ে দিলেন এবং বুকে অমিত শক্তি সঞ্চার করলেন' ২৫ বীরাঙ্গনা (১৮৬২) কাব্য রচনা করে। নারীর স্বাধিকারের প্রশ্নে সমাজ-আন্দোলন বহু পূর্বেই সূচিত হয়—সমাজ-প্রগতির পরিমাপ করার সময় এই প্রশ্নটিরও গুরুত্ব অসীম, আর এই প্রশ্নের সমাধান কে কিভাবে চান তার ইঙ্গিত থেকেই ব্যক্তি বিশেষের প্রগতিশীলতাও পরিমাপ্য।

যাহোক ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা সাহিত্য-

ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ ঠিক এর পরেই অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রাহ্ম-ধর্মের আত্মকলহের ফলে একদিকে ধর্মান্দোলনের স্রোতধারা ক্ষীয়-মান, অন্যদিকে সংস্কার-আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তরণ; একদিকে জাতীয় অবনতির কারণ অন্বেষণের প্রয়াস, অন্যদিকে জাতির উৎকর্ষ-প্রদর্শনের নিমিত্তে ধর্মীয় ঐতিহ্য-পূর্ণ অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচারণ—এই সঙ্কটময় মুহূর্তে বঙ্কিম-উপন্যাসের যাত্রা শুরু। আবার বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাস রচিত হয় দুই বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তর্বর্তী সময়ে—একপ্রান্তে সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) ও নীলবিদ্রোহ (১৮৫৮-৬০), অপর প্রান্তে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫)। প্রথম পর্য্যায়ের আন্দোলনের দ্বারা আন্দোলিত সমাজ-মানস ধীরে ধীরে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে রূপান্তরিত হয়—এর মধ্যবর্তী সময়ের সাহিত্যিক ফসল বঙ্কিম-উপন্যাস। কাজেই সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে এর বিশ্লেষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-ভাবনার সঠিক মূল্যায়ন ও তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতার পরিচয় নেওয়ার জন্য আমরা বঙ্কিম-উপন্যসগুলিকে তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করতে চাই। প্রথম পর্য্যায়ে – দুর্গেশনন্দিনী-(১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) ও মৃণালিনী (১৮৬৯) ঃ দ্বিতীয় পর্য্যায়—বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) থেকে কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮) ঃ তৃতীয় পর্য্যায়—রাজসিংহ (১৮৮২, পুনঃ ১৮৯৩) থেকে সীতারাম (১৮৮৭)। এই স্তরবিন্যাস মূলতঃ ঔপন্যাসিকের বাস্তবতাবোধের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হল।

বিভিন্ন পর্য্যায়ের ঔপন্যাসগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন বাংলার কোন্ কোন্ সামাজিক সমস্যার বাস্তব দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং সেই সব সমস্যার সমাধান প্রয়াসে তাঁর মানস-প বণতা মূলতঃ কোন্‌দিকে তা এখন বিচার্য। সমালোচকের মতে-একমাত্র বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইলেই প্রায় সমসাময়িক বাঙালীর কথা স্থান পেয়েছে। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন— 'বস্তুত বঙ্কিমের উপন্যাসে বাস্তব অনুগতির স্থান কখনোই প্রধান নয়।… …বঙ্কিমের উপন্যাসে আধুনিক কালোচিত বাস্তবতা খোঁজা

অন্যায়।' ২৬ সে আশা না করলেও সাধারণভাবে বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসেই যে সমস্যাটি অনুভূত হয় সেটি হল প্রেম-সম্পর্কিত সমস্যা। প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপন্যাসে নারীর স্বাধীন-প্রেমের প্রশ্নটি নানাভাবে উত্থাপিত হয়েছে, তৃতীয় পর্য্যায়ের প্রেম ভগবৎ-প্রেম ও দেশপ্রেমে উন্নীত। বঙ্কিমের উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রগুলি অপেক্ষা স্ত্রীচরিত্রগুলির অধিকতর ক্রিয়াশীলতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দুঃসাহসিকতা ইত্যাদির ভিত্তিতে অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে নারীর স্বাধীন প্রেমের প্রশ্নটি অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছিল। তাই নারী চরিত্রের ভূমিকার উপর তাঁর পক্ষপাতিত্ব অধিক, সেই পক্ষপাতিত্বের উৎস হয়ত সমকালীন সামাজিক আন্দোলন। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ যুগমানসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নারীর প্রতি নবতর দৃষ্টিভঙ্গী ও নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি। কিন্তু বঙ্কিম-উপন্যাসের ঐ সব সচল ও সচেতন নারীচরিত্রগুলির পরিণামের কথা বিচার করলে মনে হয় সেখানে ব্যক্তি—বঙ্কিম শিল্পী-বঙ্কিমের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন। তাই স্বাধীনতা-লিপ্সার পরিণামস্বরূপ তাদের ভাগ্যে জুটেছে হয় অপঘাত মৃত্যু, না হয় কঠোর প্রায়শ্চিত্ত; কপাল-কুণ্ডলা, কুন্দনন্দিনী, রোহিণী, শৈবলিনীর পারিণাম এই কথাই প্রমাণ করে। জনৈক সমালোচকের মতানুসারে 'বঙ্কিম নিজকালের জীবনের সমস্যাকে অনুভব করেছিলেন এই ভাবে : আমাদের প্রাচীন সমাজের এবং সংসারের যেটা আচরণবিধি বা ধর্ম তার ব্যত্যয়ে ব্যক্তির জীবনে আসে পাপযন্ত্রণা। এই পাপবোধ বাইরের ঘটনার উদ্দীপন লাভ করলেও একান্তভাবেই মন্ময় বা Subjective,' ২৭ কপালকুণ্ডলা দৈবাদেশ লঙ্ঘন করেছে, কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী বিধবা হয়ে পরপুরুষের প্রতি আসক্তা, শৈবলিনী বিবাহের পরও প্রতাপ-স্মৃতি ভুলতে পারেনি। এই সব কারণেই যেন তারা বঙ্কিম-দৃষ্টিতে পাপিষ্ঠা। বঙ্কিমের এই সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে সমকালীন সমাজচেতনা ও তাঁর ব্যক্তি-চেতনার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ব্যাপকভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতমধ্যবিত্ত যুবসম্প্রদায়ের মানস-সঙ্কট। একদিকে

প্রগতিশীল চিন্তাধারা, অপরদিকে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংস্কার ও রক্ষণশীল ধ্যানধারণা—বঙ্কিম-উপন্যাসে এই দুই বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট।

আমরা আগেই বলেছি যে, বঙ্কিমের মনে নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নটি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। নারীর স্বামীনির্বাচনের অধিকার বা অবাধ প্রেমের অধিকার সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় থাকে অস্বীকৃত, অবদমিত; কিন্তু ধনবাদী সমাজের অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতির দাবী-উত্থাপন। তাই উনিশতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বাংলার সমাজে এই চেতনার স্ফুরণ ঘটে, তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধ্যান-ধারণাও যুক্ত হয়। এই পরি-স্থিতিতে নারীর স্বাধীনপ্রেমে অধিকারের প্রশ্ন বঙ্কিম-মানসে জেগেছিল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। এখন দেখা যাক বঙ্কিম কিভাবে তা উপস্থাপিত করেছেন তাঁর উপন্যাসে।

তিন

দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) উপন্যাসে আয়েষা ও তিলোত্তমা দুজনেই প্রণয়িনী, দুজনেরই প্রণয়াস্পাদ জগৎসিংহ, তিলোত্তমার প্রেম সংযত ও অনুচ্ছ্বসিত, আয়েষার প্রেম সেবার মধ্যদিয়ে প্রকাশিত। উভয়েই পিতৃশত্রুর পাণিগ্রহণেচ্ছু, কিন্তু আয়েষার প্রেম-নিবেদনে বলিষ্ঠতা স্পষ্ট, নিশীথে কারাগারে বন্দী শত্রুর শুশ্রূষা নবাবপুত্রীর পক্ষে সমীচীন কিনা ওসমান আয়েষাকে প্রশ্ন করায় আয়েষার বলিষ্ঠ উত্তর তার প্রমাণ—'ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' (পৃঃ ৭১)। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে যে মুখরা নারীচরিত্র-গুলি আমরা পেয়েছি, ঠিক তার অব্যবহিত পরেই বঙ্কিমের সৃষ্ট এই আয়েষাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয়না, একে মধ্যযুগের সামন্ত-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় নির্যাতিতা বিদ্রোহিণী নারী–সত্তার মূর্ত প্রকাশ বলেই মনে হয়। মধুসূদন যেমন উনিশ শতকের উক্ত

আদর্শকে রূপ দিয়েছেন পৌরাণিক আখ্যানের চরিত্রের মাধ্যমে, তেমনি বঙ্কিম অবলম্বন করেছেন দূর ইতিহাসের চরিত্র সমূহকে। কিন্তু যে আয়েষা জগৎসিংহ সম্বন্ধে বলেছে— '……হৃদয় মন্দিরে ইঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্তকাল পর্যন্ত আরাধনা করিব (পৃঃ ৭১) সে-ই আবার তিলোত্তমার সঙ্গে নিজ প্রণয়াস্পদের বিবাহ দিল। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে মন্তব্য করেছেন—'পাঠক মনে করিতে পারেন যে আয়েষা তাপিত-হৃদয়ে বিবাহের উৎসবে উৎসব করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। আয়েষা নিজ সহর্ষচিত্তের প্রফুল্লতায় সকলকেই প্রফুল্ল করিতে লাগিলেন।' (পৃঃ ৮২) তিলো-ত্তমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তার মুখে শুনি—'আমি যে রত্নগুলি দিলাম, আগে পরিও। আর আমার তোমার সার রত্ন হৃদয়ের মধ্যে রাখিও।' (পৃঃ ৮৩) এই অসতর্ক 'আমার'— উক্তি সত্ত্বেও প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিনীর হাতে নিজ প্রণয়াস্পদকে ত্যাগ করে যাওয়া আধুনিক কালের বিচারে অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব বলে মনে হলেও বঙ্কিমের বর্ণিত সমাজপ্রেক্ষাপটে এটাই বাস্তব। কারণ আয়েষা-জগৎসিংহ মিলন সম্ভব হয়নি ঠিকই, কিন্তু না-পাওয়ার বেদনা আয়েষার মধ্যে স্পষ্ট ('আয়েষার নয়নপল্লব জল-ভার-স্তম্ভিত হইয়া কাঁপিতেছে')। শেষ রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর দুর্গপরিখার পাশে গরলাধার অঙ্গুরীয় থেকে বিষপান করে সব তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটানোর প্রশ্নে তার মনে যে দ্বন্দ্ব দেখা গেছে—তারই মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট এবং সেই পর্যন্ত তিনি বাস্তববাদী। কিন্তু এরপরেই যখন 'প্রলোভনকে দূর করাই ভাল' এই উক্তি আয়েষার মুখে বসিয়ে গরলাধার অঙ্গুরীয় পরিখার জলে নিক্ষেপ করালেন, তখনই আয়েষার প্রেম নীতিশাসিত হয়ে উঠল, নৈতিকতার সঙ্গে আপোষ ঘটালেন সমাজ-বেত্তা বঙ্কিমচন্দ্র। আর সেইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের অন্যান্য নারীর মতই আয়েষাকে দিয়ে কামনার ধন হারানোর যন্ত্রণা সহ্য করি-য়েছেন। 'যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন?'— অবশ্য আয়েষার এই উক্তিতে সেদিনের সমাজের উপেক্ষিতা নারী-হৃদয়েরই হাহাকার স্পষ্ট, তাই

প্রকারান্তরে এটাও বাস্তবতার পরিচায়ক বলে গণ্য হতে পারে।

এরপর স্বাধীন প্রেমের চিত্র প্রথম পর্য্যায়ের শেষ উপন্যাসে অর্থাৎ 'মৃণালিনীতে' (১৮৬৯) আমরা পাই হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যেন একটু সাবধানী। উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদের (পূর্ব পরিচয় শিরোনামায়) বিবরণ থেকে জানা যায় যে মৃণালিনী বৌদ্ধকন্যা। মথুরায় জলবিহার-কালে নৌকাডুবিতে নিমজ্জমানা মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র উদ্ধার করেন এবং পরে উভয়ের গাঢ় প্রণয় পরিণয়ে পরিণত হয়। কিন্তু এই ঘটনা মৃণালিনীর পিতার অজানা ছিল। কাজেই এরপর মাধবাচার্যের কৌশলে হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর বিচ্ছেদ এবং নানা ঘটনার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে মিলনাকাঙ্ক্ষার ইতিবাচক রূপদান ঔপন্যাসিকের পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছিল বলেই মনে হয়। তবে অজ্ঞাতকুলশীলা যুবতীকে হেমচন্দ্রের বিবাহ করা নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক, এবং মৃণালিনী ভিন্ন অন্য নারীর চিন্তা তাঁর মনে কখনও স্থান পায় নি, এমনকি হেমচন্দ্র যখন মাধবাচার্যকে বলেন—'মৃণালিনী কোথায় না বলিলে আমি যবনবধের জন্য অস্ত্র স্পর্শ করিব না' বা মাধবাচার্যের মুখে মৃণালিনীর মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ শুনে হেমচন্দ্র যখন বলেন 'যে মৃণালিনীর বধকর্তা, সে আমার বধ্য। এই শরে গুরুহত্যা ব্রহ্মহত্যা উভয় দুষ্ক্রিয়া সাধন করিব।'- তখন হেমচন্দ্রের প্রেমানুগত্যের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ-বাস্তবতার বিচারে এখানে স্বাধীন প্রেমের স্বীকৃতি যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, তেমনি দেশোদ্ধার ব্রতে ব্রতী হেমচন্দ্রের কাছ থেকে তাঁর প্রেয়সীর দুস্তর ব্যবধান রচনার ষড়যন্ত্রের মানসিকতাও তৎকালীন সমাজের হিতবাদ-পরিপুষ্ট স্বদেশিকতা-বোধেরই বাস্তবপ্রতিফলন; কারণ তখনকার ধারণা ছিল 'প্রণয়মন্ত্রে' বীরপুরুষ 'কাপুরুষ' হয়। অতএব দেশপ্রেমিকের কামিনীকাঞ্চন পরিত্যাজ্য। জনৈক সমালোচক মনে করেন—'জগৎসিংহ তিলোত্তমার প্রেমের সহিত তুলনায় হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেম আরও একটু জটিলতর, বাস্তবতার আরও একটু গভীরতর স্তর স্পর্শ করে।' ২৮ সমাজ-বাস্তবতার বিচারে তিলোত্তমা যেন সেদিনের সমাজের প্রেম-পীড়িতা অসহায় নারীর মতই নিজের

অন্তরে নিজে দগ্ধ হয়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় মৃণালিনীর আত্ম-বিশ্বাস প্রবল এবং স্বীয় প্রেমাধিকার প্রতিষ্ঠায় সে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নারীর স্বাধীন-প্রেমের স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই মৃণালিনী চরিত্র সৃষ্টিতেই ও তার প্রেমের পরিণামপ্রদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তা সামাজিক অভীপ্সার বাস্তব-রূপদানে সফলতা লাভ করেছে, যদিও তার পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে সুদূর মথুরা-মগধের দূর ইতিহাসের সমাজকে, বাংলার সমাজে তা ঘটেনি।

বাংলার সমাজপটভূমিকায় যেখানেই বঙ্কিমচন্দ্র নারীর স্বাধীন-প্রেমের প্রশ্ন তুলেছেন সেখানেই নায়ক-নায়িকাকে প্রেমের বিনিময়েই চরম মূল্য দিতে হয়েছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষ করে 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আলোচনা করলেই তার পরিচয় মেলে। একমাত্র 'রজনী' ব্যতিক্রম, এই উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহ হয়েছে, যদিও বিবাহের পরে শচীন্দ্রকেও কলকাতা ছেড়ে ভবানীনগরে গিয়ে বাস করতে হয়েছে। এই শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহে শিল্পী বঙ্কিম পুরো-পুরিভাবে বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি দানে তাঁর যে দ্বিধা ছিল, এই উদ্ধৃতিটিতে তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—'...তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু রজনী ফুলওয়ালী ছিল, পাছে কলিকাতায় ইহাকে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন।' (৫ম খণ্ড ৪র্থ পরি) এখানেই বঙ্কিমের ব্যক্তি-মানসের সঙ্গে সমাজ-চেতনার সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে, আদর্শ-ভিত্তিক ঐতিহ্যবোধের দ্বারা সীমায়িত হয়েছে তাঁর যুক্তিভিত্তিক মানসিকতা। এখন প্রথমে বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস তিনটি বিচার করা যাক। বিষয়গত সাদৃশ্য ও শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর মিল থাকায় বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাস দুটি প্রথমে আলোচনা করে নেব, তার পর চন্দ্রশেখর উপন্যাসে যাব।

'বিষবৃক্ষের' (১৮৭৩) নগেন্দ্রনাথ নৌকায় কলকাতা যাবার পথে ঝুমঝুমপুরের কুন্দনন্দিনীর বাবার মৃত্যুর পর অনাথিনীকে নিয়ে আশ্রয়দান করেন ও পরে স্ত্রী সূর্যমুখীর ভ্রাতৃতুল্য তারাচরণের সঙ্গে

কুন্দর বিবাহ দেন, কিন্তু কুন্দ কিছুকালের মধ্যে বিধবা হয়। তার-পর কুন্দ আশ্রয় নেয় নগেন্দ্রনাথের বাড়ীতে, ক্রমে তাঁর হৃদয়ে। কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষ্য করেই সূর্যমুখী স্বয়ং নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ দেয়। কুন্দ প্রথমাবধিই নগেন্দ্রকে ভাল বেসেছে, নগেন্দ্রও 'কুন্দমন্ত্রের উপাসক' হয়েছেন, বিধবা কুন্দকে বিবাহ করতে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের প্রমাণ এই উক্তিটি—'আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে তথাপি আমি বিবাহ করিব।' তাঁর যুক্তি 'যদি একপুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন?' এই পর্যন্ত যেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন প্রেমের অধিকার-প্রতিষ্ঠায় সমকালীন সমাজ-অভীপ্সার আংশিক বাস্তব প্রতিরূপদানে প্রয়াসী। 'আংশিক' এই কারণে যে নগেন্দ্র ও কুন্দের বিবাহে নগেন্দ্রের স্বাধীন-ইচ্ছার প্রকাশ যতটা স্পষ্ট, কুন্দ ও সূর্যমুখীর ইচ্ছা ততোধিক অবদমিত। সূর্যমুখী চিরন্তন স্বামী-সংস্কারবশেই বাধ্য হয়ে নগেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দের বিবাহ দিয়েছে, তাই তার মুখে শুনি—'প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব।' (২৭ পরিচ্ছেদ) আবার জানা যায় 'বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত' (৪২তম পরিচ্ছেদ)। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আরও জানতে পারি কুন্দ 'নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল।' কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণভাবে স্বীয় শক্তির জোরে হৃদয়ের বাসনা চরিতার্থ করেছেন। সমাজচ্যুতির ভয় তাঁর নেই। কারণ তিনি বলেছেন —'যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আবার সমাজচ্যুতি কি?' এই উক্তিতে মধ্যযুগের দাম্ভিক ধনী সমাজপতিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চিত্রই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। (সামন্তশ্রেণীর যে অগ্রণী অংশ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আধুনিক ব্যবসা-বানিজ্যের সুযোগ গ্রহণ করল, সেই বৈশ্য পুঁজিতন্ত্রেরই (Mercantile Capitalism) একজন প্রতিভু চরিত্র নগেন্দ্রনাথ। ২৯ তাঁর উক্ত মন্তব্যে

বোঝা যায় যে, তিনি পুরানো সামন্তমূল্যবোধকে প্রয়োজনে অস্বীকার করতে পারেন; এবং ধনশক্তির প্রতাপে মধ্যযুগীয় সমাজ-ভয়কে যে তুচ্ছ করা যায় এ বিষয়েও তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী। আর সেই কারণেই নারীর স্বাধীনতাও এখানে অবজ্ঞাত। যদি উপন্যাসে সূর্যমুখীর ও কুন্দের ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদর্শিত হত, তবেই কুন্দের স্বাধীনপ্রেম পরিপূর্ণভাবে মর্যাদা পেয়েছে বলা যেত। সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে তা সম্ভব ছিল না। তাই নগেন্দ্রের দিক থেকে বিচার করেই একে 'আংশিক' বলা হয়েছে। কিন্তু এর পরই যেন তাঁর অন্তরস্থিত সংস্কারের প্রবলতাহেতু এই প্রেম বঙ্কিমের দৃষ্টিতে দেখা দিয়েছে 'রিপুর প্রাবল্য'রূপে, 'চিত্তসংযমের অভাবই' এর কারণ, এবং তা সামাজিক মঙ্গলবিধানের প্রতিকূল। নগেন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে হরদেব ঘোষাল জানিয়েছে—'যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না।' বস্তুতঃ এই মতবাদ স্বয়ং লেখকের বলেই মনে হয়। সূর্য-মুখীর গৃহত্যাগ এবং পরে মধুপুরে হরমনি বৈষ্ণবীর গৃহদাহে তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নগেন্দ্রনাথের যে মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে তাও যেন লেখকের ঐ 'রিপুর প্রাবল্য' 'চিত্তসংযমের অভাব' ইত্যাদি আদর্শবাণী আরোপণের প্রতিক্রিয়া। মধুপুর থেকে পাল্কী চড়ে আসার সময় তাঁর মনে হয়েছে 'আমি সূর্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয় দমন করিলে সূর্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটীরদাহে মরিবে কেন।' তাই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নগেন্দ্রনাথ নিজের মৃত্যু কামনা করেছেন—'দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু··· সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন?' অপরদিকে কুন্দও বলছে—'সূর্যমুখীর এই দশা আমা হতে হইল।··· আমি মরিলাম না কেন?' অবশেষে সূর্য-মুখীর প্রত্যাবর্তনের পর কুন্দ বিষপান করে আত্মহত্যা করল, ঔপন্যাসিকের মন্তব্য—'নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল'। এ হয়ত শিল্পী বঙ্কি-মের অনুশোচনা। কিন্তু বিধবা কুন্দ ও নগেন্দ্রের বিবাহ দেবার পর থেকেই যে ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত ভালবাসা বা প্রেমের সঙ্গে

ভোগলালসার পার্থক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন (৩২শ তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) তাতে মনে হয় যে কুন্দের পরিণাম তাঁর সুপরিকল্পিত; আবার এই অনুমানের সুস্পষ্ট সমর্থন মেলে উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে তাঁর প্রত্যাশাপূর্ণ বাণীতে—'আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম; ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।' বঙ্কিমের আশা ছিল যে, এই আখ্যান পাঠ করলে অবৈধপ্রণয়ে বিরূপতা জাগবে। সকলেই চিত্তসংযমে ব্রতী হবে। এইখানেই বাস্তবের অস্বীকৃতি। তাছাড়া, বিবাহের পর কুন্দের অসহায়ত্ববোধ, তার আত্মহননের ইচ্ছা-প্রদর্শন, পরিণামে তার শোচনীয় মৃত্যু ইত্যাদি কোন কিছুই আকস্মিক চিন্তা বা ঘটনা নয়, মূল কাহিনী—পরিকল্পনার সূত্রেই গ্রথিত। সামাজিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে কুন্দের বিক্ষোভ-প্রকাশ বা সংগ্রামের অভিপ্রায় দেখা যায়নি বলে বঙ্কিমচন্দ্রকে সমাজ-বাস্তববাদী বলা যায় না—তা নয়, বরং সেযুগে তা দেখালেই অবাস্তব বলে মনে হত। এর কারণ অন্যত্র। এই উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ প্রদর্শনের মাধ্যমে বঙ্কিম মূলতঃ তার বিরোধিতাই করেছেন, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির বিপক্ষে রায় দিয়েছেন, এবং সেটাও তাঁর পূর্বপরিকল্পিত। অন্যথায় হরদেব ঘোষালের মত পণ্ডিত-সুহৃদের অনুরূপ অবতারণা করতেন না কিম্বা বিপরীতভাবে চিত্রিত করতেন। এই প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' (১৮৮৬) উপন্যাসে শরতের মায়ের গুরুদেব ও রমাপ্রসাদ সরস্বতীর ভূমিকা স্মরণে আসে। দুই ঔপন্যাসিকের উপন্যাসেই বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গটি আছে এবং এসম্পর্কে দুটি উপন্যাসেই দুই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের বিধান রয়েছে। দুই পণ্ডিতচরিত্রই অস্ফুট, অথচ হিতৈষী চরিত্র। একজন বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে, অপরজন পক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিত হরদেব ঘোষালের পত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন নগেন্দ্রনাথের 'কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমুলক কাজ' বা 'রূপবতীর রূপভোগলালসা ভালবাসা নহে' (৩২ পরিঃ); পক্ষান্তরে রমেশচন্দ্র উক্ত গুরুদেবকে দিয়ে বলিয়েছেন—'বিধবা বিবাহ সনাতন হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে। আমার পরম সুহৃদ রমাপ্রসাদ সরস্বতীরও এই মত,......'

(সংসার, ২৯ পরি)। শিল্পমূল্যবিচারে বিষবৃক্ষের তুলনায় 'সংসার' হয়ত নিষ্প্রভ, কিন্তু সমাজ-বাস্তবতার স্বীকৃতির প্রশ্নে লেখকের স্থির প্রত্যয় পরেরটিতে স্বচ্ছ, এবং সেই দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অস্বীকৃতিও তাই পূর্বনির্ধারিত। কাজেই বিষবৃক্ষে এত পরিকল্পনার পর উপন্যাসের ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদে কুন্দের মৃত্যুতে ঔপন্যাসিকের দীর্ঘশ্বাসসিক্ত মন্তব্যটুকু ('অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল') খুব সহজ, স্বাভাবিক ও শিল্পীহৃদয়ের সহানুভূতিব্যঞ্জক বলে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। স্বীকার করি যে, সমকালীন সমাজে কুন্দের মত নারীর প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়া বা বিবাহিত নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে নির্বিবাদে বসবাস করানোর চিত্র কল্পনা করা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য, কিন্তু ঔপন্যাসিক নীতিপ্রচারকের ভূমিকা নিয়ে যদি অনুরূপ সাবধানবাণী শোনান, তখনই তাঁকে সংরক্ষণকামী বলেই মনে হয়।

তাছাড়া 'গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' ইত্যাদি প্রবন্ধে সৌন্দর্যসৃষ্টি সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে যিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাঁর মত মহৎ শিল্পীর ক্ষেত্রে প্রচলিত নৈতিকতার উপর গুরুত্ব প্রদানের দ্বারা শিল্প-সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করা অসঙ্গত হয়েছে। অবশ্য জনৈক সমালোচকের মতে 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের সামাজিক বাস্তবতা দৈনন্দিন নিস্তরঙ্গ জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণের নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাব্যতার। সেখানে তাঁর সাফল্য।'[৩০]

তারপর কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) – এ নারীর স্বাধীন-প্রেমের অস্বীকৃতির চরম প্রকাশ লক্ষ্য করি, আবার এই উপন্যাসেই স্বাধীন-প্রেমে অধিকারের প্রশ্নে বঙ্কিমের শিল্পীহৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের সমাধান-প্রয়াসও বেশ স্পষ্ট। পরিশেষে শিল্পী যেন এখানে এক নেতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাই রোহিণীর অপমৃত্যু ঘটলো গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে। এই উপন্যাসে রোহিণীর মর্মান্তিক পরিণাম একাধিক সাহিত্যিক ও সমালোচকের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। 'বিষবৃক্ষে'র কুন্দের পরিণাম বেদনাদায়ক, কিন্তু রোহিণীর হত্যা সৃষ্টি করল বিক্ষোভের। এখন প্রশ্ন হল— এই পরিণাম কি আকস্মিক, না, উপন্যাসে রোহিণীর চরিত্রসৃষ্টির

পরিকল্পনার মধ্যে এবং প্রথম পর্যায়ে হরলাল ও পরে গোবিন্দলালের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার পদ্ধতির মধ্যেই তার শোচনীয় পরিণামের বীজ নিহিত ছিল ?

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রোহিণী কুন্দ নয়, বরং আচার-আচরণে,—অন্তঃস্বভাবে সে ঠিক কুন্দের বিপরীত। প্রথম থেকেই ঔপন্যাসিক তাকে অতৃপ্ত যৌবনের অনিঃশেষ লালসার মূর্তিমতীরূপে চিত্রিতা করেছেন—'রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ, রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল।' (১ম খণ্ড ৩য় পরিঃ) বারুণীর ঘাটে বসে একাকিনী রোহিণী চিন্তা করছিল, '····· কি অপরাধে বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল ? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পারিলাম না। কোন্ দোষে আমাকে এ রূপযৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহ্জীবন কাটাইতে হইল।·········ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী, কোন পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ-আমার কপালে শূন্য ?' রোহিণীর মনে এই জিজ্ঞাসার স্ফুরণ ঘটিয়ে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র সেদিনের সমাজের বাল-বিধবাদের অন্তরের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপদান করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত সংস্কারবশেই এই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির প্রয়াসকেও মেনে নিতে পারেননি। এইখানেই বাস্তববাদী শিল্পী-হৃদয় ও নীতিবাদী ব্যক্তিবঙ্কিমের দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্বের সমাধান যে নেতিবাচক হবে তার ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের ১ম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদেই দিয়েছেন এই বলে—'আমরা ত বলিয়াছি রোহিণী লোক ভাল নয়।······রোহিণীর অনেক দোষ—তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি ? করে না।'

এখন প্রশ্ন—রোহিণীর দোষ কতটুকু ? কেনই বা তার পরিণাম দেখে লেখকের কাঁদতে ইচ্ছা হয় না ? শিল্পীর কোন্ মানসিকতা এখানে ফুটে উঠেছে ? 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নারীর স্বাধীন প্রেমে অধিকার ও বিধবা বিবাহসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের

ইঙ্গিত যা-ই থাকুক না কেন—তাতে বঙ্কিম-মানসের দোদুল্যমানতার সম্পূর্ণ অবসান হয়নি, এরজন্যই প্রয়োজন হয়েছিল 'কৃষ্ণকান্তের উইল'রচনা। আবার এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের রোহিণী চরিত্রাঙ্কনে লেখকের যে মানসিকতা লক্ষিত হয়, দ্বিতীয় খণ্ডে তা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে বঙ্কিমের মনে ধনবাদী সংস্কৃতি-প্রসূত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামন্তবাদী মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব ছিল, আর সেই কারণে রোহিণীকে আমরা কিছুটা সংকুচিতা-ব্রীড়াবনতা মূর্তিতে পাই। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে চিত্রিতা রোহিণী আদৌ কামোন্মত্তা চপলা যুবতী নয়, বরং হরলালের সঙ্গে কথা বলার সময় তার মধ্যে নারীর স্বাভাবিক সংকোচ ও সংযমের পরিচয়ই স্পষ্ট। মাথায় কাপড় টেনে নিয়ে তার সলজ্জ সম্ভাষণের মধ্যে দোষের কিছু দেখিনা। তার মনের ইচ্ছা যাই থাক, হরলাল তাকে বিবাহ করার প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করলে সে কোনরকম প্রগলভতা প্রকাশ না করে বরং নীরবে মাথার কাপড় আর একটু লম্বা করে টেনে নিয়ে উনুনের পাশে রান্নার কাজে মনোসংযোগ করেছে। এপর্যন্ত রোহিণীর দোষ কোথায়? তাহলে এর পরে লেখক 'রোহিণীর অনেক দোষ,' 'রোহিণী লোক ভাল নয়,' 'রোহিণী পারেনা এমন কাজ নাই, ইহা তাহার পূর্ব পরিচয়ে জানা গিয়াছে', 'পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না' ইত্যাদি বার বার বলেছেন কেন? এতে কি মনে হয় না যে এই উপন্যাসের প্রথমেই নারীর ব্যক্তিত্বের প্রতি ঔপন্যাসিকের যে আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল, ক্রমে তা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে তিনি সামন্তবাদী দৃষ্টিতেই নারীজীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন? একথা বলা অসঙ্গত হবেনা যে, বঙ্কিমচন্দ্র রেহিণীর মত বিধবা নারীদের প্রেম ও সামাজিক মর্যাদাদানের প্রশ্নে প্রথমে কিছুটা দ্বিধান্বিত থাকলেও শেষে সে দ্বিধা কাটিয়ে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক চেতনাকে আশ্রয় করে সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন। সমাজের বিধবা যুবতীরা কিছুতেই ভাল হতে পারে না—লেখকের এই বদ্ধমূল সংস্কারকে পাঠকমনে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করতেই বার বার রোহিণীর দোষ দেখিয়েছেন। অথচ লেখকের উল্লিখিত

দোষাবহ ঘটনাগুলি চরিত্রের আভ্যন্তর নিয়মে উদ্বর্তিত হয়নি; সেগুলি অনেকাংশে বহিরারোপিত। এখানে ঔপন্যাসিক নিঃসন্দেহে স্বধর্মভ্রষ্ট হয়েছেন এবং নৈতিক শুদ্ধিকরণতত্ত্বের (Theory of Moral Purification) দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য রোহিণী চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি সার্থক হতে পারেননি। কারণ মানব-চরিত্র কেবলমাত্র দোষ বা গুণের সমন্বয়ে গঠিত নয়, অল্প-বিস্তর উভয়েরই সম্মিলিত আধার। শিল্প-সাহিত্যেও সেটাই প্রত্যাশিত, এর ব্যত্যয় ঘটলে চরিত্রের বাস্তবতা বজায় থাকে না। রোহিণী চরিত্র-সৃষ্টিতে প্রকৃত পক্ষে 'লেখকের সজ্ঞান সামন্ততান্ত্রিক চেতনা তাঁর শিল্পকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে।' ৩১ তাই এর পর থেকেই দেখি, বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে চপল-চটুল করে গড়ে তুলে অতৃপ্ত যৌবনের তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তাকে সুনির্দ্দিষ্ট পথে চালনা করেছেন— প্রথমে হরলাল বিধবা বিবাহ করতে সম্মত হওয়ায় এবং রোহিণীকে আবার বিবাহ করার প্রস্তাব দেওয়ায় সাময়িক হলেও সে যে হরলালকে কামনা করেছিল—তা হরলালের এই উক্তিই প্রমাণ— 'যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারি না।' (১ম খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ) এরপর হরলাল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা রোহিণীর 'চোখে জল আসিতেছিল,' আবার গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্তির আত্যন্তিকতাই তাকে প্রকৃত উইল রেখে জাল উইল নিয়ে আসার প্রেরণা যুগিয়েছে। সে পাপ-পুণ্যও মানে না, তাই তার মুখে শুনি—'পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে?' অতএব সে গোবিন্দ-লালের আশা ছেড়ে আত্মহত্যা করেই সব জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে চায়; এই প্রসঙ্গে রোহিণী বলেছে—'রাত্রিদিন দারুন তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।' (১ম খণ্ড ১৭ পরিঃ) এই পর্য্যায়ে কুন্দের মত রোহিণীর আত্মহত্যার মধ্য দিয়েও কাহিনীর বিয়োগান্তক পরিসমাপ্তি ঘটানো যেত। তা বঙ্কিমচন্দ্র করলেন না কেন? বোধ হয় এ ব্যাপারে গোবিন্দলালের মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের জন্যই। রেহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের

আকর্ষণও রূপজ, এবং অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তিসাধনই এর উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম দিকে—তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলেছে—'আমি রোহিণীকে ভালবাসিনা। রোহিণী আমায় ভালবাসে।' কিন্তু গোবিন্দলাল যতই অস্বীকার করুক, পরবর্তীকালে তার চিত্তচাঞ্চল্য, সংসারে অনাসক্তি—সবকিছুই রোহিণীর প্রেমের প্রতিক্রিয়া, ভ্রমরকে সে বলতে বাধ্য হয়েছে—'আমি তোমায় ত্যাগ করিব।' (১ম খণ্ড ২৮ পরিঃ) ভ্রমরকে ত্যাগও করল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভ্রমরের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল না, তা যদি না থাকত, তবে আদৌ রোহিণীকে হত্যা করতে পারত না; বরং ভ্রমরের প্রতি সুপ্ত ও স্বাভাবিক অনুরাগের গভীরতাই তাকে পুনরায় রোহিণী-বিদ্বেষী করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে বলেছেন—'যখন প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গীত স্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে প্রবল প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী—ভ্রমর অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।' (২য় খণ্ড, ১৬ পরিঃ) প্রসাদপুরে চিত্রা নদীর ধার থেকে রাত্রে রোহিণীকে ফিরিয়ে এনে গোবিন্দলাল রোহিণীকে প্রশ্ন করেছে—'তুমি আমার কে? ····· তুমি কি রোহিণী যে তোমার জন্য ভ্রমর—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, যে ভ্রমর, তাহা পরিত্যাগ করিলাম?' (২য় খণ্ড ৯ম পরিঃ) গোবিন্দলালের এই পরিণতিই স্বাভাবিক, এটাই বাস্তব। শুধু সে যুগে কেন, আজকের সমাজেও অন্য নারীর প্রতি আসক্তি একজন বিবাহিত পুরুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা স্বাভাবিক গোবিন্দলালের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছে। কখনও সে ভ্রমরের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে, পরে আবার তার জন্য অনুশোচনা করে রোহিণীকে তার অধঃপতনের জন্য দায়ী করেছে। এটা মূলতঃ ব্যক্তির কামনা ও বাস্তব পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানে ব্যর্থতা-জনিত দ্বন্দ্ব। শেষে ঐ অস্থিরচিত্ত, দ্বন্দ্বদীর্ণ গোবিন্দলালকে আরও নিষ্ঠুর করে তোলার জন্যই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র নিশাকরের সঙ্গে রোহিণীর চিত্রা নদীর ধারে রাত্রিতে গোপন সাক্ষাৎকারের কাহিনীর অবতারণা করেছেন। ফলে গোবিন্দলাল পাপীয়সী রোহিণীকে হত্যা করল। তাই বলা যায় যে, উপন্যাসের কাহিনী-

বিন্যাস ও রোহিণীর চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেই রোহিণীহত্যার বীজ নিহিত ছিল। তবে রোহিণীর হত্যার মধ্য দিয়ে শুধু যে রোহিণীর প্রেমের অপমৃত্যু ঘটল তা নয়, এ ঘটনা সেযুগের নারীর স্বাধীন-প্রেমে অধিকারের চরম অস্বীকৃতির বহি:প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রও যে এই প্রশ্নের সুষ্ঠ সমাধানে অক্ষম, রক্ষণশীল সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার প্রাবল্য যে তাঁর সহৃদয় শিল্পীসত্তাকেও আচ্ছন্ন করেছিল—এখানে তা সুস্পষ্ট। তবে গোবিন্দলালের প্রতি শিল্পী-বঙ্কিমের কিছুটা সহানুভূতি যে ছিল তার প্রমাণ পাই এই উক্তিতে–'গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য। ভ্রমরের সহায় ছিল, যম সহায়। গোবিন্দ-লালের সে সহায়ও নাই।' (২য় খণ্ড ১৩ পরিঃ) কিন্তু তবু শিল্পীর পক্ষে রোহিণীকে বাঁচানো সম্ভব হল না, গোবিন্দলালও সর্বস্বান্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের আচরণের মধ্যদিয়ে সে-যুগে নারীর ব্যক্তিত্ব কতটুকু স্বীকৃতি পেয়েছিল তা দেখা যাক। আধুনিক যুগের প্রথমপর্বেও বাঙালী বিত্তবান একান্নবর্তী পরিবারে বালবধূদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ছিল অকল্পনীয়, তখনও পুরুষপ্রধান সমাজের রীতি-নীতির কাছেই ঐ সব বধূদের স্বাধীনতা বিসর্জিত হত এবং সতীত্বের নামেই তাদের ব্যক্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ খর্বিত। ভ্রমরের ক্ষেত্রেও তাই লক্ষ্য করি। 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্রনাথের মতই এখানেও গোবিন্দলাল প্রথম পর্য্যায়ে তার বিবাহিতা স্ত্রী ভ্রমরের ব্যক্তিসত্তার কোন মূল্য দেয়নি। ভ্রমর যখন গোবিন্দলালকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত বাগানে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করেছে বা জানতে চেয়েছে যে তার গুরুতর কিছু ঘটেছে কিনা তখন গোবিন্দলালকে বলতে শুনি—'তুমি এখন 'বালিকা, সে কথা বালিকার শুনিয়া কাজ নাই' (১মখণ্ড ১৮ পরিঃ)। এই উক্তি নারীর ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি চরম কটাক্ষ। আবার অসহায় ভাবে ভ্রমর যখন গোবিন্দলালকে বলে—'আমি তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার পুতুল—' (১ম খণ্ড ২৮ পরিঃ), তখন আর সংশয় থাকে না যে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁর সমকালীন সমাজের নারী স্বাধীনতার বাস্তব

চাহিদাকে অবদমিত করেছেন। বাল্য-বিবাহ তখনও হয়ত প্রচলিত ছিল একথা ঠিক, কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে রচিত উপন্যাসে সপ্তদশবর্ষীয়া স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ঐ জাতীয় উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন সমাজ-বাস্তবতার অস্বীকৃতিরই ইঙ্গিতবহ। যদিও ভ্রমরের গৃহত্যাগের মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ক্ষীণ-রশ্মিটুকুর আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন এবং তার মাধ্যমে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ভিত্তিমূলে মৃদু আঘাত হানতে চেয়েছেন, তবু আলোচ্য উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের সঙ্গে পরবর্তীকালের পবির্তনগুলির তুলনা করলে লেখকের বাস্তব-বিরূপতার আরও প্রমাণ মেলে। মূলতঃ রোহিণী ও গোবিন্দ-লালের চরিত্রেই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে বারবার। প্রথম রচনার পর উপন্যাসের সংস্কার-সাধন, কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্জন বঙ্কিম-চন্দ্র প্রায় সকল উপন্যাসেই করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসে পাঠান্তর-গুলির মধ্যে লেখকের সমধিক ঔচিত্যবোধ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও উন্নত শিল্পকৌশলের পরিচয় রয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাসে প্রথমে পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছিল বত্রিশ, পরে ৪র্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদটি শিল্পের খাতিরে বর্জন করেছিলেন,—সেখানে জন স্টুয়ার্ট মিলের উদ্ধৃতি সহযোগে অদৃষ্টতত্ত্বের ('এশিয়াটিক ফ্যাটালিজম' ও মডিফায়েড ফ্যাটালিজম্') ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ঐ পরিচ্ছেদটির বর্জন যথার্থ শিল্প-সম্মতই হয়েছে। 'ইন্দিরা'র (১৮৭৩) প্রথম সংস্করণের মাত্র আট পরিচ্ছেদ পঞ্চম সংস্করণে গিয়ে দাঁড়ায় বাইশ পরিচ্ছেদ। এই পরিবর্ধন সম্পর্কে লেখকের কৈফিয়ৎ যাই থাকুক না কেন, সেখানে ইন্দিরা ও তার স্বামী উপেন্দ্রকে যথেষ্ট উন্নীত করা হয়েছে। 'রজনী' উপন্যাস বঙ্গদর্শনে (বঙ্গাব্দ ১২৮১-৮২) যেভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, পুস্তকাকারে তা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে দেখা দেয়। এ সম্পর্কে 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিম নিজেই লিখেছিলেন—'পুনর্মুদ্রাঙ্কণ-কালে এই গ্রন্থ এত পরিবর্তিন করা গিয়াছে যে ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে।' ৩২ পরিবর্তন করা হয়েছিল মূলতঃ অমর-নাথ চরিত্র। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অমরনাথ অপেক্ষা গ্রন্থের

অমরনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন, উন্নত রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী, যা আগে ঐ চরিত্রে ছিল না। অথচ 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণী চরিত্রকে বার বার পরিবর্তিত করেও তাকে আর উন্নীত করলেন না, কিন্তু যে গোবিন্দলাল পূর্বে আত্মহত্যা করে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল তার চরিত্র পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্তিত হল, তার আত্মহননের ইচ্ছাও আর প্রদর্শিত হল না। এতে কি রোহিণীর প্রতি ঔপন্যাসিকের বিরূপতা প্রকাশ পায় না? এখানে বঙ্কিম-চন্দ্রের পাপবোধ ও নৈতিকতা প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিল্প-চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করেছে, সেই সঙ্গে সমাজ-বাস্তবতাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে—এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হবে না বলে মনে করি।

এর আগে 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে দিয়ে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে তার চিত্তশুদ্ধি করিয়েছেন, প্রতাপ-স্মৃতি তার মন থেকে অপসৃত করে চন্দ্রশেখরের নাম অঙ্কিত করার চেষ্টা হয়েছে। এখানেও লেখক প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব বা আত্মশুদ্ধিকরণ–তত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। অস্থি কুম্ভীর, রক্তসমুদ্র, নরক স্বপ্ন ইত্যাদি দর্শনের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তের কোন দার্শনিক ভিত্তি নেই, কেবলমাত্র মধ্যযুগীয় নৈতিকতাই এর মূল ভিত্তি। এই উপন্যাসের কাহিনী শুরু হওয়ার পূর্বেই অবশ্য চন্দ্রশেখব ও শৈবলিনীর বিবাহ হয়েছে। প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেম আবাল্য, 'শৈবলিনী মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি কন্যা।' (উপক্রমনিকা ২য় পরিঃ) এখানেও সংস্কা-রের কাছে প্রেমের পরাজয় ঘটল, তাই গঙ্গায় সাঁতার কাটার সময় তারা পরস্পর পরস্পরকে গোপনে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে (অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল—'শৈবলিনী, এই আমাদের বিয়ে') পরলোকে যাবার জন্য তৈরী হয়েছিল। কিন্তু শৈবলিনী বললে 'আমি মরিতে পারিব না,' আর প্রতাপকে বাঁচালেন চন্দ্রশেখর শর্মা। শৈবলিনীর সঙ্গে এই চন্দ্রশেখরেরই বিবাহের প্রায় আট বৎসর অতিবাহিত হবার পরের ঘটনাই উপন্যাসের কাহিনীবস্তু। এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে শৈবলিনীর মন থেকে প্রতাপের কথা মুছে

যেতে পারত, যদি তাদের প্রণয় শুধুমাত্র অগভীর বাল্যপ্রণয় বা ছেলেবেলার 'বর-বউ' খেলা হত। কিন্তু তা না হয়ে বরং প্রতাপের বিরহ শৈবলিনীকে প্রকৃতই যে বিরহিণী করে তুলেছিল তা চন্দ্রশেখরের এই উক্তিটিতে প্রমাণিত হয়—'হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি।······আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ?········ আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাজ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই।' (১ম খণ্ড ২য় পরি)। চন্দ্রশেখর হয়ত প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রণয় সম্পর্ক জানত না; কিন্তু তার সঙ্গে বিবাহে শৈবলিনী যে সুখী নয় সে কথা অগোচর ছিল না। এদিকে প্রতাপ যখন নিরুদ্দিষ্টা শৈবলিনীকে ফষ্টরের বজরা থেকে উদ্ধার করে স্বগৃহে নিয়ে আসে, এবং সেখানে কথা প্রসঙ্গে প্রতাপ তাকে 'পাপিষ্ঠা' বলে সম্বোধন করে তখনও শৈবলিনী বলেছে—'আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হতে? তোমা হতে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি,·········কাহার জন্য আমি গৃহধর্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।' (২য় খণ্ড ৭ম পরি) এই উক্তিই শৈবলিনীর প্রেমের গভীরতার চরম নিদর্শন। আবার তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমিয়ট গর্ল্‌ষ্টনের বজরা থেকে বেরিয়ে প্রতাপ ও শৈবলিনী যখন গঙ্গায় সাঁতার কেটে পালাচ্ছিল, তখন প্রতাপ বার বার শৈবলিনীকে তার কথা ভুল্‌তে শপথ করাবার চেষ্টা করে; কিন্তু তার উত্তরে শৈবলিনী যখন বলে—'আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?'—তখন তার প্রেমকে আর ক্ষণিক মোহজ বলা যায় না, এই ত মানবিক প্রেমের চরম উৎকর্ষ। এই প্রেমের পরিণাম কি হল? উপন্যাসের শেষে বিবাহিতা নারীর হৃদয়ে পর পুরুষের প্রতি প্রণয়াসক্তি যে পাপ তাই প্রদর্শিত হয়েছে; সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত অত্যন্ত কঠোর—"শৈবলিনী অন্ধকারে গিরি আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে শিলাখণ্ড সকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল; ক্ষুদ্র লতাগুল্ম মধ্যে পথ পাওয়া যায় না; তাহার কন্টকে ভগ্ন শাখাগ্রভাগে, বা মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদি সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে

লাগিল, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।' (৩য় খণ্ড ৮ পরিঃ) দ্বাদশবর্ষব্যাপী শৈবলিনীর ইন্দ্রিয় সংযমের ব্রত চলল; সর্বত্র স্বামী-দর্শন, সদা স্বামীচিন্তা ইত্যাদির মাধ্যমে তার মন থেকে প্রতাপ-চিন্তা বিদূরিত হল; চন্দ্রশেখরকে ভালবাসতে শিখল। এই দৃষ্টান্ত স্বাধীন প্রেমের অবদমন (Suppression) ছাড়া আর কি? যে শৈবলিনী দু'দুবার মরতে চায়নি, বরং আশাহত প্রতাপকে জল থেকে টেনে তুলেছে, প্রতাপের ভালবাসার জন্য যে সব হারিয়েছে—তার মন থেকে প্রতাপ মুছে গেল!—এটা বাস্তবে বিশ্বাস করা কঠিন।

সমাজ-বাস্তবতার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। ঐন্দ্র-জালিক ক্রিয়াকলাপ বা যোগবলে মানব-মনে ভাবান্তর সৃষ্টিতে বিশ্বাস উৎপাদন ('যোগবল না Psychic Force?' পরিঃ দ্রঃ) ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-পটভূমিতে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের প্রাচীনমূল্যবোধ-গুলির সংরক্ষণ-প্রয়াসে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-দানের চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। চিন্তা ও চেতনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে ঐ শ্রেণীভুক্ত শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত প্রদর্শনে সে পরিচয় গোপন থাকেনি। তাছাড়া, শৈবলিনীর যে দ্বিজত্ব বঙ্কিমের অভিপ্রেত চন্দ্রশেখর-গৃহিণীরূপে প্রতাপ-প্রণয়ী-সত্তার সম্পূর্ণ বিলোপ তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা শিল্পীর দায়িত্ব ছিল। কয়েকটি পংক্তির ক্ষুদ্র পরিসরে প্রবৃত্তি সংযম ও চিত্তের ভারকেন্দ্র প্রতাপ থেকে চন্দ্রশেখরমুখী হবার যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে তাকে কোনক্রমেই মনস্তত্ত্বসম্মতও বলা যায় না। 'চিন্তা'র গভীরে—সত্তার গভীরে যে প্রতাপের স্থান সে ত শৈবলিনীর সমগ্র অস্তিত্বের সঙ্গেই যুক্ত। কেবল অনুশোচনা বা বিবেক-দংশনের দ্বারা সেখান থেকে কি করে সে প্রতাপকে উপড়ে ফেলতে পারল, তার মনস্তত্ত্বসম্মত পরিচয় উপন্যাসে প্রত্যাশিত ছিল। 'অদ্বিতীয় জ্ঞানী' 'সিদ্ধ পুরুষ' রমানন্দ স্বামীর বিধান ও তার সযত্ন অনুশীলন পরিবর্তিত শৈবলিনী চরিত্রের ব্যাখ্যা হিসেবে অকিঞ্চিৎকর, বরং শৈবলিনীর উন্মাদ-গ্রস্ততা মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা সম্মত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে অনেক সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেম সম্পর্কে আলো-

চনার সময় রমেশচন্দ্রের 'মাধবীকঙ্কন' (১৮৭৬) উপন্যাসের নরেন্দ্র-হেমলতার প্রেমের তুলনা করেছেন এবং সেখানে বস্তুনিষ্ঠায় বঙ্কিম-চন্দ্র অপেক্ষা রমেশচন্দ্র অধিকতর বাস্তব-সচেতন বলে পরিগণিত। এর কারণ শ্রীশের সহধর্মিণী হওয়া সত্ত্বেও যে হেমলতার অন্তরে নরেন্দ্র-স্মৃতি আজীবন অক্ষয় হয়ে ছিল, তাকে মুছে ফেলার বৃথা চেষ্টায় ঔপন্যাসিক সেখানে কোন কৃত্রিম ও অলৌকিক পন্থা আরোপ করেননি; বরং লেখক দেখিয়েছেন 'বহুদিন পরে পুত্রকন্যা পরিবৃত হয়েও হেমলতা এক সন্ন্যাসীকে দর্শন করতে গিয়ে যেমন নয়ন ফেরাতে পারেনি, তেমনি হেমলতাকে দেখেও সন্ন্যাসীর দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেছে।' ৩৩ নারীমনে প্রকৃত প্রেমের অনির্বাণ শিখা কোন বাহ্যিক কৃত্রিম পন্থায় যে নির্বাপিত করা যায় না—এটা তারই প্রমাণ।

প্রকৃতপক্ষে এ উপন্যাসে তা হয়ও নি, তাই উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে, কেননা শৈবলিনী বলেছে - 'যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অসার; কতদিন বশে থাকিবে জানিনা।' দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ চিত্ত সংযম অনুশীলনেও শৈবলিনীর প্রেমের শিখা নির্বাপিত হল না, তাই প্রতাপকে প্রেমানলে দগ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দিতে হল। 'এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।' (ষষ্ঠ খণ্ড ৮ম পরিঃ) মুমূর্ষু প্রতাপের হৃদয়ের এই হাহাকার যেমন শৈবলিনীর প্রেমের পূর্ণতার পরিচায়ক, তেমনি নারীর স্বাধীন-প্রেম সম্পর্কে সেদিনের সমাজের নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন আচরণের ইঙ্গিতবহ। বাস্তবতার বিচারে এইখানেই ঔপন্যাসিক সার্থকতা লাভ করেছেন। কেননা অন্তরের সংস্কার ও বাইরের সমাজভীতি এই দুয়ের প্রতিক্রিয়ায় বঙ্কিম হয়ত প্রতাপ-শৈবলিনীর মিলনমূলক পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারেননি, প্রত্যক্ষভাবে তা সম্ভবও ছিল না, কিন্তু প্রতাপের উপরের উক্তিটির মধ্যে শিল্পীর

সহানুভুতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এই সহানুভুতির ফলশ্রুতিই হয়ত পরবর্তীকালে 'রজনী' উপন্যাসে শচীন্দ্র-রজনীর প্রেমের মিলন-মুলক পরিসমাপ্তি।

'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসে পুষ্পপশারিণী অন্ধ রজনীই ছোটবাবু অর্থাৎ শচীন্দ্র মিত্রের প্রতি প্রেমানুরক্ত হয়েছিল, তার প্রেমোন্মেষ দর্শনে নয়, স্পর্শলাভে। রজনীর চোখ দেখার জন্য যেদিন শচীন্দ্র তার চিবুক স্পর্শ করে সেই দিনই রজনীর অন্তরে প্রেমের সুত্রপাত। রজনী বলেছে—'সেই চিবুক স্পর্শে আমি মরিলাম।' (১ম খণ্ড ২য় পরিঃ)। পক্ষান্তরে রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের প্রাথমিক অনীহার স্পষ্ট পরিচয় পাই তার এই উক্তিটিতে—'রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ; রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা, রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না; ইচ্ছাও নাই।' (৩য় খণ্ড ২য় পরিঃ) এছাড়া শচীন্দ্র শুনেছে যে অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করতে চায়, এইসব কারণে রজনী ও শচীন্দ্রের মধ্যে প্রেম সম্পর্ক কিছুটা একপেশে, আবার অমরনাথের রজনীর প্রতি আসক্তিও একপেশে। কারণ অমরনাথ রজনীকে ভালবাসে, কিন্তু প্রথমে অমরনাথকে রজনী বিবাহ করতে রাজী হয়েছিল কিছুটা কৃতজ্ঞতার বশে। রজনীর পিতৃ-সম্পত্তির উদ্ধার হয়েছে অমরনাথের সাহায্যে, তাই সে কিছুটা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা আর প্রণয় এক নয়, বরং এদুটো সম্পূর্ণ বিপরীতভাব। রজনী মনেপ্রাণে শচীন্দ্রকে চায়, লবঙ্গলতাকে সে বলেছে—'তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব—আমি তাহা চাহিতাম না, শচীন্দ্রের অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই নাই—আমার প্রাণ তাঁহার কাছে,' (৪র্থ খণ্ড ৩য় পরিঃ)। বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর প্রেমের মর্যাদা দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁকে সেক্ষেত্রেও এক অলৌকিক উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের প্রণয়ের প্রকাশ ও পরিপুষ্টির জন্য তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সাহায্য নিতে হয়েছে। নারীর স্বাধীন-প্রেমে অধিকারের বাস্তব দাবীর প্রতিষ্ঠায় ঔপন্যাসিক গ্রহণ করলেন অতিপ্রাকৃত পন্থা। ঔপন্যাসিক-বাস্তবতার অঙ্গরূপে তন্ত্রমাহাত্ম্য বর্ণিত হলে তা অনায়াসে চরিত্রের মানসিক পরিবর্তনের নিয়ামক

হতে পারত। বিদগ্ধ সমালোচকও তাই বলেছেন—'শচীন্দ্রের মনোভাব পরিবর্তনের যাহা মূল কারণ, তাহা অতিপ্রাকৃতের রাজ্য হইতে আসিয়াছে, বাস্তব জগতের বিশ্লেষণ-প্রণালী তাহার উপর প্রযোজ্য নহে।' ৩৪ প্রকারান্তরে 'রজনী' উপন্যাসে বাস্তবতার নিয়ম যে লঙ্ঘিত হয়েছে এই মন্তব্যে সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শচীন্দ্রের অন্তরস্থিত সুপ্ত প্রণয় পরিস্ফুটনের জন্যই নাকি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক পীড়ার সৃষ্টি ইত্যাদির আয়োজন, কিন্তু বাস্তবতার বিচারে এটা অসম্ভব। যাদুকরের যাদুবিদ্যায় অসম্ভব সম্ভব বলে মনে হয়, তবে তা নিতান্তই ক্ষণ-স্থায়ী; তাই অনুমেয় যে শচীন্দ্র রজনীকে প্রথমাবধিই আন্তরিকভাবে ভালবেসেছিল, কিন্তু তার সামাজিক মর্যাদাবোধ ও রজনীর অন্ধত্ব উভয়ের মিলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতঃ সমাজকে অস্বীকার করে তখনকার দিনে শচীন্দ্রের পক্ষে রজনীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা অসম্ভব হত—যদি রজনীর সঙ্গে সম্পত্তিজনিত একটা সম্পর্ক না থাকত। এই সম্পত্তির উপর নিজেদের অধিকার বজায় রাখার জন্যই শচীন্দ্রের পরিবারের লোকেরা তান্ত্রিক অনুষ্ঠা-নের আয়েজন করেছে ছেলের মতি-গতি পরিবর্তন করাতে, আর এটাকে উপলক্ষ করেই পরিণামে শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহ সম্ভব হয়েছে।

শুধু শচীন্দ্রের অনুরাগ সৃষ্টি নয়, অমরনাথের মনেও রজনীর প্রতি বিরাগ সৃষ্টি করতে হয়েছে সুকৌশলে। এই উভয় কার্যেই লবঙ্গলতার (শচীন্দ্রের ছোট মা) ভূমিকাই প্রধান, তিনিই এখানে 'অঘটন ঘটন পটীয়সী'। অমরনাথ শেষে বলেছে—'রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর; মাঝখানে আমি কে?……… শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব।' (৫ম খণ্ড, ১ম ও ২য় পরিঃ) অমরনাথের মনে হঠাৎ এ অনীহাকে প্রেমের আদর্শায়িত রূপ বলে মনে হবে, কিন্তু আসলে লবঙ্গলতার প্রতি তার পূর্বেকার দুর্বলতা ও পারিবারিক কলঙ্কের কথা প্রকাশিত হওয়ার আশংকাই তার এই বৈরাগ্যের কারণ; আর এই বৈরাগ্য-সঞ্চারের কাজে

ঔপন্যাসিক সুকৌশলে লবঙ্গলতাকেই নিয়োগ করেছেন। মোট কথা, বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে রজনীর প্রেমে সহানুভূতিশীল ও বাস্তববাদী, কিন্তু অমরনাথের প্রতি তাঁর বিরূপতা ঔপন্যাসিক-বাস্তবতার চরম অমর্যাদা। মূল চরিত্রের প্রতি সুবিচার করার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন চরিত্রকে আকস্মিকভাবে সরিয়ে দেওয়ার রীতি বঙ্কিম-উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপের স্ত্রী রূপসীকে একবার মাত্র (২য় খণ্ড ৪ পরিঃ) দেখা গেছে, তারপর আর লেখক তাকে আনেননি। অনুরূপভাবে অমরনাথকে কিছু পূর্বেই সরিয়ে দিলে সম্ভবতঃ বাস্তবতার বিচ্যুতি এড়ানো যেত, তাতে শিল্পমূল্যেরও বিশেষ হানি ঘটত বলে মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে অমরনাথ-লবঙ্গলতার প্রেম-সম্পর্কও উল্লেখের দাবী রাখে। লবঙ্গলতার সঙ্গে অমরনাথের বিবাহ-সম্পর্ক স্থির হয়েও অমরনাথের পারিবারিক কলঙ্কের কথায় সে বিবাহ হয়নি, কিন্তু তার হৃদয়ে লবঙ্গলতার স্মৃতি অম্লান ছিল, তাই সে একরাত্রে গোপনে লবঙ্গের বাপের বাড়ীতে লবঙ্গের ঘরে ঢোকে। প্রণয়ের আবেগ প্রাবল্যেই সে 'চোর' হয়। কিন্তু লবঙ্গের মনে বিবাহ-সংস্কার প্রবল হওয়ায় সে অমরনাথের প্রেমকে স্বীকার করতে পারেনি, তাই তার আশা— 'এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—' এই ইঙ্গিতটুকুতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি স্পষ্ট। যা এজন্মে সমাজের কাছে স্বীকৃতি পেল না, পরজন্মে যেন তা মেলে—এই হ'ল বাঙালী নারীর অতৃপ্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা। আর লবঙ্গের সেই আকাঙ্ক্ষাকে অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিতময় ভাষায় ব্যঞ্জিত করে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েছেন বলা যায়।

চার

বঙ্কিমচন্দ্রের যে সমস্ত উপন্যাসে নারীর স্বাধীন প্রেমের প্রশ্ন স্পষ্টভাবে উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলির বিশ্লেষণ করা হল। ঐ বিশ্লেষণ হতে এই বিষয়ে বঙ্কিম-মানসের দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রজনী' উপন্যাসে প্রেমের স্বীকৃতি, অপরদিকে

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে প্রণয়িনীর প্রেমাস্পদকে লাভ করার পর পাপ-বোধের প্রেরণায় প্রাণবিসর্জন আবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ প্রেমাস্পদ কর্তৃক প্রণয়িনীর নিধন—বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-সংকটেরই প্রকাশ। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে প্রতাপগতপ্রাণা শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত-প্রদর্শনও শিল্পীমনের উক্ত সংকটেরই দ্যোতক। এখন প্রশ্ন—কেন এই সংকট, কেন এই অন্তর্দ্বন্দ্ব? কেনই বা বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীর বধের দৃশ্য অঙ্কন করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেণীচেতনা ও সমাজ-দর্শনের মধ্যে। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মূলতঃ তাঁর শ্রেণীর অর্থাৎ তৎকালীন উচ্চশিক্ষিত অথচ রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজেরই দ্বন্দ্ব। প্রতাপ-চন্দ্রশেখর-নগেন্দ্রনাথ-শচীন্দ্র-গোবিন্দলাল-এরা সকলেই উক্ত শ্রেণীর প্রতিভূ। জীবনের প্রাচীনমূল্যবোধগুলি তাঁদের কাছে মূল্যহীন হলেও নতুন চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা তাঁদের কাছে ছিল অসম্ভব। কারণ ঐ শ্রেণীর সমাজিক ভিত্তিমূল সামন্তবাদী সমাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁদের গোত্রান্তর ঘটলেও মানসিকতার আমূল পরিবর্তন তখনও ঘটেনি, এত দ্রুত তা ঘটাও সম্ভব নয়। নারীর স্বাধীন প্রেমের স্বীকৃতির পূর্বসর্ত ব্যক্তিহিসেবে, স্বাধীন সত্তা হিসেবে নারীর স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদা দান। কিন্তু তৎকালীন এদেশের সমাজ-পরিবেশের মত 'কলোনীয়' পরিবেশে নবজাগরণ স্বাভাবিক এবং সর্বতোমুখী বিকাশ-লাভ করতে পারেনা। তাই বঙ্কিমের সময়ে সমাজে নারীস্বাধীনতার প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর পক্ষে ও বিপক্ষে নানা আলোচনা হয়। পক্ষাবলম্বী অপেক্ষা বিপক্ষের সমর্থক-সংখ্যাই ছিল বেশী। বিপক্ষমতের কয়েকটি উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল—

ক) "কতকগুলি যুবক মত্তপ্রায় হইয়া স্ত্রীর স্বাধীনতা বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন,............বঙ্গদেশীয় রমণীগণের স্বাধীনতা দানার্থী যুবকেরা কতদূর স্বাধীনতা দিতে চান?.........মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য নাই এই যে কথা কহিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় এই, তাঁহাদিগকে স্বামী প্রভৃতির মতানুবর্ত্তী হইয়া সকল কাজ করিতে হইবে, তাঁহারা স্বেচ্ছাচার করিতে পারিবেন না,.........". (সোমপ্রকাশ, ২২ শ্রাবণ ১২৭৯)৩৫

(খ) 'যখন হিন্দুদিগের মধ্যে একজনও স্বপ্নে ভাবেন নাই বিধবার বিবাহ হইতে পারে, যখন সমস্ত লোক এ বিষয়ে অপ্রস্তুত ছিল, সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তক প্রচার করেন আর তজ্জন্যই তাহা বিশেষ ফলোপধায়ক হয় নাই। বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তক প্রচারের তখনও যেমন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই, স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার এখনও তেমনি উপযুক্ত সময় হয় নাই। অতএব তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে অবশ্যই তাহাতে বিষময় ফল ফলিবে।' (ঐ ৩ বৈশাখ ১২৮৫) ৩৬

(গ) 'অশিক্ষিত সমাজানভিজ্ঞ ইংরাজ এবং অর্দ্ধশিক্ষিত অপরিণামদর্শী ইংরাজের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবক স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত, কিন্তু একবার যদি তাঁহারা কোন শিক্ষিত সমাজ–চিন্তাশীল ইংরাজের নিকট উপদেশ চাহেন, উপদেষ্টা নিশ্চয়ই বলিবেন—'ইউরোপীয় প্রথায় স্ত্রী স্বাধীনতা বিষম অনর্থের মূল।' (সোমপ্রকাশ, ১৮ শ্রাবণ, ১২৯৩) ৩৭

(ঘ) 'ইংরেজরা স্বাধীনতাপ্রিয়। বোধহয় প্রণয়সম্বন্ধেও স্বাধীনতা আনিতে ইঁহারা ইচ্ছা করেন। আমরা অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতার ইচ্ছুক হইলে হইতে পারি, কিন্তু আমরা প্রণয়ের স্বাধীনতা চাই না।' ৩৮

বঙ্কিম-মানসেও স্বভাবতঃই বাঙ্গালীসমাজের এই যুগ–জিজ্ঞাসা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। নানা ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তাঁকে যে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল তার প্রমাণ পাই 'সাম্য' গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহে। ঐ গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। আমাদের সমাজে স্ত্রী-জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা বঙ্কিমকে ঐ সময় (সাম্যের গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল–১৮৭৯, তার পূর্বে 'বঙ্গদর্শনে' বের হয়) যে ক্ষুব্ধ করেছিল তার পরিচয় পাই এই উদ্ধৃতিতে—'পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গলার অর্দ্ধেক অধিবাসী, স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই।' ৩৯ তিনি বিশ্বের সমাজ–দার্শনিকদের বিশেষ করে ষ্টুয়ার্ট

মিলের সাম্যনীতির আদর্শ ব্যাখ্যা করে স্ত্রী-স্বাধীনতার দাবী তুলে ধরেছেন আলোচ্য গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে। স্ত্রীপুরুষের স্বভাবগত বৈষম্য যে সমানাধিকার অর্জনের পথে অন্তরায় নয়, স্ত্রী-পরাধীনতা পাতিব্রত্য বা সতীত্বরক্ষা বা সুষ্ঠভাবে গৃহকর্মসম্পাদন ইত্যাদি কোন অজুহাতেই যে স্বীকার করা যায় না—তা বঙ্কিম সেদিন যুক্তিসহকারে প্রতিপন্ন করেছিলেন। 'সাম্যে' উল্লিখিত তাঁর মতের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করলাম –

'পাতিব্রত্যের কেহ বিরোধী নহে ; স্ত্রী যে পুরুষের দাসী-মাত্র, সংসারের অধিকাংশ ব্যাপারে স্ত্রীলোক অধিকার শূন্যা, সাম্য-বাদীরা ইহারই প্রতিবাদী।'

'যাহাকে গৃহধর্মবলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহকর্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহকর্মের দুঃখে অব্যাহতি পাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় নির্বিঘ্ন হইবে, ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্য সঙ্গত নহে।' 'ধর্ম রক্ষার্থে যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরানিবদ্ধ রাখা আবশ্যক, হিন্দু মহিলাগণের এরূপ কুৎসা আমরা সহ্য করিতে পারি না।'

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' রচনার কালেই কিন্তু উপরে বিশ্লেষিত উপন্যাসসমূহের সৃষ্টি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ১৮৭৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়, তার আগেই 'সাম্যে'র আলোচ্য পরি-চ্ছেদটি (স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য বিষয়ক) অন্যান্য দুটি পরিচ্ছেদ সহ বঙ্গদর্শনের ১২৮০র জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে-ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সাম্যনীতি বঙ্কিম-চিন্তায় ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে, কারণ মিলের সাম্য-তত্ত্বের প্রভাব তাঁর উপর ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। তিনি নিজেই বলেছেন—'একসময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।'৪০ পরে তিনি অগাস্ত কোঁৎ-এর Positivism বা প্রত্যক্ষবাদের অনুবর্তী হন। প্রত্যক্ষবাদে সমাজ-চিন্তা সমাজ-সংরক্ষণ বা সমাজভক্তির নামান্তর। প্রত্যক্ষবাদীরা সমাজবিপ্লবের বিরোধী। একদিকে প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব অন্যদিকে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার আত্যন্তিকতা—এই দুয়ের মিশ্র ফলশ্রুতিতে বঙ্কিম যেমন

'সাম্য' ত্যাগ করলেন, তেমনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা, বিশেষকরে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশ্নও নস্যাৎ করে দিলেন। 'ধর্মতত্ত্বের' ২৩ অধ্যায়ে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট বলেছেন—'স্বামীর সেবা, সুখ সাধন ও ধর্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম।…………………সাম্য কি সম্ভব? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারে? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি?'—এই অবাস্তব যুক্তির দ্বারা সে-দিনের সামাজিক প্রশ্নের বাস্তবতা অস্বীকার করার মূলে ছিল বঙ্কিমের সনাতনী মনোবৃত্তি। শিল্পসৃষ্টিতে বঙ্কিম তাঁর সামাজিক মতামতকে বারবার নিজেই খণ্ডন করেছেন। এখানে 'সীতারাম' উপন্যাসে বর্ণিত শ্রীর সিংহবাহিনীরূপে (১ম খণ্ড ৪র্থ পরিঃ) সৈন্য-চালনা উল্লেখ্য। যে সনাতন হিন্দুসমাজের সংস্কারাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় তিনি প্রতিপালিত, তা থেকে মুক্ত হতে না পেরে ঐ সনাতন ঐতিহ্যের সংরক্ষণের মনোবৃত্তি তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। বঙ্কিম-মানস যত পরিণত হয়েছে, ততই ঐ মনোবৃত্তির প্রকাশ প্রকট হয়েছে। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী'তে স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বীকৃতি হিতবাদী যুবক বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ, বিষ-বৃক্ষে দ্বিধা স্পষ্ট, অবশেষে কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর হত্যার মধ্য দিয়ে তাঁর নেতিবাচক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করলেন। নারীর স্বাধীনপ্রেম যে তাঁর দৃষ্টিতে চিত্তের অসংযম বা প্রবৃত্তির তাড়না বলে মনে হয়েছে এবং এই প্রেম তাঁর বিচারে যে সমাজের পক্ষে অকল্যাণ-কর—পূর্বে তা উল্লেখ করেছি। এই কল্যাণবোধের ভিত্তি ধর্মা-চরণের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনায় আমাদের সামাজিক আচ-রণবিধি ঐ কল্যাণবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন, তার জন্যই চাই চিত্ত-প্রবৃত্তির সংযম। চিত্তবৃত্তি সংযমের উপায় স্বরূপ তিনি 'ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন' করার উপদেশ দিয়েছেন, তাহলেই শান্তি পাওয়া যাবে। গোবিন্দলাল সেই পথেরই পথিক হয়েছে। এইভাবে বঙ্কিম সামাজিক সমস্যার সমাধানে পরাঙ্মুখ হয়ে আধ্যাত্মিক ভাবলোকে আশ্রয় খুঁজেছেন।

পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমরা 'কপালকুণ্ডলা'

ও 'রাজসিংহ' উপন্যাসের যথাক্রমে নবকুমার-কপালকুণ্ডলা ও রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারীর কাহিনী এই পর্য্যায়ে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিনি, কারণ উভয়ক্ষেত্রেই নায়ক-নায়িকার পরিণয়কে ঠিক প্রণয়-ভিত্তিক বলা চলে না। কপালকুণ্ডলার তো নয়ই, চঞ্চলকুমারীও ঔরঙ্গজেবের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যই রাজপুত বীর রাজসিংহের আশ্রয়প্রার্থিনী, পরে তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে বিক্রমশোলাঙ্কি (চঞ্চল কুমারীর পিতা) রাজসিংহের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেন। কাজেই স্বাধীনপ্রেমের অধিকার প্রসঙ্গে তাদের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় পর্য্যায়ের উপন্যাসগুলি মূলতঃ দেশপ্রেম ও ভগবদ্প্রেমসম্বদ্ধ,—বিশেষ করে তা 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারামে'র মধ্যে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিম-উপন্যাসে দেশভক্তির অরুণাভাস সূচিত হয় প্রথম 'মৃণালিনী'তে; যদিও তা রোমান্সের আধারে পরিবেশিত, তবু সেখানে হেমচন্দ্রের মধ্য দিয়ে বাঙালীর শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ ঘটাবার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। তাছাড়া, 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' (প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১) প্রবন্ধে সতেরোজন অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়-সংক্রান্ত যে ঐতিহাসিক ভ্রমের নিরসন, 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসেই প্রথম তার সূচনা। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত বঙ্কিমমানস মূলতঃ কেন্দ্রীভূত ছিল সমকালীন সমাজের নারী-স্বাধীনতা ও নারীর স্বাধীন প্রেমে অধিকারসংক্রান্ত প্রশ্নে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কিভাবে তিনি এই প্রশ্নের নেতিবাচক-সমাধান করলেন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর-পরই বঙ্কিম-দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল নীতি, আদর্শ ও ধর্মসংক্রান্ত সমস্যায়, দেশপ্রেম ও ঈশ্বরভক্তির আবেগ-প্রাবল্য তাঁকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব সমস্যা থেকে যেন মুক্তি দিল। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সমাপ্তিতে গোবিন্দলালের সন্ন্যাসগ্রহণ ও 'ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃ-স্থাপন'-পরিকল্পনা যেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রেরই 'আনন্দমঠ' পর্বে উত্ত-

রণের ব্যঞ্জনা। একদিকে উক্তসমস্যা থেকে মুক্তি-প্রয়াস, অন্যদিকে অন্তরে পরাধীনতার গ্লানিজনিত জ্বালা (যা 'মৃণালিনী'তে প্রথম দেখা যায়)—এই দুয়ের পরিণামে প্রবল হয় স্বদেশপ্রীতি, আবার তাঁর এই স্বদেশ প্রেম একান্তভাবে ঐশী-প্রেম নির্ভর।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই (ধর্ম্মতত্ত্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে)বলেছেন যে তাঁর স্বদেশপ্রীতি পাশ্চাত্যের Patriotism নয়, তাঁর মতে ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism-ধর্ম্মের তাৎপর্য এই যে, পর সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।' বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমকে যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করতেন, তেমনি আবার স্বদেশ-রক্ষা তাঁর দৃষ্টিতে ছিল 'ঈশ্বরোদ্দিষ্ট' কর্ম, 'কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়।······ সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশ-রক্ষণ কর্ত্তব্য ' (ধর্মতত্ত্ব ২৪ অধ্যায়)। তাই বঙ্কিমের স্বদেশরক্ষা ও স্বদেশ-প্রীতি ঈশ্বর-প্রেমেরই অঙ্গীভূত। স্বদেশ তাঁর দৃষ্টিতে মাতৃস্বরূপা—দেবীমূর্ত্তিতে প্রকাশিতা। 'আনন্দমঠের' প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে দেবালয়ে নিয়ে এই মায়েরই ত্রিরূপ দর্শন করিয়েছেন—প্রথমে 'সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি' অর্থাৎ মা-যা ছিলেন' তারপর 'হৃতসর্ব্বস্বা নগ্নিকা কঙ্কালমালিনী কালী' অর্থাৎ 'মা যা হইয়াছেন' এবং সবশেষে 'নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী দশভূজা দুর্গা' অর্থাৎ মা যা হইবেন'। উপরের ত্রিমূর্ত্তি যে দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থার দ্যোতক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আধ্যাত্মিক রূপকের মাধ্যমে হলেও দেশের পূর্বাপর অবস্থার অনুধাবনে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রয়াসের জন্যই সমাজ-বাস্তবতার বিচারে এখানে তিনি বাস্তববাদী। উক্ত বিশ্লেষণে অতীত ও বর্তমান যেমন আছে, তেমনই ভবিষ্যতও সুপরিকল্পিত। কিন্তু তৃতীয়াদেবীমূর্ত্তি দর্শনে মহেন্দ্রের মনে যে বাস্তব প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল—'মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব,'-ব্রহ্মচারীর উত্তর -'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে,·········' তাকে অবাস্তবতায় পর্যবসিত করেছে। এর মূল

কারণ ঔপন্যাসিকের অন্তরে পরাধীনতার জ্বালা আছে সত্য, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সঠিক পথ কি—সে বিষয়ে তাঁর স্থির প্রত্যয় ছিল না। শুধু বঙ্কিমেরই নয়, সে-সময় অধিকাংশেরই সেটা ছিল না। তখন স্বদেশচেতনা ছিল মূলতঃ আবেগপুষ্ট, সমাজ-বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্লেষণভিত্তিক নয়। 'আমাদের দেশচেতনা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দুটি পথ অনুসরণ করেছে, একটি রাজনীতির পথ, আরেকটি দেশাত্মবোধক আবেগের পথ।...... আসলে তিনি ছিলেন দেশাত্মবোধক আবেগের কবি ও দার্শনিক। তিনি আমাদের মধ্যে বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের জাগরণই ঘটাতে চেয়েছেন।' ৪১ তাই কেন দেশজননীর বর্তমানের হৃতসর্ব্বস্বা নগ্নিকা মূর্ত্তি হল অর্থাৎ দেশের চরম দুরবস্থা ও পরাধীনতার কারণ কি-সে বিষয়ে বিশ্লেষণও বঙ্কিম-মানসে স্থান পেয়েছিল বলে মনে হয় না। এর আগে 'সাম্যে'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে এদেশীয় কৃষকদের দুরবস্থার কারণ নিরূপণে একবার প্রয়াসী হয়েছিলেন – ('কি কারণে ভারতবর্ষের প্রজা চিরকাল উন্নতিহীন,—অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব'), তবে সেখানেও তাঁর সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ দেশের প্রজাসাধারণের অবনতির মূলে দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব, বিবাহপ্রবৃত্তির প্রভাব, লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদিকে নির্দেশ করেই তিনি উপসংহার টেনেছেন। সামাজিক ইতিহাসের সামন্ততান্ত্রিক পর্য্যায়ই যে আসল কারণ, তাঁর উল্লিখিত কারণগুলি যে সেই কারণেরই কার্য—বঙ্কিম তা উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হননি। এখানে তাই কার্য-কারণ বিপর্যয় ঘটেছে। আবার ঐ পরিচ্ছেদেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন—'......সভ্যতা সৃষ্টির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সমাজমধ্যে একটি সম্প্রদায় শারীরিক শ্রম ব্যতীত আত্মভরণপোষণে সক্ষম হইবে।...... সভ্যতার উদয়ের পূর্বে প্রথমে আবশ্যক—সামাজিক ধনসঞ্চয়ন।...... যখন জনসমাজে ধনসঞ্চয় হইল, তখন কাজে কাজেই সমাজ দ্বিভাগে বিভক্ত হইল। একভাগ শ্রম করে; একভাগ শ্রম করে না।...... এ বৈষম্য প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদ সম্ভবে না। এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকরও নহে।' সেকালে সমাজ-

বিপ্লবের দ্বারা পুরানো রাষ্ট্র-কাঠামো তথা সামাজিক-কাঠামো ভেঙ্গে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বিষয়ে কেউই অবহিত ছিলেন না। বোধ হয় বিবেকানন্দই প্রথম শূদ্রের অভ্যুত্থানকে ইতিহাসের নিয়তিরূপে নির্দেশ করেন। বঙ্কিমের ব্যক্তি-চেতনার সঙ্গে তাঁর শ্রেণীচেতনার যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রাথমিক জীবনে ঘটেছিল-তারই প্রমাণ পাওয়া যায় 'সাম্য', 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র কিছু কিছু প্রবন্ধে। কিন্তু পরবর্তীকালে 'সাম্য' যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যাহার করেছিলেন, তা সুবিদিত। ১৮৮৮র কাছাকাছি সময়ে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেন—'সাম্য সব ভুলে ভরা আর ছাপাবো না।' ৪২ 'সাম্য' প্রত্যাহারের পিছনে বঙ্কিমের যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল, অনুরূপ মানসিকতার বশবর্তী হয়েই তিনিই স্বদেশের অবনতি ও দীর্ঘস্থায়ী পরাধীনতার সঠিক কারণ নিরূপণ করতে অসফল হয়েছেন। একথা স্মরণে রেখেই তাঁর স্বদেশ-প্রীতির বাস্তবতা বিচার্য।

জনৈক সমালোচক বলেছেন—'বঙ্কিমের যতটুকু চিন্তা তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান ও কর্ম – স্বজাতির কল্যাণ চিন্তাতেই গণ্ডিবদ্ধ হইয়া আছে;...... ৪৩, কিন্তু 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসটি বিশ্লেষণে এই কথাই মনে হয় যে, বঙ্কিমের স্বাদেশিকতা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ-বিরোধিতা নয়, বরং তাঁর মতে ইংরেজ ছিল মিত্রশক্তি, ইংরেজশাসন যেন দেশবাসীর পক্ষে হিতকর। তাঁর এই ভাবনা যুগচেতনা-সঞ্জাত। ৪৪ এই অনুমানের সমর্থনসূচক দুটি উদ্ধৃতিও নীচে দেওয়া হল ঃ—

(১) 'ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।.........ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে– নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে।......ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।' (আনন্দমঠ ৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিঃ)

(২) 'ইংরেজ রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানীঠাকুরের কাজ ফুরাইল।' (দেবীচৌধুরাণী ৩য় খণ্ড ১৪ পরিঃ)

অথচ 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী' দুটি উপন্যাসেই যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উল্লেখ আছে— তা যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শোষণের প্রত্যক্ষ ফল সে ত বঙ্কিমের অজানা থাকার কথা নয়। বঙ্কিমের সময়েই ১৮৫৩ খ্রীঃ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে ৪৫ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন সম্পর্কে যে আবেদন পত্র পেশ করা হয় তাতেও ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের শাসননীতির আদর্শে ভারতবর্ষেও স্বশাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী জানানো হয়, 'নীলদর্পণ' নাটকও সমগ্রজাতির স্বাধীনতাস্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। 'আনন্দমঠ' ও দেবীচৌধুরাণী'র রচনাকালেও বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল—শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিন-পাল প্রমুখের প্রচেষ্টায় গুপ্ত সমিতি (১৮৭৬-'৭৭) স্থাপনের পরি-কল্পনা রচিত হয়, সমগ্র ভারতবাসীকে রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করার জন্যই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ মনীষীরা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন্ (১৮৭৬) স্থাপন করেন। দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের উদ্দেশ্যে 'ভার্ণাকুলার প্রেস্ অ্যাক্ট্' পাস হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে সমগ্রদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। তারপর এল 'ইলবার্ট বিলে'র (১৮৮২) বৈষম্য। এই পরিস্থিতির মধ্যেও বঙ্কিম উক্ত উপন্যাসগুলিতে ইংরেজ-শাসনকে স্বাগত জানালেন, 'ভার্ণাকুলার প্রেস্ অ্যাক্ট্' সমর্থন করে দেশীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মন্তব্য করলেন—

'............much of the general feeling of dis-trust towards the Government which has often been the comment, is due to the action of the native press.'৪৬ এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য পাওয়া যায় নীচে উদ্ধৃত সমকালের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র মন্তব্যের একাংশে—'certainly in a free country such remarks from a person of Bankim Babu's position would have brought down upon him universal condem-nation, but under the pressure of a foreign Govern-ment even the truest patriot turns a traitor to his

country.'৪৭ (16th. Oct. 1873)

এখন বিচার্য—সত্যই কি বঙ্কিম সরকারী চাকরির নিরাপত্তার জন্য ইংরেজ শাসকের চাপের কাছে নতি স্বীকার করেই তা করেছিলেন ? আমাদের মনে হয় বঙ্কিমের স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-প্রীতিতে এতখানি সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নেই। তিনি ছিলেন মূলতঃ সমন্বয়বাদী, সমাজ-বিধানের ক্ষেত্রে যেমন সনাতন ধারার সঙ্গে নবযুগের চিন্তার সাযুজ্যের সন্ধানী ছিলেন, ঠিক তেমনি স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও তাঁর অনুরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায়, হয়ত পুরোপুরি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতালাভের আশা সেদিনের অনেকের মত তিনিও করেন নি, ইংরেজ শাসিত ভারতের মধ্যেই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার যাতে রক্ষিত হয়, সেই চিন্তাই তাঁর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে স্বস্বার্থ ত্যাগ করে দেশীয়দের স্বার্থরক্ষা করা ছিল অসম্ভব, বাস্তবিক তা কখনই সম্ভব নয়—এই সত্য হয়ত বঙ্কিম ও তাঁর সম মনোভাবাপন্ন দেশহিতৈষীগণ উপলব্ধি করতে তখনও সক্ষম হন নি। ১৯০৫ সালের পর থেকে প্রকৃতপক্ষে স্ব-শাসিত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রচিন্তা এদেশের রাজনৈতিক ভাবনায় আভাসিত হল, তখন বঙ্কিমযুগ অতিক্রান্ত। তাই প্রাথমিক পর্বে তাঁদের স্বদেশচিন্তা ও স্বাজাত্য-বোধ ছিল কিছুটা আদর্শায়িত, আবেগপ্রসূত ও আধ্যাত্মিক চিন্তনের দ্বারা মণ্ডিত। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম—উপন্যাস তিনটিতেই স্বদেশপ্রেমের মূলভিত্তি দুটি—এক হিন্দুধর্ম রক্ষা ও হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা, দুই, ঈশ্বরাদেশে নিষ্কাম কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে জনসেবা। শিল্পমূল্যে 'আনন্দমঠ' শ্রেষ্ঠ রচনা না হলেও 'আনন্দমঠ'ই ভারতের অধিকাংশ ভাষায় সর্বাগ্রে অনূদিত হয়েছে। হিন্দুর সনাতন ধর্ম ও সমাজ মুসলমান শাসনে বিপর্যস্ত, ইংরেজ সমাগত—বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে—উভয়েই শোষক, এই দুই শাসকের মধ্যে কে সহনীয় এটাই মূল প্রশ্ন ; প্রাচীন অত্যাচারীকে পরিত্যাগ করে নবাগত ইংরেজকে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ- এই সিদ্ধান্তের মূলে সেদিনের ইংরেজ সরকারের অধীনে কর্মরত বাঙালী বিত্তবান শ্রেণীর প্রগতির

পরিপন্থী মনোভাবই হয়ত প্রকাশ পেয়েছে। প্রচলিত সমাজের সুষ্ঠ সংরক্ষণ-প্রয়াস তাঁদের মধ্যে প্রবল ছিল, সমাজবিপ্লবের তাঁরা ছিলেন বিরোধী, সমাজবিপ্লবকে রাজ-বিরোধী কার্যকলাপ হিসেবে তাঁরা গণ্য করতেন। এর দ্বারা পরোপকার বা দেশসেবা হয় না বলেই তাঁদের ধারণা। 'দেবীচৌধুরাণী'র তৃতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে প্রফুল্ল রঙ্গরাজকে বলেছেন—'তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ণ। ঠেঙ্গা লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর করিবেন—তুমি আমি কে? শিষ্টের পালনের ভার লইও— কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও।' 'আনন্দমঠে'ও শেষ পরিচ্ছেদে জনৈক চিকিৎসক সত্যানন্দকে বলেছেন যে, ডাকাতি, প্রাণিহত্যা ইত্যাদি পাপ, এর দ্বারা দেশের কোন উপকার হয় না—'তুমি বুদ্ধির ভ্রম-ক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্রফল হয় না, অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না।' (৪র্থ খণ্ড ৮ম পরিঃ) তবে লক্ষণীয় যে, এই নেতি-বাচক মনোভাবের অন্তরালেও স্বদেশপ্রেমের প্রশ্নই প্রচ্ছন্ন রয়েছে, কারণ দেশোদ্ধারের প্রশ্নটি সেখানে জড়িত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এদেশীয়দের প্রতি ইংরেজদের মনোভাবের ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ স্পষ্টতর হতে থাকে। কিন্তু এই বোধ সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকায়, বৃহত্তর জনসমাজ এতে উদ্দীপ্ত হওয়ার সুযোগ পায় নি। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে জীবানন্দ, ভবানন্দ, সত্যানন্দ প্রমুখ সন্তান-সম্প্রদায় নিষ্কাম কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশোদ্ধার ব্রতে নিজেদের নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসাধারণ এতে অংশ গ্রহণ করেনি, কাজেই 'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে', সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনও যখন মুষ্টিমেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ব্যাপক জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়, তখনই তা অসমাপ্ত অবস্থায় প্রত্যাহৃত হতে বাধ্য। এইখানেই যেমন সন্তান-সম্প্রদায়ের আন্দোলনের দুর্বলতা, আবার ঠিক তেমনি

ভবিষ্যত আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষেও চরম শিক্ষা। এদিক-দিয়ে বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্রকে যথার্থই স্বাধীনতাকামী এক জাতির যুগচেতনার রূপকার বলা চলে। যে সমাজে স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঠিক আদর্শ ও রূপরেখা অপরিজ্ঞাত সেখানে তার যথার্থ রূপায়ণের ইঙ্গিত দেওয়া তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাছাড়া, গণআন্দোলন সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন—সেই নেতৃত্বলাভের যোগ্যতাও যে অনুশীলনসাপেক্ষ তারই প্রথম পরিচয় রয়েছে 'দেবীচৌধুরাণী'তে। প্রফুল্ল দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কঠোর সংযম ও অনুশীলনের মধ্যদিয়ে সুশিক্ষিতা হয়ে 'দেবী' তে রূপান্তরিত হলেন এবং তখনই তিনি ভবানী পাঠকের দলের নেত্রীপদে স্থাপিতা হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাস দুটিতে দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা যেমন ঘোষিত হয়েছে, তেমনি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন ও উপযুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথাও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। অপরদিকে 'সীতারাম' উপন্যাসে রয়েছে নেতৃত্বের অহংবোধ ও চারিত্রিক দুর্বলতার ভয়াবহ পরিণামের দিকেই অঙ্গুলিসংকেত। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যিনি কর্ণধার তাঁর ব্যক্তিগত সুখান্বেষণ-প্রবৃত্তি যদি প্রবল হয়, তবে আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য—এই শিক্ষাই বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন সীতারাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে। কাজেই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' উপন্যাস-ত্রয় দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছে তা অত্যন্ত বাস্তব। এখানেই রয়েছে বঙ্কিম-চন্দ্রের সামাজিক অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা। কোথায় কতটুকু ইংরেজকে সমর্থন করলেন বা করলেন না তা এখানে গৌণ, মুখ্য বিচার্য হল—এই উপন্যাসত্রয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজকে তিনি কতখানি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ' উপ-ন্যাসের সাংগঠনিক কৌশল ত্রুটিপূর্ণ হলেও পরবর্তীকালে এরই প্রেরণায় যে দেশের যুবসম্প্রদায় গুপ্ত-সমিতি গঠন করে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয় সেকথা অনেকে স্বীকার করেছেন, আবার কেউ মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র সত্য সত্যই রাজনৈতিক কর্ম-

নীতি নির্দেশ করে যান নি।' ৪৮ 'আনন্দমঠের' অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের প্রভাব সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।—'The Mantra had been given, and in a single day a whole people had been converted to the religion of patriotism. The Mother had revealed herself...... ...A great nation which has had that vision can never again be placed under the feet of the conquerer.' ৪৯ অবশ্য 'আনন্দমঠ' রচনার বহু পূর্ব্বেই 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনকালে ১৮৭৫ খ্রীঃ বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্গীতটি স্বতন্ত্র রচনা করেন, পরে 'আনন্দমঠে' সংযোজিত হয়। ৫০ একথা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন এই যে, 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার কাল থেকেই বঙ্কিম-মানস প্রত্যক্ষভাবে স্বাদেশিকাতাবোধে উদ্দীপ্ত হয় এবং পরে তাঁর 'আনন্দমঠ' সমগ্র জাতির মধ্যে ঐ বোধের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। সমালোচক ও সাহিত্যিক রমেশ-চন্দ্র দত্ত 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে (১১শ সংস্করণ, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৯১০) আনন্দমঠ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার একাংশ উদ্ধৃত হ'ল—'But though the Ananda Matha is in form an apology for the loyal acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu Kingdom in India. This is especially evident in the occasional verses in the book of which the Bande Mataram is the most famous.'......ঐ 'apology for the loyal acceptance ot British rule' অর্থাৎ 'আনন্দমঠে'র ইংরেজ শাসন মেনে চলার মনোভাবের কি কারণ ছিল তারও অনুসন্ধান মেলে 'বঙ্গদর্শনে'র পত্রসূচনায়—(বৈশাখ ১২৭৯) '......আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। ......ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগ না

হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এই এক পরামর্শিত্ব, একোত্তম কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়, ·········যতদুর ইংরাজী চলা আবশ্যক, ততদুর চলুক।' ৫১ বস্তুতঃ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিক্ষার আলোকে সমগ্র জাতির আত্মোপলব্ধির ও ঐক্য-বদ্ধতার প্রয়োজনেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই সমর্থনের মধ্যেও সুগভীর দেশপ্রেমই সুপ্ত রয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই দেশপ্রেম যে আধ্যাত্মিকতার রসে সঞ্জীবিত এ-কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। দেশপ্রেম তাঁর কাছে ঈশ্বর-প্রেমের স্তরভেদ মাত্র। তাই 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় বৈষ্ণববেশধারী শক্তির সাধক, দেশমাতৃকার সেবক। 'দেবী-চৌধুরাণী'র মধ্যেও দেখি গীতোক্ত নিষ্কাম-কর্মের মাধ্যমে দেশসেবার নির্দেশ, 'সীতারামে'ও হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পই ছিল প্রধান। 'আনন্দমঠে'র উপক্রমণিকায় জানা যায় যে, দেশসেবকের সেবার মাধ্যম হল 'ভক্তি', 'দেবীচৌধুরাণী'তে ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে নিরাসক্ত ও নিরহংকার মনে 'সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ' করে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মাধ্যমে দেশসেবার উপদেশ দিয়েছেন তাঁর শিক্ষার প্রাক্-মুহূর্তে। আর 'সীতারাম' উপন্যাসেও 'শ্রী' ঈশ্বরে প্রীতি অর্পণ করেই সর্বকর্ম, এমন কি স্বামীসেবা পর্যন্ত ত্যাগ করেছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে ঈশ্বরগত মন নিয়ে কর্ম-সম্পাদনই প্রকৃত ধর্ম, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ গীতায়' আর সেই ধর্মই বঙ্কিমের স্বাদেশিকতাবোধের সারবস্তু। 'আনন্দমঠে'র স্বদেশপ্রীতি প্রসঙ্গে মনস্বী বিপিন চন্দ্র পালের একটি মন্তব্য এখানে স্মরণীয় — 'আনন্দমঠে তিনি (বঙ্কিম) দেশমাতৃকাকে মহাবিষ্ণুর বা নারায়ণের অঙ্কে স্থাপন করিয়া আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বদেশ সেবাব্রতকে সাধারণ মানবপ্রীতি এবং বিশ্বমানবের সেবার সঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছেন। মহাবিষ্ণুকে বা নারায়ণকে বা বিশ্ব-মানবকে ছাড়িয়া দেশমাতৃকার পূজা হয় না। এ কথাটা আনন্দ-মঠের একটি প্রধান কথা।' ৫২ বঙ্কিম ধর্মতত্ত্বে (২৪ অধ্যায় স্বদেশপ্রীতি) বলেছেন—আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায়

স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম,······জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। বস্তুতঃ বঙ্কিমের দেশপ্রীতি ও ঈশ্বরে ভক্তি অবিচ্ছেদ্য। আধুনিককালের দৃষ্টিতে হয়ত এই দেশপ্রেম সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক বলে মনে হবে, কিন্তু সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন সমাজ-প্রেক্ষাপটে ঐ ধর্মভিত্তিক দেশপ্রেমের উৎস ও তাৎপর্য গভীরভাবে বিচার করলে তার গুরুত্ব ও প্রভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

প্রাক্-বঙ্কিমযুগের বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয়ের মধ্যে হয়ত স্বাজাত্যবোধ ও আত্মসচেতনতার উন্মেষ ঘটেছিল কিন্তু তাদের উপলব্ধ চেতনার আলোকে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার অবকাশ পায়নি। তাছাড়া সেকালের সমস্ত কিছু সামাজিক আন্দোলনের মূলে ধর্ম যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করেছে তার কারণ এই যে, প্রাচীন-কাল থেকেই ভারতের সমাজ-কাঠামোর তলদেশে আধ্যাত্মিকরস-ধারা অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবহমানা রয়েছে। এই জাতীয় সমাজের ব্যাপক মানুষের মধ্যে যদি দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্বোধন ঘটাতে হয় তবে আধ্যাত্মিক আয়োজনের মাধ্যমেই তা সম্ভব—বঙ্কিমের এই উপলব্ধি সেদিনের সমাজে অত্যন্ত বাস্তব বলেই মনে হয়। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্যে তিনিই প্রথম যে দেশপ্রেম ও সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তারই প্রভাবে অরবিন্দ, বারীণ ঘোষ প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টায় যে সশস্ত্র আন্দোলনের পরি-কল্পনা তৈরী হয়, তার অঙ্গাবরণও ছিল ধর্ম— একথা সর্বজনবিদিত। একহাতে গীতা ও অন্যহাতে অস্ত্র নিয়েই বিপ্লবীরা সেদিন শপথ নিয়ে নিজেদের উৎসর্গ করতেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। অত্যাধুনিক কালেও ভারতবর্ষে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও আন্দোলনের অস্তিত্ব সীমিতপভাববিশিষ্ট হলেও বিদ্যমান। বর্তমানে এর মূল্য আছে কি নেই, আদৌ এজাতীয় আন্দোলন মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা-অর্জনের সহায়ক কীনা ইত্যাদি স্বতন্ত্র-ভাবে বিচার্য। বঙ্কিম-উপন্যাসে প্রতিফলিত স্বদেশপ্রেম যে ধর্ম-

ভিত্তিক ও সমকালীন সমাজপরিবেশে তার উপস্থাপনা যে অত্যন্ত বাস্তব—এটাই আমাদের বক্তব্য। তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, বঙ্কিমের এই স্বদেশচিন্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তা আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তার সমধর্মী নয়, সম্ভবতঃ সেই কারণেই তিনি সমকালের কোন রাজনৈতিক সংগঠন বা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন নি। প্রাথমিক পর্য্যায়ে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য থাকলেও স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের সময়ে শিক্ষাসংক্রান্ত সরকারী প্রস্তাব (উচ্চশিক্ষার পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থব্যয়) সমর্থন করায় তাঁর সঙ্গে অন্যান্য সদস্যদের মতবিরোধ ঘটে বলে তিনি সভ্যপদ ছেড়ে দেন। এমন কি তিনি হিন্দুমেলায় বা ন্যাশনাল কংগ্রেসেও কোনদিন যোগ দেন নি। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তিনি কংগ্রেস-বিরোধী ছিলেন না, তবে এর কার্যকলাপের পদ্ধতিও তাঁর মনঃপূত হয় নি, এর প্রমাণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যের একাংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—'কংগ্রেসের প্রতি আমার সহানুভূতি নাই, একথা আমি কখনই বলিতে পারিনা—উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, আজপর্যন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।' ৫৪

ছয়

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে সামাজিক সমস্যাভিত্তিক উপন্যাস মাত্র দুটি—'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। ঐ উপন্যাস দুটির কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু বাংলার দুই বিত্তবান পরিবার,—প্রথমটি নগেন্দ্রদত্তের, পরেরটি গোবিন্দলাল রায়ের। নগেন্দ্র সামন্ত-পরিবারের হয়েও নবোদিত বৈশ্য-পুঁজিতন্ত্রের (Mercantile Capitalism) সঙ্গে যুক্ত কিন্তু গোবিন্দলাল সামন্তমূল্যবোধেই তৃপ্ত। এখানে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি মূলতঃ যে সমস্যায় নিবদ্ধ তা হচ্ছে বিধবা-বিবাহ—প্রচলন ও নারীর স্বাধীন-প্রেমে অধিকারের

সমস্যা। ঔপন্যাসিক যেহেতু সামাজিক, তাই তাঁর উপন্যাস রচনার সময় পরিকল্পিত বিষয় ছাড়াও প্রাসঙ্গিকভাবে সমাজের অন্যান্য-দিকগুলিও প্রতিফলিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে বিক্ষিপ্তভাবে সমকালীন সমাজের নানা সমস্যার যে প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বহু-বিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিবর্তন, সহমরণ-প্রথা, পণপ্রথা, ও কৌলীন্য-প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, নতুন সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে প্রাচীন-পন্থীদের বিরোধ ও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি গোঁড়া হিন্দু-প্রধানদের দৃষ্টিভঙ্গী, নারীর স্বাধীনসত্তার স্বীকৃতি প্রসঙ্গ, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি ইত্যাদি। দু'একটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র একান্নবর্তী বিত্তবান পরিবারের জটিলতার এবং সেক্ষেত্রে বাড়ীর দাসী ও গ্রাম্য মহিলাদের ভূমিকার বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন। ঐ সব সমস্যার উপস্থাপনা ও সমস্যার সমাধান প্রশ্নে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ করার আগে কোন্ কোন্ উপন্যাসে কি কি সমস্যা উপস্থাপিত হয়েছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গ ধরা যাক। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ছাড়াও 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। মৃণালিনী'র ৪র্থ খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে (বিনা সুতার হার) মনোরমার সঙ্গে নিজের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সম্বন্ধে অজ্ঞ পশুপতি মনোরমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে গিয়ে বলেছেন— '.. তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তুমি বিধবা বলিয়া যে বিঘ্ন; শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারিব।' 'বিষবৃক্ষে'র কেন্দ্রীয় বিষয়ও এই প্রসঙ্গ, তাই উপন্যাসের নানা স্থানে প্রসঙ্গটি বহুবার আলোচিত হয়েছে – তবু 'ষোড়শ পরিচ্ছেদে' নগেন্দ্রনাথের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করলাম – 'শুন, কুন্দ! এখন বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব।' পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদেও দেখি সূর্যমুখী কমলমনিকে পত্রে লিখছেন—'কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে। এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে দোষ কি?' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর ১ম খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদে হরলাল

পিতৃগৃহ ত্যাগ করার পর কলকাতা থেকে পিতাকে যে পত্র দেন তাতে লিখেছেন—'কলিকাতায় পণ্ডিতেরা মত করিয়াছেন যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি মানস করিয়াছি যে, একটি বিধবা-বিবাহ করিব।' আবার প্রথম খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে রোহিণী হরলালকে যখন জিজ্ঞাসা করে—'আপনি না কি বিধবা বিবাহ করিবেন?' হরলাল উত্তরে বলেছেন—'ইচ্ছা তো আছে—কিন্তু মনের মত বিধবা পাই কই?' হরলাল রোহিণীকেও পুনরায় বিবাহের পরামর্শ দিয়েছেন—'দেখ রোহিণী, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত।··· ···তুমিও একটা বিবাহ করিতে পার—কেন করিবে না?'

বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ এবং প্রাসঙ্গিকভাবে 'মৃণালিনী'তে উত্থাপিত হয়েছে, এমন কি 'বিষবৃক্ষে' বিধবা কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিবাহ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলাল অবশ্য বিধবা রোহিণীর প্রণয়াসক্ত হলেও তাদের প্রণয় পরিণয়ে পরিণতি লাভ করেনি, গোবিন্দলাল ও রোহিণীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাকে আদৌ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বলা যায় না, বরং রক্ষিতার মর্যাদাই রোহিণীর ভাগ্যে জুটেছিল। 'বিষবৃক্ষে' অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে নগেন্দ্র-কুন্দের বিবাহ যখন বঙ্কিমচন্দ্র দেখালেন তখন তাঁর আপাতঃ প্রগতিশীলতাই পাঠককে মুগ্ধ করে। সে-যুগের সমাজ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে কথা-সাহিত্যে বিধবা-বিবাহের চিত্রের উপস্থাপনা বলিষ্ঠ ও বাস্তববাদী মনোভাবের পরিচায়ক। কিন্তু ঐ উপন্যাসেই আমরা লক্ষ্য করি যে, কুন্দের বিবাহের ঠিক পরেই যে ভাবে সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, কুন্দের চিন্তা—'কি করিলে আবার যেমন ছিল তেমনি হয়,' নগেন্দ্রের উপলব্ধি কুন্দের প্রতি তার ভালবাসা 'সে কেবল চোখের ভালবাসা' ইত্যাদি দ্রুত ঘটে চলেছে, তাতে মনে হয় শিল্পী-মনের অস্থিরতা ঐ সময় চরমে উঠেছিল এবং তিনি নিজেও ঐ বিবাহ আর আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হননি। এরপর 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বিধবা রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের বিবাহ যে প্রদর্শিত হ'ল না—

তার কারণও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের শিল্পীমনের ঐ পরাভব। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলোচ্য উপন্যাস দুটি পরিকল্পনার মূলে যে-সমস্যা শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল —তা আদৌ বিধবা বিবাহের সমস্যা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে (যদিও আমরা পূর্বে এই সমস্যাকেই কেন্দ্রীয় সমস্যা বলে উল্লেখ করেছি); মনে হয় উদীয়মান ধনতান্ত্রিক বা সামন্তশাসিত সমাজে মধ্যবিত্ত পরিবারে সুখী দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যদি তৃতীয় কোন নারীর আবির্ভাব ঘটে তবে কিভাবে পরিবারের স্বাভাবিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিপর্যস্ত হয়ে পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হয়—এই চিত্র তুলে ধরাই ছিল ঔপন্যাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যাহোক-না-কেন, কাহিনীর দ্রুতপরিণতির বিশ্লেষণে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী আর অস্পষ্ট থাকে না। এখন বিধবা-বিবাহ-প্রচলন সম্পর্কে বঙ্কিমের মনোভাবের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

উপরে উল্লিখিত উপন্যাস দুটির বেদনাদায়ক পরিসমাপ্তিও শেষের দিকে ঔপন্যাসিকের আদর্শবাদ এবং নৈতিকতার প্রশ্নের বারংবার উত্থাপন বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতিবাচক মনোভাবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত তা বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী'র পশুপতি, 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্র ও সূর্যমুখী, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ হরলাল, গোবিন্দলাল, দেবেন্দ্র ইত্যাদি চরিত্রের সংলাপে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তা লোকাচার-বিরুদ্ধ বলে সমাজে ব্যাপকভাবে গৃহীত হতে পারে না – বঙ্কিমের এই মতবাদও স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন সূর্যমুখীর মুখে শোনা যায়—'আর কেহ বড় বিধবা বিবাহের পক্ষে নয়।' এই প্রসঙ্গে 'সাম্যে'র পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য স্মরণীয়— 'বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব বিধবা-বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।··· ··কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এদেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই।······যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ

ব্যাকুলা হইলেও তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ সমাজের ভয়।·········সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তা বোধ হয়।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নৈতিকতার বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বিধবা-বিবাহ সমর্থন করে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সে-চিত্র উপস্থাপিত করেছেন, আবার তেমনি লোকাচার বিরুদ্ধ বলেই সূর্যমুখীর সংলাপের মাধ্যমে পরোক্ষে তার বিরোধিতা করেছেন এবং সেই সঙ্গে কুন্দ ও রোহিণীর প্রেমকে অতৃপ্ত কামনার অকল্যাণকর প্রকাশ বলেই চিহ্নিত করেছেন। বঙ্কিম-দৃষ্টিতে রিপুর প্রাবল্যই এর মূল—তাই পরিণামে তাদের জুটেছে অপঘাত মৃত্যু। ঔপন্যাসিকের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরিখে বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যতটা বাস্তববাদী, তার চেয়ে অনেক বেশী রক্ষণশীল। 'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখী যে স্বয়ং কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ করেছে সেখানে কোন উদার মানবিক আদর্শবাদ বা বিধবা-বিবাহের দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য করেছে তা নয়, বরং চিরন্তন স্বামী-সংস্কারবশেই তা করতে বাধ্য হয়েছে, 'স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ' মধ্যযুগীয় এই সংস্কারই সেখানে প্রবল। তাই সূর্যমুখীর মুখে শুনি—'প্রভু! তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব,·········' (২৬ পরিঃ) 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ ভ্রমর সে কথাও বলেনি, বরং নারীর স্বাভাবিক ঈর্ষা ও সপত্নীত্বের সম্ভাবনায় সন্দিগ্ধা হয়েই সে গোবিন্দলালকে প্রশ্ন করেছে—'তুমি আমাকে ভালবাস—আর কাহাকেও তোমার ভালবাসতে নাই—কেন রোহিণীকে ভাবছিলে বল না?' (১ম খণ্ডঃ ১৪ পরিঃ)। তাহলে বলতে হয়—কুন্দের বিবাহ বা রোহিণীর স্ত্রীর মর্যাদা লাভ না করা মূলতঃ, মধ্যযুগের পুরুষপ্রধান সামন্ত পরিবারের বহুবল্লভদের অতৃপ্ত কামনার পরিতৃপ্তি-সাধনেরই পরিণতি। সমকালীন সমাজের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বাস্তবতাকে স্বীকার করেই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীকে বিধবা হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিধবা-বিবাহ সমাজ-গ্রাহ্য হতে পারে না, বা কোথাও গ্রাহ্য

হলেও তা যে সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, তার পরিণামে 'সংসার বিষময়' হয়ে ওঠে—এই সব সতর্কবাণীও একাধিকবার শুনিয়েছেন। সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বের প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার না করে সমষ্টিগতভাবে সমাজের পক্ষই নিয়েছেন, এও তাঁর মনের পশ্চাদ্‌গামিতারই প্রকাশ। মধ্যযুগীয় সামন্ত-সংস্কার ও মূল্যবোধের আবেশে আবিষ্ট তাঁর শিল্পদৃষ্টি। 'বিধবা-বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে'—এই অস্পষ্ট মতবাদ দ্বন্দ্ব-দীর্ণ-বঙ্কিম-মানসেরই বহিঃপ্রকাশ, আর তাঁর আলোচিত সংশ্লিষ্ট উপন্যাস সমূহের কাহিনীর সূচনা, বিস্তার ও পরিণতি বিশ্লেষণে শিল্পীর মানস-সংকট সহজেই ধরা পড়ে। (বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব বা সংকট কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিক-প্রবণতা নয়, এ হচ্ছে উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানস-সংকট। শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য অনুসারে গঠিত ব্যক্তি-চেতনা ও যুগচেতনার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের ব্যর্থতাই মূলতঃ এই দ্বন্দ্বের কারণ। প্রাচীন সমাজ থেকে প্রাপ্ত সংস্কারের বশে যখন ঐ দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব হয় না, তখনই ধর্ম ও নীতিজ্ঞানকে অবলম্বন করতে হয়।) জনৈক সমালোচক যথার্থই বলেছেন—'পূর্বতন সমাজের বহুযুগস্থায়ী নীতিগুলি হইতে ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার সময় সাহিত্যিক ও শিল্পীরা তাঁহাদের সমকালীন সমাজে ইতিহাসের জটিল স্বতোবিরোধগুলির কোন সমাধান খুঁজিয়া পান না। সেই জন্যই তাঁহারা নতিস্বীকার করেন ধর্মজ্ঞান অথবা সনাতনের নীতিজ্ঞানের নিকট।' ৫৫ উক্ত (মানস-সংকট থেকে মুক্তিপ্রয়াসী বঙ্কিমের শিল্পী-মন যথার্থই নীতিজ্ঞানের কাছে নতিস্বীকার করেছে। তাছাড়া, আরও একদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে তিনি আদৌ বিধবা-বিবাহকে নারীর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হিসেবে সমর্থন করে তাঁর উপন্যাসে উত্থাপন করেননি। যদি বিধবা-বিবাহের সমস্যা-কেই তিনি মুখ্য হিসেবে গ্রহণ করে তার ইতিবাচক সমাধান চাইতেন, তবে নগেন্দ্র ও গোবিন্দলাল দু'জনেই বিবাহিত পুরুষ না হয়ে অবিবাহিত যুবক হিসেবে চিত্রিত হতে পারতো। কোন সমস্যার ইতিবাচক সমাধান নেতিবাচক পরিকল্পনায় সম্ভব নয়। বিবাহিত

পুরুষের পক্ষে পুনরায় বিধবা-বিবাহ যে জটিলতার সৃষ্টি করবে সে তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাই মনে হয় এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাতী মনোভাবের জন্যই সমাজের 'একক' (unit) পরিবারের মধ্যে বিধবা-বিবাহের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নায়ক-দ্বয়ের অনুরূপ চরিত্র পরিকল্পনা করা হয়েছে। এদিক থেকেও বিধবা-বিবাহ যে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করতেন না তা প্রমাণিত হয়।

সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলন যে বঙ্কিমের অভিপ্রেত ছিল না তা যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর সংশ্লিষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্যে, তেমনি তিনি যে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরোধী নন তাও ধরা পড়ে তাঁর উপন্যাসে। বহুবিবাহের প্রতি বঙ্কিমের বিরূপ মনোভাব তাঁর কোন উপন্যাসে দেখা যায় না, বরং সমর্থনসূচক মনোভাবই পরোক্ষে প্রকাশিত।

প্রত্যক্ষভাবে বহু-বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে তিনটি উপন্যাসে—'রজনী', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'-এ। 'রজনী' উপন্যাসের ১ম খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে দেখি রামসদয় মিত্রের দুই পত্নী—ভুবনেশ্বরী ও লবঙ্গলতা। আবার ঐ উপন্যাসের ১ম খণ্ডের ৪র্থ পরিচ্ছেদে রামসদয়বাবুর বাড়ীর সরকার হরনাথ বসুর পুত্র গোপালের এক পত্নী থাকা সত্ত্বেও সন্তানার্থে ও অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় পুনরায় তার বিবাহের প্রস্তাব করা হয়েছে—'গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর—একটি বিবাহ আছে, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্ম্মার্থে তাহার গৃহিণী আছে- সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে তাহার আপত্তি নাই। বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাকা দিবে।' 'দেবী-চৌধুরাণী' উপন্যাসের হরলালবাবুর পুত্র ব্রজেশ্বরের তিন স্ত্রী—সাগরবৌ, নয়ানবৌ আর প্রফুল্ল। লবঙ্গলতার গহনা, অর্থ, প্রতিপত্তি এবং স্বামী গৌরব নিয়ে পরমাতৃপ্তি। বৃদ্ধ রামসদয়ের সঙ্গে তার অসম বিবাহ, পূর্ব-প্রণয়ীর প্রতি সহজ অকর্ষণ শৈবলিনী-সুলভ তীব্র মনোযন্ত্রণা বা অনুরূপ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারত। অসম এবং বহুবিবাহের পক্ষে একে শিল্পসম্মত ওকালতি বলা যায়। সাগর ও নয়ানের সঙ্গে প্রফুল্লের সব বিরোধের অবসান বাসন-মাজার ঘাটে। এখানেও শিল্পীর সমর্থন। 'দেবীচৌধুরাণী উপ-

ন্যাসের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ব্রহ্মঠাকুরাণী ব্রজেশ্বরকে জানিয়েছেন—'তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক—আর চুয়াত্তর বছরই হোক—কই কেউ ডাকলে ত কখন 'না' বলিত না।' আবার 'সীতারাম' উপন্যাসের সীতারামেরও তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা ও রমা—'..... শ্রী তখন বড় বালিকা, তারপর সীতারাম ক্রমশঃ দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চনশ্যামাঙ্গী নন্দাকে বিবাহ করিয়াও বুঝি শ্রী'র খেদ মিটে নাই তাই তাঁর পিতা আবার হিমরাশি প্রতিফলিত কৌমুদী-রূপিণী রমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন' (১ম খণ্ড ৮ম পরিঃ)। 'রজনী' 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' উপন্যাসে যে সব বহুপত্নীক চরিত্র রয়েছে, সেখানে দেখা যায়—কোথাও এক স্ত্রীর সন্তান না হওয়ায় স্বামীর দার পরিগ্রহের প্রস্তাব (রজনী ১ম খণ্ড ৪র্থ পরিঃ, বিষবৃক্ষ ২৫ পরিঃ), আবার কোথাও জ্যোতিষী গণনায় স্ত্রী স্বামীহন্ত্রী বলে তাকে ত্যাগ করে স্বামীর পুনরায় বিবাহ হয়েছে (সীতারাম), আবার কোথাও কৌলীণ্যের মর্যাদা রক্ষার জন্যই বহুবিবাহ যে কুলীন পুরুষের ধর্ম- তাও বলা হয়েছে (দেবীচৌধুরাণী ৩য় খণ্ড; ৮ম পরিঃ)। উল্লিখিত সব কিছুর মধ্যেই শিল্পীর মধ্যযুগীয় সামন্তইমনোভঙ্গী-স্পষ্ট। বহুবিবাহের প্রতিক্রিয়ায় সমাজে যে বাস্তব-সমস্যা দেখা গিয়েছিল তার বিরুদ্ধে যখন বিদ্যাসাগর এবং অন্য সব প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারক সোচ্চার হয়ে উঠেছেন—তখন সনাতনপন্থীরা যেমন প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তেমনি রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন অথচ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ব্যক্তি মনে করতেন যে, বহুবিবাহ নিবারণের জন্য দুর্বার সমাজ-আন্দোলন বা রাজকীয় আইনের কোন প্রয়োজন নেই, সামাজিক মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে সচেতন হলেই ক্রমে বহুবিবাহ সমাজ থেকে স্বতঃই বিলুপ্ত হবে, সমকালীন বাংলার সাময়িক পত্রিকাগুলিতে (বিদ্যাদর্শন, ভরতসংস্কারক, সোমপ্রকাশ ইত্যাদি) দৃষ্টি দিলেই এ বিষয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। এই ক্রমবিলোপ-পন্থীদের মতের নিদর্শন স্বরূপ 'সোমপ্রকাশ' (৩০শে শ্রাবন, ১২৭৮) ৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বহু-বিবাহ হওয়া উচিত

কিনা ?' —শীর্ষক সংবাদের একাংশের উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল।

'বহুবিবাহের বিধি যখন নিত্যবিধি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ বিধেয় কিনা, ইহার বিবেচনা করা আবশ্যক। যদি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া আমাদিগের সমাজ-সংস্কার আবশ্যক হয়, অসংখ্যবার তাঁহাদিগের শরণ লইতে হইবে। প্রতিপদক্ষেপে দাদাকে ডাকা সুখের নয়। ....অত উতলা হলে চলে না।.........ইংরাজী শিক্ষাবলে আমাদিগের দেশের লোকেরা অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং সমাজ- সংস্কারে সমর্থ হইবেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসেই বহুবিবাহ-বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর না হলেও সমকালীন সমাজের এই বাস্তব-সমস্যাজাত আন্দোলনের অভিঘাত থেকে তিনি যে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেননি— তার পরিচয় পাই 'বঙ্গদর্শন' (আষাঢ়, ১২৮০) পত্রিকায় প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' শীর্ষক রচনাটিতে; এবিষয়ে বঙ্কিম-মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় নেওয়ার জন্য রচনাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত হ'ল ৫৬- 'বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এদেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এদেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে 'বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।'

'তবে বহুবিবাহ এদেশে যতদূর প্রবল বলিয়া, বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে।'

'এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায়, বহুবিবাহরূপ রাক্ষস বধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া, অনেকেই ডনকুইক্সোটকে মনে পড়িবে।'

'বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা এক মতাবলম্বী, তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রাজব্যবস্থা প্রচার হউক।......

'আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই।......

'বহুবিবাহ এদেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।...' এছাড়া 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ৩য় খণ্ডের ৭ম পরিচ্ছেদের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন—'আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম্ম। ইহা নিশ্চিত বটে যে সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে।' এখানে লক্ষণীয় যে, রক্ষণশীল বলে খ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধে' কোন অবস্থাতেই বহু-বিবাহ সমর্থিত হয়নি।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদের শেষাংশে শ্রীশচন্দ্রের পত্রের উত্তরে নগেন্দ্রনাথ পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহের পক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃনিরূপণ হয় না—পিতাই সন্তানের পালনকর্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না।......... আমি নিঃসন্তান, আমি মরিয়া গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি?' নগেন্দ্রের যুক্তির মধ্যে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র আলোচনায় বঙ্কিমের উল্লিখিত মন্তব্যের প্রতিধ্বনিই শোনা যায় অর্থাৎ বহু-বিবাহ সাধারণতঃ বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু সকল অবস্থাতে বহুবিবাহ যে নিন্দনীয় ও অধর্ম্ম তাও ঠিক নয়। এক্ষেত্রেও বঙ্কিম-মানসে দোদুল্যমানতা লক্ষণীয়।

উপরের উদ্ধৃতিতে এটা স্পষ্ট যে, বহুবিবাহ-রদবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব ছিল স্বাভাবিকতায় আস্থাবান ক্রমবিলোপ-পন্থীদের অনুরূপ। বহুবিবাহের সামাজিক অনিষ্টকারিতাকে

তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন, কিন্তু তা রোধ করার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা অনুরূপ কোন প্রত্যক্ষ প্রতিষেধক প্রয়োগের তিনি ছিলেন বিরোধী, সুশিক্ষার মাধ্যমে সমাজের সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারলে ক্রমশঃ এই প্রথার বিলোপ ঘটবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। বিধবা-বিবাহের প্রচলন ব্যাপারেও যেমন তিনি বিদ্যাসাগর-বিরোধী ছিলেন, বহুবিবাহরদের বিষয়েও তিনি বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত সংস্কার-পন্থাকে মেনে নিতে পারেন নি। প্রথমটির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রথানুগত ও রক্ষণশীল, কিন্তু বহুবিবাহরদ বিষয়ে বঙ্কিম-উপন্যাসে শিল্পীর মনোভাব কোথাও স্পষ্টভাবে ধরা না পড়লেও বা 'বঙ্গদর্শনে'র উল্লিখিত রচনায় তাঁকে আপাততঃ রক্ষণশীল ও প্রগতিবিরোধী মনে হলেও, সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে এ ব্যাপারে তাঁকে প্রকৃতই বাস্তববাদী বলতে হয়। কারণ তিনি বুঝেছিলেন সংস্কার-প্রচেষ্টা যতই মহতী ও বেগবতী হোক না কেন, উপর থেকে তা আরোপিত হলে মানুষের মনে সাময়িক চাপ সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু তা স্থায়ী-ভাবে গ্রাহ্য হতে পারে না, যতক্ষণ না সমাজ-মন ও ব্যক্তিমন তাকে গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সেই সক্ষম-মনোভাব সৃষ্টি অনুকূল আধুনিক শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব। স্বয়ং বিদ্যাসাগরও পরবর্তীকালে অনেক ব্যর্থতার মধ্যদিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করে-ছিলেন, বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে এখন পর্যন্ত যদি লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যাবে বহুবিবাহ আমাদের সমাজ থেকে প্রায়ই লোপ পেয়েছে, এমনকি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই কুপ্রথা স্বতঃই পরিত্যক্ত হচ্ছে। মধ্যযুগীয় মনোভঙ্গী বঙ্কিম-মানসে প্রবল হলেও এই একটি সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে যে দূরদর্শিতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন—তাতে তাঁকে প্রকৃতই সমাজ-বাস্তববাদী বলা যায়। তাঁর উপন্যাসে হয়ত বহুবিবাহ প্রদর্শিত হয়েছে বা এবিষয়ে সেখানে শিল্পীর অসমর্থনসূচক কোন মানসিকতাও লক্ষিত হয় নি; এ তো তাঁর মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে প্রাপ্তমূল্যবোধগুলির (values) প্রকাশ—যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র ব্যর্থ হয়েছেন। প্রাচীন মূল্যবোধ, নবলব্ধ চেতনার দ্বন্দ্ব

যে বঙ্কিম-মানসে কী ধরণের সংকট সৃষ্টি করেছিল—তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর সেই দ্বন্দ্বের ফলেই একদিকে যেমন উপন্যাসে বহুবিবাহ প্রদর্শন করেছেন, অন্যদিকে 'বঙ্গদর্শন'-এ এই প্রথার সামাজিক কুফলের কথা উল্লেখ করেও তা রোধ করার প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করতে সরকারী আইনের প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন। এই দ্বন্দ্ব ছিল সে কথা ঠিক, তবু সেদিন বঙ্কিম বহুবিবাহ প্রথা উচ্ছেদের বিষয়ে সমাজে শিক্ষার প্রসারের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তাতে তাঁর যথার্থ সমাজ-সচেতনতার পরিচয়ই পাওয়া যায়। যে কোন নতুন সমাজব্যবস্থায় সংস্কার-প্রচেষ্টা সফল করার প্রধান সর্ত হল সামাজিকের মানস-সংস্কার অর্থাৎ নতুন শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা অনুকূল অধিমানস (Super Structure) সৃষ্টি করা। একাজ সময় সাপেক্ষ, অল্পকিছুদিনের মধ্যে তা সম্ভব নয়। অবশ্য একথাও মেনে নেওয়া যায় না যে, যতদিন না সমাজ শিক্ষিত ও সচেতন হয়, ততদিন কোন সংস্কার-প্রচেষ্টা চালানো উচিত নয়—সে চিন্তা হবে সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাবের সামিল।

বিধবা-বিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের যেমন পরোক্ষ অসম্মতি ছিল, বাল্যবিবাহ নিবর্তনেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। বঙ্কিম-উপন্যাসে এ বিষয়টির উল্লেখ প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না —মাত্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'রজনী' উপন্যাসে প্রাসঙ্গিকভাবে এ ব্যাপারে দু'একটি মন্তব্য আছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ১ম খণ্ডের ২৮ পরিচ্ছেদে ভ্রমরের উক্তি স্মরণীয়—'আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ হইয়াছে—আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি।' 'রজনী' উপন্যাসের ১ম খণ্ড ৫ম পরিঃ চাঁপার (গোপাল বসুর স্ত্রী) ভাই হীরালালের এই উক্তিটিতে বাল্যবিবাহ-রদের আন্দোলনের ইঙ্গিত রয়েছে – 'এখন বয়স্থা মেয়ে ত লোকে চায়।······বাল্যবিবাহ! ছি! ছি! মেয়ে তো বড় করিয়াই বিবাহ দিবে। এসো!. আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্ করিতে দাও—আমিই এ মেয়ে বিয়ে করিব।' সমাজে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন হয় পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক সহবাসসম্মতি আইন (১৮৯১) প্রবর্তন ইত্যাদি বঙ্কিমচন্দ্র

কিভাবে নিয়েছিলেন তার পরিচয় অন্যত্র পাওয়া যায়। সেগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ ব্যাপারে বঙ্কিম-মানসের স্বরূপ সন্ধান করাই যুক্তিযুক্ত। 'প্রচার' পত্রিকার লেখক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (পরে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক) সরকার প্রস্তাবিত 'সহবাস সম্মতি আইন' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত জানতে তাঁকে যে পত্র লিখেছিলেন তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র যা লেখেন তার কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ৫৭—

'.........বিবাহিতদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, আমি ইহাকে কতকটা বৃথাড়ম্বর মনে করি। আমি যতদুর জানি এদেশীয় বালিকারা দ্বাদশবৎসরের পূর্বে সচরাচর ঋতুমতী হয় না .... সুতরাং এ বিষয়ে কোন আইনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে ইহাও বক্তব্য যে, দ্বাদশবৎসর সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বালিকাদিগের স্বামী-সংস্পর্শ অবিধেয়। এবং ইহা আমাদিগের প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ। তাহার নিষেধ জন্য যদি কোন আইন হয়, তাহাতে আমি ক্ষতি দেখি না। ঈদৃশ রাজনিয়ম প্রাচীন দেশাচার বিরুদ্ধ হইবে না।......

'..... বাল্যবিবাহের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু বাল্য-বিবাহ অর্থে বাল্যকালে বয়সের অনুচিত সংসর্গ বুঝি না। তাহার পক্ষপাতী নহি।.................আমার মতে আইন হইবার কোন প্রয়োজন নাই। হইলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্র যে বাল্যবিবাহের সমর্থক ছিলেন তা এই পত্রে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছেন। এছাড়া এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যা দেশাচার বিরুদ্ধ বা সমাজগ্রাহ্য নয়, তা যতই যুক্তিপূর্ণ ও মানব-কল্যাণের সহায়ক হোক না কেন বঙ্কিমচন্দ্র তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। সমাজ-সংস্কারমূলক যে কোন চিন্তার বা কার্যের স্বীকৃতির মাপকাঠি ছিল তাঁর কাছে লোকাচার ও সমাজ-অনুসৃত প্রাচীন রীতি। এখানেই বঙ্কিমের চিন্তার সীমাবদ্ধতা। এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের এই সীমাবদ্ধ সমাজ-দর্শন মূলতঃ গড়ে ওঠে পূর্ব্বের ক্ষয়িষ্ণু সমাজ থেকে লব্ধ ধ্যান-ধারণা ও প্রাচীন মূল্যবোধগুলির প্রভাবে—যা

থেকে ঐ ব্যক্তিবিশেষের মানস-মুক্তি তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। মধ্য-যুগের বাংলার সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের রীতি-নীতি, ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদি থেকে ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। তাই তাঁদের কর্মে ও চিন্তায় দেখা গেছে অসঙ্গতি। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, মানবিক যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক মননশীলতা, অন্যদিকে মধ্যযুগীয় সংস্কারের দুরপনেয় প্রভাব—এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করাই ছিল সমস্যা, আর এই সমস্যাই সৃষ্টি করেছিল তাঁদের মানসিক দ্বন্দ্ব। বঙ্কিমচন্দ্র বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী হলেও সরকারী সহবাসসম্মতি আইনের প্রবর্তনের গোঁড়া বিরোধী নন, যদিও এর প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও তিনি মনে করেন না। আবার এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ রচনার জন্য সরকার যখন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক-প্রকাশক প্রভৃতির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা করেন, তখন সরকারের নির্দেশে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গবাসী'র উক্ত প্রবন্ধ-গুলির ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিয়েও সরকারকে সাহায্য করেন।৫৮ এখানেও বঙ্কিম-মানস দোদুল্যমান। বঙ্কিম-উপন্যাসের আলোচনায় উপন্যাসেতর তথ্যের আধিক্য নিষ্প্রয়োজন। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। বাল্য-বিবাহ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নেওয়ার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তাই সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল।

সমকালীন সমাজের সমস্তরকম সামাজিক সমস্যা ও তা থেকে উদ্ভূত সামাজিক আন্দোলনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন থাকলেও বঙ্কিম-উপন্যাসে সবকিছুই সমান গুরুত্ব পায়নি। সেদিনের সমাজের স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনের কথা বঙ্কিম-উপন্যাসে প্রায় অনুপস্থিত, তবে দু'একটি উপন্যাসে (দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, দেবীচৌধুরাণী) এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কিছু মন্তব্য চোখে পড়ে, নীচে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হল—

'তিলোত্তমা পড়িতে জানিতেন; অভিরাম স্বামীর নিকট সংস্কৃত পড়িতে শিখিয়াছিলেন' (দুর্গেশনন্দিনী, ১ম খণ্ড, ৭ম পরিঃ) 'নগেন্দ্রের পিতা মিস্ টেম্পল্ নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত

করিয়া কমলমণিকে এবং সূর্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখাপড়া শিখা-ইয়াছিলেন। (বিষবৃক্ষঃ ৫ম পরিঃ)

'প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল। নিশি-ঠাকুরাণী, রাজার ঘরে থাকিয়া, পরে ভবানীঠাকুরের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন—বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক প্রফুল্ল তাঁহার কাছে শিখিল। তারপর পাঠক ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন।' (দেবীচৌধুরাণী ১ম খণ্ড ১৫ পরিঃ) এছাড়া 'কৃষ্ণ-কান্তের উইল'-এ প্রত্যক্ষভাবে স্ত্রীশিক্ষাদানের চিত্র না থাকলেও রোহিণী ও ভ্রমর যে লেখাপড়া জানত তার পরিচয় পাই। কৃষ্ণকান্ত-বাবু যে উইল-এ দস্তখত করেছেন—তা তিনি রোহিণীকে দেখিয়ে বলেছেন—'রোহিণী, আমি কি বুড়ো হইয়া বিহ্বল হইয়াছি? এই দেখ, আমার দস্তখত' (১ম খণ্ড ৪ পরিঃ), রোহিণী যদি লেখা-পড়া না জানত তবে তার পক্ষে বার বার আসল ও নকল উইল পরিবর্তন করাও সম্ভব হত না। শুধু সাধারণ লেখাপড়াই নয়, সঙ্গীত-বিদ্যাও তার অল্প জানা ছিল, তাই প্রসাদপুরে তাকে ওস্তাদজীর সঙ্গে গান গাইতে ও তবলা বাজাতে দেখা যায়। ভ্রমর যে লেখাপড়া জানত তার প্রমাণ সে 'অন্নদামঙ্গল' পড়ে—'ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গিয়া, কোণে বসিয়া পা ছড়াইয়া অন্নদামঙ্গল পড়িতে বসিল।' (১ম খণ্ড ১৮ পরিঃ)। 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী'র পটভূমিকা যদিও বঙ্কিমের সমকালীন বাংলার সমাজ নয়, তবু শান্তি, কল্যাণী, প্রফুল্ল প্রমুখ স্ত্রীচরিত্রগুলি শিক্ষিতা ও বিদুষী ছিল। এই সমস্ত থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসের অধিকাংশ নায়িকাই সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী। এইসব চরিত্র-চিত্রণের মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সমাজ-বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানসিক অভি-প্রায়ও ব্যক্ত করেছেন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায় সাম্যের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য—'স্ত্রীগণের নীতিশিক্ষা, জ্ঞানোপার্জন ও বুদ্ধিমার্জ্জিত করিবার জন্য তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখান উচিত।' স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলন বিষয়ে সেকালের সমাজ মূলতঃ

পক্ষে-বিপক্ষে দ্বিধাবিভক্ত হলেও সমর্থকগোষ্ঠীর মধ্যেও এবিষয়ে যথেষ্ট দোদুল্যমানতা ছিল—যার ফলে স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে যত বেশী সভা-সমিতি-আলোচনা হয়েছে বাস্তবে তা ততখানি প্রসার লাভ করেনি। এসম্পর্কে বঙ্কিমের ক্ষোভ তাঁর সমর্থনসূচক মনোভাবেরই পরিচায়ক, তিনি বলেছেন—'সমাজে কোন অভাব হইলেই তাহার পূরণ হয়—সমাজ কিছু চাহিলেই তাহা জন্মে। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্থ অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাহার উপায় হইত' (সাম্য ৫ম পরিঃ)। কাজেই বলতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র পুরোপুরি হিন্দুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে না পারলেও স্ত্রীশিক্ষাপ্রচলনের বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বচ্ছ, বরং বলা চলে এক্ষেত্রে অনেকের চেয়ে তিনি বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল। কারণ কাশীপ্রসাদ ঘোষের ('হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকার সম্পাদক) মত অনেক নব্য-শিক্ষিত ব্যক্তিও যেমন সেদিন স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন, আবার প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজও স্ত্রীগণের জন্য বুদ্ধি-প্রধান শিক্ষাদানের বিরোধিতা করে কেবল 'হৃদয় প্রধান' শিক্ষার প্রচলনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন 'তত্ত্ববোধিনী' (চৈত্র ১৮০২ শক) পত্রিকায়।৫৯ তাই তুলনামূলকভাবে বঙ্কিমের অভিমত এ বিষয়ে বাস্তব-সম্মত ও অধিকতর প্রগতিশীল বলে গ্রাহ্য হতে পারে।

'মৃণালিনী' উপন্যাসের ৪র্থ খণ্ডের ১৫ পরিচ্ছেদে (অন্তিম-কালে) সহমরণ বা সতীদাহের প্রত্যক্ষ চিত্র রয়েছে— '......... শাস্ত্রীয় আচারান্তে মনোরমা ব্রাহ্মণের আনীত নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। নববস্ত্র পরিধান করিয়া দিব্য পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া পশুপতির প্রজ্বলিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন। এবং সহাস্য আননে সেই প্রজ্বলিত হুতাশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, নিদাঘসন্তপ্ত কুসুম—কলিকার ন্যায় অনলতাপে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।' এছাড়া 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজ-সিংহ' উপন্যাসে সহমরণ-প্রথার গৌরবময় ঐতিহ্যের ইঙ্গিতবহ কিছু উক্তির উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল :—

'.........শেষে রামচরণ সিদ্ধান্ত করিল, 'বোধহয়, এই দুইজন স্ত্রীলোক সম্প্রতি 'বিধব' হইয়াছে—ইহাদিগকে সহমরণের

প্রবৃত্তি দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন··· ······।' (চন্দ্রশেখর ২য় খণ্ড ৩য় পরিঃ)

'······আমি কি হিন্দুদের বামুনের মেয়ে, না রাজপুতের মেয়ে যে, এক স্বামী করিয়া, চিরকাল দাসীত্ব করিয়া, শেষে আগুনে পুড়িয়া মরিব ?' (জেবউন্নিসা-রাজসিংহ ২য় খণ্ড ৩য় পরিঃ)

'আপনি আমার কন্যা বিবাহ করিবেন না। করিলে আপনাদিগকে আমার শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। আমি শাপ দিতেছি যে, তাহা হইলে আমার কন্যা বিধবা, সহগমনে বঞ্চিতা, মৃতপ্রজা এবং চিরদুঃখিনী হইবে।' (রাজসিংহ ৫ম খণ্ড ৩য় পরিঃ)

'রাজসিংহ' উপন্যাসের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে নির্মল কুমারী ঔরঙ্গজেবকে বলেছে— '··· হিন্দুর মেয়ে আগুনে পুড়িয়া মরিতে ভয় করে না।··· ··আপনি যে মরণের ভয় দেখাইতেছেন, আমার মা, মাতামহী প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সেই আগুনেই মরিয়াছেন। আমিও কামনা করি, যেন ঈশ্বরের কৃপায় আমিও স্বামীর পাশে স্থান পাইয়া আগুনেই জীবন্ত পুড়িয়া মরি।'

সহমরণ-প্রথা মধ্যযুগের বাঙালী হিন্দুসমাজের এক পৈশাচিক সংস্কার, ধর্মের নামে এই বীভৎস আচার বাংলার সমাজের বুকে যে দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল তার মূলে ছিল সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য-অটুট রাখার প্রবণতা এবং নারীর সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতিদানের পরিপন্থী সামন্ততান্ত্রিক সমাজধর্মকে টিকিয়ে রাখারই চেষ্টা। নতুবা বহুবিবাহের আমলে সম্পত্তি-বিভাজন রোধ করা যাবে না। সদ্য বিপত্নীক পুরুষের সহমরণের কোন বিধি তথাকথিত শাস্ত্রে নেই, কিন্তু সদ্য বিধবা হিন্দুরমণীর সহমরণ অপরিহার্য। সমাজে স্ত্রীস্বাধীনতাকে অবদমিত করে পুরুষ-প্রাধান্য বজায় রাখা ছাড়া ধর্মের নামে এই মানবতা-বিরোধী ও নৃশংস আচারের সমাজ-আর্থনীতিক (socio economic) আর কি কারণ থাকতে পারে ? বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসের সর্বশেষ দৃশ্যটিতে (৪র্থ খণ্ড ১৫ পরিঃ) বিধি-লিপি অনুযায়ী শাস্ত্রীয় আচারান্তে মৃত স্বামী পশুপতির চিতায় মনোরমা সজ্ঞানে আরোহণ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন

বাংলার সমাজে সহমরণ আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল, তবে কেন ঐ দৃশ্য-টির অবতারণা করা হল 'মৃণালিনী' উপন্যাসে?—পাঠকমনে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, নব্যপন্থী মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ও প্রমীলার সহমরণ দৃশ্যকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে।

যা হোক 'মৃণালিনী' উপন্যাসের পটভূমিকার কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ, বখ্‌তিয়ার খিলজীর (১২০৪ ১২০৬) গৌড় বিজয়ের কাহিনীর পটভূমিকায় এটি রচিত। ঐ সময়ে সমাজে জ্যোতিষের চর্চা ব্যাপকভাবে হ'ত এবং হিন্দুর যাবতীয় সামাজিক ক্রিয়াকলাপ জ্যোতিষ গণনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হ'ত, 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্,'–এই বাণীই ছিল সেকালের আদর্শ। ৬০ মনোরমার সহমরণের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ তৎকালীন সমাজের ঐ আদর্শই ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর পিতা কেশব জ্যোতির্বিদের গণনায় জানতে পারেন যে, কন্যা 'অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে।' তাই 'তিনি ধর্ম্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করিলেন কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবার ভরসায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন করিলেন' (৪র্থ খণ্ড ৩য় পরিঃ)। পশুপতির মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মনোরমা একেবারে গঙ্গাতীরে শ্মশানে উপস্থিত, মৃত স্বামীর অনু-গমন তাঁর মতে 'স্ত্রী জাতির কর্তব্য।' তাই তাঁর মুখে শুনি— 'অনুমরণ ভয়ে পিতা আমাকে এতকাল লুকায়িত রাখিয়াছিলেন। আমি আজ কালপূর্ণে বিধিলিপি পুরাইবার জন্য আসিয়াছি।' এতে যেমন সেই সমাজের দেব-নির্ভরতা প্রকাশিত, তেমনি হিন্দু নারীর চিরন্তন স্ত্রীধর্ম ও স্বামী-সংস্কারে অবিচল বিশ্বাসও প্রতি-ফলিত। বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত পশুপতির মৃত্যুর পর মনোরমার স্বেচ্ছায় সহমরণের দৃশ্য তুলে না ধরে উনিশ শতকের নতুন মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়ে এর বিপরীত দৃশ্য আঁকতে পারতেন অর্থাৎ মনোরমাকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহমরণের জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে, কিন্তু মনোরমা এই নির্মম সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী হয়ে নবযুগের নারীভাবনার প্রকাশ ঘটাচ্ছেন—এ দৃশ্য তুলে ধরলে ঔপন্যাসিক হয়ত আবেগপ্রবণ আধুনিক পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-

সংস্কারক হিসেবে পরিচিত ও প্রশংসিত হতেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে সমাজ—বাস্তবতাকে নস্যাৎ করতে হত। এখানে 'মৃণালিনী' উপন্যাসের শিল্পমূল্য বিচার্য নয়, সমাজ-বাস্তবতার বিচারই প্রধান। ঔপন্যাসিক শিল্পের খাতিরে, আধুনিক পাঠকের রুচির মুখ চেয়ে বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন নি।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র সহমরণ-প্রথাকে সমর্থন করতেন বলেই আলোচ্য দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। কিন্তু এই ভাবনা একেবারেই অমূলক। তার কারণ, যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই মনীষী রামমোহনের তিরোভাব (১৮৩৩) ঘটেছে এবং সতীদাহ-নিবারণ আইন (১৮২৯) প্রবর্তিত হয়েছে, তবু রামমোহনের সমাজ-সংস্কার ও ধর্মসংস্কারের পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্রকে যে প্রভাবিত করেছিল—তার সাক্ষ্য দুর্লভ নয়। 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' ব্যাখ্যায় তিনি রামমোহনের ব্যাখ্যাত ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তির কথা স্বীকার করেছেন—ঐ ভিত্তিকে স্বীকার করেই তিনি বলেছেন—'ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্ম না মানিয়াও হিন্দুধর্ম্মের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে।' এছাড়া ঐ 'দেবতত্ত্ব' আলোচনায় অন্যত্র নৃশংস ধর্মের (তা হিন্দুধর্ম হলেও) বিরুদ্ধে সোচ্চারও হয়েছেন ('নৃশংস ধর্মের পুনরুজ্জীবনে কি ফল ?' দ্রঃ), যে ধর্ম সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ও জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটায় তা শাস্ত্রসম্মত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাকে ধর্ম বলে স্বীকার করেননি। যুদ্ধকালে শত্রুসেনা যে তড়াগ পুষ্করিণীতে স্নান ও পানের নিমিত্ত জল গ্রহণ করে তা নষ্ট করা বা সহস্র সহস্র লোককে জলপিপাসা পীড়িত করে প্রাণে মারার যে নির্দেশ মনু-সংহিতায় আছে ৬১ তাকেও বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম বলে মানতে না পেরে বলেছেন—'.........যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে,......যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে.........সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে।' কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র সতীদাহের মত অমানবিক ও অনিষ্টকর প্রথাকে

সমর্থন করতেন—এ অনুমান ভিত্তিহীন। যদিও প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রবন্ধ বা চিঠিপত্রে এ সম্পর্কে বঙ্কিমের মতামত এযাবৎ জানা যায় নি তবু তিনি যে এই প্রথা সমর্থন করতেন না—তার পরোক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায়। প্রথমতঃ যা তিনি ব্যক্তিজীবনে সমর্থন করতেন, তাঁর সাহিত্যে সেই সব বিষয়ই তিনি নানা যুক্তিসহকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে তার প্রমাণ পেয়েছি। সহমরণের চিত্রের উপস্থাপনা এক 'মৃণালিনী'তে ছাড়া আর কোন বঙ্কিম-উপন্যাসে দেখা যায় নি, আবার সেখানেও নিছক সমাজে অনুসৃত প্রাচীন সংস্কারের চিত্রের নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনা মাত্র, কোন মন্তব্য করেন নি, যা অন্যত্র প্রায়ই দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ রামমোহন তাঁর 'প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদে' মূলতঃ যে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যার মাধ্যমে সহমরণ অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভগবদগীতার ব্যাখ্যায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। বঙ্কিমের ধর্মচেতনা ও সামাজিক কর্মপদ্ধতির ভিত্তি ঐ গীতোক্ত বাণী ও আদর্শ। সে দিক থেকে বিচার করলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে রামমোহনের সংস্কার-প্রচেষ্টার সমর্থক বলা যায়, এবং সহমরণ যে তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না—এই অনুমানই যুক্তিযুক্ত। তৃতীয়তঃ 'বঙ্গদর্শনে' (আষাঢ় ১২৮৪) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখিত 'সতীদাহ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছে—'এ প্রবন্ধে যে সকল পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের মতে অনেক স্থানে অনুমোদনীয় নহে। কিন্তু বঙ্গদর্শনে সকল প্রকার মত সমর্থিত ও সমালোচিত হউক, ইহা আমাদিগের ইচ্ছা; স্বাধীন সমালোচনা ভিন্ন উন্নতি নাই।' ৬২ যদিও ঐ সময় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা করতেন সঞ্জীব-চন্দ্র, তবু বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন প্রধান লেখক এবং তাঁর প্রাধান্যও ছিল অক্ষুণ্ণ। অতএব বলা যায় যে, উক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য পরোক্ষে বঙ্কিম-মতেরই প্রকাশক এবং ঐ মন্তব্য নিঃসন্দেহে সতীদাহ প্রথার অসমর্থনসূচক। তা ছাড়া, ঐ বৎসরই 'বঙ্গদর্শনে' (কার্তিক, ১২৮৪) নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সতীদাহ প্রবন্ধটিও চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উল্লিখিত রচনার প্রতিবাদ রূপেই

মুদ্রিত হয়। এই জাতীয় নানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, 'মৃণালিনী' উপন্যাসের আলোচ্য সহমরণ-চিত্র বঙ্কিম-মানসের সমর্থন-পুষ্ট নয়, বরং তিনি এই প্রথার বিরোধীই ছিলেন।

'মৃণালিনী' উপন্যাসে তিনি সহমরণ-দৃশ্য চিত্রিত করেছেন সত্য, কিন্তু সেদিনের সমাজেও যে ঐ প্রথা সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। কেশব ঐ সামাজিক প্রথাকে এড়াবার জন্যই মেয়েকে নিয়ে প্রয়াগে পালিয়েছিলেন, শ্মশানে উপস্থিত হয়ে মনোরমা তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে ব্রাহ্মণ দুর্গাদাস তাঁকে নিরস্ত করতেও চেষ্টা করেছেন ('মা, তুমি বালিকা—এ কঠিন কার্যে কেন প্রস্তুত হইতেছ?')। এ সবের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, সেকালের জনমানসেই এই প্রথার বিরোধিতার বীজ উপ্ত ছিল। এই ইঙ্গিত-দান যথার্থ সমাজ-বাস্তববাদীর লক্ষণ। একমাত্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের নীতি-প্রচার-প্রবণতা অত্যন্ত সংযত, অথচ সমাজের বাস্তব-চিত্রায়ণ এখানে সম্পূর্ণ সার্থক হয়ে উঠেছে।

নবযুগের সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি প্রাচীনপন্থীদের বিরূপতা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁদের প্রতিকূল মনোভাবের পরিচায়ক 'বিষবৃক্ষ' ও 'রজনী' উপন্যাসের নীচের উদ্ধৃতিগুলিঃ 'সুতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্যদেবতাদের মধ্যে হইয়া উঠিলেন, বিশেষতঃ তিনি citizen of the world এবং Spectator পড়িয়াছিলেন,········ তিনি দেবীপুর নিবাসী জমিদার দেবেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইলেন এবং বাবুর পারিষদ মধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিক বিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন,·········স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য।' (বিষবৃক্ষ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

'কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফরমর্ বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত

করিলেন।·········একটা ফিমেলস্কুলের জন্যও মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন,······বিধবা-বিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি দুই চারিটা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানারূপ কারাগারের শিকল ভাঙার বিষয়ে তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার একমত—উভয়েই বলিতেন মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রবাবু বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বাহির করার অর্থবিশেষে' (বিষবৃক্ষ ১০ পরিঃ)। 'আর একপ্রকারের লোকের উপকারের ঢং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে, বলিতে হয় 'বকাবকি, লেখালেখি।'······বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্পবয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দাও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গরুর মত গোহালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া খাক।········· বিধবা-বিবাহ করুক, ছেলেপুলেরা আইবুড়ো থাকে থাকুক, কুলীন ব্রাহ্মণ এক পত্নীর যন্ত্রণায় খুশী হয় হউক, আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার পোষকতায় লোকের কি হিত হইবে তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।' (অমরনাথের কথাঃ রজনীঃ ২য় খণ্ড ৪র্থ পরিঃ)

১৯শ শতকে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর সাহিত্যজীবনের এক বৃহৎ অধ্যায় ব্যয়িত হয়েছে হিন্দুধর্মের আধুনিক কালোপযোগী সংব্যাখ্যানে, সেই সময়ে কি প্রবন্ধ, কি উপন্যাস—সর্বত্রই বঙ্কিম-মানসের ঐ বিশেষ প্রবণতা ক্রিয়াশীল ছিল, মূলতঃ 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশকাল (১৮৭২) থেকেই এর সূচনা। হিন্দুশাস্ত্রের নানা অপব্যাখ্যা-জনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা-বশতঃ যখন দেশের যুবসম্প্রদায় স্বধর্মত্যাগের উন্মাদনায় মত্ত, তখন হিন্দুর প্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী বঙ্কিমের দার্শনিক মননশীলতা বিশুষ্কপ্রায় হিন্দুধর্মের স্রোতধারাকে বেগবতী করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। একদিকে খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের উৎসাহ, অন্যদিকে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার—এই সন্ধিলগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য, সমালোচনায় সর্বত্র হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে ব্রতী। স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের

প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। বিশেষ করে পূর্বে উদ্ধৃত 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে—তারাচরণ ও দশম পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রের চরিত্রাঙ্কনে এবং 'রজনী' উপন্যাসের ২য় খণ্ড ৪র্থ পরিঃ অমরনাথের উক্তিতে ব্রাহ্মসমাজ ও সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি যে কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য রয়েছে তা থেকে ঐ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক।

ব্রাহ্মসমাজের উত্থান ও পতনের মধ্যেই বঙ্কিমের সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে। ১৮৩৮ সালে ২৬শে জুন বঙ্কিমের জন্ম, আর 'ব্রাহ্মসমাজ' এই নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৮ সালের ২০শে আগষ্ট জোড়াসাঁকোর চিৎপুররোডস্থ কমললোচন বসুর বাড়ীতে। ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন, এরপর ১৮৬৬ সালের ১১ই নভেম্বর ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হয় এবং কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে নতুন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক না ভেবে এই ধর্মেরই এক পরিশীলিত ও উন্নতরূপ বলেই মনে করতেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র যে আদি ব্রাহ্মসমাজকে কখনই স্বতন্ত্র বলে ভাবতেন না—তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' শীর্ষক আলোচনায়,—'ব্রাহ্মধর্মের আমরা পৃথক উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মের শাখামাত্র।' আবার ব্রাহ্মসমাজের কার্যাবলীও যে সমাজ উন্নতির অনুকূল ছিল—বঙ্কিমের মনে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ জাগেনি। 'সাম্য' প্রবন্ধের ৫ম পরিচ্ছেদে বলেছেন - 'আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক।'

যদিও পরবর্তীকালে 'সাম্যে'র প্রবন্ধগুলিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভুল' বলেছিলেন, তবু উদ্ধৃত মন্তব্যটি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীর উপলব্ধিতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করে। ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হওয়ার পরই ঐ সম্প্রদায়ের আধুনিক সংস্করণের মধ্যে ক্রমে অনেক ত্রুটি ও সঙ্কীর্ণতা দেখা যায়। পূর্বের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ক্রমে

লোপ পায়—কেশবচন্দ্র সেন কেবল ব্রাহ্মসমাজের উৎকর্ষের কথাই চিন্তা করতেন। শুধু তাই নয়, পরে তিনি নিজেকে ব্রহ্মের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, আদিব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে যে হিন্দুধর্মের সারভাগটুকুর অবশিষ্ট ছিল, তা ক্রমে লোপ পেয়ে সেখানে ক্রীশ্চানি সংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটল। সমসাময়িক বাংলার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে এর সাক্ষ্য মেলে। 'সোমপ্রকাশ' ৬৩ (২৭শে মাঘ, ১২৭০) ১৩ সংখ্যায়, 'হিন্দু-সমাজের সহিত ব্রাহ্মদিগের সংস্রব রাখা উচিত কিনা?'—শীর্ষক সমালোচনামূলক এক সংবাদের একাংশে জানা যায় জনৈক ব্রাহ্ম-পত্রলেখক লিখেছেন—'যে সকল ব্রাহ্ম হিন্দুদিগের সহিত সংস্রব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কপটতা করা হয়, তাঁহাদিগের ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য।'

ঐ পত্রিকার (৫ই পৌষ ১২৭৫, সোমপ্রকাশ) অন্য একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে রয়েছে—'বাবু কেশবচন্দ্রের কোন্ আলোক সামান্যগুণে যে তাঁহার অনুচরেরা মোহিত হইয়া তাঁহার চরণরেণু লেহন করেন এবং তাঁহাকে অবতার বলিয়া গণনা করেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।'

ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে ক্রীশ্চানি আচরণের সাক্ষ্য মেলে 'সোম-প্রকাশ' (৪ঠা আশ্বিন ১২৭৭) পত্রিকার অন্য একটি সংবাদের অংশ বিশেষে—

'একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টিয়ানরা যীশুখ্রীষ্টকে ধর্মশিক্ষার প্রধান আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া উন্নত ব্রাহ্মেরাও যীশুখ্রীষ্টকে ধর্মশিক্ষার প্রধান আদর্শ ও প্রধান গুরু বলিয়া স্থির করিয়াছেন ········আর শুনা গিয়াছে যে রামকৃষ্ণপুরে কোন উন্নত ব্রাহ্ম অন্য কোন ব্রাহ্মের বাটীতে একখানি যীশুখ্রীষ্টের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আগ্রহের সহিত সেইখানির চরণে মস্তকাবনত করিয়া-ছিলেন।' পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র সেন ক্রমে বৈষ্ণব ভক্তিবাদে অনুরক্ত হন এবং অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে পথে খোল-করতাল সহ ব্রহ্মনাম সংকীর্তন শুরু করেন। পরে ১৮৭৬ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে পুরোপুরি মাতৃভাবে বিভোর হয়ে

যান—এইভাবে কেশব সেনের ব্রাহ্মধর্ম প্রকৃতই হিন্দুধর্মের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয়। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে আগ্রহী বঙ্কিমচন্দ্র কেশবসেনের সমাজের কার্যাবলী লক্ষ্য করে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন যে, কেশবের ব্রাহ্মসমাজ দীর্ঘদিন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে না,—তার কারণ দুটি—এক, সমাজের অধিকাংশ সভ্যই নীতিভ্রষ্ট ও কর্মবিমুখ, বাক্য-বাগীশ ও স্বার্থান্বেষী, ('বিষবৃক্ষে'র তারাচরণ ও দেবেন্দ্র তাদেরই প্রতিনিধি); দুই, কেশব স্বয়ং ভাব-প্রবণ ও হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি ছিল তাঁর সুপ্ত অনুরক্তি। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপলব্ধিই ব্রাহ্মধর্মের দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর মধ্যে কোন বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেনি, বরং 'ধর্মতত্ত্বের' ১০ম অধ্যায়ে কেশব সেন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

'ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ সকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।' 'ধর্ম্মতত্ত্ব' তাঁর পরিণত বয়সের রচনা (অনুশীলন বিষয়ক ধারাবাহিক আলোচনা 'নবজীবনে' আরম্ভ হয় ১৮৮৪ খ্রীঃ), কাজেই ঐ মন্তব্যও নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাব উপলব্ধির সহায়ক।

এরপর কেশব সেনের অবতারবাদ ও ভক্তিবাদ থেকে ব্রাহ্মসমাজকে মুক্ত করার প্রয়াস শুরু হল এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে কেশব-বিদ্রোহীদের নিয়ে নতুনভাবে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' গড়ে ওঠে ১৮৭৮ সালের মে মাসে। এই 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' প্রথম সম্পাদক শিবচন্দ্র দেবকে ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই জুন রাজনারায়ণ বসু এক পত্রে লেখেন—'We should adopt a national form of divine worship, a national theistic text-book and national ritual as far as all this could be done consistently with disctates of conscience.' ৬৪ এই তৃতীয় স্তরে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও আন্দোলনের ধারা অতিদ্রুত জাতীয়তার আদর্শ ও আন্দোলনের ধারার সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। এই মিলনপর্বের তিনজন প্রধান নেতা হলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায়। শিবনাথের ব্রাহ্মআদর্শ সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'আত্মজীবনীতে' লিখেছেন— 'Shivanath's Brahmoism was more attractive to me than that of the Keshub··· Shivanath's Brahmo ideal was more instinct with the spirit of freedom and individualism...... social freedom and national emancipation were both organic elements of Shivanath's religion and piety.' ৬৫ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রবক্তাগণ ধীরে ধীরে হিন্দু-ঐতিহ্যের অনুগামী হয়ে হিন্দু-সম্প্রদায়ের সঙ্গেই জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের সহযোগী হয়ে ওঠেন। এমন কি প্রাচীন ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে লেখেন,—'হিন্দুধর্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকার-মাত্র মনে করি।' ৬৬ পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় রাজনারায়ণ বসু সম্পর্কে লেখেন—'রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক।'

ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় নেওয়ার জন্য 'প্রচার'-'নবজীবন' পর্বের ঐতিহাসিক বঙ্কিম–রবীন্দ্র-বিতর্কের বিষয়ে এখন কিছু আলোচনা করা যাক। ১২৯১, শ্রাবণ মাসে 'নবজীবন' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ সূচনায় সম্পাদকীয়তে 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'বঙ্গদর্শনের' প্রশংসা করা হয়, কিন্তু 'বঙ্গদর্শনে'র প্রশংসা অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রতিবাদ লেখা হয়, পরে 'নবজীবনে' চন্দ্রনাথ বসু তার জবাব দেন—এই-ভাবে বাদ-বিসম্বাদের শুরু। 'নবজীবন' প্রকাশের এক পক্ষকাল পরেই 'প্রচারে'র আত্মপ্রকাশ। উভয় পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্র নিয়মিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে লিখতে থাকেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজ থেকে বঙ্কিমবাবু বার বার আক্রান্ত হন, এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়—'যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারিবার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ।' ৬৭

বঙ্কিমবাবুর 'ধর্মজিজ্ঞাসা'র সমালোচনায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'নব্যহিন্দু সম্প্রদায়' প্রবন্ধের মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমবাবুকে 'নিরীশ্বরবাদী' আখ্যা দেন। এই হচ্ছে প্রথম আক্রমণ। দ্বিতীয়-বার রাজনারায়ণ বসু (আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি) বে-নামে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় 'নূতন ধর্ম্মমত' নামে প্রবন্ধ লিখে বঙ্কিম-বাবুকে 'নাস্তিক' 'জঘন্য কোম্‌ত মতাবলম্বী' ইত্যাদি ভাষায় আক্রমণ করেন। তৃতীয়বার বঙ্কিমচন্দ্র আক্রান্ত হন আদি ব্রাহ্মসমাজের কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের দ্বারা, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসজ্ঞানকে বিদ্রূপ করে ('বাঙ্গালীর কলঙ্ক' প্রবন্ধের প্রতিবাদে) নব্যভারতে লেখেন। আর চতুর্থবার রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে (অগ্রহায়ণ, ১২৯১) 'একটি পুরাতন কথা' শিরোনামায় একটি প্রস্তাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেন, মূলতঃ তিনি 'প্রচারে' পূর্বে-প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। তখন রবীন্দ্রনাথ আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক। এই চতুর্থবার আক্রমণের পরই বঙ্কিমবাবু জবাব দেবার তাগিদ অনুভব করেন এবং 'প্রচার'এ (অগ্রহায়ণ,-১২৯১) তাঁর মতামত প্রকাশ করে উক্ত আক্রমণের জবাব দেন। তিনি বুঝেছিলেন—'সুর কেমন পরদা পরদা উঠিতেছে,............ সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে [সুর] লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না'। তবে এই জবাবী প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি না ছিল তাঁর কোন অশ্রদ্ধেয় মনোভাব, না ছিল ব্রাহ্মধর্মের প্রতি বিদ্বেষ; বরং বিপরীত-টাই লক্ষ্য করা গেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'রবীন্দ্র-বাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা শুনাই নীরবে আমার কর্ত্তব্য।'

'তবে যে এ কয়পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড়ছায়া দেখিতেছি'। ঐ প্রবন্ধের শেষাংশে ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধেও যে সম্ভ্রমসূচক মন্তব্য তিনি করেছেন তাই বর্তমানে আমাদের কাছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি

লিখেছেন—'আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা এদেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব এমন আশা রাখি।' ৬৮ সাধারণভাবে ব্রাহ্মসমাজ ও বিশেষভাবে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব শুধুমাত্র অবৈরীই ছিলনা, ছিল নিঃসন্দেহে সম্ভ্রমপূর্ণ।

এর কারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভবের সামাজিক তাৎপর্য এবং এই সমাজের ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। হিন্দু-সমাজের ঐতিহ্য অম্লান রাখার যে প্রবৃত্তি বঙ্কিমমানসে চিরজাগরূক ছিল—সেই মানস-প্রবৃত্তির অনুকূল কার্যপদ্ধতি অনেকাংশে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা অনুসৃত হত বলেই বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রতি মানসনৈকট্য অনুভব করতেন্। আদি-ব্রাহ্মসমাজ মূলতঃ হিন্দু-ধর্মবিরোধী কোন আন্দোলনই, এমনকি বিধবাবিবাহ আন্দোলন পর্যন্ত সমর্থন করত না। ১৮৭২, ১৫ই সেপ্টেম্বরে 'জাতীয় সভা'র অধিবেশনে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে যেমন রাজনারায়ণ বসু বক্তৃতা দেন, তেমনি আবার ঐ বৎসরেই (১২৮৯, ১১মাঘ) মাঘোৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আদি ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথও আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে ১৮৯১ সালে আদমসুমারী গ্রহণের সময় সেন্সাস অধ্যক্ষকে লিখিতভাবে জানান—'The members of the Adi-Brahmo-Samaj are really Hindus, ৬৯ ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তকগণের ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের উভয়গোষ্ঠীরই মূল লক্ষ্য ছিল বাংলার সমাজে খ্রীষ্টধর্মের প্রসাররোধ ও বাঙালী যুবসম্প্রদায়ের বিজাতীয় প্রবণতার অপনয়ন। কাজেই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে আপাতঃ বিরোধ থাকলেও বিদ্বেষ ছিলনা।

এখন প্রশ্ন জাগে—তবে বঙ্কিম-উপন্যাসে ব্রাহ্মসমাজ ও তাদের সংস্কারমূলক কার্যকলাপের প্রতি যে কটাক্ষ রয়েছে তার কারণ কি? বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও তাঁর মন ছিল শুধু প্রাচ্যাভিমুখীই নয়, প্রাচীনাভিমুখীও। তাই সমাজের অর্বাচীন

ধ্যান-ধারণাকে স্বীকৃতি দানে তাঁর কুণ্ঠা ছিল। আবার একথাও সত্য যে, সমকালীন বাংলার সমাজে প্রগতিশীলতার নামে এক-শ্রেণীর মানুষ উচ্ছৃঙ্খলতার মাধ্যমে কেবল আত্মপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ ছিল। পরার্থপরতার নামে স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধন ও স্বার্থসিদ্ধিই ছিল মূল লক্ষ্য। এই স্বার্থান্বেষীর দল সেদিন বিশেষ করে নবোদ্ভূত ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় নিয়েছিল। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দেবেন্দ্র, তারাচরণ ঐ শ্রেণীরই প্রতিভূ। বঙ্কিমচন্দ্রের কটাক্ষ ঐ শ্রেণীর প্রতি, সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নয়।

নারীর স্বাধীন-সত্তার স্বীকৃতি বা স্বাধিকারের প্রশ্নটি বঙ্কিম-উপন্যাসে স্বাধীন-প্রেমে অধিকার প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। যেহেতু এই বিষয়টি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক, তাই দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে নানাভাবে এটির উপস্থাপনা করা হয়েছে, নীচের উদ্ধৃতি কয়টিও তারই প্রমাণ –

'এ নিশীথে একাকিনী কারাগার মধ্যে আসিয়া এই বন্দীর সহিত আলাপ করা আমার ইচ্ছা। আমার কর্ম্ম উত্তম কি অধম, সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই।' (আয়েষা, দুর্গেশনন্দিনী ২য় খণ্ড ১৫ পরিঃ)

'তুমিও কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব।............যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ-দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।' (কপালকুণ্ডলাঃ ৪র্থ খণ্ডঃ ১ম পরিঃ)

'গোপাল বসুর বিবাহ ছিল—তাঁহার পত্নীর নাম চাঁপা......চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়—তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।' (রজনী ১ম খণ্ড ৫ম পরিঃ)

'শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না; কিছুতেই চুল বাঁধিল না। সে বাটীর ভিতর থাকিত না; পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত।........ শ্বশুর শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ পরে ভৎর্সনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল।.........একদিন দ্বার খোলা পাইয়া

শান্তি কাহাকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।' (আনন্দমঠ ২য় খণ্ড ১ম পরিঃ)

'তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা লইব না। তোমার নিজের যদি কিছু থাকে, তবে তোমার কাছে ভিক্ষা লইব।' (প্রফুল্ল—ব্রজেশ্বরকে) (দেবীচৌধুরাণী ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিঃ)

'কিন্তু তুমি দয়া করিয়া আমাকে কেবল প্রাণে বাঁচাইবার জন্য যে, একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, আমি সে দয়া চাহি না। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সর্বেশ্বর অধিকারিণী,—আমি তোমার শুধু দয়া লইব কেন?' (সীতারাম, শ্রীর উক্তি ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিঃ)

সমাজে নারী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তখনই প্রাধান্য পায় যখন নারীর ব্যক্তিত্ব চূড়ান্তভাবে খর্ব হয়। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রদোষ লগ্নে ব্যক্তি ও সমাজ—সম্পর্কের যে দ্বন্দ্ব সার্বিকভাবে দেখা দিয়েছিল, ব্যক্তি হিসেবে নারীর সামাজিক স্বীকৃতির দাবীও তারই একটি অঙ্গ। কাজেই নারীর পূর্বাবস্থার চিত্রণ ও আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদার উপস্থাপনা সমকালীন কথাসাহিত্যে লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদের এই অংশটিতে মধ্যযুগের সমাজে নারীর ব্যক্তিসত্তার চরম অস্বীকৃতির প্রমাণ মেলে—'স্ত্রী-লোকের পরিচয়ই বা কি? যাহারা কুলোপাধি ধারণ করিতে পারে না, তাহারা কি বলিয়া পরিচয় দিবে? গোপনে বাস করা যাহা-দিগের ধর্ম্ম, তাহারা কি বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে?' আবার 'মৃণালিনী' উপন্যাসের ৩য় খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে গিরিজায়ার আত্মচিন্তায়—'মেয়েমানুষের মুখ এখনও বন্ধ' উক্তিটিও সমার্থক। যা হোক, নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় যেহেতু প্রথম পরিচ্ছেদে নারীর-স্বাধীন—প্রেমাধিকার প্রসঙ্গে বিশ্লেষিত হয়েছে, তাই পুনরালোচনা এখানে অনাবশ্যক। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অনেকাংশেই পশ্চাদ-ভিমুখী।

সাত

আলোচ্য-অধ্যায়ে সমাজ-বাস্তবতা নিরূপণের মাধ্যমে বঙ্কিম-উপন্যাসের মূল্যায়নই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যানুযায়ী আমরা এতক্ষণ সমকালীন বাংলার সামাজিক আন্দোলনের যে সমস্ত দিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে তুলে ধরেছেন, তাদের আলোচনা করলাম এবং সেইগুলির উপস্থাপনার রীতি বা পদ্ধতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিস্ফুটনে চেষ্টা করেছি। সামাজিক কাহিনী-ভিত্তিক উপন্যাস যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের মাত্র দুটি (পারিবারিক সমস্যা-ভিত্তিক বলাই যুক্তিযুক্ত), তবু তাঁব রোমান্স বা ঐতিহাসিক উপ-ন্যাসের কোথাও কোথাও যে উনিশ শতকীয় সমাজ-সমস্যার প্রাসঙ্গিক উপস্থাপনা রয়েছে—তাও আমরা আলোচনা করেছি। আবার অনেক উপন্যাসে সমস্যামূলক কোন কোন প্রাচীন রীতির বা সংস্কারের নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনাও রয়েছে, অথচ ঔপন্যাসিকের মনোভঙ্গীর কোন ইঙ্গিত (Suggestion) সেখানে অনুপস্থিত। সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উপন্যাসের ভিত্তিতে বঙ্কিম-মানসের স্বরূপ বিশ্লেষণে অসুবিধা থাকায় তাঁর প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কিছুকে তাঁর উপন্যাসসমূহে গৌণভাবে স্থান দিয়েছেন অথচ সামাজিক সমস্যা হিসেবে সেই বিশেষ বিষয়টি তখনকার বাংলার সমাজে হয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদি বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ ঐ বিষয়ের উল্লেখ না করতেন তাঁর উপন্যাসে, তাহলে আমাদেরও তা বিচার্য হত না; কিন্তু বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে অথচ উপস্থাপনের উদ্দেশ্য বা শিল্পীর মানস-প্রবণতার কোন ইঙ্গিতই উপন্যাসে নেই। উদা-হরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বহুবিবাহ সমস্যা বা সহমরণ প্রথার চিত্র কোন কোন উপন্যাসে রয়েছে, কিন্তু ঐ সব ব্যাপারে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া সেখানে অসম্ভব। তাই তাঁর অন্যান্য রচনার বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

এ-যাবৎ যে সব উপন্যাস আমরা বিশ্লেষণ করেছি, তাতে

দেখা গেছে বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও কোথাও সমাজ-বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার বা প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ পশ্চাদগামী মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও প্রগতিশীল আবার কোথাও রক্ষণশীল। যেমন নারীর স্বাধীন-প্রেমে অধিকার বা সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন বঙ্কিম স্বীকার করেননি, বহুবিবাহ প্রথার উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, অথচ বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনে আগ্রহী, কিন্তু নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক; আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তিনি মানস-নৈকট্য অনুভব করতেন, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরবর্তী ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক পরিচালিত সংস্কার-আন্দোলনের আতিশয্যকে তিনি কটাক্ষ করেছেন। সাহিত্যে বঙ্কিম-মানসের এই দ্বিমুখী প্রকাশের কারণ তাঁর ব্যক্তি-চিত্তের দোদুল্যমানতা; একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে অন্তর্লীন নিগূঢ় সম্পর্ক, অন্যদিকে উদীয়মান ধনতান্ত্রিক সমাজ—ব্যবস্থায় সৃষ্ট নবচেতনার মানসাভিঘাত—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও যুগচেতনাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আবার কোথাও সামঞ্জস্যবিধানে অপারগ হয়ে প্রাচীনের কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। আবার এই দোদুল্যমানতা বা দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও পরিমাণ ছিল সদা পরিবর্তনশীল, সেই জন্যই 'সাম্যে'র প্রবন্ধগুলি পরবর্তীকালে ভ্রান্ত বলে মনে করেছিলেন। এই জটিল ও দ্বন্দ্বপূর্ণ মানসিকতার জন্যই সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের মূল্যায়নেও কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এককথায় তাঁকে সম্পূর্ণ রক্ষণশীল বা প্রগতিশীল বলে দিলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু যুগভাবনা ও সমাজভাবনার প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচেতনার সম্যক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়।

বঙ্কিম-অধ্যায় আলোচনার প্রারম্ভেই যুগমানসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে লক্ষ্য করেছি যে সেদিনের ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্বের মূল নিহিত রয়েছে 'সমকালীন সমাজের বাস্তব-প্রেক্ষাপটের গভীরে। ইংরেজ আগমনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস সামগ্রিকভাবে গ্রামবাংলার

সনাতনী জীবনাচরণের গতিহীন ভিত্তিমূলে যেমন প্রচণ্ড আঘাত হানল, তেমনি সদ্য ইংরেজী—শিক্ষিত মুষ্টিমেয় নাগরিক বাঙালীর মানসলোকে নব নব আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিল। পাশ্চাত্যশিক্ষা নগর-বাংলার যুবমানসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদাবোধকে যেমন উদ্দীপ্ত করল, তেমনি ক্রমে ঐ শ্রেণী স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ হয়ে উঠল। কিন্তু এই উন্মুখতা ও উৎসাহের সীমাবদ্ধতাও স্মরণীয়—প্রথমতঃ এসবই ছিল শহরকেন্দ্রিক, বিস্তীর্ণ গ্রামবাংলাকে সেদিনের নবচেতনা আলোড়িত করতে সক্ষম হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এ ব্যাপারে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, কারণ ইংরেজশাসন যেমন তাঁদের অনভিপ্রেত ছিল, তেমনি ইংরেজশাসকও ছিল ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি অপেক্ষাকৃত কঠোর মনোভাবাপন্ন। এই সমস্ত কারণে ইংরেজ আগমনের ফলে নবসৃষ্ট বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানসলোকে যে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম নিল, বাস্তবে ঔপনিবেশিক সমাজ-প্রেক্ষাপটে তা পূরণ সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হল, আর এইখানেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। এছাড়া, আর একধরণের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মানুষের মনে—দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য মনীষা ও সংস্কৃতির সম্মিলন প্রয়াসের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বের উৎস। উক্ত উভয় শ্রেণীর দ্বন্দ্বেই বঙ্কিম-মানস ছিল সংক্ষুব্ধ। সমাজে স্বীয় শ্রেণীর ও স্বজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগের ক্রমাবলুপ্তিতে তাঁর মধ্যে যেমন উগ্র স্বাজাত্যভিমান ও স্বদেশপ্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল, তেমনি আবার পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে জাতীয় ভাবধারার পরিপুষ্টির জন্যই প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ বিরোধিতাও তাঁর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, বরং ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্বই তাঁর কাম্য ছিল; অন্যদিকে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যথার্থ উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁর সমাজ-দৃষ্টিও ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। বেন্থামের হিতবাদ (utilitarianism), মিলের যুক্তিবাদ (Rationalism), কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) ইত্যাদির প্রভাব বঙ্কিম-মানসে পড়লেও পরবর্তীকালে বঙ্কিম এসমস্তকিছু থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ-সাম্যের তত্ত্ব যে ত্যাগ

করেছিলেন, তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সমাজ-বিপ্লব নয়, সমাজানুগত্যই ছিল তাঁর উপদেশ; একক ব্যক্তির বিকাশ বা কল্যাণ অপেক্ষা সমগ্র সমাজের কল্যাণই তাঁর অভিপ্রেত। এই সমাজ-কল্যাণের নিরিখেই তিনি সামাজিক সমস্যার বিচার করেছেন এবং যতটুকু অনুরূপ মানসভঙ্গীর অনুকূল, সমাজ বাস্তবতার ততটুকুই তিনি স্বীকার করেছেন, অন্যত্র তিনি বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই কোথাও তাঁকে প্রগতিশীল, অন্যত্র রক্ষণশীল বলে মনে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে সমাজ-চিন্তা-নায়ক বলা গেলেও সমাজ-কর্মী বলা যায় না, কারণ তিনি কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেমন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, তেমনি কোন সমাজ আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশ নেননি (অবশ্য মুর্শিদাবাদে থাকার সময় তিনি গ্র্যাণ্ট হল ক্লাবের সক্রিয় সদস্য ছিলেন)। 'হিন্দুমেলা'য় তাঁর উৎসাহ ছিল না, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র সভ্যপদ গ্রহণ করেও কিছু দিনের মধ্যেই তা ছেড়ে আসেন, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও কোনদিন যোগ দেননি, এমনকি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলনের প্রতিও তাঁর কোন আগ্রহ দেখা যায় নি, বরং ইংরেজ কর্তৃক দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ-নীতিকে তিনি যে সেদিন সমর্থন জানিয়েছিলেন—তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সমকালীন বা পূর্ববর্তী সমাজ-সংস্কারক মনীষীদের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রগতিবিরোধী ছিলেন তা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের বাস্তববাদী চিন্তাধারার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বঙ্কিম-উপন্যাসে উত্থাপিত সামাজিক সমস্যাগুলির বেশীর ভাগই নারীর সমস্যাকেন্দ্রিক—বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ও কৌলীন্য, সহমরণপ্রথা, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুর মূলেই যে প্রশ্নটি রয়েছে, তা সমাজে নারীর স্থান। সমাজে নারীর ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির তৌলে যে কোন সমাজের প্রগতিশীলতা পরিমাপ্য, আবার মনে রাখার প্রয়োজন যে, 'প্রগতি' শব্দটিও আপেক্ষিক। সমাজ ও কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রগতির

অর্থও পরিবর্তিত হয়। প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী বা বাস্তব-সচেতন হতে হলেই যে ঔপন্যাসিককে সরাসরি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বদা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে—তা ঠিক নয়। সামাজিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়নেই তা বিচার্য। সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে নারীর স্বাধীন-সত্তা থাকে নির্জিত ও উপেক্ষিত, পরবর্তী ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন যখন প্রধান হয়ে দেখা দেয়, তখনই অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে ব্যক্তি হিসেবে নারীর স্বাধীন স্বীকৃতির দাবীও ওঠে। এই দাবীকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতার পরিমাণের উপর কোন্ সমাজ কতটা প্রগতিশীল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র আদৌ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলি অধিকতর সজীব ও সক্রিয় হলেও তারা চিরন্তন গোষ্ঠী-চেতনার অনুবর্তিনী ও সামাজিক-পারিবারিক আবর্তনেই আবর্তিতা। স্বাধীন প্রেমে নারীর অধিকারকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেননি, বরং বিশেষ এক নৈতিকবোধ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যে, তথাকথিত অবৈধ প্রেম পাপ এবং ঐ প্রেমে পারিবারিক ও সামাজিক সুস্থ জীবনাচরণ বিপর্যস্ত হয়। জনৈক সমালোচক তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন—'বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কিছুটা সনাতনী মনোভাব থাকায় তাঁর প্রেমচিত্রে আধুনিকতার আস্বাদ অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ৭০ নারী-সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার প্রতি বঙ্কিমের দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিশ্লেষণ যে ভাবে আমরা করেছি, তাতে তাঁর সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট, পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও নবজাগরণের অভিঘাতও বঙ্কিম-মানসের ঐ পাশ্চাদভিমুখিতাকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য নারীমনের আকাঙ্ক্ষার কথা উপলব্ধি করলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কোন নারীচরিত্রই শেষপর্যন্ত স্ব-মহিমায় আত্মমর্যাদায় সমুজ্জ্বল হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বিমলা-আয়েষা, মতিবিবি-মনোরমা, হীরা-লবঙ্গলতা প্রমুখেরা নিঃসন্দেহে 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী,' বুদ্ধিমতী ও নির্ভীক, কিন্তু তাদের কেউই শেষ পর্যন্ত আত্মমহিমায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি, সমষ্টির কল্যাণে ব্যষ্টির আত্মসমর্পণই প্রত্যেকের পরিণামে স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে। তাই উপসংহারে বলা যায়—যদিও তাঁর 'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী' দেশাত্মবোধের উদ্দীপক, তবু সমাজ-বাস্তবতার প্রসঙ্গে তাঁর মানস-প্রবণতায় রক্ষণশীলতার আধিক্য স্পষ্টই অনুভূত হয়।

— —

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ঃ 'সাহিতা সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ', পৃঃ ১০০

১. (ক) অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী : 'সাহিত্য-চিন্তা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' গ্রন্থের ভূমিকা পৃঃ ১

২-৯. বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত, ৩য় মুদ্রণ ১৩৭১) ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৮৬, ১৮২, ১৮৩, ১৮৩-৮৪, ৯০৬, ৮৫০, ২৭২ ও ৮৩৫

১০, ১১. অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী : 'সাহিত্য-চিন্তা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' গ্রন্থের ভূমিকা যথাক্রমে পৃঃ ২০—২১ ও ১১ দ্রঃ

দ্রঃ—'বঙ্কিমচন্দ্রের মতে হিতসাধন ও সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে কোন বিরোধ নাই।.........জগতে যেখানে যত মহাকবি আছেন তাঁরা সৌন্দর্যের পথে মানুষের হিতসাধন করেছেন, তাঁদের কাব্য বিশ্লেষণ করলে এই সত্য প্রমাণিত হয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র যদি সৌন্দর্যের দ্বারা হিতসাধন চেষ্টা করে থাকেন তবে তিনি মহাকবির কার্যই করেছেন।'

১২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ঃ 'দীনবন্ধু মিত্র অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র-গুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ়

দেখিলেই, অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism, তাহার উপর Idealise করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল।'—বঙ্কিমরচনাবলী (সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত) ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৩২

১২ক. ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—বাংলা সমালোচনা পরিচয়, পৃঃ ৯১

১৩. Miriam Allott : 'Novelists on the Novel' : The Ethics of the Novel, P-30

১৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'দীনবন্ধুর এই দুটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি, তাঁহার কাব্যের গুণ দোষের কারণ............' বঙ্কিমরচনাবলী (সা সং) ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৩৩

১৫. বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত, ৩য় মুদ্রণ ১৩৭১) ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯০

১৬. ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'উপন্যাসের তত্ত্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৭. অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় : 'সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' পৃঃ ১২৩ ২৪

১৭(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'কৃষ্ণচরিত্র ৪র্থ খণ্ড ৪ পরিঃ— '......আমরা জিজ্ঞাসা করি ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজ-সংস্কার কিসের জোরে হইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্ম্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্ম্মের উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাজ—সংস্করণের পৃথক চেষ্টা করিতে হইবে না। তা না করিলে কিছুতেই সমাজ-সংস্কার হইবে না।' —বঙ্কিমরচনাবলী (সাঃ সং প্রকাশিত) ২য় খণ্ড পৃঃ ৫০৬

১৮. অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী : 'সাহিত্য চিন্তা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' গ্রন্থের ভূমিকা পৃঃ ২১

১৯. অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় : 'সাহিত্য-সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' পৃঃ ৮৮

২০. ডঃ ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র (২য় সং) পৃঃ ১২২

২১. সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রদত্ত ১৮৯২ সালে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে বক্তৃতা দ্রঃ
২২. ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার ঃ বঙ্কিম-মানস, পৃঃ ৬২
২৩. নীরেন্দ্রনাথ রায় ঃ সাহিত্য-বীক্ষা পৃঃ ৮১
২৪. অধ্যাপক অসিত কুমার ভট্টাচার্য ঃ বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিম-চন্দ্রের চিন্তাধারা, পৃঃ ৩৮
২৫. ডঃ অজিত কুমার ঘোষ ঃ 'হরফ' প্রকাশিত মধুসূদন রচনাবলীর ভূমিকা, পৃঃ ৪৮
২৬. ডঃ সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়) পৃঃ ২১৬, ২১৮
২৭. অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃঃ ১১৮
২৮. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ৭৪, দ্রঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসেও শিবাজী-রোসিনারার প্রণয় শাজাহানের আশীর্বাদ পেয়েছিল।
২৯. ডঃ রবীন্দ্রগুপ্ত উপন্যাস প্রসঙ্গে, পৃঃ ৮৯ দ্রঃ 'স্বয়ং নগেন্দ্র তৎকালীন 'ফ্রি ট্রেড'-এর অংশীদার উদীয়মান ভদ্র বণিক সম্প্রদায়ের প্রতীক—'
৩০. ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত ঃ বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, পৃঃ ২৫৫
৩১. ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত ঃ উপন্যাস প্রসঙ্গে, পৃঃ ৯৬
৩২. শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার লিখিত 'সাক্ষরতা প্রকাশন'-এর 'বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ' (উপন্যাস খণ্ড) ভূমিকা পৃঃ ২১ দ্রঃ।
৩৩. অধ্যাপক প্রবোধরাম চক্রবর্তী ঃ সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত, পৃঃ ২৮
৩৪. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃঃ ১১৪
৩৫-৩৭. বিনয় ঘোষ ঃ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ যথাক্রমে ২৬৩-৬৪, ২৭৭ ও ৩৬৮
৩৮. চন্দ্রনাথ বসু ঃ নবেল বা কথা গ্রন্থের উদ্দেশ্য, ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, পৃঃ ১৪২ দ্রঃ।

৩৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'সাম্য' পঞ্চম পরিঃ

৪০. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার : বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড

৪১. ডঃ ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ১৫৭

৪২. শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার সম্পাদিত 'বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ' (প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ) ভূমিকা পৃঃ ২৭

৪৩. মোহিতলাল মজুমদার : বাংলার নবযুগ, পৃঃ ৬১

৪৪. ডঃ ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ১৫৫,
'১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতের উদারনৈতিক নেতা জর্জ টম্‌সনকে এদেশে নিয়ে এলেন। ইংরেজ রাজত্বে পরিপূর্ণ আস্থা রেখে দেশের কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে টম্‌সন তাঁদের উপদেশ দিলেন। ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব এখান থেকেই দৃঢ় হয়ে উঠল।'

৪৫. ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত : ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ, পৃঃ ২২১

৪৬-৪৭. ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার : বঙ্কিম-মানস পৃঃ ৬৯ দ্রঃ

৪৮. ডঃ ভবতোষ দত্ত : চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র পৃঃ ১৫৭

৪৯-৫০. বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত) ১ম খণ্ড (উপন্যাস) ভূমিকা পৃঃ যথাক্রমে ২৬ ও ২৩ দ্রঃ

৫১. ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন : নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, পৃঃ ২-৩

৫২. বিপিন চন্দ্র পাল : নবযুগের বাংলা, বঙ্কিম সাহিত্য, পৃঃ ১৭৯

৫৩. বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত) প্রথম খণ্ড (উপন্যাস) ভূমিকা পৃঃ ২১ দ্রঃ—বঙ্কিমচন্দ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের নীতির পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন কেবল উচ্চশিক্ষার সপক্ষে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলনের জন্য স্যার জর্জ ক্যাম্বেল প্রয়াসী হওয়ায় বঙ্কিম তাঁকে সমর্থন করেন, ফলে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হন। বিবিধ প্রবন্ধে (২য় খণ্ড) 'বাঙ্গালা শাসনের কল' রচনা (পূর্বে নাম ছিল—'সর্‌ উইলিয়ম গ্রে ও সর্‌ জর্জ ক্যাম্বেল' ১২৮২ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) দ্রঃ।

৫৪. বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত) প্রথম খণ্ড (উপন্যাস) ভূমিকা পৃঃ ২৪

৫৫. নীরেন্দ্রনাথ রায় : সাহিত্য—বীক্ষা পৃঃ ৯৪

৫৬. ডঃ রবীন্দ্রগুপ্ত সম্পাদিত ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য পরিচায়িত 'বঙ্গদর্শন নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ' পৃঃ ১৭৭-১৮৯ দ্রঃ।

৫৭, ৫৮. শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় : 'বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র' (১৫নং) দ্রঃ সাপ্তাহিক 'দেশ' (৮ এপ্রিল ১৯৭৮) পত্রিকায় প্রকাশিত।

৫৯. 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (চৈত্র, ১৮০২ শক) লিখলেন—'বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।··· কিন্তু আমরা বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী হওয়া বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলের ও উন্নতির চিহ্ন বিবেচনা করিনা।····· স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে একপ্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী প্রকৃতি স্বভাবতঃ হৃদয়প্রধান, এবং পুরুষ প্রকৃতি স্বভাবতঃ বুদ্ধিপ্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি।' (বিনয় ঘোষ : 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' পৃঃ ২৩৭ দ্রঃ)।

৬০ সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, পৃঃ ১১১ দ্রঃ।

৬১. মনুসংহিতা ৭ম অধ্যায়, ১৯৬—'ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকা-রোপরিখাস্তথা ইত্যাদি, বঙ্কিম রচনাবলী (সা সং) ২য় খণ্ড (সমগ্র সাহিত্য) পৃঃ ৭৭৭ দ্রঃ

৬২. ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য পরিচায়িত 'বঙ্গদর্শন : নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ' পৃঃ ২০০

৬৩. বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ খণ্ড) পৃঃ ২০৩, ২১৭, ২১৯ দ্রঃ

৬৪. যোগেশচন্দ্র বাগল : রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ ৫১

৬৫-৬৬. বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ (সম্পূর্ণ) যথাক্রমে পৃঃ ৩০৮ ও ৩১৬ দ্রঃ

৬৭-৬৮. বঙ্কিম-রচনাসংগ্রহ (প্রবন্ধ খণ্ড শেষ অংশ) 'সাক্ষরতা প্রকাশন' পৃঃ ১২০৭ দ্রঃ ডঃ ভবতোষ দত্ত : 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজ' প্রবন্ধ দ্রঃ (সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৯ পৌষ ১৩৮১)

৬৯. শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৫১

৭০. ডঃ সত্যব্রত দে : রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা পৃঃ ৫৫

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

। রবীন্দ্র-উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতা ।

এক

রবীন্দ্র-উপন্যাসে সমাজ—বাস্তবতা বিচারের পূর্বে রবীন্দ্র-ভাবনায় সমাজের স্বরূপ কি এবং রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে বাস্তবতা কি—এই দুটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন; এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল জানতে পারলে আমাদের মূল আলোচনার সিদ্ধান্তে আসা সহজ হবে আশা করি।

কোন শিল্পীর সাহিত্যে বাস্তবতা ও সমাজ-সচেতনতা মূল্যায়নের সময় দেশ-কাল-পরিস্থিতিগত পটভূমিকার কথা যেমন একান্তভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তেমনি ঐ বিশেষ সাহিত্যিকের সামাজিক অবস্থান ও তজ্জনিত সীমাবদ্ধতা এবং তাঁর মানস-প্রবণতার কথাও স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তিনি ছিলেন মূলতঃ কবি। তাঁর কাব্যসাধনার ধারা যেমন নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বিচিত্র-বন্ধুর পথে প্রবাহিত, তেমনি নব নব উপলব্ধি ও অনুভবে প্রগাঢ় ও সমৃদ্ধ। সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের মধ্যেও যে বিশেষ লক্ষ্যাভিসারী ছিল তাঁর কবি-মানস—সেটা হচ্ছে সীমার সঙ্গে অসীমের, খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের, ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের, প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের, প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের মিলনসাধন। তাঁর সাহিত্য-সাধনা, চিন্তা ও কর্ম—সমস্ত কিছুতেই ঐ মিলন-প্রয়াস ও সাযুজ্য-সন্ধান সুস্পষ্ট। এক কথায় বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানতঃ সমন্বয়বাদী। আবার সেই সমন্বয়, তাঁর মতে, আসে বিচ্ছেদ ও বিপ্লবের মধ্যদিয়ে (সামঞ্জস্য, শান্তিনিকেতন দ্র:) ১। তাঁর চেতনার দুই বিপরীত কোটিতে যে দুটি মৌল উপাদান ছিল—তা হ'ল প্রকৃতি ও মানব। মানব-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ, প্রকৃতির সঙ্গে মানবের নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যমে বহি:প্রকৃতির উদার, অবাধক্ষেত্রে তার মুক্তিদান, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিশ্বমানবের অঙ্গীভূত করা ইত্যাদির প্রয়াস বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যের সর্বত্র সুপরিকল্পিত। এতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতা ও উন্মার্গগামিতা সহজেই ধরা পড়ে। স্বভাবত:ই 'সমাজ' বলতে আমরা যে খণ্ডিত

ভূ-ভাগের মধ্যে অবস্থিত পরিবার-ভিত্তিক এক বিশেষ কালের নির্দ্দিষ্ট পরিবেশকে বুঝি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমাজ 'তা থেকে ব্যাপকতরই শুধু নয়, তা বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় প্রাণিত। নির্দ্দিষ্ট দেশ-কালের সীমানায় সে-সমাজ সীমাবদ্ধ নয়, তা দেশকালাতিশায়ী। 'সমাজ' বলতে তিনি বিশ্ব-মানবসমাজকেই বুঝতেন। অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে স্বদেশের ও স্বীয় সমাজের চিন্তা যে পরবর্তীকালে (বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই) রবীন্দ্রমানসে প্রাধান্য পেয়েছিল তার পরিচয়ও পাওয়া যায় ('স্বদেশী সমাজ' 'পল্লীসমাজ' 'সমাজমুক্তি' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। সেক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তা ও কর্মপ্রয়াস মূলতঃ বৃহতের অভিমুখী। মানব-চিত্তের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই সেখানে প্রবল, অসীম বিশ্ব-মানবসমাজের সঙ্গে এই সসীম সমাজের সামঞ্জস্য বিধানের অভীপ্সা সেখানেও তীব্র। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে প্রীতিকর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যেদিন মানুষ মানুষকে জানবে, ঈর্ষা-লোভ-হিংসার দ্বারা মানুষের উপর মানুষের শোষণ বন্ধ হবে, সমাজের জন্য সকলেই কিছু-না-কিছু কাজ করবে, কেউ পরশ্রমজীবী হয়ে থাকবে না—সেই দিনই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। সারা বিশ্বে ঐ সমাজ গড়ে উঠুক—এটাই ছিল তাঁর কাম্য। তাই স্বদেশের সমাজের কথা চিন্তা করলেও রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনি—'পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না।' ২ বিশ্বের যে-কোন সমাজেই যখনই মানবাত্মার অবমাননা ও নির্যাতন রবীন্দ্রমানসে সংক্ষোভের সৃষ্টি করেছে, তখনই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তিনি নিপীড়িত মানুষের পক্ষাবলম্বন করে অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। তাঁর এই সমাজ-দর্শন ব্যাপকভাবে ঔপনিষদিক রসপুষ্ট হলেও নিগূঢ় মানব-প্রেম ও মানবের মুক্তিপ্রয়াস সেখানে দুর্লক্ষ্য নয়। আবার সেই মানুষের 'একদিকে তাহার বিশেষত্ব আর একদিকে তাহার বিশ্বত্ব' ৩—উভয়ের ক্রমবিকাশ ও সুসমন্বয়-সাধনই রবীন্দ্রনাথের আজীবন সাধনার ও কর্মপ্রচেষ্টার চরম লক্ষ্য। যেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ অবরুদ্ধ, সেখানেই দেখা দেয় দ্বন্দ্ব—সমাজ ও

ব্যক্তির মধ্যে, গোষ্ঠী ও ব্যষ্টির মধ্যে, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতই সৃষ্টি করেছে নব নব সভ্যতা, সমাজকে করেছে চিরচলিষ্ণু। রবীন্দ্রনাথ সমাজের এই চলমানতাকে ও রূপান্তরকে যে শুধু উপলব্ধি করেছিলেন তাই নয়, এর মূলে যে বিশেষ দ্বান্দ্বিক শক্তি বিদ্যমান তাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। তিনি প্রতিটি সমাজ-বিপ্লবের মূলে প্রত্যক্ষ করেছেন 'সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ,' ৪ আর এই বিরোধের অবসান ঘটে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভবে—'কিন্তু মানুষ তো পুরাতন আবরণের মধ্যে থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয়, বিদীর্ণ করতে হয়—বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়।' ৫ রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝার রূপকে এই যে উক্তিটি করেছেন, প্রতিটি নতুন সমাজের সৃষ্টির মূলে যে বৈপ্লবিক সংঘাত অনিবার্য—তার তীব্রতার উপলব্ধিই এখানে সুস্পষ্ট। সমাজের স্থিতিশীলতায় যেমন তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, তেমনি সনাতন বা শাশ্বত বলেও কোন কিছুকে তিনি ভাবতে পারেন নি; তাই তিনি বলেছেন— '.........নির্বিচার অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী, সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হলে মোহমুক্ত মনকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য করতে হবে,.........।' ৬ যে সমাজের চলমানতা জীর্ণ সংস্কার, পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বেষ ও নানা ভেদবুদ্ধির বন্ধনে আবদ্ধ, সেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকে নিষ্পেষিত। ঐ স্থাণুবৎ সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন সমাজের উদ্বোধনে কবির ছিল চির-আগ্রহ, তাই তিনি সারাজীবন 'সবুজের' বা 'যৌবনের' আবাহন করেছেন সর্বত্র।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার নবজাগরণের পটভূমিকায় এবং ঠাকুরবাড়ীর সংস্কারমুক্ত ও স্বাদেশিকতাপূর্ণ আবহাওয়ায় জাত ও বর্ধিত রবীন্দ্রনাথের মনে যে আধুনিকতার বীজ উপ্ত ছিল, প্রথমবার বিলেত যাওয়ার (১৮৭৮, ২০ সেপ্টেম্বর) পরই তার অঙ্কুরোদ্গম ঘটে। ইউরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই পরিচয় রবীন্দ্র-মানসে সমাজ-সচেতনতার স্ফুরণে বিশেষ তাৎপর্যবহ।

পাশ্চাত্য সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও মানবতা-ভিত্তিক আধুনিক সংস্কৃতির আলোকে এদেশের সমাজের সার্বিক অনগ্রসরতা তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রতিভাত হ'ল। এই সময় তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যেমন প্রসার লাভ করে, তেমনি আবার তাঁর মধ্যে এক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়—একদিকে প্রাচীন বেদান্ত-উপনিষদ-নির্ভর আধ্যাত্মিকতা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিজাত গণতান্ত্রিক ও বিশ্বমানবতাভিত্তিক আধুনিক-চেতনা। এই দুয়ের দ্বন্দ্বে পরিশেষে বিশ্বের সকলপ্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান-সূত্রের সন্ধান যেন তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদের শ্লোকগুলির মধ্যে (১৩১৫, ১৭ই অগ্রহায়ণ থেকে ১৩২১, ৭ই পৌষ পর্যন্ত প্রদত্ত 'শান্তিনিকেতনে'র ভাষণগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়)। আবার বিদগ্ধ রবীন্দ্র-সমালোচকের মন্তব্যও প্রাণিধানযোগ্য '............তাঁর প্রগতিমূলক ধারণার অনুকূলে তিনি উপনিষদ মন্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে আধুনিক রাষ্ট্রনীতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও উপনিষদ্-বচন উদ্ধার করে নিজ বক্তব্যকে সমর্থন করতে তাঁর কোন দ্বিধাই হয়নি।........ উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যদ্যপি ছিল, উপনিষদকে তিনি নিতান্ত স্বকীয় এবং আধুনিক অর্থ দিয়ে নবীন ক'রে তবেই গ্রহণ করেছেন। অমৃত, ভূমা, তপস্যা প্রভৃতি শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করলেও ঐ শব্দগুলিকে মানুষের দুঃখবরণ, সংগ্রাম, অভিব্যক্তির ধারায় জয়যাত্রা প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ করেছেন। ফলতঃ উপনিষদের উপরেই রবীন্দ্রচিন্তা প্রভাব বিস্তার করেছে, রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদ নয়।' ৭ তাই তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ বা ব্যক্তি অমৃতের পুত্র এবং সমাজও বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্ট বৃহৎ কর্মক্ষেত্র। সমাজের উন্নতিতে সামাজিক মানুষের আত্মশক্তির বা আধ্যাত্মিক বিকাশের উপরই রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ধনলিপ্সু, স্বার্থান্ধ মানুষের হাতে বিশ্বের মানব-সমাজকে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় দেখে তাঁর চিত্তে জেগেছে গভীর বেদনাবোধ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি তাঁর বিমুগ্ধতার জের বেশীদিন ছিল না, কিছু দিনের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের পররাজ্য আগ্রাসনের বীভৎস চেহারা দেখে তাঁর মোহ-

ভঙ্গ হয়। চীনে আফিম ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-বাদীরা একটা জাতির যে কি সর্বনাশ করছিল সে সম্বন্ধে রবীন্দ্র-নাথ 'ভারতী' (জ্যৈষ্ঠ্য ১২৮৮, পৃঃ ৯৩-১০০) পত্রিকায় 'চীনে মরণের ব্যবসায়' নামে এক প্রবন্ধে মানবতার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় যে কোন বিশেষ জাতি বা দেশের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, এ যে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থারই পূর্ণতম বিকাশের স্তর ('highest stage of capitalism'—Lenin) এবং অন্যান্য দেশে উপনিবেশ স্থাপন এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া—এসমস্ত সমাজ-তত্ত্ব সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করার আদৌ প্রয়াসী হননি। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মূলে যে অর্থনৈ-তিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নটি জড়িত আছে—রবীন্দ্রনাথ হয়ত সে বিষয়েও সচেতন ছিলেন না বলে অনেকে মনে করতে পারেন, কেননা উপনিষদে দীক্ষিত কবিসত্তা মূলতঃ এক পরম সত্যের অনুসন্ধানেই নিয়োজিত ছিল। এ ধারণা কিন্তু অভ্রান্ত নয়। সর্বত্র খুব স্পষ্ট-ভাবে না হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর মন্তব্যে ঐ বিষয়ে সচেতন-তার আভাস পাওয়া যায়। 'সমাজে মুক্তি' এই প্রসঙ্গে তাঁর 'শান্তিনিকেতনে' ভাষণে (১লা মাঘ, ১৩১৫) তিনি বলেছেন—সমা-জকে একটা এঞ্জিনওয়ালা কারখানা বলে মানতে হয়; ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।' এই 'ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজন'কে দুভাবে দেখা যায়—শোষকের মুনাফা-লিপ্সা, আবার শোষিতের জীবনধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় ন্যুনতম রোজগার-দুই-ই হতে পারে। এই দ্বন্দ্ব মূলতঃ অর্থনৈতিক। আবার 'কালা-ন্তর' গ্রন্থের 'নারী' প্রবন্ধে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে আরো সুস্পষ্টভাবে বলেছেন 'ধনিকের ধন উৎপন্ন হয়েছে শ্রমিকের প্রাণ শোষণ করে; প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন জ্বালানো রয়েছে অসংখ্য দুর্বলের রক্তের আহুতি দিয়ে, ... এ সভ্যতা ক্ষমতার দ্বারা চালিত, এতে মমতার স্থান অল্প। ....এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পান্বিত।' সমাজ বিপ্লবে অর্থ-নৈতিক তাৎপর্যের কথা আরো স্পষ্টভাবে তাঁর 'সমবায় নীতি' প্রবন্ধে

উল্লিখিত হয়েছে— '............আজকের দিনের সাধনায় ধনীরা প্রধান নয়, নির্ধনেরাই প্রধান। বিরাটাকায় ধনের পায়ের চাপ থেকে সমাজকে, মানুষের সুখশান্তিকে বাঁচাবার ভার তাদেরই'পরে। ....নির্ধনের দুর্বলতা এতদিন মানুষের সভ্যতাকে দুর্বল ও অসম্পূর্ণ করে রেখেছিল, আজ নির্ধনকেই বল লাভ করে তার প্রতিকার করতে হবে।' এ সমস্ত উক্তি থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ সমাজে বৈষম্যের মূলে যে অর্থনৈতিক ভিত্তি রয়েছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

তাছাড়া, যখন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলেত যান (১৮৯০, ২২ আগষ্ট) তার পূর্বেই ইংলণ্ডে কার্ল-মার্কসের 'ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থ (১৮৮৭) প্রকাশিত হয়, স্যামুয়েল মুর 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র ইংরাজী অনুবাদ (১৮৮৮) করে প্রকাশ করেন, ১৮৮৯ খ্রীঃ এঙ্গেলসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা হয়। একই সময়ে সিড্‌নি ওয়েব ও বার্ণাড শ' সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচারে ব্রতী হন।৮ কাজেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রগতিশীল ভাবধারায় আকৃষ্ট ও মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ যে এসব বিষয়ে আদৌ কোন সংবাদ রাখতেন না তা ভাবা যায় না, কিন্তু কোথাও এ ব্যাপারে তাঁর ঔৎসুক্য লক্ষিত হয় না; বরং তিনি বলেছেন—'এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে, বলের দ্বারা বা কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম্য কোনদিন সম্পূর্ণ দূর হতে পারে।' ৯ তাঁর এই মনোভাবের বা ঔৎসুক্যের অভাবের দুটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমতঃ হয়ত সমাজের গতিশীলতাকে ও সমাজ-বিবর্তনের অনিবার্যতাকে তিনি উপনিষদের 'চরৈবেতি'—'চরৈবেতি,' এই বাণীর আধুনিক সংব্যাখ্যানে উপলব্ধি করেছিলেন, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। আর ঐ উপলব্ধির প্রাবল্যই এর অন্য কোন তাৎপর্য অনুধাবনের পথে প্রধান অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়তঃ, হয়ত রবীন্দ্র-মানসে মানবপ্রেমের ভাবাবেগের আতিশয্যহেতু সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী বিশ্লেষণের পদ্ধতি তাঁর মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করতে পারেনি, তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের অবিভাজ্যতার

কথা ভুলে গিয়ে এবং সমাজের পরিবর্তন যে রাষ্ট্রের চরিত্রের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল—তা উপলব্ধি না করে মন্তব্য করেছেন—'আমি জানি রাষ্ট্রব্যাপার সমাজের অন্তর্গত; কোন দেশেরই ইতিহাসে তার অন্যথা হয় নি; সামাজিক ভিত্তির কথাটা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রিক ইমারতের কল্পনায় মুগ্ধ হয়ে লাভ নেই।' ১০ রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা যে রীতিরই হোক-না-কেন, কর্ম ও প্রীতির মাধ্যমে যে-কোন সমাজকে সুস্থ-সুন্দর করে গোড়া তোলা যায়। 'স্বদেশী সমাজ' প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যে এই অনুমানের প্রমাণ মেলে '......ইংরেজ আমাদের রাজা কিম্বা আর কেউ আমাদের রাজা এই কথাটা নিয়ে বকাবকি করে সময় নষ্ট না করে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, নিজের দেশকে নিজে সত্যভাবে অধিকার করবার চেষ্টা সর্বাগ্রে করতে হবে।' ১১ জনৈক সমালোচকের মতেও 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টিতে, রাজনীতি জিনিসটা গৌণ, সমাজধর্ম জিনিসটাই মৌল; এবং সেই সমাজধর্মের জীবন মানবধর্মের সঙ্গে গাঁথা। এজন্যই নিছক রাজনীতিক কর্মকাণ্ডের 'অবাস্তব ভূমিকায়' তাঁর আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু স্বদেশিকতার সঙ্গে রাজনীতির সর্ববিধ যোগ অবাস্তর নয়।' ১২ তাই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সম্পর্কিত ঐ ধারণা ভাববাদী-দর্শনপ্রভাবিত। রাষ্ট্রই শোষণের হাতিয়ার এবং সমাজ-মানস সংগঠনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্রিয়াশীলতা সন্দেহাতীত। রাষ্ট্রের প্রকৃতির পরিবর্তন ছাড়া সমাজের সুস্থ বিন্যাস সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'স্বদেশী সমাজ' গঠন তাঁর ঐকান্তিক কর্মপ্রয়াস সত্ত্বেও বাস্তবে সফল হয়নি; ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষে, এমনকি স্বাধীনোত্তর ভারতীয় সমাজব্যবস্থাতেও ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক অনুসৃত হওয়ায় আজও কবির আজীবন আকাঙ্ক্ষিত সমাজ-পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। অথচ বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার সার্বিক ক্রমোন্নতির পদ্ধতি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে (১৯৩০) তিনি মন্তব্য করলেন —'যাদের হাতে ধন, যাদের হাতে ক্ষমতা তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে

রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত।' (রাশিয়ার চিঠি, ৩য় পত্র)। এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপন্ন দ্রব্যের সমবণ্টন ব্যবস্থা-কেও রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ উপনিষদের বাণীর ('মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং;··· তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ইত্যাদি)-মাধ্যমেই উপলব্ধি করেছিলেন (রাশিয়ার চিঠি ঃ ৭ম পত্র দ্রঃ)। জমির স্বত্ব জমিদারের নয়, চাষীর হওয়া উচিত, সমবায়ভিত্তিক কৃষিকার্যপরিচালনাই গ্রামের মানুষের উন্নতির পথ ইত্যাদি মত প্রকাশ করলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ও ধন-সঞ্চয়ের ব্যক্তিগত অধিকারের বিলোপ রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই চান-নি। তাঁর ধারণায় সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নতির জন্যই সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োজন, তাছাড়া ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই অধিকার অপরিহার্য। তবে তিনি ব্যক্তিকে অর্থসঞ্চয়ের লোভ সংবরণ করতে বলেছেন। এই মতবাদ আদৌ বাস্তব ও সমাজবিজ্ঞান সম্মত নয়, 'মাগৃধঃ' বললেই সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্লোভ ও নির্মোহ হয়ে ওঠে না। সেইজন্যই একে ভাবাবেগ-সর্বস্ব বলছি। মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ সন্দে-হাতীত, কিন্তু তাঁর সমাজ-দর্শন নিঃসন্দেহে কাল্পনিক বা ইউটোপীয়ান। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বা সমাজ-সম্বন্ধীয় মতবাদ রাষ্ট্র বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক ধ্যানধারণা প্রসূত নয়; এর মূলভিত্তি হ'ল মানবিকতার আদর্শ। পারস্পরিক ঈর্ষা-দ্বেষ, অর্থলোলুপতা ও শ্রেণী-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে যেদিন বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে মানু-ষের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠবে, রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে সেই সমাজই হয়ে উঠবে মানবের পূর্ণতর বিকাশের প্রকৃষ্ট সমাজ। আদর্শ হিসেবে এর যত মূল্যই থাক, বস্তুবাদী বিশ্লেষণে ও প্রয়োগগত মূল্যায়নে উক্ত মতবাদ অবাস্তব। যদিও রবীন্দ্রনাথের অনেক মন্তব্য বা চিন্তাধারা ('কালান্তর' 'সমাজ' 'রাশিয়ার চিঠি'র রচনাসমূহ দ্রষ্টব্য) সমকালীন সমাজ-প্রেক্ষাপটে নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল, এমন কি অনেকক্ষেত্রে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সঙ্গে ভাবগত ঐক্য অনুভূত হয়, তবু একথা ভুললে চলবেনা যে, মানুষের পূর্ণতর বিকাশে ও সমাজ-সাম্য প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ভূমিকাকে তিনি কখনই গুরুত্ব দেননি। ধন-তান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপসাধনে কোনোরকম বলপ্রয়োগের পক্ষ-

পাতীও তিনি ছিলেন না, অন্তরের আত্মশক্তির স্ফুরণ পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সহায়ক বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই। কারণ রাষ্ট্রই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শোষণের হাতিয়ার, মুনাফালোভী সংখ্যালঘু ধনিকগোষ্ঠীর হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত হচ্ছে – উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ, তা মূলতঃ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। ঐ রাজ-নৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক পন্থা ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব নয়—রুশ বিপ্লবের পরে এ সত্য ইতিহাসে পরিণত হলেও রবীন্দ্রনাথ তার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। আর এই-খানেই রবীন্দ্রনাথের সমাজ-ভাবনার সীমাবদ্ধতা। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার কর্মপদ্ধতি তাঁকে যে মুগ্ধ করেছিল তার পরিচয় রবীন্দ্র-পাঠক মাত্রেই জানেন, কিন্তু তিনি যে মার্কসীয় অর্থনীতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি তারও পরিচয় পাওয়া যায় নীচের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে :—

'সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি।' ১৩

'বলশেভিক অর্থনীতি সম্বন্ধে আমার মত কি, একথা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন, ...প্রয়োগের দ্বারাই মতের বিচার হতে পারে, এখনও পরীক্ষা শেষ হয়নি, যে কোনো মতবাদ মানুষ-সম্বন্ধীয়, তার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মানব-প্রকৃতি। এই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কি পরিমানে ঘটবে তার সিদ্ধান্ত হতে সময় লাগে। তত্ত্বটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করবার পূর্বে অপেক্ষা করতে হবে।১৪

রবীন্দ্র-মানসে মার্কসীয় তত্ত্বগ্রহণে এই দ্বিধা অত্যন্ত স্বাভা-বিক। তবে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুনি-য়ার সর্বত্র যে ব্যাপক অপপ্রচার চলেছিল—তার মধ্যেও তিনি নিজে সেখানে গিয়ে সবকিছু প্রত্যক্ষ করে তার উজ্জ্বল দিকটা যে নির্দ্বিধায় প্রচার করেছিলেন—সেটা সেদিনের ভারতবর্ষের সমাজে কম কথা

নয়। এই সত্যনিষ্ঠাও তাঁর চরম প্রগতিশীলতারই পরিচায়ক; মানবতাবাদী ও সমাজ-সচেতন অ-রাজনৈতিক মনীষী রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া পরিদর্শনের পর নিজে যা অনুভব করেছিলেন—তার ভাল-মন্দ, ইতিবাচক-নৈতিবাচক সবকিছুই স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। ধনতন্ত্রের শ্বাসরোধকারী বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে সুস্থ সমাজতান্ত্রিক সমাজ জন্ম নেওয়ায় তিনি খুশী হয়েছিলেন, তাদের নতুন চিন্তা ও কর্মপদ্ধতিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদী হিসেবে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্বিত হচ্ছে মনে করে তিনি বলেছেন—'মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসেবে এরা ফ্যাসিষ্ট-দেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোন বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে।' ১৫ রুশদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—একথা ঠিক এবং সেইটাই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সেখানে 'সমষ্টি'র স্বার্থে 'ব্যষ্টি'কে শৃঙ্খলিত করে দুর্বল করা হচ্ছে বলে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন—তা আসলে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর অনবধানতার ফলশ্রুতি বলেই মনে হয়। কারণ ধনতান্ত্রিক দেশের বুর্জোয়া দার্শনিক ও সমাজ-বিজ্ঞানীরাই প্রচার করে থাকেন যে, সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ থেকে সাম্যবাদের উত্তরণের পর্বে ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে গোষ্ঠীর অর্থাৎ সমাজের স্বার্থে অবদমিত হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজবাদেই ব্যক্তি তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়—ব্যক্তি-স্বার্থ তখন সমাজের সার্বিক স্বার্থেরই অঙ্গীভূত হয়ে যায়, ফলে উভয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের অবলুপ্তির পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-বিজ্ঞানীর মন্তব্য স্মরণীয়।—

'...... .....Socialism provides Individual with

opportunities for development, because it has destroyed the social roots of individualism, while the possibility for the individual's development is guaranteed by the triumph of the relationships of collectivism, brotherhood and comradeship,' ১৬

এছাড়া, Ralph Fox তাঁর 'The Novel and the people' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন – 'It is often objected against Marxism that it denies the individual, who is merely the prey of abstract economic forces which drive him to his doom with the inevitability of a Greek fate......... At least this objection is prompted by the humanist tradition of the great art of the western world and is therefore worthy of respect, even though it is based on a grave misunderstanding. .....

For Marxism does not deny the individual... Marxism places man in the centre of its philosophy, for while it claims that material forces may change man, it declares most emphatically that it is man who changes the material forces and that in course of so doing he changes himself.' ১৭

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে বিচার করলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যষ্টি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের মূলসূত্রটি যে রবীন্দ্রচেতনায় আভাসিত হয় নি তা ঠিক বলেই মনে হয়। তবে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রমানসের স্বাভাবিক দ্বন্দ্বের জন্য তাঁর সমাজ-সম্পর্কিত বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যেও স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমায় অভিভূত ছিলেন বলেই রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির উপর বিধিনিষেধ তাঁর দৃষ্টিতে পীড়ন বলে মনে হয়েছে ১৮ আবার তিনি নিজেই যখন 'স্বদেশী সমাজ'এর সংবিধান রচনা করেছিলেন সেখানে সমাজের

অধিনায়ককে পরোক্ষে একনায়কত্বের অধিকার দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। সেখানে বলেছেন—'সমাজের একজন অধিনায়ক থাকিবেন। সমাজে যে-কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, আলোচনান্তে অধিনায়ক তৎসম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় স্থির করিবেন, অবিসম্বাদে তাহাই গ্রাহ্য হইবে।.........তাঁহার স্বাক্ষরিত আদেশ সমাজের আদেশ বলিয়া গণ্য হইবে।......অধিনায়ক যে কোনো সামাজিককে কারণনির্দেশ ব্যতিরেকেও সমাজ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন।' ১৯ প্রস্তাবিত অধিনায়ককে একচ্ছত্র ক্ষমতাদান ও সাধারণ সামাজিকের আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার অস্বীকার কি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সহায়ক? না, পূর্বে বিশ্লেষিত রবীন্দ্র-চিন্তার অনুকূল? এখানে স্ব-বিরোধিতা সুস্পষ্ট। আবার দেখি, যদিও তিনি রুশ সমাজ-তন্ত্রীদের 'ফ্যাসিষ্টদেরই মতো' বলে আখ্যাত করেছেন, ঐ একই পত্রে (রাশিয়ার চিঠি ১৩ পত্র) অন্যত্র স্বীকার করেছেন যে, এরা 'ব্যক্তির আত্মনিহিত শক্তিকে বাড়িয়েই চলেছে—ফ্যাসিস্টদের মতো নিয়তই তাকে পেষণ করেনি।.........ধর্মমূঢ়তা এবং সমাজ-প্রথার অন্ধতা থেকে সাধারণের মনকে মুক্ত রাখবার জন্যে প্রবল চেষ্টা করেছে।' এক বিশেষ উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে এক-দিকে মুগ্ধতা, অন্যদিকে অনীহা-এই দ্বন্দ্ব তাঁর মানসিক দোদুল্য-মানতারই প্রকাশক। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দানবীয় অত্যাচার ও শোষণজনিত বিশ্বে মানবসত্তার লাঞ্ছনার অবসান হোক—এটা রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে কামনা করেছেন, এমন কি তাঁর রাশিয়াদর্শনকে পবিত্র 'তীর্থদর্শন' বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব যুক্তিসম্মত পথের নির্দেশ তিনি দিতে সক্ষম হন নি। অবশ্য তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের সমাজ-ভাবনার স্বরূপ একদিকে যেমন ভাবসর্বস্ব ও অমূর্ত, অপর দিকে তেমনি অসম্পূর্ণ।

রবীন্দ্র উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপ নিরূপণের পূর্বে তাঁর সমাজ-সম্পর্কিত ধারণার আভাস যেমন দেওয়া হল, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মতে বাস্তবতা কি—তারও কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক

হবে বলে মনে করি। বাস্তবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধে, আলোচনায় ও ভাষণে একাধিক দৃষ্টান্ত সহযোগে উপস্থাপিত হয়েছে। 'সাহিত্য' 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' ইত্যাদি গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পরিদৃশ্যমান জগতে ব্যাপ্ত তথ্যসমূহকে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতা বলে মনে করেন নি—তিনি তথ্য ও সত্যের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর বস্তুপুঞ্জ বা তথ্যসমূহ আমাদের মনে যে ভাবের সৃষ্টি করে, কোন কিছু অবলম্বনের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে যে উপলব্ধি ঘটে—তা-ই রবীন্দ্রনাথের মতে বাস্তব। বাস্তবকে যে সবসময় প্রত্যক্ষগোচর হতে হবে—তিনি তা মনে করতেন না, বাস্তব প্রত্যক্ষের অতীতও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যে বাস্তবতা রূপায়ণে সার্থকতা বস্তু-নির্বাচনের উপর নির্ভর করেনা, শিল্পীর উপলব্ধির গভীরতা ও রচনা-নৈপুণ্যেই তা সার্থক হয়ে ওঠে। 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধের অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হল—

'সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি—জ্ঞানে নয়, স্বীকৃতিতে। তাকেই বলি বাস্তব।'

'খুব বেশি চেনা হলেই যে বাস্তব হয় তা নয়. কিন্তু যাকে চিনি অল্প তবু যাকে অপরিহার্য রূপে হাঁ বলেই মানি সেই আমার পক্ষে বাস্তব।'

'আজকাল অনেকের কাছে বাস্তবের সংজ্ঞা হচ্ছে 'যা-তা'। কিন্তু আসল কথা, বাস্তবই হচ্ছে মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজের বাছাই করা জিনিস।······কিন্তু বিষয় বাছাই নিয়ে (তার) রিয়ালিজ্‌ম্ নয়, রিয়ালিজ্‌ম্ ফুটবে রচনার জাদুতে। সেটাতেও বাছাইয়ের কাজ যথেষ্ট থাকা চাই, না যদি থাকে অমনতরো অকিঞ্চিৎকর আবর্জনা আর কিছুই হতে পারে না।'

অতএব বলা যায় যে, রবীন্দ্র-চিন্তায় বাস্তবতা শুধু যে নিছক প্রকৃতিবাদ বা ন্যাচারালিজ্‌ম্ থেকে পৃথক তা-ই নয়, এর রূপায়ণের শিল্পরীতিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে নিবিড় ঐক্য-

অনুভূতির মাধ্যমেই তা সাহিত্যে রূপলাভ করতে পারে। এই বাস্তব-তাই সাহিত্যের সত্যের সমার্থক এবং প্রকৃতির তথ্যের অতিরিক্ত। সেটাই, তাঁর মতে, সাহিত্যের ব্যাপক ও সার্থক সত্য। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে 'সাহিত্যতত্ত্ব' আলোচনায় বলেছেন—'যে কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে-ভাষায় ভঙ্গিতে-ইঙ্গিতে যখন সেই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোন ব্যব-হারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে এমন একটা কিছু প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth eternity.' এই বাস্ত-বতা কোন খণ্ডিত বা তাৎক্ষণিক সত্তা নয়, এ-এক অখণ্ড সর্বকালিক সত্য – যা শিল্পীর সৃজনশীল কল্পনার মাধ্যমে বর্তমানকে অতিক্রম করে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হয়। যা আছে—তাকে ভিত্তি করে যা হতে পারে বা হওয়া উচিত তারই ইঙ্গিতবহ ও সত্য-সন্ধানী সাহিত্যই বাস্তব। একেই রবীন্দ্রনাথ অন্য ভাষায় বলেছেন-'সমাজের পথ যাত্রার পাথেয়,' 'উৎকর্ষের আকাঙ্ক্ষা' (সাহিত্যের পথে : 'সাহিত্য সমালোচনা' দ্রঃ)। যুগসত্য পরিস্ফুটন ও যুগমানসের আকাঙ্ক্ষার শিল্পরূপদানই যে প্রকৃত বাস্তববাদী সাহিত্যিকের পরি-চায়ক তা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্র-নাথের ব্যাখ্যাত বাস্তবতাও প্রায় সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবতার আলোচনা প্রসঙ্গে যাকে অন্তরের সত্য বলে উপলব্ধির শৈল্পিক প্রকাশ বলেছেন, জনৈক বিদেশী বাস্তববাদী সাহিত্য-সমালোচকের মন্তব্যে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—'The corner stone of every genuinely realist creation is poetic idea, a po-etic concept which, in turn, determines its plastic realisation; ······the character of realism is determi-ned by the times, by the age that dictates its aest-hetic demands.' ২০ সমকালীন সমাজপরিবেশকে কেন্দ্র করে বাস্তবতার উদ্ভব হলেও শিল্পীর প্রকাশনৈপুণ্যে তা অভূতপূর্ব শিল্প-রস সমৃদ্ধ হয় এবং তারই মধ্যে যুগমানসের অভীপ্সাও মূর্ত হয়ে ওঠে। এর ব্যত্যয় ঘটলে তথ্যের বাহুল্য থাকতে পারে, কিন্তু

তাকে বাস্তবতাপূর্ণ শিল্প বা সাহিত্য বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ নিজের শিল্পীসত্তার প্রবণতা সম্পর্কে বলেছেন—
'আমারে শুধাও যবে এরে কভু বলে বাস্তবিক ?
আমি বলি কখনো না, আমি রোম্যাণ্টিক।' (রোমাণ্টিক 'নবজাতক')

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা নিঃসন্দেহে রোম্যাণ্টিক, তবে সেই রোম্যাণ্টিকতা যে নিছক বাস্তববিবিক্ত স্কেপ্‌টিসিজ্‌ম্‌ বা পলায়নী মনোভাব নয়—তা তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রায় সর্বত্র সুস্পষ্ট। রবীন্দ্র-মানসের অতীত-চারিতা বা অসীমলোকে বিহারকে হয়ত আপাতঃদৃষ্টিতে বাস্তববিমুখতা বলে মনে হতে পারে; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় সেসব ক্ষেত্রেও বাস্তবজীবনের বেদনাবোধই কবিকে অতীতচারী করেছে, অসুন্দরের জায়গায় সুন্দরের প্রতিষ্ঠা, সীমার সঙ্কীর্ণতার অপসারণের মাধ্যমে অসীমের আবাহনই সেখানে তাঁর অভিপ্রেত। একে নিছক বাস্তব-বর্জিত বলা যায় না। তাছাড়া, সাহিত্যের বাস্তবতার সঙ্গে সৃজনশীল রোম্যাণ্টিসিজ্‌মের (creative Romanticism) প্রকৃত কোন বিরোধ নেই, বরং বাস্তবতার শিল্পরূপদানে এর প্রয়োজন সর্বত্র গ্রাহ্য। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে রোম্যাণ্টিকতার ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় ক্ষুব্ধ শিল্পীহৃদয় যদি জরাজীর্ণ বর্তমানের সমাধির উপর সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যতের সৌধ-নির্মাণ কল্পনা করেন তবে সেই রোম্যাণ্টিক কল্পনা নিঃসন্দেহে বাস্তব-সম্পৃক্ত। বিদেশী বাস্তববাদী সমালোচকের মতে—'The historical service of active romanticism is in that it points a sharp and definite contrast between the world of the ideal and bourgeois reality. These contrasts embody the uncompromising nature of romantic poetry.' ২১ কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ (১৩৩৯) কাব্য থেকেই কবির রোম্যাণ্টিকতায় বাস্তব-ভিত্তিক নব-চেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, পরিশেষ (১৩৩৯), শেষ-সপ্তক (১৩৪২), প্রান্তিক (১৩৪৪-শেষের ১৭ এবং ১৮ নং কবিতা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য) নবজাতক (১৩৪৭) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের

একাধিক কবিতায় নতুন সমাজ-চেতনা ও ইতিহাস-চেতনার স্পষ্ট পরিচয় যেমন মেলে, তেমনি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য কবির আকুলতাও প্রকট। সমকালীন ঘটনার (হিজলী জেলে হত্যা) প্রেক্ষাপটে রচিত 'প্রশ্ন' (পরিশেষ) কবিতায় শাসকের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ কবিহৃদয়ে দেশে প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলনের কার্যকারিতায় সন্দেহ দেখা দিয়েছে। 'প্রান্তিকে'র ১৭ নং কবিতায় কবি বলেছেন—

'.........দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ।'

তারপরেই ঐ কাব্যের ১৮ নং কবিতায় কবিকে বলতে শুনি—

'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

কবির এই আহ্বান, শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে তাঁর একাত্মতার অনুভূতি কল্পনারঞ্জিত হলেও একে কি বাস্তব-বর্জিত বলা যায়? কবি মাত্রেই রোম্যান্টিক, কিন্তু এখানে বাস্তব-সচেতনতা সন্দেহাতীত। শুধু তাই নয়, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতায় মানবতার নিত্য লাঞ্ছনা কবি তো অনুভব করলেনই, এই সভ্যতার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। 'নবজাতক' কাব্যে কবিকে তাই বলতে শুনি—

'ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্য নামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।' (প্রায়শ্চিত্ত)

এই উপলব্ধি ও সচেতনতা নিছক কল্পনা-বিলাসী বাস্তব-বিমুখ কবির পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা সমাজ-বাস্তবতাকে যে অর্থে প্রথম

অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেছি তারই পরিচয় রয়েছে কবির এই প্রত্যাশা-পূর্ণ বাণীতে—

'ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষ
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগাবে নূতন দেশ।' (প্রায়শ্চিত্ত : নবজাতক)

বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের অবসান হবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজের অভ্যুদয়ে—কবির এই প্রত্যয় গভীর বাস্তব-সচেতনতারই সাক্ষ্যবহ। তিনি নিজেকে যতই বাস্তববাদী বলতে অস্বীকার করুন, বা নিজেকে 'রোম্যান্টিক' বলে আখ্যাত করুন না কেন– তাঁর সেই রোম্যান্টিকতা বাস্তবতা বিরোধী তো নয়ই, বরং তীব্র বাস্তব-সচেতনতা-সমৃদ্ধ।

দুই

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা ও বাস্তবতাবোধের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এখন তাঁর উপন্যাস সমূহের সমাজ-বাস্তবতার রূপায়ণের প্রকৃতি নিরূপণে আমরা প্রয়াসী হব। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসসৃষ্টির পিছনেও যে কারণ ছিল—তাও বাস্তবভিত্তিক। সাময়িক পত্রিকার তাগিদ ছাড়াও শিল্পীর নিজস্ব অনুভবের তাগিদও এক্ষেত্রে কম ছিল না, এবং সে অনুভবও অনেকখানি মানবপ্রেমভিত্তিক ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ-জনিত। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে অধিকাংশক্ষেত্রেই নাকি চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় নি – এই মতবাদ স্বয়ং কবিই প্রকাশ করে-ছিলেন 'আনন্দমঠ' উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে। তিনি চন্দ্রনাথ বসুকে পত্রের মাধ্যমে তাঁর অভিমত জানিয়েছিলেন। 'বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে individual এর চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানে তিনি চমৎকার সফল হইয়াছেন·········কিন্তু যেখানে মানুষের সমষ্টি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, সেইখানে সমস্তটা একটা

পিণ্ডবৎ তাল পাকাইয়া গিয়াছে, কোন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।······একটা প্রকাণ্ড idea যে বিচিত্র মানবপ্রকৃতিকে revolution এর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য, তাহাদের কর্মপ্রবাহ, বিচিত্র ভাবপ্রবাহ, নানা শক্তির উন্মেষ যে একটা প্রকাণ্ড আবর্তে পড়িয়া একটা দিকে চলিয়াছে, বঙ্কিমবাবু তাহা দেখাইলেন কই।' ২২ ব্যক্তির এই প্রকৃতিগত পার্থক্য এবং সেই পার্থক্য–জনিত তার নিজস্ব ভাব-ভাবনা, আচার-আচরণের জন্য বাহ্যিক ও মানসিক যে সংঘাত প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলশ্রুতিতে যে জীবন-জটিলতা দেখা দেয় প্রায় প্রতিটি রবীন্দ্র-উপন্যাসেই তা প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে তাই কাব্য-নাটক, গান-গল্প ইত্যাদির প্রসঙ্গ না এনেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, সমাজের পটে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশই ছিল তাঁর একান্ত কাম্য। ব্যক্তি হিসেবে নারীও সমাজে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করুক রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে এই দাবীর প্রবক্তা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ ও পরিপুষ্টিতে যেমন তাঁর পারিবারিক পরিবেশ সহায়ক হয়েছিল, তেমনি তিনি শুধু সাহিত্য-সৃষ্টিতেই নয়, ব্যবহারিক জীবনেও এই বোধের যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন। সেকালের পটভূমিকায় ঠাকুর বাড়ীর পরিবেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কথা সকল রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠকেরই সুপরিজ্ঞাত, তবু সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মন্তব্য এখানে উল্লেখ করছি—'যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম, সে ছিল অতি নিভৃত।········· আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার-অনুশাসন ক্রিয়া-কর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।

'এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক, মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যেরই মতো।' ২৩ এই স্বতন্ত্র পরিবেশই রবীন্দ্রমানসে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটায়। বাল্যকালে তাঁর

চিত্তবিকাশের সহায়ক ছিলেন মূলতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, তিনিও কবির অন্তরে উপ্ত ঐ স্বাতন্ত্র্যবোধকে কিভাবে পোষণ করেছিলেন তার পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের অপর একটি মন্তব্যে—'জ্যোতিদাদা যাকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে তিনি আমাকে কোন বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করেছেন। তিনি আমার পরে কর্তৃত্ব করবার ঔৎসুক্যে যদি দৌরাত্ম্য করতেন তাহলে ভেঙেচুরে তেড়ে বেঁকে যাহয় একটা কিছু হতুম, সেটা হয়ত ভদ্রসমাজে সন্তোষ-জনকও হোত, কিন্তু আমার মতো একেবারেই হোত না।' ২৪ এই মন্তব্য থেকে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের মতে, ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রয়োজন, সমাজ বা সমষ্টির অহেতুক শাসন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। ব্যক্তির স্বাধিকার অর্থে তিনি অবশ্য কখনোই ব্যক্তির যথেচ্ছাচার বা স্বৈর মনোভাবকে সমর্থন করেন নি। এটা কেবল তত্ত্ব হিসেবেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি, ব্যবহারিক জীবনেও যে অনুসরণ করতেন তার বহুল পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্ত্রীকে লেখা একান্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে। ১৯০০ সালে পূজোর সময় কলকাতা থেকে শিলাইদহে স্ত্রী মৃণালিনীদেবীকে লিখিত পত্রের একাংশে সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে লিখেছেন—'ওরা যাতে ভাল হয় ভাল শিক্ষা পায় আমাদের সাধ্যানুসারে সেটা করা উচিত, ওরা ভাল-মন্দ মাঝারি নানারকমের হয়ে আপন আপন জীবনের কাজ করে যাবে, ওরা আমাদের সন্তান বটে তবু ওরা স্বতন্ত্র ....। আমার ছেলের সম্বন্ধে বেশি করে প্রত্যাশা করবার কোন অধিকার আমার নেই।' ২৫ আবার স্ত্রীকে লেখা অন্য একটি পত্রে (৬ই পৌষ, ১৩০৭) দেখি—

'সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে—আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই—সুতরাং সে

সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুঁৎ খুঁৎ না করে ভালবাসার দ্বারা আমার জীবনকে মধুর—আমাকে অনাবশ্যক দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে।' ২৬

এই পারিবারিক পরিবেশের আনুকূল্য ছাড়াও পাশ্চাত্যের রেনেসাঁসজাত যুগপরিবেশও রবীন্দ্র-মানসের উক্ত স্বাতন্ত্র্যবোধকে পুষ্ট করেছিল। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যরক্ষা, বিশেষকরে ব্যক্তি হিসেবে সমাজে নারীর স্বীকৃতির প্রশ্নই ছিল নবযুগের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন। এই যুগচেতনার অভিঘাত রবীন্দ্রমানসে তীব্রতর আলোড়ন সৃষ্টি করে তাঁর প্রথমবার ইউরোপযাত্রার পরে। পাশ্চাত্য সমাজে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত ও নারীর সার্বিক স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা তাঁকে এ ব্যাপারে আরো উন্মুখ করে তোলে। বিলেত থেকে 'য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে ধারাবাহিকভাবে মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে তিনি যে সব পত্র লিখেছিলেন (পত্রগুলি 'ভারতী'তে মাঝে দু'মাস বাদ দিয়ে বৈশাখ ১২৮৬ থেকে শ্রাবণ ১২৮৭ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়), তার ষষ্ঠ পত্রে (ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১২৮৬) তিনি লিখেছেন—'মেয়ে পুরুষে একত্রে মিলে আমোদ-প্রমোদ করাই তো স্বাভাবিক। মেয়েরা তো মনুষ্য-জাতির অন্তর্গত; ঈশ্বর তো তাদের সমাজের এক অংশ করে সৃষ্টি করেছেন।······সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু করে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার কর, তা হলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।' ২৭ লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বিশের কম হলেও ব্যক্তিত্বের মূল্য বিষয়ে যথেষ্ট তিনি সচেতন। ব্যক্তি হিসেবে নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা যথার্থভাবে তখনই হতে পারে যখন তাঁর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়—যা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে আদৌ সম্ভব নয়। এই দাবীও উদীয়মান ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় উদ্ভূত ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি। তাই রবীন্দ্রনাথ এই দাবীর কার্যকারিতা উপলব্ধি করেই নারীর আর্থিক স্বাধীনতার প্রশ্নটির গুরুত্বও পরবর্তী

হৃদয়-ধর্মের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে, দামিনীকে সে বলেছে—'......তোমায় আমায় মিলিয়া একেবারে বুনিয়াদ হইতে আগাগোড়া নূতন করিয়া ঘর বানাইব, সে কেবল আমাদের দু'জনের সৃষ্টি।' (শ্রীবিলাস ৫ম পরিঃ) শ্রীবিলাসের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেমন ঋজুতা বিদ্যমান, তেমনি তার আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ। ভাবাবেগের বাহুল্যবর্জিত, অথচ সংস্কারমুক্ত ও প্রখর বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্ন মানসিকতার অধিকারী বলেই সে অন্যদের তুলনায় আপন ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। সে সাধারণ স্তরের balanced man, এর মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ ব্যক্তিত্বের পথ দেখিয়েছেন। আমাদের সমাজের বাস্তবক্ষেত্রে এই ধরণের balanced ব্যক্তিরাই যে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে রবীন্দ্রনাথ যেন শ্রীবিলাসের মাধ্যমে তাই দেখিয়েছেন, অথচ শ্রীবিলাসের আচার-আচরণে কোথাও উপন্যাসের বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। এখন প্রশ্ন—শচীশের জীবনে যে নানা রূপান্তর ঘটেছে—তাও কি লেখকের উদ্দেশ্যানুসারী? বাস্তবিক তাই; রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, শচীশ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার আন্তর স্বভাবকে, হৃদয়ধর্মকে অবদমিত করেছে। নাস্তিক জ্যাঠামশায়ের শিষ্য লীলানন্দ স্বামীর আস্তিক শিষ্যে রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির ফাঁদে পা দিতে সে রাজী নয় বলেই জোর করে সে নিজেকে 'প্রকৃতির চর' দামিনীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে; অবশ্য দামিনীকে দোরগোড়ায় এলোচুলে বসে থাকতে দেখেও তার হৃদয় টলেছে। শ্রীবিলাস তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, সে যাকে 'প্রকৃতি' বল্‌ছে সেটা তো একটা প্রকৃত জিনিষ,—'তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে তো বাদ পড়ে না' (দামিনী ৩য় পরিঃ)। শচীশ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও বার বার তার অন্তরে অলক্ষ্যে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার প্রমাণ পাই এই উদ্ধৃতিটিতে—'জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে পা টলিতেছে' (দামিনী ৪ পরিঃ)। কিন্তু শচীশের দৃষ্টি একপেশে, সে সীমা-অসীমের, প্রকৃতি-পুরুষের সামঞ্জস্য বিধানে অপারগ, 'অসীম

তুমি আমার, তুমি আমার' – এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল' (শ্রীবিলাস ৩য় পরিঃ)। সীমাকে ছেড়ে সে অসীম-প্রয়াসী, সীমা-অসীমের মিলনসাধনের মাধ্যমে অখণ্ডত্ব প্রাপ্তি, সম্পূর্ণতার আস্বাদন তাই তার পক্ষে দুর্লভ। শচীশের অবলম্বিত আত্মবিকাশের পথও তাই খণ্ডিত, তার ব্যক্তিত্বও সেইজন্য খর্বিত। যে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে আসা হয়েছে প্রথম জীবনের শচীশকে গড়ে তোলার জন্য, সেই জ্যাঠামশায়ের ব্যক্তিত্বও একমুখী নয়। 'পজিটিভিস্ট' জ্যাঠামশাই আপাতঃদৃষ্টিতে হৃদয়াবেগ বিবর্জিত বলে মনে হলেও দু'একটি ঘটনায় তাঁর হৃদয়দৌর্বল্য দেখা গিয়েছে। জগমোহন ও হরিমোহন দুই ভায়ের সম্পত্তি ভাগাভাগির পর শচীশকে যখন তিনি বিদায় দেন, তখন তাঁর অন্তরে স্নেহ-দৌর্বল্য দেখা গিয়েছিল, তাই তিনি 'দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহার ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন'। আর একবার তাঁর বাড়ীতে আশ্রিত ননিবালাকে কাঁদতে দেখে তাঁর চোখেও জল এসেছিল। এটাই স্বাভাবিক; এতেই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের হৃদয়ধর্মকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু জ্যাঠামশাই (জগমোহন) যেহেতু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হৃদয়-ধর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত, তাই তাঁকেও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলা যায় না। তত্ত্বগত-দিক থেকে দামিনীর অবস্থান শচীশের বিপরীত কোটিতে। উপন্যাসের প্রথমদিকে যে দামিনীকে আমরা পাই – তার মধ্যে ছিল উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ। শিবতোষের মৃত্যুর পর সে যখন কার্যকারণ-সূত্রেই লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে এল—তখন সে তার আচার-আচরণে, আহারে-বিহারে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণ বজায় রেখেই চলত। শচীশের প্রতি তার আকর্ষণ অত্যন্ত বাস্তব, বিধবার অতৃপ্ত যৌবনের পরিতৃপ্তিই ছিল একান্ত কাম্য। তার দৃষ্টিতে যে কামনার বহ্নি প্রোজ্জ্বলিত ছিল– তা যেন দহন ক্ষমতা হারালো শচীশের কাছ থেকে আঘাত প্রাপ্তির পর। আপন ব্যক্তিত্বের অপূর্ণতা সম্বন্ধে সে যেন তারপর সচেতন হয়ে উঠল। কিন্তু যে তাকে সচেতন করলো—সেও তো পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নয়। তাই শচীশের কাছ থেকে বারবার আঘাত পেয়ে তার আত্মোপলব্ধি ঘটেছে। সে

বুঝতে পেরেছে যে প্রেমে-সেবায়-মাধুর্যে শচীশের মত সৃষ্টিছাড়া মানুষকে সে যতই বাঁধতে চেষ্টা করুক-না-কেন, শচীশ তার নয়; শ্রীবিলাসের মত সাধারণ মানুষই তার উপযুক্ত। শেষ পর্যন্ত তাই সে শ্রীবিলাসকেই নির্দ্বিধায় বিয়ে করতে পেরেছে। ঔপন্যাসিকের এই সিদ্ধান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নারী-স্বাধীনতার নিরিখে বাস্তব ও ...তিশীল। কিন্তু দামিনীর অন্তরে তখনও শচীশের প্রতি আকর্ষণ সুপ্ত ছিল, তাই সে শ্রীবিলাসকে শচীশ সম্বন্ধে কটূক্তি করতে নিষেধ করেছিল—'তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিও না' (শ্রীবিলাস ৫ম পরিঃ)। তার বুকের ব্যথা, যে ব্যথা তার সুখের দাম্পত্যজীবনের অকালে যবনিকাপাত ঘটালো, সেটাও তো শচীশের প্রতি আকর্ষণেরই প্রতীক; যে পদসেবা করে সে জীবন কাটিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা করেছিল তার আঘাতজনিত ব্যথা তো ঈপ্সিত বস্তুকে না-পাওয়ার ক্ষোভের প্রকাশ। সে তাই বলতে পেরেছে—'এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশ-মনি।' এই 'যৌতুক' নিয়েই সে শ্রীবিলাসকে পেয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রীবিলাসকে বিয়ে করেও দামিনী তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পায়নি। তাই তার কপালে সুখ সইল না, এক বৎসর যেতে-না-যেতেই তার মৃত্যু হল। আবার এও হতে পারে যে, ঔপন্যাসিক নারীর স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দিলেন ঠিকই, শ্রীবিলাস-দামিনী উভয়েই সম্ভাব্য সব রকমের সামাজিক বাধাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঘর বাঁধল, কিন্তু তারা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করবে কি না—সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। আর সেই দ্বিধার symbolic প্রকাশই দামিনীর বুকের ব্যথা। সমাজ-বাস্তবতার বিচারে বিধবা দামিনীর বিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে লেখকের বাস্তবানুরক্তির পরিচায়ক, কিন্তু তার পরিণাম প্রদর্শনে শিল্পীমনের সংশয় প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লেখক দামিনীর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল, তাই অন্তিমকালে দামিনীর মুখ দিয়ে—'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই'—এই কথা বলিয়ে উপসংহার টেনেছেন। অনাগত ভবিষ্যতে সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা যেন অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা

লাভ করে—লেখকের এই প্রত্যাশা এখানে যেমন ব্যঞ্জিত, তেমনি সমাজ-বাস্তবতার স্বীকৃতিও সুস্পষ্ট।

'ঘরে-বাইরে' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩) উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নারীর স্বাধীন সত্তার বিকাশের পথটি একটু ভিন্ন ধরণের। প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে 'চতুরঙ্গে'র ছ'মাস পূর্বে প্রকাশিত হলেও রচনাকালের বিচারে অনুজ। তাই এর আলোচনাও 'চতুরঙ্গে'র পরে করলাম। অন্যান্য উপন্যাসের মত অবিবাহিতা নারী বা বিধবার প্রেম-সমস্যাকে কেন্দ্র করে এখানে কাহিনী যেমন পল্লবিত হয়নি, তেমনি সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বও এখানে প্রত্যক্ষ নয়। এর সমস্যা মূলতঃ বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা। নারীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতার জন্য ঘর ও বাইরের সামঞ্জস্য প্রয়োজন এবং এরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদর্শিত হয়েছে স্বদেশী-আন্দোলনের এক বিশেষ পন্থার সমর্থন-অসমর্থনের পটভূমিকায়। বিবাহের সামাজিক অনুষ্ঠানের বাহ্যিক বন্ধনেই কি নরনারীর অন্তরে প্রীতির বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকে?—বিমলার মধ্য দিয়ে লেখক তারও পরীক্ষা চালিয়েছেন। বিমলার ব্যক্তি-সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতেই নিখিলেশ তাকে ঘরেও যেমন, বাইরেও তেমনি করেই পেতে চেয়েছিল। তাই বলা যায়, বিমলার সুপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ উদ্দীপ্ত হয়েছে নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের জোরেই। সে বিমলাকে বাইরে মেলে ধরতে চাইলে প্রথমে বিমলার মধ্যে দ্বিধা স্পষ্ট, কিন্তু নিখিলেশ বলেছে—বাইরে বিমলার দরকার না থাকলেও, বিমলাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমকে ঘরের সীমাবদ্ধতার গণ্ডী পার করে বাইরের অসীম ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল নিখিলেশ। নিখিলেশের এই আদর্শবোধের সুযোগ নিয়েই তার বন্ধু সন্দীপ তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। দেশ-প্রেমিকের নামাবলী গায়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতার জোরে সে বিমলার অন্তরে কামনার বহ্নি জ্বালিয়েছে। তখন নিখিলেশের প্রেমকে বিমলার নিরুত্তাপ পৌরুষহীন বলে মনে হয়েছে, আর সন্দীপকেই তার প্রেমের একমাত্র যোগ্য বিবেচনা

করেছে। দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্পর্ক, ইউ-রোপীয় সমাজে নরনারীর স্বাধীন সম্পর্কের কথা ইত্যাদি বিষয়ে সন্দীপ তাকে অনেক কিছু শোনায়, তাদের ঘরে ঐ সব বিষয়ের নানা বই সন্দীপ ইচ্ছা করেই ফেলে রেখে যায়—এই ভাবে নানা কৌশলে ধীরে ধীরে সন্দীপ বিমলাকে নিখিলেশের কাছ থেকে মুক্ত করে আপনার সহচরী করে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্দীপ বিমলাকে জয় করতে পারেনি। তার কারণ ছ'দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে—এক, বিমলার প্রতি সন্দীপের আকর্ষণকে যথার্থ প্রেম বলা যায় না, স্থূল কামনা মাত্র। আর তার ব্যক্তিত্বও অত্যন্ত দুর্বল—কৃত্রিম দেশপ্রেমের বাহ্যিক আবরণের অন্তরালে তার চরিত্রে যে উগ্র কামান্ধতা, স্বার্থপরতা ও অর্থলিপ্সা লুকিয়ে ছিল, বিমলার কাছে তা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল যখন সে সন্দীপের জন্যই গহনা বিক্রি করে টাকা যোগাড় করেছে, গিনিও চুরি করেছে। দুই—বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্বও বিমলাকে স্বস্থানে ফিরে আসতে সাহায্য করেছে। তার সহজাত স্বামীসংস্কার ও সতীত্ব ধারণার সঙ্গে অমূল্যের প্রতি নবোন্মেষিত অপত্যস্নেহ যুক্ত হওয়ার ফলে যেমন সন্দীপের উৎকট চেহারা সে দেখতে পেয়েছে, তেমনি অবশেষে নিখিলেশের শান্ত সমাহিত ব্যক্তিত্বের প্রাখর্য ও অনুদ্বেল প্রেমের অতলস্পর্শী মাধুর্য তার দৃষ্টিতে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। কাজেই বাইরের পরীক্ষার মধ্যদিয়েই ঘরের সত্যকে বিমলা শেষপর্যন্ত যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছে, নারী-ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতার জন্য ঘরের গণ্ডীকে অতিক্রম করে বাইরের বিশাল ও জটিল কর্মক্ষেত্রে তার স্বাধীন বিচরণ প্রয়োজন নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার জন্য অবশ্যই সর্তকতা আবশ্যক। দীর্ঘদিন অন্ধকার কক্ষে অবরুদ্ধ থাকার পর হঠাৎ কেউ যদি বাইরের উন্মুক্ত আলোকোজ্জ্বল প্রান্তরে অবারিত বিচরণের স্বাধীনতা পায়, তাহলে তার যেমন পদে পদে বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তেমনি সদ্য স্বাধীন নারীমনেও আসে নানা বাধা, নানা প্রলোভন। আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও বাহ্যিক বাধার সমন্বয়ে সৃষ্টি করে তার মধ্যে এক জটিল মানসিকতা, আর এই সবকে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত

যে আপন কক্ষপথে ঠিক থাকে, সত্যাসত্য, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের দ্বারা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যে যথার্থ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে—তার ব্যক্তিত্বই পরিপূর্ণতা লাভ করে, স্বীয় স্বাতন্ত্র্যও অক্ষুন্ন রাখতে সে-ই সক্ষম হয়। আলোচ্য উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের প্রতিপাদ্য দিকগুলির মধ্যে এটি হচ্ছে একটি প্রধান দিক। নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের সমাজের এই বাস্তব সত্যটিকে তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন বিমলার জীবনের নানা বিচ্যুতি-বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে। আজও আমাদের সমাজে মেয়েদের সন্দীপের মত ভণ্ড চরিত্রের সম্মুখীন হতে হয় অহরহ। আর তাদের ভণ্ডামী যারা ধরতে পারে না, তারাই জীবনে ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। বিমলার জীবনেও সন্দীপকে কেন্দ্র করে এসেছে নানা বিভ্রান্তি। বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতায় নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সে সত্যকে উপলব্ধি করেছে, ফিরে এসেছে আপন কক্ষে। তাই সে যেমন শেষ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছে, উপলব্ধি করেছে আপন ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সঠিক পথকে, তেমনি রবীন্দ্রনাথও সমাজ-সত্যকে তুলে ধরে যথার্থ বাস্তব-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। বিমলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে প্রথমদিকে আমরা বাঙালীবধূর চিরন্তন প্রবণতাগুলি স্পষ্ট লক্ষ্য করি। ভোর-বেলায় উঠে অতি সাবধানে সে স্বামীর পায়ের ধুলো নিত, কারণ সে বলেছে 'আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা।' তারপর বাইরের সংস্পর্শে এসে হঠাৎ তার মধ্যে এমন দ্রুত পরিবর্তন দেখা গেল যে, পূর্বাপর বিচারে তখন তার আচার-আচরণকে অনেকখানি কৃত্রিম বলে মনে হয়। আবার সন্দীপের প্রতি বিদ্বেষে যখন সে আবার নিখিলেশের কাছে ফিরে এসে বলেছে—'আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।'—তখন তার মধ্যে বাস্তবতা স্পষ্টতর হয়েছে, আর এই উক্তির মধ্যেই নিখিলেশের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। কারণ আপন স্ত্রীর চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে স্বীকার করে

নির্দ্বিধায় পুনরায় তাকে গ্রহণ করা বাস্তবে যে কত কঠিন, কত মানসিক শক্তির প্রয়োজন—তা সকলেরই জ্ঞাত। সেই বিচারে নিখিলেশ তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শেষপর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছে বলা যায়। তবে প্রশ্ন হতে পারে—কেন লেখক তাদের পুনর্মিলন স্থায়ী হতে দিলেন না? নিখিলেশ দাঙ্গায় গিয়ে মাথায় চোট নিয়ে অচেতন অবস্থায় ফিরে এল বটে; তারপর সুস্থ হয়ে উঠে তাদের সংসার জীবন কি আবার গড়ে উঠেছিল? এই সব প্রশ্নের উত্তরের কোন ইঙ্গিতই ঔপন্যাসিক দেননি। তবে শেষের দিকে বিমলার মনে যে পাপবোধের সঞ্চার তিনি ঘটিয়েছেন ('আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা দিক থেকে মারতে থাকবে') তাতেই মনে হয় যে, চিরন্তন সংসারের কাছেই বিমলার স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতা যেন আত্মসমর্পিত। লেখকের কোন্ মানসপ্রবণতা এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল—তা এই অধ্যায়ের শেষে সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ করব। এখন যোগাযোগ উপন্যাসে আসা যাক্।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ও নারীস্বাধীনতার পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর এক অভিনব নিদর্শন 'যোগাযোগ' (১৩৩৬) উপন্যাস। এখানে বিপ্রদাস, মধুসূদন ও কুমু এই তিনটি প্রধান চরিত্রের মাধ্যমে ঐ পরীক্ষা প্রদর্শিত হলেও কুমুর মধ্যেই ব্যক্তিত্ব-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রধানভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলার মধ্য দিয়ে যার সূত্রপাত, এখানেই তার স্পষ্ট প্রকাশ। ঔপন্যাসিকের প্রত্যয় আরও সুদৃঢ়। বিবাহ মানেই যে মিলন বা অন্তরের যোগ নয়—এটাই তিনি তুলে ধরলেন এখানে। প্রথাসিদ্ধ বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের হৃদয়ের মিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না, বরং তা নারীর ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করে, নারীর স্ত্রীত্ব ও ব্যক্তিত্ব যে এক নয়—এই সত্যই লেখকের প্রতিপাদ্য। একদিকে আধুনিক স্বাতন্ত্র্যবাদী ''পজিটিভিস্ট্' বিপ্রদাস, অন্যদিকে সামন্তবাদী সমাজের মূল্যবোধপুষ্ট অথচ আধুনিক উদীয়মান ধনবাদী বণিক-সমাজের প্রতিভূ মধুসূদন—এই দু'য়ের টানাপোড়েনে কুমুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরীক্ষা হয়েছে। দুটি পরিবারই বনেদি,—চাটুজ্জ্যে পরিবারের শেষ প্রতিনিধি

বিপ্রদাস সামন্তশাসিত সমাজের ক্ষয়িষ্ণু সংস্কারগুলোকে আপাতঃ-দৃষ্টিতে কাটিয়ে উঠেছে বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণভাবে তা পারেনি। অপরদিকে ঘোষাল পরিবারে মধুসূদন স্বীয় প্রতিভা-বলে জমিদারতন্ত্রের বেদীমূলে নয়া বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে, কিন্তু প্রাচীন সামন্তযুগীয় পারিবারিক সংস্কারগুলো যেন তার মজ্জাগত। সেই জন্যই তার কাছে স্বামীত্ব আর প্রভুত্ব এক। বিপ্রদাস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও নারী-স্বাধীনতার প্রবক্তা, আর মধু-সূদন তার স্ত্রীকে পরিবারের সামগ্রিক সত্তার অধীন করে দেখতে চায়—যার উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব বা আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। এই দু'জনের দুই বিপরীত-ধর্মী মানসিকতার বাহ্যিক চাপ আর স্বীয় চরিত্রের আভ্যন্তরীণ সুপ্ত সংস্কার-সংযোগে কুমুদিনীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিচিত্র জটিলতা দেখা দিয়েছে।

প্রথমেই বিপ্রদাসের কথা ধরা যাক। বিপ্রদাসকে যত বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও স্বাতন্ত্র্যবাদী বলে মনে হোক-না-কেন—তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুর্বলতা স্পষ্ট; কারণ নীলমণি ঘটক কুমুর সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহ প্রস্তাব করে চলে যাওয়ার পর তার মনে গ্রহা-চার্যের গণনা সম্পর্কে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মধুসূদন ঘোষালকে কেবল দাদার কথায় কুমু বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। এছাড়া কৌলীন্যের সংস্কারও সে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি ('বিপ্রদাসের মনের গতি হাল আমলের, তবু জাত-কুলের হীনতায় তাকে কাবু করে।' ১২ পরিঃ) এবং তার আত্মীয় ও জমি-দারীর অংশীদার নবগোপালকে বিয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছে – 'তার চেয়ে সাত্ত্বিকভাবে কাজ করি, সে দেখাবে ভালো। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিয়ে আমাদের সামবেদের মতে বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান পালন করব।' (১৫ পরিঃ) কাজেই বলা যায় যে, 'পজিটিভিস্ট' বিপ্রদাস তার সংস্কার-মুক্তির পরিচয় দিতে পারেনি। কুমুকে সে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে দীক্ষা দিয়ে বলেছে – 'আমার মা যে অপমান পেয়ে-ছিলেন তাতে সমস্ত স্ত্রীজাতির অসম্মান, কুমু তুই ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতে হার মানবি নে।' (৫০ পরিঃ) যে সমাজে নারীর মর্যাদা কলুষিত, যেখানে

নারীর স্বতন্ত্রমূল্য থাকে অস্বীকৃত, সেই সমাজের বিরুদ্ধে সে লড়াইয়ের পরামর্শ দিয়েছে বোন কুমুকে। কিন্তু পরিণামে কুমুর সংস্কারের কাছে যে আত্মসমর্পণ – সেটা কার-নির্দেশে? এই বিপ্র-দাসেরই। শ্বশুর বাড়ী যাবার দিন সকালে সে কুমুকে বলেছে—'শকুন্তলা পড়েছিস—দুষ্মন্তের ঘরে যখন শকুন্তলা যাত্রা করে বেরিয়েছিল, কণ্ব কিছুদূর পর্যন্ত তাকে পৌঁছিয়ে দিলেন। যে লোকে তাকে উত্তীর্ণ করতে তিনি বেরিয়েছিলেন, তার মাঝখানে ছিল দুঃখ, অপমান। কিন্তু সেইখানেই থামল না—তাও পেরিয়ে শকুন্তলা পৌঁচেছিল অচঞ্চল শান্তিতে।.........আমার সমস্ত অন্তঃ-করণের আশীর্বাদ তোকে সেই নির্মল পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিক।' (৫৮ পরিঃ) এই আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শের কাছেই বিপ্রদাসের বিংশ শতকীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের পরাজয় ঘটেছে; এমন কি মধুসূদন-শ্যামার ঘটনা জানার পরে বিপ্রদাসের যে বিদ্রোহী-সত্তাকে বলতে শুনি—'কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবী করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।' (৫০ পরিঃ), পরে কুমুর সন্তান-সম্ভাবনার কথা জানতে পেরেই সে-ই আবার সামাজিক সংস্কারের কাছে আপোষমুখী হয়ে উঠলো কেন? এর মূলে রয়েছে বিপ্রদাসের মানসিকতায় প্রাচীন ও নবীন মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব—এই দ্বন্দ্ব প্রধানতঃ সমকালের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরই মানসিক দ্বন্দ্ব। বিপ্রদাস তাদেরই প্রতিনিধি। কাজেই বলা যায় – বিপ্রদাস যেমন আপন স্বাতন্ত্র্যবোধকে অক্ষুণ্ণ রাখতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সমাজ-সংস্কারের সঙ্গেআপোষ করতে বাধ্য হয়েছে, তেমনি নারী-স্বাধী-নতার আদর্শকে চরমসীমায় উর্ধ্বায়িত করেও চিরন্তনতার বেদী-মূলেই তার প্রতিষ্ঠা করেছে; আবার কুমুকেও চরম আত্মগ্লানি নিয়েই যেতে হয়েছে ঘোষাল পরিবারের বড় বউ হয়ে। ব্যক্তি কুমুর স্বাতন্ত্র্য এখানে অস্বীকৃত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কুমুর স্বাতন্ত্র্যবোধও অনেকাংশে অর্জিত, সহজাত নয়। বিপ্রদাসের সান্নিধ্য ও শিক্ষায় মানুষ হলেও তার অন্তরে নারীমনের প্রচলিত

সংস্কার ও সতীত্ব সম্বন্ধে ধারণা অন্তঃসলিলা ছিল, লেখকের ভাষায়- 'কুমুর চিত্তের এই অন্ধকার মহলে ওর উপর দাদার একটুও দখল নাই'। বিবাহ-ব্যাপারে তার পছন্দ-অপছন্দের কোন বালাই ছিল না, বাঁ চোখ নাচায় শুভ লক্ষণ বলে বিশ্বাস, ঠাকুরের নামে ফুল রেখে ফুলের রঙ মেলানো, মল্লিকদের বাড়িতে সন্ধ্যারতির সময় জোড় হাত করে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করা ইত্যাদির মাধ্যমে কুমুর যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তাতে তাকে আমাদের সেই চির-পরিচিত ভক্তিমতী বাঙ্গালী হিন্দুরমণী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সতীত্ব-সংস্কার সে পেয়েছে তার মায়ের স্মৃতি থেকেই, তাই সে বলেছে—'মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে, প্রজাপতি যাকেই স্বামী বলে ঠিক করে দিয়েছেন, তাকেই ভালোবাসবই। ছেলেবেলা থেকে কেবল মাকে দেখেছি, পুরাণ পড়েছি, কথকতা শুনেছি, মনে হয়েছে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে চলা খুব সহজ।' (৪৪ পরিঃ) তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, মধুসূদনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর এই 'সহজ' কাজটা সে সহজভাবে করতে পারেনি, সংস্কার আর স্বাধীনচিন্তা— এই দুয়ের দ্বন্দ্বে সে নানা প্রশ্নে অস্থির হয়েছে। মধুসূদনের আচরণের প্রতিবাদে সে নিজেকে স্বতন্ত্র রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কখনও সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। শ্বশুরবাড়ী থেকে অসুস্থ দাদাকে দেখতে এসে আর ফিরে যায় নি। তার দাদার উপদেশে, এমনকি মোতির মা তাকে নিতে এলে দাদাকেই সে জিজ্ঞাসা করেছে—'উনি জানতে চান, তাঁদের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে কি না'? (৫১ পরিঃ) তাই মনে হয় কুমুর মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্যবোধের স্ফুরণ লেখকের ঈপ্সিত, তা একান্তভাবেই বিপ্রদাস-আরোপিত। কিন্তু এও সত্য যে, সে সবক্ষেত্রে দাদার পরামর্শও মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারে নি। যেখানে তার অন্তরে সংস্কার প্রবল হয়ে উঠেছে, সেখানেই সে বিপ্রদাসের থেকে পৃথক। আত্মব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় কুমু বরা-বর মধুসূদনের বিরোধী থাকতে চায়নি; তার প্রমাণ বিপ্রদাস যখন তাকে ব্যক্তিত্বের মূল্য বিষয়ে উদ্দীপিত করতে চেয়েছে, তখন সে-কথার জোরকে ছাপিয়ে তার মনে পড়েছে মায়ের কথা—'বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালবাসতেন সে কথা ভুলো না দাদা। সেই ভালবাসায়

অনেক পাপের মার্জনা হয়' (৫০ পরিঃ)। তবে কি মুকুন্দলালের সংসারে নন্দরাণী যেভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ঐ সংসারকে মানিয়ে নিয়েছিলেন, সেই পথেই কুমু তার সমস্যার সমাধান খুঁজছে ? অন্ততঃ বিপ্রদাসের শিক্ষাই একমাত্র অভ্রমাত্মক এবং নারীব্যক্তিত্বের সমস্যা-সমাধানে অবশ্যগ্রাহ্য—কুমু আর একথা যেন নিঃসংশয়ে মানতে পারছে না। আবার মধুসূদন-শ্যামার সম্পর্ক তার কানে উঠলে সে আক্ষেপ করে বলেছে—'আজ কতবার বসে বসে ভেবেছি দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এ বিপদ ঘটত না। তবুও মনের মধ্যে যে দেবতাকে নিয়ে দ্বিধা উঠেছে, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে এড়াতে পারি না। ফিরে ফিরে সেই-খানে এসে লুটিয়ে পড়ি।' (৫১ পরিঃ) বিপ্রদাস থেকে নিজের এইটুকু পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল বলেই বোধ হয় শেষবারে ঘোষাল পরিবারে ফিরে যাবার সময় দাদার নির্দেশ সত্ত্বেও সে বলতে পেরেছে—'কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব; চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড় বৌ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই ?' (৫৭ পরিঃ) যদি ধরে নেওয়া যায় যে, বিপ্রদাসের অনুসৃত আধুনিক মানবিকতাভিত্তিক চিন্তার প্রভাবেই কুমুর এই সাময়িক বিক্ষোভের প্রকাশ, তবু এখানে যে স্বাতন্ত্র্যবোধের ইঙ্গিত রয়েছে তাই চরিত্রটিকে নিঃসন্দেহে মহিমো-জ্জ্বল করে তুলেছে। বাস্তবে তাকে আপোষ করতে হলেও তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীন সত্তার দাবী সম্বন্ধে সচেতনতা এখানে সুস্পষ্ট—যা শেষ পর্যন্ত বিপ্রদাসের মধ্যেও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এসেছিল। অতএব একথা অসঙ্গত নয় যে, দাদার কাছ থেকে পাওয়া চেতনাই কুমুকে দাদার চেয়ে পৃথক করে তুলেছে—তাই তো দাদার নির্বিচার সামঞ্জস্য-প্রবণতাকে সে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারে নি। এখানেই কুমুর বিশিষ্টতা। আর এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করেই সমালোচক কুমুদিনীকে 'বাংলা উপন্যাসের নায়িকাদের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় বিদ্রোহিণী' ৪০ বলে মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলার মধ্য দিয়ে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

বজায় রাখা ও নারী-ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে যে-সমস্ত সামাজিক বাধা আছে—তা চিত্রিত করেছেন। 'যোগাযোগে' কুমুর ক্ষেত্রে যে বাধা—তা বাহ্যিক নয়, আভ্যন্তরীণ। সমাজ-বিবর্তনের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে দ্বন্দ্বপূর্ণ সমাজ-মানসিকতার এক জটিল পরিবেশই অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। চাটুজ্জে পরিবার ও ঘোষাল পরিবার সেই পরিবেশের দৃষ্টান্ত। দুই পরিবারের বর্তমান মানসিকতার সংঘাতটাই কুমুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রধান বাধা। তবু এখানে কুমুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত, ঔপন্যাসিকেরও পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট। কিন্তু উপসংহার যে ভাবে টানা হয়েছে শিল্প-রীতির দিক থেকে তা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ, কেন না এখানে মনে হয় লেখক যেন কুমুকে শ্বশুর বাড়ী পাঠানোর জন্যই প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে আপোষ করেছেন, আর সেই আপোষের মনোভাবকে অড়াল করার জন্যই sublimation—এর প্রয়াস। কুমু যদি বিদ্রোহিণী হয়ে শ্বশুর বাড়ী না যেত তবে কি ঠিক হ'ত? না, কুমুর আন্তর-সংস্কার যে ভাবে আমরা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি তাতে সে অবকাশ ছিল না, বরং তাতে বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হ'ত। মধুসূদনের মত স্বামীর কাছে কুমুর ফিরে যাওয়াটা যে স্বেচ্ছায় নয়, অনিবার্য পরিস্থিতির চাপে বাধ্যতামূলক—তা আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কেন সে ফিরে গেল—তার ইঙ্গিত দেওয়ার অবকাশ যথেষ্ট ছিল; সেটা হলেই উপন্যাসের বাস্তবতা পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হত।

মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক অধিকারবোধই প্রবল। যা তার—সেটা তারই; অন্য কারও নয়—এই প্রভুত্বের মনোভঙ্গীই মধুসূদন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই প্রভুত্বের ঝোঁক ও দম্ভের উৎস তার হীনতাবোধ। চাটুজ্জে পরিবারের মর্যাদা সম্পর্কে তার মনের মধ্যে যে complex গড়ে উঠেছিল—তাই তাকে করে তুলেছে দাম্ভিক। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সে তার এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছে বলা যায়। কুমুর সঙ্গে তার বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনে যে প্রবণতা তার অন্তরে ক্রিয়াশীল ছিল সেটা আদৌ প্রেম নয়, দ্বেষ ও প্রতিশোধ-স্পৃহা। কাজেই দাম্পত্য-জীবনে কুমুর প্রেম স্বীকৃতি লাভ করবে—সে আশা করা যায় না।

লেখক মধুসূদনের চরিত্রটির বর্ণনা দিতে গিয়ে উপন্যাসের এক জায়গায় বলেছেন—'চাঁদের যেমন এক পিঠে আলো আর এক পিঠে চির অন্ধকার, মধুসূদনের চরিত্রেও তাই, ইংরেজের অভিমুখে তার মাধুর্য, পূর্ণচাঁদের মতোই উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। অন্যদিকটা দুর্গম, দুদৃশ্য এবং জমাট বরফের নিশ্চলতায় দুর্ভেদ্য' (১৯ পরিঃ)। অন্যত্র মধুসূদন সম্বন্ধে লেখকের আর একটি মন্তব্য উল্লেখ করছি—'বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয়, ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেমনি করেই ভেবেছিল।'—মধুসূদনের এই স্বভাবের কাছে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা আশা করা অর্থহীন। একদিকে সে নিজেকে বিপ্রদাসের মহাজন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে, অন্যদিকে কুমুকে তার দাদার 'চেলাগিরি' করা থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাতে সফলও হয়েছে। অবশ্য মানসিক উৎকর্ষে নয়, অর্থের দাম্ভিকতায় ও প্রভুত্বের মনোভঙ্গীতে। শ্যামার প্রতি তার আসক্তি শুধু কুমুর প্রেমে অপরিতৃপ্তি বা অন্য কোন মানসিক দৌর্বল্য-জনিত নয়, বিপ্রদাস ও কুমুর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার ঝোঁকেও শ্যামার সঙ্গে সহবাস করেছে; অবশ্য এর জন্য শ্যামা ও কুমু উভয়েই অনেকাংশে দায়ী। শ্যামা চেয়েছে মধুসূদনের কাছ থেকে কুমুর দখল খারিজ করে দিয়ে নিজের দখল সম্পূর্ণ করতে, আর কুমুর নির্বিকার মনোভঙ্গী মধুসূদনের প্রবৃত্তিকে নিঃসন্দেহে অশান্ত উদ্দাম করে তুলেছে। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, মধু-সূদনের ব্যক্তিত্ব মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে পড়েছিল—বিশেষ করে সে নিজেই যখন কুমুকে আনতে তাদের বাড়ী যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, হঠাৎ কুমুদের বাড়ী যাবার তার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল, উপন্যাসের মধ্যে তার পরিচয়ও রয়েছে—'মধুসূদন ইচ্ছে করেই খবর না দিয়েই এসেছে। এপক্ষ আয়ো-জনের দৈন্য ঢাকা দেবার অবকাশ না পায় এটা তার সংকল্পের মধ্যে।' (৫৫ পরিঃ) কুমু যখন তাকে বলেছে যে, সে ঘোষাল বাড়ীতে যেতে চায় না তখন মধুসূদনকে বলতে শুনি—'জান, পুলিস ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড় ধরে! না বললেই

হল !'—এটা তার হৃদয়ের জোর নয়, অর্থের দম্ভ ও প্রভুত্বের জোর। এই মধুসূদনের কাছে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে কি ভাবে? কুমুও তার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা তার কাছে আদায় করতে চাইলেও কোন দিন পায় নি, সে তার অহংবোধ শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেই চলেছে। সে ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় নবোদ্ভূত বণিকতন্ত্রের প্রতিভূ, হৃদয়ধর্ম অপেক্ষা অহংবোধ ও প্রভুত্বধর্মই এ চরিত্রে স্পষ্টতর।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের উপন্যাসগুলোর মূল তত্ত্ব বক্ষ্যমান বিষয়বস্তু থেকে কিছুটা পৃথক। সেখানে মানব-জীবনের বিচিত্র পর্যায়ে ও পরিস্থিতিতে প্রেম কীভাবে অপ্রতিরোধ্য ও অনিবার্য হয়ে ওঠে মূলতঃ তাই প্রদর্শিত হয়েছে, আবার 'শেষের কবিতা'য় লেখকের subjective purpose ও ছিল। একমাত্র 'চার-অধ্যায়' উপন্যাসে এলা-অতীনের সংলাপের মধ্যে নারী-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন কিছুটা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, তবে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় যদি তার আত্মোপলব্ধির ও অধিকারবোধের সমার্থক বলে ধরে নিই, 'মালঞ্চে' নীরজার মধ্যে তা সুপ্রকাশিত। সুখী দাম্পত্য জীবনের মাঝে তৃতীয় নারীর অনুপ্রবেশ কীভাবে সংসার-জীবনে ভারসাম্য বিনষ্ট করে—তাই দেখানো হয়েছে 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাসে। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। বঙ্কিমও 'বিষবৃক্ষে' তাই দেখিয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে সূর্যমুখী অপেক্ষা নীরজা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধিকার-সচেতন। নীরজার মধ্যে আপোষকামিতা নেই, সে তার স্বামী আদিত্য আর তার ফুলের বাগানের উপর সরলার আধিপত্য কিছুতেই মেনে নেয় নি। এটা তার নিছক ঈর্ষা নয়, প্রেমের গভীরতা ও তীব্র আত্মমর্যাদাবোধেরই প্রকাশ। আদিত্য-সরলার প্রণয় সম্পর্ক যখন প্রগাঢ় তখন সে সূর্যমুখীর মত স্বামীর পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করেনি, বা শর্মিলার মত কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেনি, সে বিদ্রোহিণী হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্যচিন্তা ও সম্ভ্রমবোধ যে কত গভীর, তার পরিচয় পাওয়া যায় রমেনের সঙ্গে কথাবার্তার সময়—'বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক

ফেটে যায়। আমার এতদিনের আনন্দকে ফেলে রেখে হাসিমুখেই চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিম্‌টিম্‌ করেও জ্বলবে। একথা ভাবতে গেলে যে মরতেও ইচ্ছা করে না।' (অনুঃ ৬) আবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে সরলাকে বলেছে – '.........জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব থাকব।.........পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।' (১০ অনুঃ) এই মৃত্যুঞ্জয়ী স্বাতন্ত্র্যবোধে সমুজ্জ্বল নারীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যেভাবে রবীন্দ্রনাথ নীরজা চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন—তা সমগ্র বাংলা উপন্যাসে বিরল বললেও চলে। উনবিংশ শতাব্দীর নারীমুক্তি আন্দোলনের মর্মবাণী মধুসূদনের পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে মর্যাদার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। 'মনের সংসারের সেই কারখানা-ঘরে···আগুনের জ্বলুনি' দেখাবার যে অভিপ্রায়ে তিনি বিনোদিনীকে সৃষ্টি করেছিলেন নীরজার মধ্যে তারই পরিণত রূপের প্রকাশ। পার্থক্য শুধু এই যে একজন অকালবৈধব্যজনিত অতৃপ্ত কামনার বহ্নিতে দগ্ধ হয়েছে, অন্যজন সধবা থেকেও সব হারাবার আশঙ্কায় বিদ্রোহিণী। নীরজার মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ব অন্যপন্থায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

'চার অধ্যায়' (১৩৪১) উপন্যাসখানি বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট পটভূমিকায় রচিত। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি লেখকের বিমুখতাই এই উপন্যাস রচনার প্রেরণা। রবীন্দ্রচিন্তায় সন্ত্রাসবাদীরা দলের ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের বিনাশ ঘটায়, দলীয় শৃঙ্খলার নামে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সেখানে নিষ্পিষ্ট হয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রনাথের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিছক আত্ম-কেন্দ্রিকতা নয়, তা স্বতঃই বিকাশোন্মুখ ও স্বাধীনভাবে বিশ্ব-মানবতার অঙ্গীভূত হওয়ার প্রয়াসী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'চার-অধ্যায়ে' ইন্দ্রনাথ ও তার চেলাদের কার্যকলাপ মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন নি, হৃদয় ধর্মের অবদমন তাঁর দৃষ্টিতে 'বিভীষিকাময়' পন্থা। তাই এলা ও অতীনের মধ্যদিয়ে স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ ও প্রেমের

অপ্রতিরোধ্যতার তত্ত্ব প্রদর্শন করতে গিয়ে সেদিনের সমাজ-বাস্তবতা অস্বীকার করেছেন। এতে কি তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধও ক্ষুণ্ণ হয় নি? যে এলা প্রথমাবধি তীক্ষ্ণ আত্মসচেতন, মায়ের কাছে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু বাবার নিত্য অসম্মান যাকে আহত করেছে, আত্মসম্মান পঙ্গু হওয়ার আশঙ্কায় ও শাশুড়ির নির্যাতন এড়াবার জন্য যে প্রথমে বিয়ে করা পছন্দ করেনি এবং 'নবযুগের দূতী' সেজে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে দেশের কাজে নেমেছে—শেষ পর্যন্ত সে না পেরেছে আপন স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে, না পেরেছে সার্থকভাবে বিপ্লবী-দলে যুক্ত থাকতে। শুধু সে নিজে পরিবর্তিত হয়েছে তা-ই নয়, অতীনকেও পরিবর্তন করেছে অর্থাৎ দেশের প্রয়োজন থেকে সরিয়ে এনে বিপ্লব-বিরোধিতায় প্রেরণা যুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়েছে, ঐ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টিও তাঁর পূর্ব-পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। দেশের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে সেদিনের যুবসম্প্রদায় ও তরুণীদের মধ্যে যে অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা দেখা গিয়েছিল ইতিহাসে তার প্রমাণ দুর্লভ নয়। ১৯০৫ সালে প্রকাশিত অরবিন্দ ঘোষের 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকাখানি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ৪১ ভগিনী নিবেদিতাও বাংলার বিপ্লববাদের মূলে প্রথম অবস্থায় রসদ যুগিয়েছিলেন এবং পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট ভারতীয় বিপ্লব সমিতির (Revolutionary National Council) অন্যতমা ছিলেন। ৪২ এছাড়া, কলকাতার বীণা দাস (ভৌমিক), কুমিল্লার শান্তি ঘোষ (দাস) ও সুনীতি চৌধুরী, চট্টগ্রামের কল্পনা দত্ত (যোশী) ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বরিশালের শান্তিসুধা ঘোষ প্রমুখ তরুণীদের বিপ্লবী কার্যে আত্মত্যাগের কথাও সর্বজনবিদিত। এঁরা কেউই এলার মত ছিলেন না। তবে গুপ্ত সমিতিগুলিতে সেদিন এলার মত যুবতী বা অতীনের মত যুবকের কদাচিৎ দেখা গেলেও সমকালীন যুবসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তারা বিবেচ্য নয়, সাহিত্যে চিত্রিত হবার যোগ্যতাও তাদের নিশ্চয় ছিল না। আর যারা প্রকৃত যোগ্য, তাদের স্বাভাবিক আবেগ-উৎসাহ-কর্মোদ্যোগ সমেত চিত্রিত করলেন না কেন রবীন্দ্রনাথ? অথচ ঐ সব বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ যুবসমাজের প্রতি তাঁর আকর্ষণও কম ছিল

না। মূলতঃ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হিজলী বন্দী-শালার বন্দীদের উপর ইংরেজের অমানবিক ও নিষ্ঠুর নিপীড়নে (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের কথা আমরা সকলেই জানি। তবে 'চার-অধ্যায়ে'-এ এলা-অতীনকে ঐভাবে আঁকলেন কেন? সহিংস বৈপ্লবিক কর্মপন্থার প্রতি বিরূপতাই যে এর কারণ তা পরে প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করবো। এখানে শুধু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যখন কমলা চট্টোপাধ্যায়, বীণা দাস, কল্পনা দত্ত প্রমুখেরা আরামের অন্তঃপুর ছেড়ে রাজ-নৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন তখনই অতীন-সর্বস্ব রোমাণ্টিক এলা অথবা বিমূঢ় বিমলা মাত্র অঙ্কন করলে সমাজ-বাস্তবতার অপলাপ হয়। যদিও বলা হয়ে থাকে 'বাংলার সন্ত্রাস-বাদের রক্তবর্ণ পটভূমিকায় দুটি তরুণ-তরুণীর প্রেমের উন্মেষ, উন্মীলন ও আত্মঘাতী পরিণতি—এই হল চার অধ্যায়' ৪৩, এমনকি রবীন্দ্রনাথও এই উপন্যাসের কৈফিয়তে লিখেছিলেন—'......বিপ্লবের ঝোড়ো হাওয়া দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়,' তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ঐ প্রেমচিত্র অঙ্কনে দেশের সমকালীন বৈপ্লবিক পরিস্থিতির বাস্তবতার রূপায়ণ ঘোলাটে হয়ে গেছে।

যা হোক, এলা পরিবর্তিত হ'ল। পরিবর্তিত এলাকে বলতে শুনি—'জয় করবার সেই গর্ব আজ নেই, ইচ্ছে হারিয়েছি—বাইরের কথা ছেড়ে দাও, অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্দিনী।' (২য় অধ্যায়) তার এই পরিবর্তন প্রেমের অপ্রতিরোধ্যতার তত্ত্ব অনুযায়ী স্বাভাবিক ও বাস্তব বলে তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়—যে প্রেমে সে ধরা দিয়েছে—তার মর্যাদা কি শেষ পর্যন্ত সে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে? কারণ নারীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অন্যতম পরিচায়ক তার স্বাধীন প্রেমের প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—'মেয়েদের... সৃষ্টির কেন্দ্রগত জ্যোতির উৎস হচ্ছে প্রেম। এই প্রেম নিজের স্ফূর্তির জন্যে, সার্থকতার জন্যে, যাকে চায় সে জিনিষটি হচ্ছে মানুষের সঙ্গ। প্রেমের সৃষ্টিক্ষেত্র নিঃসঙ্গ নির্জনে হতে পারে না,

সে ক্ষেত্র সংসারে'। ৪৪ বস্তুতঃ এলার প্রেম সমাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। অতীন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই পরিণতি যেমন এলার ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করেছে, আবার অতীনের দুর্বলতাকেও প্রকাশ করেছে। অতীন বিপ্লবীদলে যোগ দিয়েও শেষ পর্যন্ত বিপ্লববাদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছে। কারণ এই পন্থা নাকি তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রতিহত করেছে, আপন স্বভাবকে করেছে হত্যা। কিন্তু সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেরিয়ে এসে এলার প্রেমকে বলিষ্ঠতার সঙ্গে গ্রহণ করার ক্ষমতাও সে অর্জন করে নি। এখানেই তার ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা। যে-প্রেমের প্রেরণায় সে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল, সেই প্রেমকে সার্থকতায় প্রতিষ্ঠা করতে পারল না—এটা নিঃসন্দেহে পৌরুষ-হীনতারই লক্ষণ। তাই বলা যায়—'চারঅধ্যায়'-এ অক্ষুণ্ণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় নেই, বরং বিপরীতটাই প্রকট। একমাত্র কানাই আর বটু ছাড়া প্রতিটি চরিত্র বাইরে যত দুর্দম, অন্তরে তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল। বিপ্লবপন্থার প্রতি বিরূপতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে এলার গুপ্তসমিতিতে অংশগ্রহণের যে চিত্র তুলে ধরলেন, তাতে সেদিনের নারীসমাজের স্বাধীনতাস্পৃহার বাস্তব রূপটি কিছুটা ফুটে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু দেশের সমাজ-পটভূমির বিচারে এখানে সমাজ-বাস্তবতা যেমন ক্ষুণ্ণ হয়েছে, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-বোধও অটুট থাকেনি।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নের নিরিখে এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ, মালঞ্চ ও চার অধ্যায় উপন্যাসের আলোচনা করা হ'ল। দেখা গেল যে, রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রশ্নের সমাধান খুঁজেছেন প্রচলিত সমাজ-নীতি ও প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আদর্শের মধ্যেই। আবার ব্যক্তির সমাজ-সংস্কার থেকে মুক্তিপ্রয়াসেরও আভাস দিয়েছেন। তাই তাঁকে প্রথমটির ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী ও দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বাস্তববাদী বলে মনে হয়। কিন্তু নারীস্বাধীনতার প্রশ্নে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল এবং সেটা থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নারীর পরাধীনতার প্রকৃত আর্থ-সামাজিক কারণ ও নারীমুক্তির উপায়ের ইতিহাস-ভিত্তিক

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ রবীন্দ্রভাবনায় প্রাধান্য পেতে পারে না। শোষণ-নির্ভর সামাজিক সম্বন্ধেরই একটি রূপ নারীর পরাধীনতা, আর সমাজে শোষণের অবসানের সঙ্গে নারীস্বাধীনতার প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজের প্রতিটি স্তর এক একটি বিশেষ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। তাই বিশেষ সমাজে নারীর স্থান, নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, বিবাহপ্রথা ইত্যাদি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে নিরূপিত ও রূপান্তরিত হয়। সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের অনিবার্যতা এবং সার্বিকভাবে সমাজের চালিকাশক্তির অংশরূপে তার গুরুত্ব স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত নারী-স্বাধীনতার প্রশ্ন কথার কথাই থেকে যায়, বাস্তবে সার্থকতা লাভ করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে লেনিনের মন্তব্য স্মরণীয়—'If we do not draw women into public activity, into the militia, into political life, if we do not tear woman away from the deadening atmosphere of household and kitchen, then it is impossible to secure real freedom,......' ৪৫ ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের পর্বে, বিশেষ করে ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের যুক্তিবাদের আলোকে নারীস্বাধীনতার দাবী প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কাজেই রবীন্দ্র-উপন্যাসেও এপ্রশ্নের অবতারণা যেমন বাস্তব কারণসম্মত, আবার তেমনি এই প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-মানসে দ্বন্দ্ব না-থাকাই অস্বাভাবিক। কারণ রবীন্দ্রযুগ বুর্জোয়া মানবিকতার যুগ। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ভাববাদী চিন্তানায়কেরা ব্যক্তিহিসেবে নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকার করেন; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। রবীন্দ্র-উপন্যাসেও আমরা তাই দেখি, 'চোখের বালি'তে বিনোদিনীর স্বাধীন প্রেমকে শিল্পী স্বীকার করেছেন, তার স্বাধীন মর্যাদাও মেনে নিয়েছেন, কিন্তু বিবাহের মাধ্যমে তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ও সংশয়ান্বিত, তাই শেষে তাকে কাশীবাসিনী হতে হয়েছে। 'গোরা'তে যেন রবীন্দ্রনাথ আর একধাপ এগিয়ে ললিতাকে সমাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন।

পরেশবাবু বলেছেন—'বিবাহ তো কেবল ব্যক্তিগত নয়, এটা একটা সামাজিক কার্য,.........' (৫৯ পরিঃ)। পরেশবাবু যে রবীন্দ্র-আদর্শের মণ্ডনে মণ্ডিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই পরেশ-বাবুর মুখে যখন শুনি—'সমাজ প্রবল তাতে সন্দেহ নাই, অতএব বিদ্রোহিণীকে দুঃখ পেতে হবে।......সে জন্যে যারা দুঃখ স্বীকার করতে রাজী আছে, আমি তো তাদের নিন্দা করতে পারব না' (৬০ পরিঃ),—তখন মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ এখানে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠায় উৎসুক। কিন্তু নারী নবলব্ধ অধিকারকে কিভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে—সে বিষয়েও রবীন্দ্র-মানস ছিল সংশয়াচ্ছন্ন। তাই 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে প্রশ্নটির উত্থাপন ও বিস্তার সম্পূর্ণ নতুনভাবে লক্ষ্য করি। নিখিলেশ বিমলাকে বাইরের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছে, ঘরে ও বাইরে সর্বত্র সে বিমলাকে সমানভাবে পেতে চায়। তার ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে চায়; কিন্তু বিমলা বাইরে গিয়ে আত্মসংযম হারালো, সন্দীপের মত অর্থলোলুপ, কামান্ধ ও স্বার্থপর এক যুবককে সে প্রণয়াস্পদ হিসেবে বেছে নিল, নিখিলেশের শান্ত-সংযত প্রকৃতিকে সে প্রেমশূন্য বলে ভুল বুঝতে শুরু করল। কিন্তু নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সে যখন নিজের বিচ্যুতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, তখন সে নিখিলেশের কাছে ফিরে এসেছে ঠিকই, কিন্তু অন্তরের সংস্কার-জনিত পাপবোধের উন্মেষ ঘটেছে তার মনে। বলা যায় যে, ইউরোপীয় উগ্র আধুনিকতা সন্দীপের মধ্যে দেখা দিয়েছে, নিখিলেশ যেন সনাতন ভারতের স্থিতি ও সহিষ্ণুতার আদর্শ—বিমলা উভয় পন্থার দোটানায় বিমূঢ় বাংলা-দেশেরই প্রতিমূর্তি।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস যদিও ঘর ও বাইরের সমন্বয়েই মানব-জীবনের এই বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মক্ষেত্র সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তবু দেখি 'ঘরে-বাইরে'র বিমলা যেমন শেষে অন্তঃপুর-অভিমুখী, ঠিক তেমনি 'চার অধ্যায়ে' এলা অতীনকে নিয়ে ঘরবাঁধার স্বপ্নে বিভোর। রবীন্দ্রনাথ অতীনকে দিয়ে এলার নারীপ্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে যে প্রয়াসী তার সাক্ষ্য মেলে অতীনের এই মন্তব্যে-

—'এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হ'ল, যে মেয়েটি রিয়ল্। এক-টুকুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোমাণ্টিক। যে-সংসারে কাঁসার থালায় দুধভাত মাছের মুড়ো তারই কেন্দ্রে বসে আছ তালপাতার পাখা হাতে।' (৩য় অধ্যায়) আবার এলাকে দিয়েও বলিয়েছেন—'প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে।......পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।' (২য় অধ্যায়) এলার এই উক্তি যদি রবীন্দ্রনাথের মতের পরিচায়ক হয়, তবে তা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচিত বঙ্কিমের মতের প্রায় সমধর্মী ('ধর্মতত্ত্ব' ২৩ অধ্যায়ে গুরু-শিষ্যের কথোপকথন স্মরণীয়, এগ্রন্থের 'বঙ্কিম অধ্যায়' পৃঃ ১৫০ দ্রঃ)। 'বায়োলজির সংকল্প' বা প্রকৃতিগত পার্থক্য যে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও সমানাধিকার অর্জনের পথে অন্তরায় নয়, সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীদের ক্রমবর্ধমান সাফল্যই তার প্রমাণ। রবীন্দ্র-সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলির মধ্যে এই ধরণের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সহজাত হীনমন্যতা তাঁর উপন্যাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। এমনকি 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুকে আপাতঃদৃষ্টিতে বিদ্রোহিণী হিসেবে চিত্রিত করেও শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মূল্যবোধের কাছেই তাকে পরাভব স্বীকার করানো হয়েছে। ভাবী সন্তানের কথা চিন্তা করেই কুমুকে ফিরে যেতে হয়েছে মধুসূদনের কাছে ঘোষাল বাড়ীর বড় বৌ হিসেবে। সেখানেও তৃতীয় পুরুষ নামমাত্রে উপস্থিত। পাঠকরা বুঝে উঠতে পারেন না, নবজাতকটি কুমু অথবা মধুসূদনের পুত্র হিসেবে বেড়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ নারীস্বাধীনতার প্রশ্নে, বিশেষকরে নারীর স্বাধীন-প্রেমে অধিকারের প্রশ্নে অনেক সময়ই শেষ পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত। সূচনার জোর সমাপ্তিতে কোমল হয়ে আসে। অবশ্য একদিকে যেমন যুগ ও সমাজকে অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, অন্যদিকে আবার প্রাচীন ভারতীয় সমাজের আদর্শ ও তখনকার নারীর জীবনচর্যার প্রভাবও তাঁর মনে ক্রিয়াশীল ছিল—তাই 'যোগাযোগে' কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, মীরা-বাঈয়ের কাহিনী ইত্যাদি প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এটা তাঁর

রোমান্টিক কবি-মানসেরই প্রতিফলন। নারীর স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেও লেখক পুরুষের সঙ্গে তার সমকক্ষতা যেন মানতে চান নি—তাই 'গোরা'তে গোরার মুখে শুনি—'দিন আর রাত্রি, সময়ের এই যেমন দুটো ভাগ—পুরুষ এবং মেয়েও তেমনি সমাজের দুই অংশ। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতোই প্রচ্ছন্ন—তার সমস্ত কাজ নিগূঢ় এবং নিভৃত।........মেয়েদের যদি তেমনি আমরা প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে টেনে আনি তাহ'লে তাদের নিগূঢ় কর্মের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়—তাতে সমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তি ভঙ্গ হয়, সমাজে একটা মত্ততা প্রবেশ করে।' (১৭ পরিঃ) সাধারণভাবে গোরা এই অভিমত পোষণ করলেও পরবর্তী পর্যায়ে 'কিন্তু সুচরিতা সম্বন্ধে নিজের মতকে সে মনে মনেও কখনো প্রয়োগ করিয়া দেখে নাই। সুচরিতা গৃহিণী হইয়া কোন-এক গৃহস্থ ঘরের অন্তঃপুরে ঘরকন্নায় নিযুক্ত আছে এ কল্পনা তাহার মনেও ওঠেনা।' (৬২ পরিঃ) গোরার মনে এই যে দ্বন্দ্ব, এটাই বিংশ শতকের প্রথমার্ধের শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানসিক সংকট—একদিকে বুর্জোয়া মানবিকতাবাদের প্রতি আদর্শনিষ্ঠা, অন্যদিকে বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে চিরন্তন-সংস্কারজনিত সীমাবদ্ধতা। রবীন্দ্রনাথও এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নন। তাই তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদিতে যে-সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন—তাতে দেখা যায় তিনি নারীর ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র মর্যাদা ও স্বাধীনতা স্বীকার করেও তাদের প্রকৃতি বা স্বভাবের ভিন্নতার জন্যই সে-স্বাধীনতা সীমায়িত করার পক্ষপাতী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের একাংশ উদ্ধৃত হ'ল— '...মানব সমাজের বৃহৎ ক্ষেত্রে নারী আপন প্রকৃত আসন পায়নি বলেই আজ সে আত্মমর্যাদার প্রয়াসে পৌরুষ-লাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত। অন্তঃপুরের প্রাচীর থেকে বাইরে চলে আসার দ্বারা নারীর মুক্তি নয়। তার মুক্তি এমন একটি সমাজে যেখানে তার নারীশক্তি, তার আনন্দশক্তি আপন উচ্চতম প্রশস্ততম অধিকার সর্বত্র লাভ করতে পারে।' 'নারীর-মনুষ্যত্ব' নামক পত্র প্রবন্ধেও তিনি বলেছেন—'স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে সেটা অস্বীকার করা ভুল।......মেয়েদের কাছে প্রকৃতির যে দাবী,

পুরুষের কাছে প্রকৃতির সে দাবী নেই।······আমার মতে সংসারে মেয়ে পুরুষের ক্ষেত্র একই। সেই এককক্ষেত্রে উভয়ে ভিন্নভাবে কাজ করে।······মেয়েদের উপরে প্রকৃতির দিক থেকে অত্যন্ত মা হবার তাগিদ আছে। তেমনি সমাজের দিক থেকে পুরুষের উপর তাগিদ আছে অত্যন্ত কেজো হবার।' রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত পরিণত বয়সের হলেও আলোচ্য সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি-ভঙ্গী যে আজীবন অপরিবর্তিত ছিল তার পরিচয় পাই যুবক রবীন্দ্রনাথের লেখা (মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে লেখা—১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬) 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে' পত্র-প্রবন্ধে। ৪৬ রমাবাই নামে এক মহারাষ্ট্রীয় বিদুষী পুণায় এক সভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ, কেবল মদ্যপানে নয়। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন—সেই অসম্পূর্ণ বক্তৃতার সমালো-চনায় তিনি বলেন যে, পুরুষ বল ও বুদ্ধিতে নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আবার নারী সৌন্দর্য ও হৃদয়াবেগে শ্রেষ্ঠ। তিনি এই ব্যাপারে প্রকৃতির Law of compensation (ক্ষতিপূরণের নিয়ম)—এর উল্লেখ করেছেন—একের যা নাই, অন্যের তা আছে। তাই পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করেই প্রত্যেকে পরিপূর্ণতা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের মতে 'যতদিন মানবজাতি থাকবে,········· ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন করতেই হবে। এ-কাজটা এমন কাজ যে, এতে অনেক দিন ও অনেক্ষণ গৃহে রুদ্ধ থাকতে হয়, নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।······এই রকম সন্তানকে উপলক্ষ করে ঘরের মধ্যে থেকে পরিবারসেবা মেয়েদের স্বাভাবিক হয়ে পড়ে; এ পুরুষদের অত্যাচার নয়, প্রকৃতির বিধান।······প্রকৃতির যা অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল নিয়ম তা গ্রহণ এবং পালন করা ধর্ম।·········আজকাল একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্ছে। কর্তব্যের অনুরোধে যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে তো স্বামীর অধীন নয়, সে কর্তব্যের অধীন।' ৪৭ এই উদ্ধৃতিটি নারী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সুস্পষ্ট

সাক্ষ্য বহন করে। এ ব্যাপারে তিনি প্রথম জীবনে যে মত পোষণ করতেন পরিণত জীবনেও তাঁর মনে তা অপরিবর্তিত ছিল, তবে তিনি মনে করতেন যে স্ত্রী-শিক্ষার সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। ব্যক্তি হিসেবে নারীর পরিপূর্ণ বিকাশ তিনি কামনা করতেন, আমাদের সমাজে নারীর স্থান কোথায়, কিভাবে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খর্বিত হচ্ছে সমস্ত কিছু স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা নিয়েও তিনি উপলব্ধি করেছেন। নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি না পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে যে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে—সেটাও তিনি স্পষ্টই নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। কিন্তু তবু বলতে হয় যে, প্রকৃতির বিধান বা স্বাভাবিক ধর্মের নামেই নারীর গতিবিধিকে তিনি সীমায়িত করার পক্ষপাতী। এর কারণ কি তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এখন বিচার্য তবে কি তিনি সমাজ-বাস্তবতাকে, যুগ-অভীপ্সাকে অস্বীকার করেছেন? তিনি কি প্রগতি বিরোধী? মোটেই তা নয়। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় সামাজিক অবস্থানে থেকে তাঁর সাহিত্যে যেভাবে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নটি বাস্তবসম্মত রূপদান করেছেন—তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এই সম্পর্কিত সমস্যার নানারূপ যেমন তিনি তুলে ধরেছেন, আবার তেমনি সমাধানেরও ইঙ্গিতও অনেকক্ষেত্রে দিয়েছেন। 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধে তিনি যে স্পষ্টই বলেছেন 'তার মুক্তি এমন একটি সমাজে যেখানে তার নারীশক্তি, তার আনন্দশক্তি আপন উচ্চতম প্রশস্ততম অধিকার সর্বত্র লাভ করতে পারে'—তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত সমাজ-বাস্তববাদী, সত্যদ্রষ্টা। তিনি কামনা করেছেন 'এক ভবিষ্যত সমাজের' অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজেও যে নারীর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ, তার স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নয়—এই উপলব্ধি সঠিকভাবেই তাঁর হয়েছিল। সামন্তবাদী সমাজ-ব্যবস্থার অবসানে ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়কে যেমন তিনি স্বাগত জানিয়েছেন, আবার সেই সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে, তার সীমাহীন অর্থলিপ্সা ও অমানবিক আচরণে, মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচারে তিনি বিক্ষুব্ধ হয়ে তার অবসানে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার কথাও চিন্তা করেছেন। কাজেই তিনি

সমাজ-প্রগতির বিরোধী—এ কথা বলা সমীচীন নয়, বরং গতি-প্রবণতাই তাঁর মানসিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। তা সত্ত্বেও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে কেন তাঁর এই দ্বিধা—এপ্রশ্ন পাঠক চিত্তে বার বার দেখা দেয়; কেনই বা তাঁর সাহিত্যে পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে এ তারতম্য? আগে যদিও আমরা উল্লেখ করেছি যে, শিল্পীমনের এই দ্বিধা দ্বন্দ্বের উৎস তাঁর রোমান্টিক স্বভাবের মধ্যে নিহিত, এছাড়াও বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁর অভীষ্ট সমাজ সম্বন্ধে—যে সমাজে নারীশক্তির 'উচ্চতম' 'প্রশস্ততম' অধিকার যথার্থই স্বীকৃতি লাভ করবে—কোন স্থির আদর্শ রূপ নিতে পারেনি। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আসে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই বিশ্বের সমাজ প্রেক্ষাপটে তার অভ্যুদয় ঘটেছিল রাশিয়ায়, কিন্তু রাশিয়া ভ্রমণের পর ঐ সমাজব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেও সেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন (রাশিয়ার চিঠি দ্রঃ)। যদিও প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়, তবু রবীন্দ্র-মানসে ঐ সংশয়ই তাঁকে বোধ হয় স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশ্নে কিছুটা সংকুচিত করেছে। দ্বিতীয়তঃ পুরাতন সমাজব্যবস্থা থেকে লব্ধ সংস্কার ও বিশ্বাস তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল,—যার প্রভাবও এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। কোন ব্যক্তির পক্ষে, তিনি যত উন্নত ও মুক্ত মানসিকতার অধিকারী হ'ন না কেন, স্বীয় সমাজ থেকে প্রাপ্ত মূল্যবোধগুলিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। এরজন্য প্রয়োজন দীর্ঘসময় ও কঠোর মানসিক সংগ্রাম। নতুন ও পুরানো মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের ফলে মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয়, কখনও কখনও নতুন চিন্তার উপর পুরানো ধ্যান-ধারণা প্রাধান্য বিস্তার করে। ফলে সেই ব্যক্তিবিশেষের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীতে পশ্চাদ্‌গামিতার ছায়া লক্ষিত হয়। নারীর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে স্ত্রী-স্বাধীনতা অপরিহার্য। কিন্তু স্বাধীনতার পরিধি নিরূপণে রবীন্দ্রমানসে যে দ্বন্দ্ব তা ঐ প্রাচীন সংস্কার ও নতুন মূল্যবোধেরই দ্বন্দ্ব। তাই কোথাও কোথাও রবীন্দ্র-মানসের পশ্চাদ্‌গামিতার আভাস যে লক্ষ্য করা যায় নি, তা নয়। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ

তাঁর কথাসাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাস-সমূহে সার্বিকভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সপক্ষে এবং নারী-স্বাধীনতার অনুকূলেই মনোভাব প্রদর্শন করেছেন, এতে তিনি নিঃসন্দেহে বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল। সমকালীন সমাজের জটিল আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে হয়ত তিনি সবক্ষেত্রে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেননি—তা পারাও সম্ভব ছিল না, তবু মানবপ্রেমই ছিল তাঁর সৃষ্টিপ্রেরণার উৎস। সেই মানবপ্রেম আমাদের সমাজের উপেক্ষিতা নারীসমাজকে দিতে চেয়েছে নতুন ব্যক্তিমূল্য ও আত্মমর্যাদা। রবীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী না, ভাববাদী ?—বস্তুত এই প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে আজও বহু আলোচিত। ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'সাহিত্যের আভিজাত্য' নামক প্রবন্ধে প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—'নূতন জগৎ গড়িবার আকাঙ্ক্ষা, নূতন ব্যক্তিত্বের সূচনাও রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভূরি পরিমাণে পাওয়া যায়। নূতন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সবগুলিই স্বপ্নের রাজ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন।' ৪৮ কিন্তু আমরা উপরে যে-ভাবে তাঁর উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণ করেছি—তাতে কি সত্যই সব কিছুই বাস্তবতা-শূন্য বলে মনে হয় ? সাহিত্যের বাস্তবতার বিচার হওয়া উচিত সেই বিশেষ যুগপ্রেক্ষাপটে যেখানে সৃষ্টি হয়েছে সেই সাহিত্য, আর বিচার্য সেই সাহিত্য ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ কী না। রবীন্দ্র-দর্শন ভাববাদপুষ্ট হলেও তাঁর সাহিত্য বাস্তবতাবর্জিত নয়; হয়ত বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ তাঁর অনায়ত্তীকৃত ছিল, কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে যে আদর্শবাদের প্রয়োজন রবীন্দ্র-সাহিত্যে তা সুপ্রচুর এবং তার সঙ্গে বাস্তববাদের প্রকৃত কোন বিরোধ নেই। দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ বস্তুবাদের গতিশীলতাকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যেখানে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কাজেই তাঁর উপন্যাস একেবারে 'বস্তুতন্ত্রহীন'—সে কথা বলা চলে না। তাই জনৈক সমালোচকের ভাষায় বলা যায়—'বস্তুবাদী না হলেও তাঁর মন ছিল বাস্তবতায় স্পর্শকাতর,......... রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল প্রতিভার মহত্ত্ব এই যে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নূতনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বারংবার।' ৪৯ এই

'নূতনের প্রতি আহ্বান' বা অনাগত ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলার উন্মুখতাই প্রগতিশীলতার লক্ষণ; আর ব্যক্তির, বিশেষ করে নারী-ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র মর্যাদা ও তার পরিপূর্ণ বিকাশের অনুকূল সমাজ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষাই সমাজ-বাস্তববাদী শিল্পীর অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য। সেই বিচারে রবীন্দ্রনাথকে যুগের প্রেক্ষাপটে প্রগতিশীল ও সমাজ-বাস্তববাদী অভিধায় ভূষিত করা যায়।

তিন

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আবাল্য স্বাদেশিক। 'হিন্দুমেলা' জাতীয় সভা সংস্থাপনে (১ম অধিবেশন ১২ এপ্রিল ১৮৬৭) জোড়া-সাঁকোর ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগ স্মরণীয়। সেই আবহাওয়ায় তাঁর দিন কেটেছে। মাত্র তের বৎসর বয়সে মেলার নবম অধি-বেশনে (১৮৭৫) তিনি স্বরচিত দেশাত্মবোধক কবিতা পাঠ করেন। সেদিন বালক কবির ক্ষীণ ও অস্ফুট কণ্ঠে 'দেশমুক্তি কামনার সুর ভোরের পাখির কাকলির মতো' শোনা গিয়েছিল। ৫০ তাছাড়া, কৈশোরে যাঁর প্রভাব কবিকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল, সেই অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থাপিত গুপ্ত বিপ্লবী সভা 'সঞ্জীবনী সভা'র সভ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন 'আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত আবহাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা-ভয়-সংকোচ কিছুই ছিল না, এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।' এই সঞ্জীবনী সভার উত্তেজনাতেই কবি লেখেন দিল্লীর দরবার সম্পর্কে একটি কবিতা ৫১— যা হিন্দুমেলার দশম অধিবেশনে পঠিত হয়। এইভাবে একদিকে 'হিন্দুমেলা' ও 'সঞ্জীবনী সভা'-র সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং বাইরের নানা স্বদেশচিন্তামূলক কর্মকাণ্ডের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের মনে স্বদেশানুরাগ ঘনীভূত করে তোলে। ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরোধিতা (১৮৭৮), ইল্‌বার্ট বিল নিয়ে আন্দোলন (১৮৮৩), ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশ্‌ন্যাল কন্‌ফারেন্স ও ন্যাশ্‌ন্যাল ফণ্ড

গঠন (১৮৮৩), জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫), আইনসভার সম্প্রসারণের জন্য আবেদন (১৮৯০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপন ও ১৮৯২ সালে 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট' তৈরী হয়) ইত্যাদির মত সমকালীন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। তবে ১৮৯২ এর পূর্বে স্বদেশের সমস্যা সম্বন্ধে আপন মতামত তিনি প্রকাশ করেননি। ১৮৯২ এর ডিসেম্বর মাসে 'সাধনা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ, আর এই 'সাধনা' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই তাঁর স্বদেশ-সম্পর্কিত সুচিন্তিত মতামত প্রথম প্রকাশিত হয় 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের মাধ্যমে। কবি নিজেও বলেছেন—'সাধনা পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি আলোচনা শুরু করি।' প্রাক্-সাধনা পর্বে রবীন্দ্র-মানসের উপর দিয়ে স্বাদেশিকতার যে প্লাবন উত্তাল-তরঙ্গে বয়ে গিয়েছিল, তখন তা প্রশমিত হয়ে যেন ভবিষ্যতের পরিপুষ্ট ফসলের জন্য মনের গভীরে উর্বর পলির আস্তরণ বিছিয়ে দিল। আবেগ-উচ্ছ্বাসের অবসানে শুরু হ'ল চিন্তা ও উপলব্ধির পর্ব। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এযাবৎ যে ঐতিহাসিক কারণেই স্বাদেশিকতা ও হিন্দুত্ব বা হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব সমার্থক ছিল, হিন্দুধর্মের ভিত্তিমূলেই যে যাবতীয় স্বদেশচিন্তার উদ্বোধন ঘটেছিল—তার যথাযথতা ও ফলশ্রুতি সম্বন্ধে কবির মনে যেমন নানা প্রশ্ন জাগালো, অপরদিকে বাহ্যিক বাগাড়ম্বরময় উত্তেজনা-সর্বস্ব স্বদেশী আন্দোলনের কার্যকারিতা সম্বন্ধেও তাঁর মনে দেখা দিল সংশয়। তখন তিনি তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে জাতীয় সমস্যার বাস্তব দিকটা বিচার করে দেখতে লাগলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে, জাতীয় সমস্যার মূল নিহিত রয়েছে জাতীয় অনৈক্যের গভীরে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্য, উচ্চ-নীচের মধ্যে অনৈক্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে অনৈক্য; আর এই অনৈক্যের প্রধান কারণ অশিক্ষা ও ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা। তাই তিনি চাইলেন শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষায় পরিণত করতে; তাঁর মতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনাও মাতৃভাষায় হওয়া আবশ্যক। শিক্ষাই মানুষকে সংস্কারমুক্ত করতে পারে, দূর করতে পারে অন্তরের সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামী।

এই বাস্তব সমস্যার কারণ ও তার সমাধানের ইঙ্গিতই তিনি তুলে ধরেছিলেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে। ১৮৯২ থেকে ১৯১০-'১১ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সাহিত্যকর্মের মধ্যেও তাঁর স্বদেশের জন্য বিভিন্ন সৃষ্টিপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এই পর্বে যেমন রবীন্দ্র-নাথের স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধে প্রত্যয়নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট' প্রবর্তন ক'রে (আইনসভায়) ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করল বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আসন বণ্টনের যে ব্যবস্থা করা হল তা জাতীয় অনৈক্যের বিষবীজে জলসিঞ্চনের তুল্য। রবীন্দ্রনাথ সেটি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' শীর্ষক প্রবন্ধে (১৮৯৩) তাই তিনি বলেছেন ৫২—

'আজকাল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে, আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া কিরূপ বলা কহা করি। আমরা কি গোপনে বলিনা যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ—ইংরাজরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে না।······ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে।' হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যের বিষময় পরিণামের যে ইঙ্গিত সেদিন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আভাসিত হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের মাধ্যমেই বাস্তবে তার সত্য রূপের প্রকাশ ঘটলো। রবীন্দ্রনাথ বার বার এই অনৈক্যের অবসানের কথা বললেও সেদিনের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নি বা করতে চাননি। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তিনি যে অনেকক্ষেত্রে নিজেকে সরিয়ে রাখতেন—তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, জাতীয় সমস্যার কারণ নিরূপণ ও সমাধানের উপায় সম্পর্কিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য ছিল প্রচুর। উপরের দৃষ্টান্তও তার প্রমাণ। জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে নেতৃত্বের ভার যাঁদের উপর ছিল—শ্রেণী হিসেবে রবীন্দ্রনাথও সেই শ্রেণীভুক্ত, তাই শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে—

তাঁর রাজনৈতিক মতপার্থক্য ঘটা উচিত ছিল না। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যুক্তিনির্ভর পথে সত্যান্বেষণা রবীন্দ্রমানসের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। যে-কোন প্রকার প্রতারণা ও কপটতাকে যেমন তিনি ঘৃণা করতেন, তেমনি অন্যের মতকে নির্বিচারে গ্রহণ করে তার দ্বারা প্রভাবিত কখনও হননি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল বিবর্তনমূলক—তাই মানুষের পক্ষে কল্যাণকর নতুনকে যেমন নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পেরেছেন, তেমনি অতীতের অকল্যাণকর অন্ধ বিশ্বাসকে ত্যাগ করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম মতপার্থক্য ঘটে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে। যেহেতু তাঁর এই মতপার্থক্য ও আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ায় দেশের মধ্যে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল, ফলে কবি নিজেও বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন, ৫৩ তাই এর কারণটা কি তা আমাদের জানা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর জবাব দিয়েছেন—'তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপর-ওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সম্মীলনীতে, গ্রাম্যজনমণ্ডলীসভাতে, ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন না।' ('রবীন্দ্র-নাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' কালান্তর) বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের বিরোধী ছিলেন। এছাড়া ইউরোপীয় ন্যাশানালিজমের অনুকরণে উগ্র স্বাদেশিকতার উচ্ছ্বাসময় আন্দো-লনও তিনি পছন্দ করতেন না। তাই নিজেকে সেই আন্দোলন থেকে সরিয়ে এনে স্বাদেশিকতার বৃহত্তর তাৎপর্য যেমন দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলেন, তেমনি বাগাড়ম্বরপূর্ণ আন্দোলনের পরিবর্তে দিলেন গঠনমূলক কার্যের পরিকল্পনা। কাজেই জাতীয় আন্দোলন থেকে তাঁর ঐ সাময়িক বিচ্ছিন্নতা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী মনোভাবপ্রসূত নয়, বরং তা ছিল অত্যন্ত বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গী-সঞ্জাত। স্বীয় শ্রেণীর বিরোধিতা, তীব্র সমালোচনা, সরকারী রোষ—সব কিছুকে উপেক্ষা করে সেদিন যে তিনি আপন উপলব্ধ সত্যপথে অবিচল ছিলেন—এটাই অসামান্য লেখক-ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যবহ।

এছাড়া, বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই উগ্রপন্থী নেতাদের গুপ্ত সংগঠনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমকেও তিনি মেনে নিতে পারেন নি। গুপ্তহত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদি পথে স্বরাজ আসতে পারে না বলেই তাঁর বিশ্বাস, দেশবাসীর মনে স্বত্ববোধ জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন; আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিকাশের মাধ্যমেই তা হতে পারে—তাই সর্বাগ্রে চাই উপযুক্ত শিক্ষা। কারণ শিক্ষাই আনে সচেতনতা। দেশনেতাদের দেশের বাস্তব প্রয়োজনের উপলব্ধির অক্ষমতায় রবীন্দ্র-মানস সংক্ষুব্ধ হয়েছে বার বার, তাঁর সেই ক্ষোভের প্রকাশ বহু রচনায় দেখা যায়। তিনি প্রশ্ন করেছেন—'আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কী অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন ? কী বর্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি। কেবল ছদ্মবেশ ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়।.........আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরাজের নিকট কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপ সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনও দেখিব, অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না।............।' ('ইংরাজ ও ভারতবাসী' ১৮৯৩ আগষ্ট)। এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যে কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে দেশের জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে। একদিকে মহামান্য তিলক কর্তৃক স্বরাজ স্থাপনে ভারতবাসীর জন্মগত অধিকারের কথা ঘোষণা, জাতীয়তাবোধের উন্মেষের জন্য মহারাষ্ট্রে 'গণপতি উৎসব', 'শিবাজী উৎসব' ইত্যাদির আয়োজন, তিলকের কারাদণ্ড, অরবিন্দের আবির্ভাব, তাঁর স্বদেশীকার্যে আত্মনিয়োগ ও গুপ্ত সমিতি স্থাপনের উদ্‌যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পর্বান্তর সূচিত হয়, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বর্বর উন্মত্ততা ও হিংস্র অর্থলোলুপতা প্রকট হয়ে ওঠে, আফ্রিকানদের উপর অকথ্য অত্যাচার, স্পেন—আমেরিকার যুদ্ধ (১৮৯৮), ব্রিটিশ-বুয়োর যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২), রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৫) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্নরূপ প্রকাশ পেল। ঐ সব জাতীয় আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি গভীরভাবে অনুধাবন

করার পর রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধের আমূল পরিবর্তন হয়। সংকীর্ণ দেশাভিমান বা Nationalism যে প্রকৃত জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী,—এই সত্য তিনি উপলব্ধি করলেন। উগ্র দেশাত্মবোধ আত্মনাশের কারণ, আত্মোন্নতির জন্য প্রয়োজন উদার মানবিকতাভিত্তিক বিশ্বাত্মবোধ। তিনি বুঝলেন—'নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা আমাদের নহে, য়ুরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।' (ভারতবর্ষীয় সমাজ') 'জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান নেশন-নামক মানস-পদার্থ সৃজনের মূল উপাদান নহে।' ('নেশন কী')

'নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস-পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে।........ তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত আর একটি বর্তমানে। .... অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূল-পত্তন। অতীতকালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা, পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প—ইহাই জনসম্প্রদায় গঠনের ঐকান্তিক মূল।' ('নেশন কী') শুধু তাই নয়, আমাদের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইউরোপের জাতীয়তা-বাদের মৌল পার্থক্যটুকুও তিনি নির্দেশ করেছিলেন। ইউরোপের জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য পরজাতি নিপীড়ন, পুঁজিবাদের বিস্তার, বিশ্বব্যাপী স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করা; পক্ষান্তরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের পটভূমিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, পরজাতির শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্তিকামনাই এদেশের জাতীয়তাবাদের মৌল প্রেরণা। কাজেই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে ইউরোপীয় Nationalism-র উন্মাদনায় অন্ধভাবে মত্ত থাকার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদই সাম্রাজ্যবাদের জনক এবং সেই সাম্রাজ্যবাদ মান-বিকতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের স্বরূপ সম্বন্ধে বললেন—'ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে সকল কাজকে চৌর্য মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল খুন ডাকাতি নাম দেয়, একটা ইজম্‌-প্রত্যয়-যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া

তোলে, বিলাতি-ইতিহাসের মান্যব্যক্তিদের চরিত্র হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়' (ইম্পীরিয়ালিজম : রাজাপ্রজা)। এই পরিস্থিতিতে এল বঙ্গভঙ্গরদের আন্দোলন। এই আন্দোলন-পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মতান্তর ঘটায় তিনি সরে দাঁড়ালেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্য ও পথ কি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বহু রচনায় তিনি তাঁর সুনির্দিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি। এই প্রসঙ্গে 'আত্মশক্তি ও সমূহ', 'রাজাপ্রজা' গ্রন্থসমূহের প্রবন্ধাবলী স্মরণীয়। তিনি বয়কট আন্দোলনকে সেদিন সমর্থন করেননি; তার অর্থ এই নয় যে, তিনি ব্রিটিশের শোষণব্যবস্থাকে পরোক্ষে সমর্থন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করলেন যে, বিলাতি দ্রব্য বয়কটের জবরদস্তিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ আরো তীব্রতর হ'ল, বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ইংরেজ যে অনৈক্য জিইয়ে রাখতে চাইছিল—তখনকার ঐ বয়কট আন্দোলনও তারই সহায়ক। এই সত্যটা সেদিন জাতীয় আন্দোলনের অন্যান্য নেতারা উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাছাড়া, অর্থনৈতিক দিক থেকেও সেদিন সমাজে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়; বয়কট আন্দোলনের চাপে অগণিত দরিদ্র ভারতবাসী নিষ্পেষিত হচ্ছিল, অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে প্রাপ্য বিলাতী কাপড় কেনা বন্ধ করে বেশী টাকায় দেশী কাপড় কিনতে তারা বাধ্য হচ্ছিল। এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষের দুর্গতির বিনিময়ে দেশীয় মিল মালিকদের ক্রমে বেশী মুনাফা লুট করার পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হ'ল। কাজেই রবীন্দ্রনাথের বয়কট-অন্দোলন-বিরোধিতা নিছক ভাবাবেগপ্রসূত ছিল না, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তিনি ঐ আন্দোলনের কার্যকারিতা বিচার করেছিলেন। এই পর্যায় থেকেই তাঁর গঠন-মূলক স্বাদেশিক কার্যক্রমের শুরু এবং তারই পরিণতি আমরা লক্ষ্য করি স্বদেশী-সমাজ-গঠনের প্রচেষ্টায়। ঐ স্বদেশী সমাজের কাল থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় মানবিকতাভিত্তিক স্বাদেশিকতা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ঐ সব বিচিত্র গঠনমূলক কর্মের মাধ্যমে। জনশিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তিতেই তাঁর সমস্ত

পরিকল্পনা রচিত হয়। গ্রামীণ সমাজের স্বনির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেছিলেন—'দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্ত-শাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে।............জোতদার ও চাষা রায়ত যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট-বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চির-দিনই অন্যের গোলামি ও মজুরি করিয়া মরিতেই হইবে।' (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী (১৩১৪) সভাপতির অভিভাষণ)। তখন স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী, বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছে তার বিশেষ আবেদন ছিল না। সকলকে জাগ্রত করতে হলে কি করতে হবে—তার ইঙ্গিত সেদিন রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর স্বাদেশিক চিন্তা ও কর্মপ্রণালী যেমন ছিল গঠনমূলক, তেমনি ছিল অসাম্প্র-দায়িক ও উদার মানবতাভিত্তিক। তাঁর মতে ইউরোপীয় উগ্র স্বাজাত্যবোধ বা 'প্যাট্রিয়টিজম্' থেকেই জন্ম নেয় ইম্পীরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ। সারা বিশ্বে ব্রিটেনের অমানবিক আচরণই তার প্রমাণ। তাই একদিকে বিশ্বমানবাত্মার লাঞ্ছনায় ক্ষুব্ধ হৃদয়ে তিনি যেমন বার বার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি তাঁর জাতীয় ধ্যানধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন আন্তর্জাতিকতার বিশাল পটভূমিকায়। তিনি মনে করতেন যে, দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন নিজের অন্তরের স্বাধীনতা—সাম্প্রদায়িকতা এবং সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে নিজেকে মুক্ত করা। এই উপলব্ধির ফলেই তিনি পরিণতকালে হিন্দুর সঙ্কীর্ণতা ও নির্বিচার ধর্মান্ধতাকে যেমন আক্রমণ করেছেন, তেমনি ব্রাহ্মধর্মের ত্রুটির সমালোচনা করতেও ছাড়েন নি। অকৃত্রিম মানবপ্রেমই ছিল তাঁর

সবকিছু বিচারের মাপ-কাঠি; যে-ধর্ম বা সমাজ মানুষকে নিকটে টানে না, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে-ধর্ম বা সমাজ তাঁর দৃষ্টিতে সত্য নয়। তাই তাঁকে বলতে শুনি—'ধর্ম যদি অন্তরের জিনিষ না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয় এমন আর কিছুই না।' (ছোট ও বড় ঃ কালান্তর)। এই ধর্ম-নিরপেক্ষ বিশ্ব-মৈত্রী ও জাতীয় ভাবনার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার সংযোগ সাধনের চিত্রই রবীন্দ্র উপন্যাস-সমূহের মধ্যে প্রথম 'গোরা'য় লক্ষ্য করি। গোরা চরিত্রের বিবর্তনের মধ্যদিয়ে লেখক এ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্র-মানসে স্বদেশি-কতার উদ্বোধন ও বিভিন্ন পর্বে তার ক্রমবিকাশের যে সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি আমরা এতক্ষণ তুলে ধরার চেষ্টা করলাম তা সূত্রাকারে চারটি পর্বে প্রকাশ করা যায় ঃ

(১) প্রথম পর্ব ঃ—'হিন্দুমেলা'র সংস্পর্শে আসা থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রাক্-সাধনা পর্ব ঃ এই সময় কবিমনে স্বাদেশিকতা মূলতঃ উচ্ছ্বাস ও আবেগপূর্ণ, তবে পরাধীনতার জ্বালা যে তাঁর অন্তরে দারুণ দহন সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'জুতা-ব্যবস্থা' ৫৪ (১৮৮১) 'চেঁচিয়ে বলা' (১৮৮২) 'জিহ্বা-আস্ফালন' (১৮৮৩), 'ন্যাশ্‌নাল ফণ্ড' (১৮৮৩), 'টৌনহলের তামাসা।' (১৮৮৩), অকাল কুষ্মাণ্ড' (১৮৮৩) 'হাতে-কলমে' (১৮৮৪) রচনাসমূহে। 'চীনে মরণের ব্যবসায়' ৫৫ (১৮৮১) প্রবন্ধটিও 'ভারতী'তে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮) প্রকাশিত হয় এই পর্বে।

(২) দ্বিতীয় পর্ব ঃ ১৮৯২ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতায় মনন-শীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, ইংরেজের রাজনীতি, উপনিবেশবাদ, ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক জীবনাদর্শ ইত্যাদি বিচার-বিশ্লেষণে কবির আগ্রহ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই পর্বেই তাঁর সঙ্গে দেশের অন্যান্য রাজনীতিকদের মতপার্থক্য ঘটে বয়কট আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে এবং তখনই তিনি 'স্বদেশী সমাজে'র পরিকল্পনা প্রচার করেন।

(৩) তৃতীয় পর্ব : এর সময়সীমা ১৯১১-১৯২৫ পর্যন্ত; এটি রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণের পর্ব। প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মানবিকতার বিরোধ, পশ্চিমী ধনতন্ত্রের স্বার্থপরতা ও আগ্রাসী মনোভাব, অসহযোগ আন্দোলন ও চরকা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ইত্যাদি কবির চেতনায় আনে আমূল পরিবর্তন। গ্রামাঞ্চলে স্বরাজ সংগঠনের উদ্‌যোগ নেন এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক প্রচার চালান।

(৪) চতুর্থ পর্ব : ১৯২৫ থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত; সমাজ-সংগঠনে অধিকতর আত্মনিয়োগ, শ্রীনিকেতনে মনোনিবেশ, যাবতীয় স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি ঔদাসীন্য, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রতিবাদ, কিন্তু ইংরেজের দমন ও শোষণ থেকে নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, রাশিয়া পরিদর্শন ও ভারতীয় সমাজের নানা দিকের সঙ্গে রাশিয়ার সমাজের তুলনা, দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রমিক ও কৃষকের জীবনের শরিক হওয়ার জন্য আকুলতা ইত্যাদি এই পর্বের কবি-মানসিকতার বিশিষ্ট দিক। উপন্যাস সাহিত্যে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁর জাতীয়তাবোধের স্বরূপ অন্বেষণে মাত্র তিনখানি উপন্যাস—গোরা, ঘরে-বাইরে ও চার অধ্যায়—আমাদের বিচার্য। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার যে পর্ব ভাগ করা হল—সেই অনুযায়ী 'গোরা' (১৯০৯) দ্বিতীয় পর্বের, 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) তৃতীয় পর্বের এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) চতুর্থ পর্বের রচনা। মূলতঃ তিনটি উপন্যাসেই তিনি সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করে জাতীয়তার প্রকৃত তাৎপর্য, ইউরোপীয় ন্যাশনালিজম্ ও প্যাট্রিয়টিজমের সঙ্কীর্ণতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'গোরা' ও 'ঘরে-বাইরে' তে বয়কট আন্দোলনের ক্ষতিকারক দিকগুলি যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি 'ঘরে-বাইরে', বিশেষ করে 'চার অধ্যায়ে' সন্ত্রাসবাদ কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। আবার ঐ তিনখানি উপন্যাসেই সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতা যেমন স্পষ্ট, তেমনি গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে গ্রামীণ

সমাজকে স্বয়ম্ভর করে তোলার আগ্রহ প্রবলভাবে অনুভূত হয়। এখন আমরা উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করে কোথায় কোন্ চরিত্রের মাধ্যমে কি কি বিরোধিতা করেছেন, কি কি সমর্থন করেছেন—তা নিরূপণ করবো এবং সেই পরিপেক্ষিতে ঔপন্যাসিকের শিল্পী-মানস এবং ঔপন্যাসিক বাস্তবতার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

স্বদেশচিন্তামূলক ও জাতীয় সমস্যা সংক্রান্ত রবীন্দ্র-উপন্যাস বলতে 'গোরা'-ই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান। বিদেশী-শাসিত নানা সমস্যাসঙ্কুল একটি বৃহৎজাতির বিচিত্র চিন্তাভাবনার পরিস্ফুরণে 'গোরা' অদ্বিতীয় সৃষ্টি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলা তথা ভারতের সমাজ-প্রেক্ষাপটে জাতীয় মুক্তি-প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মত ও পথ যে জটিলতা সৃষ্টি করে, রবীন্দ্র-চেতনাও তাতে বিচলিত না হয়ে পারেনি। তাঁর মনে জাগে ধর্ম-সমাজ-স্বদেশসম্পর্কিত নানা প্রশ্ন। যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এযাবৎ প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যে আস্থাবান, যাঁর কাছে আগেও হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্ব ছিল সমার্থক, যাঁর স্বাদেশিকতার প্রথম দীক্ষা হয় 'হিন্দু মেলা' ও 'সঞ্জীবনী সভা'র ধর্মীয় চন্দ্রাতপের নীচে, তাঁর মনেই সংশয় দেখা দেয় ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে। বঙ্গভঙ্গ-রদ-আন্দোলনের পটভূমিকায় দেশের রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেন নি। তাই হিন্দু জাতীয়তার পরিবর্তে তিনি চাইলেন উদার মানবিকতাভিত্তিক জাতীয়তা। তাঁর কণ্ঠেই আমরা সেদিন শুনলাম ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়—সকলেরই। শাশ্বত ভারতাত্মার ঐকতান কবির সংবেদনশীল হৃদয়তন্ত্রীতে সেদিন যে অনুরণন সৃষ্টি করেছিল—'গোরা'র উপসংহারে সেই মহাসঙ্গীতই উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। তাই বলা যায় যে 'গোরা' একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধের পরিণতরূপের প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে তেমনি উগ্র স্বাজাত্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ব্যর্থতার দর্পণ।

গতিশীলতাই রবীন্দ্র-মানসের ধর্ম, কোন কিছুকে কখনও তিনি ধ্রুব বলে মনে করতেন না। তাই গোরা চরিত্রের বিবর্তন প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-মানসে স্বাদেশিকতার পরিপূর্ণতার পথে

অভিসার। গোরা আর পরেশবাবু রবীন্দ্র-চেতনার দ্বৈতরূপ—প্রথমটি যেন দ্বিতীয়টির মধ্য দিয়েই পূর্ণতা অর্জন করেছে। গোরা প্রথম জীবনে নব্যবঙ্গ যুবসম্প্রদায়ের মতই ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরক্ত। কেশব সেনের বক্তৃতা তাকে আকৃষ্ট করেছে, পরে হিন্দু-পুনরুত্থানবাদীদের নেতা হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রভাবে গোঁড়া হিন্দুতে পর্যবসিত হয়, এমনকি 'হিণ্ডুয়িজ্‌ম্' গ্রন্থ রচনাতেও মনোনিবেশ করেছিল। হিন্দু-সমাজের শাস্ত্র, আচার বিশ্বাস সব কিছুকে বাঁচিয়ে চলাই ছিল তখন তার জীবনের ব্রত। ইংরেজ; এমন কি অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয়দের আক্রমণ করতেও তখন সে দ্বিধাবোধ করত না। গোরার ধারণা ছিল যে, আচারকে অস্বীকার করার অর্থ সমাজকে অস্বীকার করা, এমনকি ভবিষ্যতে মাকেও অস্বীকার করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পাড়ার ছুতোরের ছেলে নন্দর অকালমৃত্যু শেষ পর্যন্ত তার চোখ খুলে দিল, সংস্কারের মূঢ়তা যে কী ভয়ানক সেইদিন সে উপলব্ধি করল। তারপর ধীরে ধীরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেশকে, দেশবাসীকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার সে চেষ্টা করেছে। মানুষকে বোঝার জন্য কখনও গেছে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করতে, কখনও পাড়ার তথাকথিত নীচ জাতির বাড়ীতে, আবার কখনও কলকাতার বাইরে চরঘোষপুরে অত্যাচারিত প্রজাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সবের মধ্য দিয়ে সে উপলব্ধি করেছে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতাই ভারতবাসীর অনৈক্যের মূল কারণ। শিক্ষার অভাব মানুষের নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করেছে, আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে রয়েছে প্রবল সাহেবিয়ানা এবং স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তীব্র ঘৃণা-মিশ্রিত অবজ্ঞা—'আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের এই-রকম মনের ভাব। এমন অবস্থায় মানুষ, হয় নিজের স্বার্থ নিয়েই থাকে, নয় উদাসীনভাবে কাটায়। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকেরা এই কারণেই চাকরীর উন্নতি ছাড়া আর কোনো কথা ভাবে না, ধনী লোকেরা গবর্মেন্টের খেতাব পেলেই জীবন সার্থক বোধ করে,.........

'গবর্মেন্টের কাজ যারা করে তারা গবর্মেন্টের শক্তিকে

নিজের শক্তি বলে একটা গর্ব বোধ করে এবং দেশের লোকের থেকে একটা ভিন্ন শ্রেণীর হয়ে ওঠে—যতদিন যাচ্ছে আমাদের এই ভাবটা ততই বেড়ে উঠছে।' (গোরা : ২০ পরিঃ)

গোরা আরও উপলব্ধি করল— '.........আচারের অস্ত্রে মানুষ মানুষের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে নিঃস্বত্ব করিতেছে।' (গোরাঃ ৬৭ পরিঃ) প্রথমদিকে গোরার মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রাবল্য দেখা গেলেও স্বদেশের ও স্বজাতির সমস্যা সম্পর্কে সে ছিল সদা সচেতন। সমাজের মৌল সমস্যার প্রতিকার করাই ছিল তার একান্ত কাম্য, কিন্তু প্রথমদিকে তার মধ্যে দেখা যায় ভাবাবেগ-সর্বস্বতা; উগ্র স্বাজাত্যবোধে সে ইংরেজদের সঙ্গে হাতাহাতি করতেও কুণ্ঠা বোধ করত না। কিন্তু ক্রমে তার উপলব্ধি হল যে, বাইরের শক্তি দিয়ে দেশের আত্মিক দৌর্বল্য কাটানো যায় না। তার জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটানো, ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ঐক্যানুভূতির উদ্বোধন। বস্তুতঃ গোরার এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথেরই আত্মোপলব্ধি। সমকালে রচিত 'আত্মশক্তি ও সমূহ' 'ব্যধি ও প্রতিকার' 'রাজা ও প্রজা' ইত্যাদি প্রবন্ধ-সমূহের মধ্যেও 'গোরা'র উপলব্ধ এই বাণীই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তাছাড়া স্বদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য দেশ-নেতারা যেভাবে উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে আবেদন-নিবেদনের পথ সেদিন অবলম্বন করেছিলেন, তার ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে গোরা বলেছে—'আমাদের শৌখিন পেট্রিয়টদের সত্যকার বিশ্বাস কিছুই নেই, তাই তাঁরা নিজের এবং পরের কাছে কিছুই জোর করে দাবি করতে পারেন না।' (গোরাঃ ৪ পরিঃ)। জেল-খানায় গিয়ে গোরা উপলব্ধি করল—'পৃথিবীর বহুতর মানুষই দোষে এবং বিনা দোষে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া যে বন্ধন এবং অপমান ভোগ করিতেছিল আজ পর্যন্ত তাহাদের কথা ভাবি নাই, তাহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই রাখি নাই - এবার আমি তাহাদের সমান দাগে দাগি হইয়া বাহির হইতে চাই। পৃথিবীর অধিকাংশ কৃত্রিম ভালোমানুষ যাহারা ভদ্রলোক সাজিয়া বসিয়া আছে তাহাদের দলে ভিড়িয়া আমি সম্মান বাঁচাইয়া চলিতে চাই

না।' (গোরাঃ ৩২ পরিঃ)। গোরা চায় জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমাজসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে, রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্বদেশী-সমাজ পরিকল্পনায় ঐ ধরণের কাজের লোক চেয়েছিলেন। 'আত্ম-শক্তি ও সমূহ' গ্রন্থের 'সঞ্চয়ন' অধ্যায়ের ৭ নং প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—'স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিকে খর্ব করা, উদ্ধত অভিমানকে দমন করা, নিষ্ঠার সহিত নিয়মের শাসনকে গ্রহণ করা, এ সমস্ত কাজের লোকের গুণ—কাজ করিতে করিতে এই সকল গুণ বাড়িয়া ওঠে, চিরদিন পুঁথি পড়িতে ও তর্ক করিতে গেলে ঠিক তাহার উল্‌টা হয় ....'

আবার ঐ অধ্যায়ের ১৩ নং প্রবন্ধে বলেছেন—'যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করি নে।........ তাতে শক্তি হ্রাস হয়।.........দেশের সেবার মধ্যে দেশের প্রতি প্রীতির প্রকাশ কোন বাহ্য অবস্থান্তরের অপেক্ষা করে না, তার নির্ভর একমাত্র আন্তরিক সত্যের প্রতি। আজ যদি দেখি সেই প্রকাশ অলস উদাসীন, তবে বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে একথা আমি বিশ্বাস করিনে।......... স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তার পরে, এমন কথা ..... সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।'

কিন্তু লক্ষণীয় যে, গোরার স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম যতই পূর্ণতার পথে এগিয়ে যাক্-না-কেন, তবু তার আত্মপরিচয় প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে হিন্দুত্বের অহমিকা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই সে বলেছে— '.........আমি বাংলার অনেক জেলায় ভ্রমণ করেছি, খুব নীচ পল্লীতেও আতিথ্য নিয়েছি— ......কিন্তু কোনোমতেই সকল লোকের পাশে গিয়ে বসতে পারি নি—এতদিন আমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদৃশ্য ব্যবধান নিয়ে ঘুরেছি—কিছুতেই সেটাকে পেরোতে পারিনি।' (গোরা : ৭৬ পরিঃ)। কিন্তু যেদিন সে জানতে পারল যে, সে হিন্দু নয়, আইরিশ, ভারতবর্ষের সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার তার কাছে রুদ্ধ—সেই দিনই

মানুষের ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির মিথ্যা আবরণ সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হল। যে হিন্দুত্বের অহংকার সে এতদিন অন্তরে পোষণ করেছিল, সবই তখন তার কাছে মিথ্যা। এইখানেই গোরার রূপান্তর সম্পূর্ণ হ'ল। গোরা তখন কোন বিশেষ জাতের নয়—সে ভারতবর্ষীয়। সে তাই বলেছে—'সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পৌঁচেছে—আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি—সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে—সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণক্ষেত্র।' ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত করে, সাম্প্রদায়িক বাধাকে সরিয়ে এই উদার মানবিকতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বদেশচেতনার প্রতিষ্ঠাই 'গোরা' উপন্যাসের সিদ্ধান্ত। উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতা চরিত্রের উদ্‌বর্তনেই সার্থক হতে পারে। সেই উদ্‌বর্তন রবীন্দ্রচিন্তাতেও ঘটেছে। আনন্দময়ীর চরিত্রের মাধ্যমেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধ্যানলব্ধ ভারতবর্ষের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন – এ যেন সাম্প্রদায়িক সংস্কারমুক্ত ঐক্যবদ্ধ দেশেরই মানবীমূর্তি। প্রথমদিকে গোরার আনন্দময়ীর হাতের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলার প্রবণতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন যে, ভারতের হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মণ্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে প্রকারান্তরে দেশমাতাকেই অস্পৃশ্য করে রেখেছে। হিন্দুধর্মের এই contradiction রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে অস্পষ্ট থাকেনি, গোরাও তাই শেষে সংস্কারমুক্তির অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আনন্দময়ীর কোলেই ভারতবর্ষের কোলের আস্বাদ লাভ করেছে। এখানে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ শুধু চিন্তাবিদই নন, কর্মী ও সমাজসেবী। তাঁর জাতীয়তাবোধ যেমন জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানবপ্রেমেরই সমার্থক, তেমনি তাঁর স্বাদেশিকতাও কর্মকেন্দ্রিক ও গঠনাত্মক। পরাধীন ভারতের সামাজিক সমস্যার মৌলিক কারণ যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শ্রেণী-অনৈক্য, সে-সম্পর্কে তিনি ছিলেন সদাসচেতন। তাই ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের কামনাই তিনি করেছিলেন। সেদিনের বয়কট আন্দোলনের অন্তরালে যে স্বার্থান্ধ দেশীয় বণিকগোষ্ঠীর অর্থলোলুপতা বিদ্যমান ছিল সেটাও তাঁর দৃষ্টি

এড়ায় নি। তিনি প্রকাশ্যে সে কথা ঘোষণাও করেছিলেন। সে-দিনের সমাজ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দেশীয় শিল্পের উন্নতির কথা বলে বয়কট আন্দোলনের সপক্ষে যুক্তি যে দাঁড় করানো যায় না তা নয়; কিন্তু দেশের গ্রামীণ শিল্পের ধ্বংস সাধন করেছিল যে ব্রিটিশ পণ্য—তা বয়কট করে গ্রামীণ শিল্পের উন্নতি তো হয় নি, আজও গ্রামাঞ্চলের বয়নশিল্পীরা বয়কট আন্দোলনের সুফল কি ভোগ করতে পারছে ? বরং তাদের দুর্দশা বেড়েছে, আর দেশীয় বৃহৎ একচেটিয়া মিল মালিকরাই তাদের মুনাফার ভাণ্ডার ক্রমশঃ স্ফীত করছে। তাই বলতে হয় এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী এবং প্রকৃত ভবিষ্যতদ্রষ্টা।

এবার 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে আসা যাক্। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের রচনাকাল [১৯১৫ (১৩২২)] স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের শেষ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাতের সন্ধিক্ষণ। বয়কট আন্দোলনের রেশ তখনো রয়েছে, এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধও আরম্ভ হয়েছে। ইতোমধ্যে অ্যানি বেসান্ত্ ও তিলকের উদ্যোগে হোমরুল লীগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে (১৯১৪) এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়ে ভারতের সর্বত্র আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেশে আন্দোলন পরিচালনায় বাক্-সর্বস্ব গতানুগতিক পদ্ধতি তখনো বিদ্যমান। একদিকে মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরদিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য—উভয়ে মিলে আন্দোলনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে, আবার বয়কট আন্দোলনের জবরদস্তি নিরীহ সাধারণ মানুষকে আন্দোলন থেকে ক্রমে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তায় কোনো মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই 'গোরায়' এর যে বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করেছি—'ঘরে-বাইরে'তে তারই পুনরুত্থাপন; তবে তা যেন এখানে আরো বিস্তৃত-ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে; তার কারণ ধর্ম আন্দোলনের প্রসঙ্গ এখানে অনুপস্থিত, সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের দুর্বলতার প্রতিই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ যেন এখানে অধিকতর

সার্থক।

মূলতঃ এই উপন্যাসে চারটি চরিত্র স্বদেশমূলক আলোচনায় অংশ নিয়েছে। একদিকে সন্দীপ ও বিমলা, অন্যদিকে নিখিলেশ ও চন্দ্রনাথবাবু (মাস্টারমশাই)। প্রথম দু'জন সমকালীন অন্যান্য স্বাদেশিকদের মুখপাত্র, শেষের দু'জন রবীন্দ্রনাথের মতের প্রবক্তা। তবে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বিমলার নিজস্ব কোন মত নেই, আর সন্দীপের মতকে সামনে প্রকটভাবে তুলে ধরা হয়েছে চন্দ্রনাথবাবু ও নিখিলেশের মতের বৈপরীত্য প্রদর্শনের জন্য। এইভাবে চরিত্রগুলির তর্কবহুল সংলাপ ও আচরণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক উপসংহারে নিজের মতকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারজন্য অবশ্য সন্দীপের চরিত্রায়ণে লেখকের বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট। তখনকার জাতীয় আন্দোলনের সমস্ত নেতাই যে সন্দীপের মত কপট, দুশ্চরিত্র ও আত্মসুখান্বেষী ছিলেন—একথা মনে করলে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শুধু অবিচার করাই হয় না, তাঁদের আত্মত্যাগ ও স্বাধীনতাস্পৃহার অবমাননাও করা হয়। তবে সন্দীপের মত ব্যক্তি যে তখন একেবারে ছিল না—সেকথাও বলা যায় না। এজাতীয় চরিত্র সর্বকালে সর্বদেশে থাকে, তাদেরকে আদর্শ বা প্রতিনিধিস্থানীয় হিসেবে চিত্রিত করা ভুল হবে। সমাজ-বাস্তবতার অঙ্গীকার চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে সার্থক হয়ে উঠলে স্বভাবতই সে 'ব্যক্তি' হয়েও 'মুখপাত্র' হয়ে ওঠে। এঙ্গেলস্ যাকে বলেছেন, 'the truthful reproduction of typical characters under typical circumstances', এ-উপন্যাসে তা দেখিনা, ঔপন্যাসিকের বাস্তববিরূপতা অনেকাংশে প্রকট। বালজাক প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—'Balzac was politically a Legitimist, his great work is a constant elegy on the irretrievable decay of good Society, his sympathies are all with the class doomed to extinction.........And the only men of whom he always speaks with undisguised admiration, are the bitterest political antagonists......

who at that time (1830–36) were indeed the representatives of the popular masses. That Balzac was thus compelled to go against his own class sympathies and political prejudices.' ৫৬ তাহলে রবীন্দ্রনাথের মত মহৎ ও মানব-প্রেমিক শিল্পী ও সংস্কারমুক্ত চিন্তাবিদ্ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপ চরিত্র সৃষ্টিতে কেন যে ঐতিহাসিক বাস্তবতার যথাযথতা রক্ষা করলেন না—তা সত্যই বিস্ময়কর। এদিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত বলা যায় না।

তিনি প্রচলিত রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও দেশসেবার আদর্শের সঙ্গে যে একমত হতে পারেন নি সে কথা উল্লেখ করেছি, গঠনমূলক স্বাদেশিকতারই পক্ষপাতী ছিলেন। আবার তাঁর মতে —সেই কার্যক্রমের কেন্দ্রভূমি হবে গ্রামাঞ্চল। এই মতবাদই তিনি তুলে ধরেছেন নিখিলেশের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে। নিখিলেশ 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র দিয়ে দেশকে বন্দনা করার বিরোধী, সে চায় দেশের সেবা করতে; সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টাই হবে ঐ দেশসেবার মাধ্যম। তাই সে বলেছে—'দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।' কারণ তার মতে—'দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার করে মা বলে দেবী বলে মন্ত্র পড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যেমন নেশার প্রতি।' নিখিলেশের এই দেশসেবা প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধেরই রূপান্তর, আবার এই দেশসেবা সঙ্কীর্ণ জাতীয়-স্বার্থে নয়, আন্তর্জাতিক চেতনায় সমৃদ্ধ। তাই নিখিলেশকে পুনরায় বলতে শুনি—'পূজা করতে নিষেধ করি নে, কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করে সে পূজা কেমন করে সমাধা হবে?' একদিন গীর্জায় যাবার পথে মিস্ গিল্‌বিকে নিখিলেশদের এক আত্মীয় নরেন যখন ঢিল ছুঁড়ে মেরে অপমান করে, তাকে ইংরেজ বলেই বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার

কথা বলতে হবে—এসব নিখিলেশের ভাল লাগেনি। অবশেষে যখন লাঞ্ছিত হয়ে মিস্ গিল্‌বি নিজেই চলে গেল, তখন নিখিলেশ নিজের গাড়ি করেই তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথও বিদ্বেষ-প্রসূত হয়ে ইংরেজ হিসেবে কোন ব্যক্তিবিশেষকে দৈহিক নির্যাতন বা অপমান করাকে পছন্দ করতেন না, নানা প্রবন্ধে আমাদের জাতীয় চরিত্রে তার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে লিখেছেন। নীচের অংশটুকু এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

'বিদ্বেষ হইতে, বাহাদুরি হইতে, স্পর্ধা হইতে নিজেকে সর্বপ্রযত্নে বাঁচাইয়া, ন্যায়নীতির সীমার মধ্যে কঠিনভাবে নিজেকে সংবরণ করিয়া দুষ্টশাসনের কর্তব্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। শারীরিক কষ্ট ক্ষতি বা অকৃতকার্যতা ভয়ের বিষয় নহে—ভয়ের বিষয় এই যে, ধর্মকে বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তির হাতে পাছে আত্মসমর্পণ করি, পরকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে আপনাকে কলুষিত করি, বিচারক হইতে গিয়া পাছে গুণ্ডা হইয়া উঠি।......... প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যে সামঞ্জস্য পথ আছে তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও তাহাই আমাদিগকে নিতে যত্নে অনুসন্ধান ও অবলম্বন করিতে হইবে—নতুবা বিনাশপ্রাপ্ত হইতেই হইবে।' (আত্মশক্তি ও সমূহ : ঘুষাঘুষি)

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে হিন্দু মুসলমান, উচ্চ নীচ নানা শ্রেণীর মধ্যে অনৈক্যকেই আমাদের প্রধান দুর্বলতা বলে নির্দেশ করেছেন। নিখিলেশের এই মন্তব্যে তারই প্রতিধ্বনি : 'আজ যারা আমার নীচে রয়েছে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে রেখে দিতে পারিনে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়, আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।' ভারতবর্ষ যে হিন্দু-মুসলমান সকলেরই এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন এবং 'গোরা' উপন্যাসেও গোরা চরিত্রের মাধ্যমে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'কালান্তরে' 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধেও তিনি মন্তব্য করেছেন—'বহুদিন ধরে পোলিটিকাল নেতারা ইংরাজী পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান

নি কেন না তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজী-ইতিহাস পড়া একটা পুঁথি-গত দেশ।' বিদেশীদ্রব্য বয়কট, বিশেষ করে বিদেশী বস্ত্রের প্রচলন বন্ধ করা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কেন আপত্তি ছিল একথা আমরা আলোচনা করেছি। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসেও সে প্রসঙ্গ এসেছে। নিখিলেশ ও চন্দ্রনাথবাবু উভয়েই উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে দেশের গরীব লোকের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, এছাড়া এতে দেশীয় মিল মালিকেরা তাদের সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ নেয়। চন্দ্রনাথবাবু সন্দীপ ও তার দলের লোকেদের বলেছেন – 'তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু'পয়সা বেশী দিয়ে জিনিষ কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না।............ ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনমতে টিকে থাকবার জন্য—ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়? জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে; আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও, তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি তো একে কাপুরুষতা মনে করি।··· ঐ গরীবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয় পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।' সেই সময় দেশের গরীবরা সস্তায় বিলিতি কাপড় কিনলে তাদের প্রতি কি অত্যাচার করা হ'ত তার প্রমাণ পাওয়া যায় জমিদার হরিশকুণ্ডুর বাড়ীতে পঞ্চুর সাজা দেবার চিত্রটিতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বয়কট আন্দোলনকে একটা নেতিবাচক আন্দোলন বলেই মনে করতেন এবং সেই কারণেই তৎকালীন জাতীয় আন্দো-লনের নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন— 'কাপড় পোড়াতে আমি রাজী আছি, কিন্তু কোন উক্তির তাড়নায় নয়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সময় নিয়ে যথোচিত উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করুন এবং সুযুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দিন যে, কাপড় পরা সম্বন্ধে আমাদের দেশ অর্থনৈতিক যে অপরাধ করেছে অর্থনৈতিক কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা তার প্রতিকার হতে পারে,··· কাপড় পরে আমরা আর্থিক

যে অপরাধ করেছি কাপড়টাকে পুড়িয়ে সেই অপরাধের মূলটাকে আরও বিস্তারিত করে দিচ্ছি নে, ম্যাঞ্চেস্টারের ফাঁস তাতে পরিণামে ও পরিমাণে আরও কঠিন হয়ে উঠবে না?'৫৭ এই কাপড় পোড়ানোর ফলে দেশীয় দরিদ্র জনসাধারণ যেমন নিপীড়িত হচ্ছিল, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ যেমন ঘনীভূত হচ্ছিল, অন্যদিকে দেশীয় মিল মালিকরা যে মুনাফাকে আরো স্ফীত করছিল সেদিকেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি; তাই তাঁকে বলতে শুনি—'মনের ক্ষোভে বাঙালী সেদিন ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় বর্জন করে বোম্বাই মিলের সদাগরদের লোভটাকে বৈদেশিক ডিগ্রিতে বাড়িয়ে তুলেছিল, যেহেতু ইংরেজ সরকারের 'পরে অভিমান ছিল এই বস্ত্রবর্জনের মূলে, সেইজন্যে সেইদিন এই কথা বলতে হয়েছিল 'এহ বাহ্য' (সত্যের আহ্বান)।' সেদিন রবীন্দ্রনাথ বিলেতিবস্ত্র পোড়ানো পছন্দ করেননি, ও বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন বলেই তাঁকেও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একসময় 'ভেরা সেজোনোভা' নাম্নী এক অষ্টাদশ বর্ষীয়া রুশ বালিকার জীবন পর্যালোচনা কালে মন্তব্য করেন 'এই প্রবন্ধের নায়িকার স্বদেশপ্রেম আত্মোৎসর্গের আশ্চর্য বিবরণটি আমাদের নিষ্ঠা উদ্রেকের পক্ষে উপযোগী।' ৫৮ এই আলোচনায় তিনি বয়কট আন্দোলন ও দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তাঁর 'পথ ও পাথেয়' (রাজা-প্রজা) প্রবন্ধে তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করি, সেখানে তিনি বলেছেন—'দেশী বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যত বড়ো কাজই হউক লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে একথা আমি কোনমতেই স্বীকার করিতে পারিনা।··· মঙ্গলকে পীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিব, ইহা কখনোই হইতেই পারে না,··· বয়কট ব্যাপারটা অনেকস্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে।' (পথ ও পাথেয়)। এই মত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে যে সমালোচনা বার হয় তারই অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিচ্ছি :—

'আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রবাবু স্বদেশীর উদ্বোধন কালে যে শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন এখন সেই শাখাই ছেদন করিতেছেন।··· রবীন্দ্রনাথ অকারণে দেশের নেতা ও দেশবাসীর মানহানি করিয়া লঘু প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন।··· রবীন্দ্রনাথের জন্য আমরা একটু শঙ্কিত হইয়াছি, এই সকল 'পরামর্শে'র অনুবাদ পড়িয়া গবর্মেণ্ট যদি সহসা তাঁহাকে, 'রায়সাহেব' করিয়া দেন, তাহা হইলে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না।' ৫৯ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসেও আমরা দেখি নিখিলেশের বিরুদ্ধে কাগজের পাতায় নানা কুৎসা রটনা এবং নানা ছড়া ও ছবির মাধ্যমে তাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, এমনকি গঙ্গার ঘাটে তার কুশপুত্তলিকাও দাহ করা হয়েছে। খবরের কাগজের সংবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিখিলেশ মন্তব্য করেছে—'পুলিশের সঙ্গে আমার তলে তলে যোগ আছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমি গোপনে চিঠি চালাচালি করছি এবং বিশ্বস্ত সূত্রে খবরের কাগজ খবর পেয়েছে যে পৈতৃক খেতাবের উপরেও স্বোপার্জিত খেতাব যোগ করে দেবার জন্যে আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না।' বস্তুতঃ বয়কট আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত এবং সে-বিষয়ে সমকালীন মনোভাবই 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথের পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টার নানা দিক—পল্লী অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় স্থাপন, কৃষি-সমবায়-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, গ্রামীণ শিল্পস্থাপনে উদ্যোগ, সালিশী বিচারে গ্রাম্য বিবাদের নিষ্পত্তির প্রবর্তন, উন্নত প্রথায় কৃষিকার্যের প্রচেষ্টা ইত্যাদির কিছু কিছু নিদর্শন নিখিলেশের মধ্যেও দেখা গেছে। বিমলা বলেছে—'আমার স্বামীর দানের লিস্ট ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল কিম্বা ধান ভানার যন্ত্র কিম্বা ওই রকম একটা কিছু যে কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্যন্ত তিনি সাহায্য করেছেন।' ব্যক্তিগত উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ সেদিন শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর আশানুরূপ সমাজ গড়ে তুলতে পারেন নি, আলোচ্য উপন্যাসেও তাই নিখিলেশের কণ্ঠে অনুরূপ ব্যর্থতার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই: 'আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর সেই যে একদিন

মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি করতে বসেছিলুম তার ইতিহাস এরা জানে না। ক'বছর ধরে জাভা মরিশাস থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম, সরকারি কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষের পরামর্শে যতরকমের কর্ষণ-বর্ষণ হতে পারে তার কিছুই বাকি রাখি নি, অবশেষে তার থেকে ফসলটা কী হল? সে আমার এলাকার চাষিদের চাপা অট্টহাস্য। আজও সেটা চাপা রয়ে গেছে। তার পরে সরকারি কৃষিপত্রিকা তর্জমা করে যখন ওদের কাছে জাপানি সিম কিম্বা বিদেশী কাপাসের কথা বলতে গেছি তখন দেখতে পেয়েছি সে পুরনো চাপা হাসি আর চাপা থাকে না।' 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার একটি বিশিষ্ট পর্যায়ের দর্পণ বলা যায়। সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক জটিলতা শিল্পী-মানসে যে আবর্তের সৃষ্টি করেছিল তারই প্রকাশ এখানে স্পষ্ট। নিখিলেশ পুরোপুরি-ভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার মণ্ডনে মণ্ডিত, তাই ঔপন্যাসিকের মত ও পথ, প্রয়াস ও পরিকল্পনা, সফলতা ও ব্যর্থতা—সবকিছুই এই চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। 'গোরা'র শেষে রবীন্দ্রমানসে স্বাদেশিকতার যে পরিণতরূপের পরিচয় আমরা পেয়েছি, এখানে তারই অনুবর্তন লক্ষ্য করি, এখানেও তিনি স্বাদেশিক অর্থে রাজনীতি-বিদ্ নন, স্বীয় মত ও পথে তিনি সমাজসেবী ও স্বদেশ-সংগঠক।

'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) ও 'চার-অধ্যায়' (১৯৩৪)—উপন্যাসদুটির প্রকাশনার কালগত ব্যবধান প্রায় আঠারো বৎসর। এর মধ্যে বিশ্বসমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। রুশ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ সংকট আরো ঘনীভূত হয়েছে। আবার ভারতের সামাজিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় মুক্তিআন্দোলনও নব নব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল, বিশেষকরে চরমপন্থীদের উদ্যোগে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ দেশের মধ্যে দুর্বার হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে সিংহল ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ 'চার-অধ্যায়' উপন্যাসটি রচনা করেন—যার মধ্যে বিপ্লবপন্থার 'বিভীষিকাময়' চিত্র তুলে ধরেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হতাশাক্লিষ্ট বিপ্লবীদের আত্মধিক্কারের বাণীও শোনালেন। স্বভাবতঃই এই

উপন্যাসের প্রকাশনা একদিকে যেমন সমগ্রদেশে সৃষ্টি করল তুমুল বিতর্ক, বিক্ষোভ ও অসন্তোষ, অন্যদিকে ইংরেজ শাসক উল্লসিত হয়ে উঠলো। তদানীন্তন বাংলার গভর্ণর জেনারেল এণ্ডারসন্ সাহেবের মতে এই গ্রন্থ 'বিপ্লবীদের moraie বা নৈতিক মনোবল ভাঙ্গিয়া দিবার একটি শক্তিশালী অস্ত্র হইতে পারে।' ৬০ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আলোচ্য উপন্যাসখানি প্রকাশের ঠিক পূর্বে দার্জিলিং এ লেবং ঘোড়দৌড় মাঠে এণ্ডারসন্‌কে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপের ঘটনার (৮ই মে ১৯৩৪) প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ এক প্রেস্ বিবৃতি দেন। এই সমস্ত কিছুর ভিত্তিতে দেশবাসীর মনে ধারণা হয় যে, বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি প্রকাশ করেছেন। এছাড়া, গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের 'আভাস' অংশে উল্লিখিত (পরে ঐ অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে) বিপ্লবী ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে'—এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটিকে স্বয়ং লেখক কর্তৃক 'উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য'—বলে গুরুত্ব দেওয়ায় দেশবাসীর মনে ঐ সন্দেহ ঘনীভূত হয়। সম্ভবত উপাধ্যায়ের 'পতনের' কথা শুনেই কবি 'চার-অধ্যায়ে'র অতীন্দ্রের অনুরূপ চিত্র অঙ্কন করেছেন। এর পর শুরু হয় দেশময় নানা পত্র-পত্রিকায় কবির বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা, তাই পরে আত্মপক্ষসমর্থনের উদ্দেশ্যে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩৪২) 'চার-অধ্যায়' সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ লিখে মন্তব্য করেন—'চার-অধ্যায়ের কোন বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে তর্ক সাহিত্য বিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্ট দেখা যচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালী নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনাঅংশ গৌণমাত্র; ···।' মন্তব্যটিতে লক্ষণীয় যে, লেখক এই উপন্যাসে তাঁর নিজস্ব কোন মত বা উপদেশের কথা যেমন সরাসরি অস্বীকার করেননি, বিপ্লবের বর্ণনার কার্যকারিতাও গৌণ হোক বা মুখ্য হোক—পরোক্ষে স্বীকার করেছেন। তাই কবির 'আভাসের' বক্তব্য ও 'কৈফিয়তের' ব্যাখ্যার যথাযথতা সম্বন্ধে

প্রশ্ন উঠেছে, এ ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই; তবে সম্প্রতি রবীন্দ্র-উপন্যাস সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ তা সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে 'আভাস' ও 'কৈফিয়তের' স্ববিরোধিতা যেমন নির্দেশ করেছেন, আবার আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমিকায় বিপ্লববাদের ঐতিহাসিক সত্যতার যে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে—তাও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেছেন। ৬১ তাই লেখক যাই বলুন না কেন—উপন্যাসের মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি, তাদের সংলাপ ও আচরণ যে-ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে, গুপ্ত বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে যে-ভাবে চরিত্রগুলিকে দিয়ে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়েছেন—তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সশস্ত্র বিপ্লব সম্পর্কে রবীন্দ্র-মানসের বিমুখতাই এই উপন্যাস রচনার মৌল প্রেরণা এবং গল্পের মাধ্যমে তা প্রচার করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধ অপেক্ষা গল্পের আবেদন বেশী; তাই 'নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস'-এর আবরণে লেখক বিপ্লবপন্থা সম্পর্কে যে তর্ক-বিতর্কের অবতারণা করেছেন—তার ব্যাপ্তি সমগ্র উপন্যাসটি জুড়ে আছে।

বিপ্লববাদ সম্পর্কে তাঁর মতবাদ কি – তা শুধু এই উপন্যাসেই নয়, বিভিন্ন পত্র ও প্রবন্ধে তিনি তা প্রকাশ করেছেন; বিপ্লববাদের সূচনা ও বিকাশ-পর্বও বিংশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ-ব্যাপী। প্রথমদিকে, ১৯০৮ (৩০ এপ্রিল) সালেই মজঃফরপুরে প্রফুল্লচাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর বোমায় কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা মারা যাওয়ার কিছুদিন পর আবার যখন কলকাতায় মানিকতলায় বোমার কারখানায় কিছু যুবক ধরা পড়ে, তখন কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরীতে এক সভায় (২৫ মে ১৯০৮) স্বরচিত 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধটি পাঠ করে দেশবাসীকে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে সজাগ করে দেন। তাঁর ধারণা ছিল—'এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই।...... একটি কথা ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই, অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়।... দেশহিতৈষীর ভয়ংকর হস্ত হইতে দেশকে

রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে…।' ঐ 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধেই আবার তিনি বলেন—…'অবৈধ বা অজ্ঞানবশতঃ স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু একটাকে ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশী প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয়।'

আবার ঐ সময় (২৩ বৈশাখ ১৩১৫) জোড়াসাঁকো থেকে শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত একটি পত্রে কবি লিখেছেন—

'দেশের যে দুর্গতি-দুঃখ আমরা আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে—গুপ্তচক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না, আমাদের পাপের বোঝা কেবলই বাড়িয়াই চলিবে।' ৬২

১৯৩০ সালে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার সমাজব্যবস্থার সার্বিক প্রশংসা করলেন বটে, কিন্তু যে বিপ্লবের পথে সেই সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেই পথ সম্পর্কে কবির দ্বিধা প্রকাশ পাচ্ছে এই মন্তব্যটিতে— 'শক্ত ও অশক্তের ভেদ আছে যে একটা বিশেষ আকার ধরে প্রকাশ পাচ্ছে সেইটাকে রক্তপাত করে বিনাশ করলেই কি মানবপ্রকৃতি থেকে ভেদের মূল একেবারে চলে যায়?' (কোরীয় যুবকের রাষ্ট্রীক মত—রাশিয়ার চিঠি) ঐ বছরই (২৮ অক্টোবর, ১৯৩০) ল্যান্স্‌ডাউন থেকে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে একটি পত্রে লিখেছেন—

'দেশবিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ করেছে কেবলমাত্র মারকে স্বীকার না করে—দুঃখকে উপেক্ষা করার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলই চেষ্টা করছে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুলতে; যদি সফল হতে পারে তবেই আমরা হারব। …বাংলাদেশের মাঝে মাঝে ধৈর্য নষ্ট হয়, সেইটেই আমাদের দুর্বলতা। আমরা যখন নখদন্ত মেলতে যাই তখনই তার দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়। উপেক্ষা কোরো, নকল কোরো না।' (রাশিয়ার চিঠি : ১৪ পত্র দ্রষ্টব্য)

উপরের উদ্ধৃতিগুলির উদ্দেশ্য হল মূলতঃ বিপ্লববাদ

সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মানসভঙ্গীটির পরিস্ফুটন। বৈপ্লবিক কার্যক্রমকে তিনি যে নৈতিকতার দিক থেকে বিচার করেছেন তাও স্পষ্ট বোঝা গেল। বিপ্লববাদ যেহেতু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী ও হিংসাত্মক বলে মনে হয়েছে, তাই রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'বিভীষিকা পন্থা,' তিনি মন্তব্য করেছেন 'সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে লোক মদের পাত্র নিয়ে বসেছে।'

এখন দেখা যাক্—'চার-অধ্যায়' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঐ বিপ্লববাদের বিরোধিতা করেছেন কিভাবে ও কোন্ কোন্ চরিত্রের মাধ্যমে। উপন্যাসে প্রধান চরিত্র তিনটি—ইন্দ্রনাথ, এলা ও অতীন্দ্র। অতীন্দ্রের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষভাবে লেখক বিপ্লব-বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে উঠেছেন – পরে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে এলা। আর ইন্দ্রনাথের আবেগপ্রবণ কথাবার্তা ও কাজকর্মের মধ্যে এত অসঙ্গতি, যুক্তিহীনতা ও রহস্যময়তা রয়েছে—যাতে পাঠকচিত্তে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সমাজে আকাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠা না পাওয়ায় কিছু হতাশ যুবক যেন লক্ষ্যহীনভাবে আত্মবিধ্বংসী এক খেলায় মত্ত হয়েছে। তাই সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ঐতিহাসিকতার বিকৃতি ঘটিয়ে। উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ঐ তিনটি চরিত্রের সকলেই কোন-না-কোন প্রকারে বিপ্লববিরোধী। বিপ্লবীদলে যোগ দেওয়ার পিছনে এদের মধ্যে কোন্ প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল—বৈপ্লবিক নিষ্ঠা ও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ, না, অন্য কোন কারণ? উপযুক্ত শিক্ষা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও জীবিকার্জনের পথ সুগম না হওয়ায় ইন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে—'য়ুরোপে থাকতে ভারতীয় কোনো একজন পোলিটিকাল বদনামির সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল, দেশে ফিরে এলে তারই লাঞ্ছনা তাঁকে সকল কর্মে বাধা দিতে লাগল।'—তাই ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতাবোধ ও হতাশাই ইন্দ্রনাথকে সন্ত্রাসবাদী করেছে, দেশের প্রতি কর্তব্যবোধে সহজভাবে সে এতে যোগ দেয়নি। এলার ক্ষেত্রে আমরা দেখি, নিজের পারিবারিক পরিবেশ তার মধ্যে যে বিরুদ্ধভাব জাগিয়েছিল তার ফলেই সে সন্ত্রাসবাদী। প্রথম-

দিকে মায়ের কাছে বাবার অসম্মান দেখে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, তারপর কাকার (সুরেশের) পরিবারে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারায় 'কাকার স্নেহের সঙ্গে কাকার সংসারের দ্বন্দ্ব' ঘটতে বসেছিল, তা থেকে নিজে মুক্তি পাওয়ার জন্যই সে ইন্দ্রনাথের দলে 'কোনো একটা কাজ' চেয়েছে, আর অতীন্দ্র তো এসেছে এলার আকর্ষণে, সে স্পষ্টই এলাকে বলেছে—'তোমার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলুম এইটে অত্যন্ত সহজ কথা। দুর্জয় সে লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরিয়া হয়ে জীবন পণ করলুম বাঁকা পথে।' কাজেই ইন্দ্রনাথ, এলা, অতীন্দ্র-এরা কেউই দেশপ্রেমের স্বাভাবিক প্রেরণায় সন্ত্রাসবাদী হয়নি; এ ব্যাপারে তারা যে তাগিদ অনুভব করেছে সেটা সম্পূর্ণ তাদের ব্যক্তিগত, দেশগত নয়। কিন্তু বিপ্লববাদের যুগে বাংলার যুবকরা যে সন্ত্রাসবাদের পথ অবলম্বন করেছিল তার মূল প্রেরণা ছিল দেশপ্রেম, ব্যক্তিগত জীবনে ব্যর্থতাজনিত হতাশা বা কোনো নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা নয়। যদিও জাতীয় আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায়ে নরমপন্থী কংগ্রেসীদের আপোষকামী আন্দোলনের ধারায় দেশবাসীর হতাশা সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমকে দুর্বার করে তুলেছিল, কিন্তু তারও আগে যাঁরা বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ও হৃদয়বান ব্যক্তি; পি মিত্র, অরবিন্দ ঘোষের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রবীণ বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন—'বাংলার যে সমস্ত যুবক রাজনৈতিক মুক্তি চাহিত, যাহারা ত্যাগী, যাহারা কার্যত জীবনপণ করিয়া কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিত—তাহারা অধিকাংশই তখন এই বিপ্লবদলে যোগ দিয়াছিল।' ৬৩ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মূল প্রেরণা যে দেশপ্রেম, তা উল্লেখ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—

'There is hardly any doubt that this movement (terrorism) owes its origin to the same currents of nationalism which produced the new school of political thought noticed above. As a matter of fact the proper name for it is militant nationalism.' ৬৪

কাজেই রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য উপন্যাসে ইন্দ্রনাথ-এলা-অতীনের বিপ্লবী-দলে যোগদানের কারণগুলি যেভাবে নির্দেশ করেছেন তাতে পরোক্ষে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিপ্লবীদলগুলি ছিল যেন সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে ব্যর্থ কতকগুলি হতাশ যুবক-যুবতীর আখড়া। গুপ্ত সমিতি বা বিপ্লবীদলকে এই ভাবে চিত্রিত করাতেও তাঁর সন্ত্রাসবাদ-বিরোধিতা প্রকট হয়ে পড়ে।

এবার আমরা দেখবো, বিপ্লব সম্বন্ধে ঐ তিনটি চরিত্রের ধারণা কেমন ? ইন্দ্রনাথের কাছে বিপ্লব যেন রোমান্স, তাই সে বলেছে—'ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে। গোলামি চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মত মরতে পারার' গৌরব অর্জনই তার দৃষ্টিতে বিপ্লবের উদ্দেশ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে স্বদেশের মুক্তি কামনার ন্যূনতম পরিচয়ও ফুটে ওঠে না। অন্যদিকে এলা ও অতীন্দ্র দুজনেই শেষে উপলব্ধি করেছে যে, বিপ্লববাদ এক অর্থহীন, অন্তহীন আত্মবিধ্বংসী আবর্ত—সেখান থেকে পরিত্রাণের কোন পথ নেই, অথচ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সেখানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। এলা তাই বলেছে—'হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁঠ বাঁধা, তৎসত্ত্বেও এত বড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোন মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে।' এই উক্তিই প্রমাণ করে যে দেশপ্রেমের চেয়ে তাদের আপন ব্যক্তিগত প্রেমের সার্থকতার জন্য তারা উন্মুখ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় অতীন্দ্র ক্ষুব্ধ, সে মনে করে এভাবে মানুষের মনুষ্যত্বই বিনষ্ট হয়। পূর্বেই আমরা বলেছি যে, উপন্যাসের মধ্যে লেখক তাঁর নিজস্ব বক্তব্য মূলতঃ অতীন্দ্রের মুখ দিয়ে প্রচার করেছেন। অবশ্য কোন বিশেষ চরিত্রের বক্তব্যকে লেখকের বক্তব্য বলে সব সময় ধরে নেওয়া যায় না, কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি এই কারণে যে বিপ্লবী কার্যক্রম, দেশহিতৈষা ইত্যাদি সম্বন্ধে অতীনের মুখ থেকে আমরা যা শুনেছি—প্রায় একই মত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির অন্যান্য শাখাতেও অন্যভাষায় প্রচার করেছিলেন। নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল—

অতীন্দ্রের উক্তি— (ক) 'অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হলেও তাতেও হার, পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে

যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানব-ধর্মে বড়ো—নইলে এতবড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন? নির্বুদ্ধিতার আত্মঘাতের জন্যে?

(খ) 'মনুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়-ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষ সীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।'

(গ) 'পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম্ কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকা।'

এবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কিছু মন্তব্য উল্লেখ করছি—

(ক) 'এখন আমাদের দেশের লোককে অকপট হিতৈষণা হইতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে, গবর্মেন্টের শাসননীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনই মথিত করিতে থাক্, আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।' (পথ ও পাথেয়ঃ রাজাপ্রজা)

(খ) 'আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায় পীড়ন, দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে,··· জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ংকর ভুলকে তিনি কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্মকে শক্তি বলিয়া নিশ্চয় জানেন।' (দেশহিতঃ আত্মশক্তি ও সমূহ)

(গ) প্যাট্রিয়টিজ্‌মের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে।······ স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা।·· স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয় তাহাই পেট্রিয়টিজ্‌ম্ শব্দের বাচ্য হইয়াছে।' (দেশের কথাঃ আত্মশক্তি ও সমূহ)

এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অতীন্দ্র ঔপন্যাসিকের মতবাদের প্রচারক। এছাড়া, লেখক এলার মধ্যে যে দোদুল্যমানতা ও নারীসুলভ হীনমন্যতা দেখিয়েছেন—তাতে যেন সমকালীন

মহিলা-বিপ্লবীদের প্রতি কিছুটা কটাক্ষপাত করা হয়েছে। তখন বাংলাদেশের যেসব মহিলা বিপ্লবে যোগদান করেছিলেন—তাদের মানসিকতায় ঐ জাতীয় রোমান্স ও দোদুল্যমানতার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় স্বীকৃত নয়, বরং অনেক অসাধ্যসাধনে পুরুষের সমকক্ষতার প্রমাণ তাঁদের ক্ষেত্রে সুপ্রচুর। কলকাতায় অনুজা সেন ডালহাউসী স্কোয়ারে টেগার্টের উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ করেন (১৯৩০), চট্টগ্রামে পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণের (২৪-৯-১৯৩২) নেতৃত্ব দেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং পুলিসের হাতে ধরা পড়ার পূর্বে তিনি আত্মহত্যা করেন, তাছাড়া ঐদলে কল্পনা দত্তও ছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে (১৯৩২) গভর্ণরের প্রাণনাশের জন্য পিস্তল ছোঁড়েন বীণা দাস—এইভাবে সেদিনের বিপ্লবী মহিলাদের বীর্যদীপ্ত ভূমিকার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কাজেই এলার চরিত্র সমাজ-বাস্তবতার পরিপন্থী হয়ে সার্থক হতে চেয়েছে। তাতে ঘটেছে উপন্যাসের স্বধর্মচ্যুতি। এলা যতটা অপরের নির্দেশের তাড়নায় চলেছে, ততটা অন্তরের উপলব্ধির জোরে নয়। অথচ লেখক আমাদের ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন, এলা বুদ্ধিমতী। তার কথাতেও আছে বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। যে পর্যন্ত নির্লিপ্ত ও পরমত-সহিষ্ণুতা বাস্তবতাকে আত্মস্থ করে চরিত্ররূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য লেখকের পক্ষে অপরিহার্য, রবীন্দ্রনাথ এখানে তা রক্ষা করতে পারেন নি। তাই উপন্যাসেরও সম্পূর্ণ মুখ রক্ষা হয়নি। যেহেতু 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের অঙ্গ থেকে কিছুতেই রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করা যাচ্ছেনা, তাই এ-কাহিনীকে নিছক 'কোন আধুনিক বাঙালী নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস' রূপে গণ্য করাও সম্ভব নয়।

শুধু চরিত্র সৃষ্টিতেই নয়, বিপ্লবী কর্মপন্থার চিত্রাঙ্কনেও লেখকের উষ্মা স্পষ্ট; অবশ্য উপন্যাসের মধ্যে বিপ্লবী কার্যক্রমের বর্ণনা বিশেষ কিছুই নেই, শুধু একবার পিস্তল দিয়ে ছাগল মেরে নিষ্ঠুর হওয়ার পরিমাপ করা আর মন্মথের গ্রামের এক অনাথা বিধবার সম্পত্তির লুঠের উল্লেখ আছে মাত্র। এই দুটি ঘটনার উল্লেখও ব্যঙ্গাত্মক। আবার দ্বিতীয় ঘটনাটি অর্থাৎ বিপ্লবীদলের

দ্বারা বিধবার সম্পত্তি লুঠ ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিকৃতি। কারণ অগ্নিযুগের যে-সমস্ত বিপ্লবী রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের বিশেষ শপথ বাক্য পাঠ করতে হ'ত। 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্যদের জন্য নির্ধারিত ঐ বিশেষ প্রতিজ্ঞার মধ্যে রয়েছে ৬৫—

১। 'স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাই অসৎ কর্ম জানিয়াও আমরা অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসাবে ডাকাতির পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হইয়াছি।......'

২। 'যাহারা দেশদ্রোহী, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী, সরকারের গুপ্তচর, প্রতারক, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, অসৎ, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি উৎপীড়নকারী, জাতি বা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ আত্মসাৎকারী, অতিরিক্ত সুদখোর, কৃপণ-ধনবান কেবল তাহাদের বাড়ীতেই আমরা ডাকাতি করিব।'

৩। প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ডাকাতি করিতে যাইয়া আমরা কোন রমণী, শিশু, দুর্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতিদের উপর কখনই কোন প্রকার অত্যাচার করিব না।'

এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের ঐতিহাসিক সত্যতা এখানে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে—এও রবীন্দ্রনাথের বিপ্লববাদ-বিরোধিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিধবার সম্পত্তি যে বিপ্লবীরা লুঠ করতেন না—তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে উপরের উদ্ধৃতিতে। আবার অতীন্দ্রের মুখ দিয়ে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে যা আমরা জানতে পারি সেটা হচ্ছে—'মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচর বৃত্তি।...' বিপ্লবীদলের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য গুপ্তচর বৃত্তির প্রয়োজন থাকলেও 'মিথ্যাচরণ', 'নীচতা' ইত্যাদি যে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না—তার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়, এমন কি রবীন্দ্রনাথও অনেকবার তাঁদের সম্পর্কে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন। এখানে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল— 'মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনদিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে

দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেন্টের চাকরী বা রাজ-সম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কন্টকিত।... ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্তপত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই; ছোটো ইংরেজ ইহাদের শুভ সংকল্পকে ঠিকমত বুঝিবে কিম্বা হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিবে, এ দুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই।' (ছোট ও বড় : কালান্তর)। এছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধেও বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের আদর্শের প্রশংসা করেছেন, এতে বাঙালী জাতির ভীরুতার অপবাদ কিছুটা ঘুচেছে বলেও মনে করেছেন। দেশের ঐ উত্তেজনা যে একেবারেই নিষ্ফলা তাও তিনি মনে করেন না, বরং বাংলার জড়ত্বপ্রাপ্ত অসাড় গণশক্তিকে 'সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার পরে কী করিতে হইবে। কাজ করাইতে হইবে, না মাতাল করিতেই হইবে? যে পরিমাণ মদে ক্ষীণ প্রাণকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলে তাহার চেয়ে বেশি মদে পুনশ্চ তাহার কাজের উপযোগিতা নষ্ট করিয়া দেয়।' (পথ ও পাথেয় : রাজাপ্রজা) বস্তুত : 'সবুজ সংসদের গুরু' রবীন্দ্রনাথকে সেদিনের সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত দেশের দামাল ছেলেরা কম আকৃষ্ট করেনি। তাদের মত ও পথকে সমালোচনা করেও আত্মোৎসর্গের উন্মাদনায় অভিভূত না হয়ে পারেন নি, 'বিবেচনার সংযম তিনি প্রার্থনা করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে অশ্রদ্ধা করেন না অবিবেচনার বেগকে।' ৬৬

তাহলে দেখা যাচ্ছে—একদিকে বিপ্লবী যুব সম্প্রদায়ের মহত্ত্বের প্রশংসা, অন্যদিকে বৈপ্লবিক রাজনীতির বিরোধিতা, একদিকে দেশে গণশক্তির অভ্যুত্থান-কামনা, অন্যদিকে গণ-আন্দোলনকে সংযত করার প্রবণতা—দুই বিপরীতধর্মী মানসিকতার দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সকল দেশেরই বুর্জোয়া মানবিকতার আদর্শে অনুপ্রাণিত চিন্তানায়কদের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব থাকে। মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা মানুষের মুক্তি কামনা করেন, কিন্তু মুক্তির পথ নির্দেশে তাঁরা নির্ভর করেন নৈতিকতার উপর।

এই প্রসঙ্গে ভারত-রক্ষা আইনে (Defence of India Act 1915) শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের গ্রেপ্তারের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে যে পত্র লেখেন ('দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় ৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ প্রকাশিত) তার শেষাংশ স্মরণীয়—'I pay my homage to those who have faith in ideals and therefore are willing to take all other risks except that of weakening the foundation of moral responsibility.' ৬৬ (ক) অতএব বলা যায় যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রগতিশীল চিন্তার প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যত্যয় ঘটেছে। প্রখ্যাত সমালোচকের মতেও 'A work of literature always reflects whether consciously or unconsciously, the psychology of the class which the writer represents, or else, as often happens, it reflects a mixture of elements in which influence of various classes on the writer is revealed,…' ৬৭ তাই দেখি রবীন্দ্রনাথও অনেক ক্ষেত্রে স্বশ্রেণীর সমাজ-ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত করেও সম্পূর্ণভাবে তার ঊর্ধে যেতে পারেন নি। তারই প্রমাণ 'চার অধ্যায়ে'র বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা। অপর এক রবীন্দ্র-গবেষক এই উপন্যাসের ত্রুটি নির্দেশ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন— '‥ কবি তাঁহার এই উপন্যাসে বাংলাদেশের বিপ্লব প্রচেষ্টার পটভূমিই শুধু গ্রহণ করেন নাই,—একটি বিপ্লবীদলের নেতা ও কর্মীদের তাঁহার উপন্যাসের আসল চরিত্র ও নায়ক—নায়িকা করিয়াছেন।… এই কারণেই এই দলের উদ্দেশ্য, মতাদর্শ ও কার্যকলাপকে তাহার সত্যকার রূপে ও বর্ণে (in their true official colour) চিত্রিত করার দায়িত্ব লেখকের থাকিয়াই যায়।… কিন্তু যখন সেই দলের বিভ্রান্ত এক নায়কের মুখে সেই দলের শুধুমাত্র ক্লেদাক্ত দিকটিই উদ্ঘাটিত হইয়াছে তখন তাঁহার সমালোচনার ভাগ লেখক হিসাবে কবিকে চিরদিনই বহন করিতে হইবে।' ৬৮ রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের ধর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, এর জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তির উদ্বোধন ও প্রবৃত্তির

সংযম। কাজেই হিংসাত্মক পন্থায় তাঁর সমর্থন থাকতে পারে না। ব্যক্তি সন্ত্রাসের পন্থা যে যথার্থ বিপ্লবী পন্থা নয়—এ-সত্য ইতিহাসে স্বীকৃত। লেনিনের পূর্ববর্তী বিপ্লবীদের কার্যকলাপ আমাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের সঙ্গে অনেকাংশে তুলনীয়। দাদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে লেনিন দাদার সহকর্মীদের প্ররোচনায় জারকে হত্যা করতে চাননি। তিনি জারতন্ত্র উচ্ছেদের রাজনৈতিক হাতিয়ার খুঁজেছেন। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী অধ্যায়ে অনেক প্রাক্তন বিপ্লবীই বুঝেছেন যে, ব্যক্তি-সন্ত্রাসের দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপসারণ বা স্বদেশের মুক্তি অসম্ভব। কিন্তু 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে বিপ্লববাদের বীভৎস চিত্র রূপায়ণের পশ্চাতে ছিল রবীন্দ্রনাথের এক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। এখানে তিনি রাষ্ট্রীক বা সামাজিক সমস্যার চেয়ে যেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমস্যার উপরেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে, ব্যক্তির আত্মোৎকর্ষের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা অপরিহার্য, আর আত্মিক উন্নত ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বসমন্বিত সমাজ-ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা লাভ করবে, এর জন্য বল-প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে এক্ষেত্রে তাঁকে বাস্তববাদী শিল্পী বলা যায় না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এখানে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের একটি পর্বের নেতিবাচক দিকেই ঝুঁকে পড়েছে।

উপরে যে-তিনটি উপন্যাসের (গোরা, ঘরে-বাইরে ও চার-অধ্যায়) বিশ্লেষণ করা হ'ল, তাতে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার মূল বৈশিষ্ট্যটি কিভাবে ধরা পড়েছে? রবীন্দ্র-নাথের স্বদেশচেতনা ও আন্তর্জাতিকতার সামগ্রিক পরিচয় তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্মের মধ্যেই অনুসন্ধেয়—উপন্যাসে তারই কিছুটা বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায় মাত্র। তাই স্বাভাবিকভাবে উপন্যাসের মধ্যে এর বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনের জন্য সামগ্রিকতার আভাস দেওয়া কিছুটা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যে রাজনীতিবিদ্ নন—সে-কথা স্বয়ং কবিই বার বার বলেছেন,[৬৯] কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর জীবৎকালে বিশ্বের সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলী গভীরভাবে অনু-ধাবন করে সে-সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করতে

কখনও তিনি পিছিয়ে যাননি। তিনি কখনও 'প্রিয়' হতে চাননি, চেয়েছিলেন 'সত্য' হতে—তাই সব বিষয়ে আপন উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করাই ছিল রবীন্দ্রমানসের ধর্ম। এই সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অকৃত্রিম ও অনিঃশেষ মানবপ্রীতি ও মর্তমুখীনতা। মানুষের মুক্তি, ব্যক্তিহিসেবে তার পরিপূর্ণ বিকাশই ছিল কবির আজন্ম সাধ্য। তাঁর স্বদেশ ও সমাজ-চিন্তার মূলেও ছিল ব্যক্তির আত্মোন্নয়ন ও আত্মবিকাশের কামনা, পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের মানব-সমাজের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধের উদ্বোধন। কবির এই অনুভব যখনই বাস্তবে প্রতিহত হয়েছে তখনই তিনি হয়েছেন ক্ষুব্ধ, দেখা গেছে তাঁর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যপরায়ণতা। কাজেই স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে ও স্বদেশী আন্দোলনের বিষয়ে তাঁর বিরোধিতাকে প্রগতিবিরোধী বা একান্ত আত্মপরায়ণ বলে মনে করা ভুল হবে। হয়ত অধিকাংশের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারাও সমাজমুখীন। সামাজিক সমস্যাকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। মূলতঃ তাঁর সমাজদর্শন ও জীবনদর্শন ছিল পরস্পর সম্পৃক্ত, তাই কর্ম ও চিন্তার মধ্যে কখনও সামঞ্জস্যের অভাব ঘটেনি। গোরা ও ঘরে-বাইরে উপন্যাসে তাঁকে 'বয়কট আন্দোলনে'র বিরোধিতা করতে দেখেছি, কেন বিরোধী তাও বিশ্লেষিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, কেবল বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হননি, গঠনমূলক পল্লী-উন্নয়নের পরিকল্পনাও তিনি দিয়েছেন। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার কাজে তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ হয়ত রাষ্ট্রনেতা নন, কিন্তু তিনি সমাজসেবী ও স্বদেশকর্মী। দেশবাসীর পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন বলেই কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের পথ ও মতকে তিনি কঠোর ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছিলেন সেদিন। আবার ব্যক্তিসন্ত্রাস কোন বিজ্ঞান-সম্মত বিপ্লব-পন্থা নয়,—এবোধও তাঁর ছিল। সেই জন্যই আবার তাঁকে দেখি ঘরে-বাইরে ও চার-অধ্যায় উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী ভূমিকায়। এখন প্রশ্ন হল-সামগ্রিকভাবে স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী ও

প্রগতিশীল, না, বাস্তববিমুখ প্রগতি-বিরোধী? উপরের আলোচনার নিরিখে তাঁর প্রগতিশীলতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সমাজ-সচেতনতা সম্পর্কেও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। ঔপন্যাসিকের চিন্তাস্রোতের গতি-প্রকৃতির মাপকাঠিতেই তাঁর সমাজ-সচেতনতা ও প্রগতিশীলতা বিচার্য, সমকালীন সমাজের কোন বিশেষ আন্দোলনের সমর্থন বা বিরোধিতায় তা নির্ণয় করা কঠিন।

সমকালীন বুর্জোয়া মানসিকতায় বিশ্বাসী মনীষীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতার ভিত্তিমূলে রয়েছে শোষণ-নীতি ('এক্স্‌প্লইটেশন্‌'-সমবায় নীতি দ্রঃ)। সেখানে মূলধন ও মজুরির মধ্যে ভেদের আত্যন্তিকতায় গণতন্ত্র ('ডিমক্রাসি'—ঐ দ্রঃ) পদে পদে প্রতিহত (অর্থাৎ সারপ্লাস ভ্যালু বা উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করছে মূলধন)। তাই তিনি সমবায় নীতির মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঐ মূলীভূত কারণ এবং বিশ্বের ধনতন্ত্রীদের অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত বিশ্ব-মানবসমাজের শোষণ ও বঞ্চনা যাঁর দৃষ্টিতে এমন স্বচ্ছ—তাঁর চিন্তাস্রোতের গতি কোন্‌দিকে সহজেই তা অনুমেয়। আধুনিক বিশ্বের মানবসমাজের সমস্যাকে তিনি সামগ্রিকভাবে এক অখণ্ডদৃষ্টিতে দেখার প্রয়াসী ছিলেন, বিচ্ছিন্নভাবে দেখা তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। তিনি বলেছিলেন 'স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত, একথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে' (রাশিয়ার চিঠিঃ তৃতীয় পত্র)। তাই বলা যায় যে, তাঁর স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতা পরস্পরের অঙ্গীভূত। ইউরোপীয় ন্যাশন্যালিজম ও প্যাট্রিয়টিজমের সঙ্কীর্ণতা যে ইম্পীরিয়ালিজমের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ('অজগরের ঐক্যনীতি' দ্রঃ) এবং উগ্র দেশাভিমানজনিত পরজাতি-বিদ্বেষের যে ভয়ঙ্কর পরিণাম, সেদিন এদেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনিই সারা বিশ্বে শান্তিকামী চিন্তানায়কদের আহ্বান জানিয়েছিলেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও শীর্ণদেহ নিয়েই ছুটে গিয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় এবং অকপটে

নির্ভিকভাবে তার প্রশংসনীয় দিকগুলির প্রতি বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে সারা বিশ্বের দৃষ্টি সেদিন আকর্ষণ করেছিলেন। এগুলি শুধু প্রগতিশীলতার সাক্ষ্য নয়, সমাজ-বাস্তবতার পরস্পর বিরোধী ভাব-সংঘাতের যথার্থ আত্মীকরণেরই পরিচয়বহ। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর কাছে প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু বিশ্বসমাজের, বিশেষকরে আমাদের ভারতীয় সমাজের সমস্যার মূলীভূত কারণ তিনি যেভাবে নিরূপণ করেছেন, তা প্রায় বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণের সমধর্মী।

পুঁজিবাদী সমাজের ক্রমবর্ধমান শ্রেণীবৈষম্যজনিত শ্রেণী-সংগ্রামের অপরিহার্যতাও রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু সে-পথ তাঁর চিন্তাধারার অনুকূল নয় বলেই 'চার-অধ্যায়' উপ-ন্যাসের সৃষ্টি, পরিবর্তে তিনি গণশিক্ষা ও সমবায় নীতির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, চেয়েছিলেন রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত গ্রামীণ সমাজ। কিন্তু বাস্তবে এই ধরণের রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। তাই তাঁর ব্যক্তিগত কর্মপ্রয়াসও পরিণামে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ উদার মানবিকতাভিত্তিক স্বদেশচেতনা ও আন্তর্জাতিকতা আজও আদর্শস্থানীয়। এইখানেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের চরম সার্থকতা। সম-কালীন সমাজবাস্তবের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দোটানায় তিনি কথনো প্রতিক্রিয়ার শিকার হননি। অম্লান শুভবুদ্ধি, মানুষের চিত্তধর্মে স্বভাবজ বিশ্বাস তাঁর উপন্যাস-শিল্পকে কথনো তুচ্ছতায় নির্বাসিত বা গল্প-সর্বস্ব হতে দেয়নি।

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথঠাকুর : সামঞ্জস্য : শান্তিনিকেতন,

'দেশের জ্ঞান ও দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসার যাত্রার মধ্যে, এতবড় বিচ্ছেদ কথনোই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্তভাবে প্রবল, সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না কি রাষ্ট্রতন্ত্রে, কি ধর্ম-তন্ত্রে।'

২. রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ১২ খণ্ড), 'স্বদেশী-সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭০৭ দ্রঃ

৩, ৪. রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, ১৩ খণ্ড) 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধ দ্রঃ পৃঃ যথাক্রমে ১৫২ ও ১৪৮

৫, রবীন্দ্ররচনাবলী (জ. শ. সং ১২ খণ্ড), পৃঃ ৪২১, 'নববর্ষ : শান্তিনিকেতন' দ্রঃ

৬. ঐ ১৩ খণ্ড পৃঃ ৩৮০ নারীঃ কালান্তর দ্রঃ

৭. ডঃ ক্ষুদিরাম দাস : সমাজ : প্রগতি : রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৮-৯

৮. শ্রীযুক্ত নেপাল মজুমদার : ভারতের জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (১ম খণ্ড), পৃঃ ৬০

৯. রবীন্দ্র-রচনাবলী (জ. শ. সং, ১৩ খণ্ড) পৃঃ ৪৩৫, 'সমবায়-নীতি' প্রবন্ধ দ্রঃ

১০. ঐ পৃঃ ৩৮৪ 'কালান্তর' দ্রঃ (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'কংগ্রেস' বিষয়ক পত্রের একাংশ)

১১. রবীন্দ্ররচনাবলী (জ, শ. সং ১২ খণ্ড) পৃঃ ৭৬৮, 'স্বদেশী-সমাজের মর্মকথা' দ্রঃ

১২. শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার : রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা, শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন 'রবীন্দ্রনাথ' পৃঃ ১৩৩

১৩ ও ১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাশিয়ার চিঠি, উপসংহার দ্রঃ

১৫. ঐ ঐ ত্রয়োদশ পত্র দ্রঃ
এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথের সহযোগীরূপে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও রাশিয়া গিয়েছিলেন। সেই ভ্রমণের ফল সোভিয়েত অর্থনীতি সম্বন্ধে বাংলায় লেখা তাঁর প্রথম বই 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ'।

১৬. D. Chesnokov & V. Karpushin : Man and Society, P-232

১৭. Ralph Fox : The Novel and the people, P-13-14

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাশিয়ার চিঠি, উপসংহার দ্রঃ
'কোন বিষয়েই নায়কিয়ানা আমি পছন্দ করিনে।… নিজের মত প্রচারের রাস্তাটাকে সম্পূর্ণ সমতল করবার লেশমাত্র চেষ্টা আমি কোনোদিন নিজের কর্মক্ষেত্রে করতে পারিনে।'

১৯. রবীন্দ্র রচনাবলী (জ. শ. সং ১২ খণ্ড) পৃঃ ৭৭৫, 'আত্মশক্তি ও সমূহ' দ্রঃ
২০. Pavel Korin : 'On Realism,' 'Socialist Realism in Literature and Art.' P-94-98
২১. Vladimir Shcherbina, Nikolai Gei & Vladimir Piskunov : 'Socialist Realism and the Artistic Development of Mankind' (Socialist Realism in Lit. & Art P-235)
২২. শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (১ম খণ্ড) ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৭৭, পৃঃ ১৫৯ দ্রঃ
২৩, ২৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মপরিচয়, পৃঃ ৮৫-১০৯, সত্তর বৎসর বয়সে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের অভি-নন্দনের প্রতিভাষণ, ১৫ পৌষ, ১৩৩৮
২৫-২৮. শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (১ম খণ্ড) পৃঃ যথাক্রমে ৫০৮-৯, ৯৫ ও ২৭৪
২৯. রবীন্দ্র-রচনাবলী (জ. শ. সং ১৩ খণ্ড) পৃঃ ২৫১, কালান্তর 'ছোট ও বড়ো' দ্রঃ
৩০. ডঃ সত্যব্রত দেঃ রবীন্দ্র-উপন্যাস সমীক্ষা, পৃঃ ৩৫
৩১. শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (১ম খণ্ড) পৃঃ ৩৩৪ দ্রঃ ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৪২, শিলাইদহ, ৮এপ্রিল ১৮৯২।
৩২. অনেকের মতে মায়ের ঈর্ষা 'চোখের বালি' উপন্যাসের সমস্যাকে ভিতর থেকে জটিল করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই মতের সমর্থক। ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথের 'ঔপন্যাসিক রবীন্দ্র-নাথ' গ্রন্থ দ্রঃ
৩৩, ডঃ রবীন্দ্র গুপ্ত : 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস' প্রবন্ধ, (গোপাল হালদার সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন, পৃঃ ৫৯ দ্রঃ
৩৪. ডঃ আদিত্য ওহদেদার : রবীন্দ্র-সমালোচনার ধারা পৃঃ ৫৮ ও 'রবীন্দ্র-সাহিত্যের কয়েক দিক, পৃঃ ৫৯ দ্রঃ। 'সাহিত্য', সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'চোখের বালি' উপন্যাসের সমা-লোচনায় এটিকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উমা' উপন্যাসের অনুকৃতি বলে সন্দেহ করেছিলেন।

৩৫, ৩৬. ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদর : রবীন্দ্র-সমালোচনার ধারা, পৃঃ ৫৭, ১৫৪

৩৭. ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা (৫ম সংস্করণ) পৃঃ ৪০৩

৩৮. নন্দরাণী চৌধুরী : সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ (১ম) পৃঃ ৪৫ দ্রঃ 'উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস বর্তমান যুগের ফ্যাশন বটে, কিন্তু 'গোরা'র উদ্দেশ্য এক নয়, বহু এবং কিছু গুরুতর। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে জগতের বহু তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে যে তর্কজালের উদ্ভব হইয়াছে, পাঠকের মন নিতান্ত নাচারভাবে সেই লতাতন্তুজালে জড়াইয়া যাইতেছে।' ('সাহিত্য' ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ)

৩৯. ডঃ সত্যব্রত দে : রবীন্দ্র-উপন্যাস সমীক্ষা, পৃঃ ৭৮

৪০. ডঃ রবীন্দ্রগুপ্ত : উপন্যাস প্রসঙ্গে, পৃঃ ১৩৩

৪১. শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ৯৮ দ্রঃ 'সিডিসন কমিটির মতে : 'ভবানী মন্দির'-এ ধর্ম সম্পর্কে বহু আলোচনার সহিত রুশীয় বৈপ্লবিক আদর্শ ও পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে।'

৪২. যোগেশচন্দ্র বাগল : জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী, পৃঃ ১০ দ্রঃ 'She (Nivedita) taught them first the mechanism of Secret Societies, such as Ireland had known. These Samities existed already plentifully in the Indian Villages, but they remained fragmentary... Then Nivedita insisted on the absolute security of the immense network of secret communication stretched throughout the country like the protecting spider's web'. (Lezelle Raymond)

৪৩. শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (৩য় খণ্ড পৃঃ ৫১০

৪৪. : রবীন্দ্র-রচনাবলী (জ. শ. সং) ১৯ খণ্ড পৃঃ ৩৮৯, 'যাত্রী' দ্রঃ

৪৫. V. I. Lenin : Letters From Afar, Letter No. 111

৪৬. শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (১ম খণ্ড) পৃঃ ২৭২-৭৩

পণ্ডিত রমাবাই কোঙ্কনস্থ মঙ্গলুর জেলার এক গ্রামে ১২৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইংলণ্ডে গিয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং দেশে ফিরে এসে ১২৯৫ সালের ২৬শে ফাল্গুন হিন্দু-বিধবাদের জন্য 'সারদা-সদন' স্থাপন করেন। তাঁকে ভারতীয় নারী-প্রগতির উল্কা বলা হ'ত।

৪৭. রবীন্দ্র-রচনাবলী (জ. শ. সং) ১৩ খণ্ড, পৃঃ ১০৩—১০৪

৪৮. ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদার : রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ধারা, পৃঃ ১২২

৪৯. ভবানী সেন : একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী, ধনঞ্জয় দাস সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' গ্রন্থের পৃঃ ১৫৭ ও ১৬১ দ্রঃ

৫০ ও ৫১. শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (১ম খণ্ড) পৃঃ ৫০, ৫৫, ১০৮

দ্রঃ—দিল্লীর দরবার (১৮৭৭) সম্পর্কিত কবিতাটি ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট-এর জন্য কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটকের মধ্যে ভাষার কিছু পরিবর্তন ('ব্রিটিশে'র পরিবর্তে 'মোগল' শব্দ ব্যবহার) সহ সন্নিবেশিত হয়।

৫২. রবীন্দ্ররচনাবলী (জ. শ. সং ১২ খণ্ড, পৃঃ ৯৩৩

৫৩, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (২য় খণ্ড) পৃঃ ১২৬ দ্রঃ—সমকালীন জনৈক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদ পৃথ্বীশচন্দ্র রায় বলেছিলেন 'রবিবাবু যে সমস্ত রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর ও নানা দোষে দুষ্ট মনে করি।'

৫৪, ৫৫. শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৩৯-৪০

দ্রঃ—'জুতা ব্যবস্থা'য় কবির স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনী-কারের মতে 'রচয়িতার নাম না থাকিলেও উহা যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীপ্রসূত—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশই কম'। আর

'চীনে মরণের ব্যবসায়' ডঃ থিওডোর ক্রিস্টলীব (Theodore Christlieb) নামে জনৈক জার্মান পাদরি লিখিত 'The Indo-British Opium Trade' গ্রন্থ পাঠের ফলশ্রুতি।

৫৬. Letter written by Engels to Margaret Harkness in London (April, 1888).
Marx-Engels : on Literature and Art, P. 91 – 92

৫৭. রবীন্দ্র-রচনাবলী (জ. শ. সং) ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৩০৩

৫৮, ৫৯. নন্দরানী চৌধুরী সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' পৃঃ ৪৫-৪৬, দ্রঃ—রবীন্দ্র–বিরোধী সমালোচনাটি 'প্রবাসী' ১৯ বর্ষ ২য় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) প্রকাশিত হয়েছিল।

৬০. শ্রীযুক্ত নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (৩য়) পৃঃ-৫৬৪

৬১. ডঃ সত্যব্রত দে : রবীন্দ্র-উপন্যাস সমীক্ষা পৃঃ ৪৮২-৮৬

৬২. শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-জীবনী (২য়) পৃঃ ১৮৭

৬৩. নলিনীকিশোর গুহ : বাংলায় বিপ্লববাদ, পৃঃ ৪৬

৬৪. Dr, Ramesh Ch, Mazumder : The Genesis of Extremism, (Vide 'Studies in the Bengal Renaissance,' P-198)

৬৫. শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস পৃঃ ৮৯-৯০

৬৬, ৬৬ (ক) শ্রীযুক্ত দিলীপ মজুমদার : বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৬৪ ও ৪৭

৬৭, A Lunacharsky : On Literature and Art P-11

৬৮. শ্রীযুক্ত নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (৩য় খণ্ড) পৃ ৫৬৬

৬৯. রবীন্দ্ররচনাবলী (জ, শ, সং) ১৩ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২
দ্রঃ—'প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রীক আন্দোলনের বাইরে।' (কালান্তর : হিজলী ও চট্টগ্রাম)।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

ঃ শরৎ-উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতা ঃ

এক

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই ঘটেছিল। যদিও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০২) শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'র (১৯১৩) বেশ কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হয়, তবে একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, উভয়ের উপন্যাস সৃষ্টির ধারা প্রায় সমান্তরাল ভাবেই চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর 'চোখের বালি' থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী প্রায় সকল উপন্যাসেই সমাজ-সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন নানা সমস্যার, কোথাও কোথাও সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়েছেন—তা ইতিবাচক বা নেতিবাচক হোক, ঠিক তেমনি শরৎ-উপন্যাস সৃষ্টির পিছনেও ছিল শিল্পীর এক বিশেষ প্রকৃতির সমাজ-জিজ্ঞাসা। তবে রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে সমাজ যেমন ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ (যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে) শরৎচন্দ্রের সমাজ-ভাবনায় তা অনুপস্থিত। তাঁর বর্ণিত সমাজ অত্যন্ত সাদামাটা আটপৌরে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালীর সমাজ। তাঁর সমাজের ধারণাটি নীচের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে —

'একজন অশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের চাষা 'সমাজ' বলিয়া যাহাকে জানে, তাহার উপরেই নির্ভয়ে ভর দেওয়া চলে—পণ্ডিতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটির উপর চলে না। অন্ততঃ আমি বোঝাপড়া করিতে চাই ঐ মোটা বস্তুটিকে লইয়াই। যে সমাজ মরা মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়; বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বৌভাতে হয়ত বাঁকিয়া বসে, কাজ-কর্মে, হাতে পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধ শান্তি করিতে হয়, উৎসবে-ব্যসনে যে সাহায্যও করে, বিবাদও করে, যে সহস্র দোষত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়—আমি তাহাকেই 'সমাজ' বলিতেছি…'

'(সমাজ ধর্মের মূল্য)। এই উদ্ধৃতিটিতে 'আমি বোঝাপড়া করিতে চাই' আর 'যে সহস্র দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়'—মন্তব্য দুটি লক্ষণীয়। প্রথম মন্তব্যটি তাঁর যুযুধান মনোভঙ্গীর প্রকাশক, আর দ্বিতীয়টিতে তিনি যেন প্রচলিত সমাজের কাছে আত্মসমর্পিত। তাঁর উপন্যাসেও সমাজ-সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে

শিল্পীমানসের এই দ্বন্দ্ব যে প্রকট— তার পরিচয় যথাস্থানে পাব।

শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী, না আদর্শবাদী ?—সে সম্পর্কেও তাঁর ধারণা, এ'দুটোকে সম্পূর্ণ ভাগ করা যায় না। তাঁর মতে—'Art জিনিষটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে··· তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়।··· আমি ত জানি কি করে আমার চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচিনে, কিন্তু বাস্তব বা অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।' (১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ)। সাহিত্যের বাস্তবতা কি, সমাজ-বাস্তবতার স্বরূপ কি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে সে-প্রসঙ্গের পুনরুত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু বলা যায় যে, শরৎ-সাহিত্য মূলতঃ শিল্পীর রূঢ়-বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ চেতনার প্রতিবিম্বন, আর সেই সঙ্গে আভাসিত হয়েছে সমকালীন সমাজ-অভীপ্সা। ঔচিত্যানৌচিত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে মানুষের সত্যস্বরূপের প্রকাশে তিনি কখনও কুণ্ঠা বোধ করেননি। মানুষ প্রকৃত অন্তরঙ্গে কি, সমাজে ব্যক্তি হিসেবে তার স্থান ও মূল্য কিভাবে বিচার্য ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নই তিনি বারবার পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। জনৈক সমালোচকের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক— 'তিনি (শরৎচন্দ্র) সমাজে যেমনটি দেখেছেন, তেমনটি এঁকেছেন— কিন্তু এমনভাবে এঁকেছেন যাতে বর্তমান সমাজের কার্যকলাপে আমাদের হৃদয় বেদনায় কল্যাণকর ক্রান্তির প্রতিক্রিয়া ওঠে। এই কারণে যে হিসাবে তিনি realist সেই হিসাবে তিনি একজন Idealist ও বটেন।' ১ কাজেই তাঁর সমাজ-সচেতনতা ও বস্তুনিষ্ঠা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকা উচিত নয়, প্রশ্ন ওঠে সেই সব প্রশ্নের সমাধানে শিল্পীর মানস্-ভঙ্গীর ক্ষেত্রে। অবশ্য একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শরৎ-উপন্যাসে বাস্তবতা সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। কোন কোন সমালোচকের মতে, ১(ক) যদিও বাংলা কথাসাহিত্যে

বিষয়বস্তু নির্বাচনে শরৎচন্দ্র প্রকৃতই পথপ্রদর্শক, তবু চরিত্র-চিত্রণে তাঁর আদর্শবাদ ও রোমান্টিক ভাবানুভূতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে; 'জীবানন্দ চরিত্রের আরম্ভ বস্তুতান্ত্রিক রূঢ়তায়, কিন্তু চরিত্রটি শেষপর্যন্ত তিনি আদর্শের রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন। মেসের ঝি সাবিত্রীকে স্থান দিয়া তিনি বাস্তব-সাহিত্যের মর্যাদা রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহানুভূতিশীল হৃদয়ের স্পর্শে ঝি আর ঝি থাকে নাই, ব্যক্তিত্বে, চরিত্রবলে অসামান্য নারী হইয়া উঠিয়াছে।'

যাহোক, সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে শরৎ-উপন্যাসের বিশ্লেষণের পূর্বে আরেকটি কথা স্মরণীয় যে, সামগ্রিকভাবে তাঁর উপন্যাসে নারীচরিত্রই প্রধান এবং সেখানে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্পীমানসে এই প্রশ্নটি প্রাধান্য পাওয়ার বাস্তব কারণও যথেষ্ট ছিল। উনবিংশ শতকের শুরু থেকেই নারীমুক্তির আন্দোলন বাংলার সমাজ ও সাহিত্যকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছিল—শরৎ-মানসে তারই অভিঘাতজনিত প্রতিক্রিয়ার প্রাবল্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্রে (২৭. ৯. ১৯) তিনি লিখেছেন—'নারীর স্বামী পরম পূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়··· স্বামীও মানুষ, মানুষকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতে যাওয়া কেবল নিষ্ফল নয়, ইহাতে নিজেকে এবং স্বামীকে উভয়কেই ছোট করিয়া তোলা হয়। ·· যে ষোল-সতের বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকে ভালবাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য?' ২ আমাদের প্রচলিত সমাজে নারীর স্থান ও তজ্জনিত নানা সমস্যা যে শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল—পত্রটিতে তার প্রমাণ রয়েছে।

নারীর সামাজিক অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-গ্রাহ্য হলেও ব্যাপকভাবে সেগুলি সমাজ গ্রহণ করেনি। বিধবা-বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্য-বিবাহরদ, পরবর্তীকালে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনানুগ হলেও সমাজ তার পূর্বসংস্কার ও রীতি অনুযায়ীই চলছিল, সমাজে নারীনির্যাতনও যেন ক্রমবর্ধমান।

নারীর এই শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে শরৎচন্দ্র যে কত বিক্ষুব্ধ ছিলেন লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা অন্য একটি পত্রে (২৪.৭.১৯) তা জানা যায়, তিনি লিখেছেন—'অনেকগুলি বড় এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবাবিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে।' বস্তুত শিল্পীহৃদয়ের এই অপার সহানুভূতি ও বেদনাবোধের জন্যই নারীর নানা সমস্যা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। উপন্যাস-সাহিত্যের পূর্বসূরীদের সিদ্ধান্তও তাঁর মনঃপুত হয়নি, বরং তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন—'স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্ণমেন্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি।··· তাঁর অতবড় চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল। নিন্দা, গ্লানি, নির্যাতন তাঁকে অনেক সইতে হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনের কোন সাহিত্য-সেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলেন না' (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি)। বঙ্কিম-উপন্যাসে কুন্দ ও রোহিণীর মৃত্যু, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি শরৎ-মানসে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই রোহিণী-প্রসঙ্গ তিনি বার বার নানা আলোচনায় তুলেছেন (সাহিত্য ও নীতি, আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত ইত্যাদি প্রবন্ধ ও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ২য় পর্বের ১৫ পরিঃ দ্রঃ)। একজায়গায় তিনি বলেছেন—'আমার মনে আছে। ছেলেবেলায় কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী কিছু আর রইল না।··· মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ অহেতুক জবরদস্তির অপমৃত্যুতে। হতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক-পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির convention সমস্তই বেঁচে গেল, সন্দেহ নাই, কিন্তু মল সে, আর তার সঙ্গে সত্য সুন্দর art। উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙানিতে তার মরা চলে না।' (সাহিত্য ও নীতি')। যদি রোহিণী না মরত, তবে কি সে সেদিন সমাজে স্থান

পেত ?—এ প্রশ্নও শরৎচন্দ্রের মনে জেগেছিল। কারণ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল যে, কোন নারীর যদি একবার পদস্খলন হয়, তবে হিন্দুসমাজে তার প্রবেশের দ্বার একেবারে বন্ধ; তখন তাকে বেঁচে থাকার জন্যই স্বদেশের সমাজ ছেড়ে অন্যত্র হয় ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হ'ত, আর না–হয় পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে হ'ত। আচার-সর্বস্ব সামন্তশাসিত বাংলার হিন্দুসমাজে নারীর এই জীবন্মৃত অবস্থার জন্যই তিনি আবার রোহিণীর মৃত্যুপ্রসঙ্গে বলেছেন—'এইরূপে তাহার পাপের শাস্তি না হইলে কানা খোঁড়া হইয়া তাহাকে নিশ্চয়ই কাশীর পথে পথে 'একটি পয়সা দাও' বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইত। তার চেয়ে এ ভালই হইয়াছে, সে মরিয়াছে' (বিরাজবৌ-তে বিরাজের পরিণতি স্মরণীয়) (আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ত)। এই উক্তিটিতে সমাজে নারীর অসহায়ত্ব এবং শরৎ-মানসের বিক্ষোভ দুই-ই স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে। কাজেই শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে নারীর প্রতি সামাজিক অবিচার, তাদের সংস্কারের মূঢ়তা, সতীত্ব সংস্কারের জন্য নারীর হৃদয়ধর্মের অবদমন ও অস্বী-কৃতির বিরুদ্ধে খুব স্বাভাবিকভাবেই সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ব্যক্তি হিসেবে সমাজে নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা ও স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। সমাজের ধর্মীয় অনুশাসন, শাস্ত্রবিধি, ন্যায়-অন্যায় বিচারের মাপকাঠি – এ সবকিছুই মনুষ্যসৃষ্ট এবং এগুলির মূল উদ্দেশ্য সামন্ততান্ত্রিক সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য বজায় রাখা। তাই শাস্ত্রীয় অনুশাসনভিত্তিক সামাজিক নিয়ম প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্ত্রী–পুরুষে বৈষম্য দেখা যায়, দুশ্চরিত্র পুরুষের শত অপরাধ সমাজ স্বীকার করে নিতে পারলেও নারীর সামান্যতম বিচ্যুতিও ক্ষমার্হ নয়। 'শ্রীকান্ত' (২য় পর্ব) উপন্যাসে ১ম পরিঃ পিয়ারী শ্রীকান্তকে প্রশ্ন করেছিলেন—'আচ্ছা জিজ্ঞেস করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক, ভাল হতে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলায় সব পথ বন্ধ কেন ? অজ্ঞানে, অভাবে পড়ে একদিন যা করেছি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন ? কেন আমাদের তোমরা ভাল হতে দেবে না ?'—পিয়ারীর এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে সমাজের সমস্ত নির্যাতিত নারীরই

প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি, আর লেখকেরও সমাজ-জিজ্ঞাসার মূল সুরটিও ঐখানেই ঝংকৃত। ঐ সমাজ-জিজ্ঞাসাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে সমাজে নারীর দুঃসহ অবস্থার সমাজ-আর্থনীতিক কারণ অনুসন্ধান করতে। তিনি বিভিন্নস্থানে বিচিত্র নারীর সংস্পর্শে এসেছেন, অপার সহানুভূতি ও মমতা নিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন তাদের জীবন-যন্ত্রণার গভীরতাকে, আর সত্যানুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে ঐ সব নারীব্যক্তিত্বের অন্তঃস্থিত মহনীয় রূপটি। অনুসন্ধিৎসু শরৎ-মানসের প্রকৃত দর্পণ তাঁর 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি ৩ এবং এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' প্রকাশের সমকালেই (১৯১৩) রচিত। ঐ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে H, Spencer-এর Descriptive Sociology, Mill-এর 'Subjection of women, K, Pearson-এর 'Ethics of free thought,' History of Women's suffrage' Joan F, M' Lennan এর 'Primitive marriage' ইত্যাদি এবং সামতাবেড়ে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের সংগ্রহে প্রাপ্ত ৪ 'Woman in all ages and in all countries' গ্রন্থের সাতটি খণ্ড নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সমাজে নারীর স্থান ও তাদের সমস্যা-সংক্রান্ত প্রশ্নটি শরৎ-মানসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, আর সেই প্রভাবের ফলশ্রুতিতেই শরৎ-উপন্যাস মূলতঃ নারী-জীবনের সমস্যাপ্রধান হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, এ ব্যাপারে তিনি যে কত স্থির-প্রতিজ্ঞ ছিলেন—তার পরিচয় পাই ঢাকায় ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাসভবনে একবার আতিথ্যগ্রহণকালে (১৯২৫) তাঁর একটি মন্তব্যে; তিনি ডঃ রমেশচন্দ্রের স্ত্রীকে বলেছিলেন—'দিদি, তোমাদের সম্বন্ধে কোন সমাজই কখনই সুবিচার করেনি। আমার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমি জীবনভোর তারই প্রতিবাদ করব।' ৫ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তুলনামুলকভাবে পুরুষ চরিত্রগুলি সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় উদাসীন প্রকৃতির, অত্যধিক আদর্শ-পরায়ণ ও দার্শনিক মনোভাবাপন্ন, আর না-হয় ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশাসিত সমাজের একান্ত আত্মপরায়ণ জমিদারশ্রেণীর প্রতিভূ। শ্রীকান্ত, দেবদাস, 'পণ্ডিতমশায়ে'র বৃন্দাবন, 'গৃহদাহে'র মহিম, 'দত্তা'র নরেন্দ্র

প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, আর সুরেশ, উপেন্দ্র, জীবানন্দ (দেনা-পাওনা), বেণী ঘোষাল (পল্লীসমাজ) হারান মুখুজ্যে (শুভদা), রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী (দত্তা) প্রমুখ দ্বিতীয় শ্রেণীর। ঐ দুই শ্রেণীর কোন পক্ষের কাছেই আধুনিক স্বাতন্ত্র্যবোধে সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানসিকতা আশা করা যায় না। অবশ্য সব্যসাচী-রমেশ-চন্দ্রনাথের মত চরিত্রে কিছু ব্যতিক্রম যে দেখা যায় না—তা নয়, তবে অধিকাংশ উপন্যাসেই ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছে মূলতঃ নারী-জীবনের নানা সমস্যাকেই কেন্দ্র করে। এখন প্রশ্ন ওঠে—শরৎ-উপন্যাসে অধিকাংশ পুরুষ চরিত্রের অনুরূপ চিত্রায়ণ কি শিল্পীর বিশেষ উদ্দেশ্য-পুষ্ট ? শরৎ-উপন্যাসে নারীচরিত্রের সমস্যাগুলির প্রাধান্য পাওয়ার যেমন বাস্তব কারণ আমরা বিশ্লেষণ করেছি, তেমনি পুরুষ চরিত্রগুলি সৃষ্টির পিছনেও সমকালীন সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিজনিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর মানসিকতার প্রতিফলনও সুস্পষ্ট। এখানে তার বিস্তৃত আলোচনা না করে শুধু এইটুকুমাত্র বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের প্রারম্ভেই সার্বিকভাবে বিশ্বের সামাজিক পটভূমিকায় যে নৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, যার ফলশ্রুতি বিংশ শতকের প্রথমার্ধেই দু'টি বিশ্বযুদ্ধ—সেই সংকট এ-যাবৎ অনুস্যূত আদর্শ ও মূল্যবোধে প্রচণ্ড আঘাত হানে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় মানুষের ভাব-জগতে। তখন সমাজ-মানস যেমন অস্থির, তেমনি ব্যক্তিমানসও দিশেহারা। সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে যৌথ পরিবার প্রথা ধ্বসে পড়ছে, পরিবারে প্রাধান্য পাচ্ছে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। পিতৃভক্তি, পতিভক্তি, প্রাচীন কর্তব্যপরায়ণতাবোধ ইত্যাদি ধারণাগুলিতে দেখা দিচ্ছে সংশয়—চারিদিকে একটা নৈরাশ্যের ভাব বিরাজমান। বাংলা উপন্যাস ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ঠিক এই পর্বে এবং তাঁর সৃষ্ট অধিকাংশ পুরুষচরিত্রই বাঙালীর সেই প্রজন্মের প্রতিভূ। জনৈক সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করেছেন—

'শরৎ-সাহিত্যের পুরুষগণের অধিকাংশই বহুল পরিমানে নিষ্ক্রিয়, উদ্যমহীন, লক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতন, ঘটনার তাড়নাতে ভাসিয়া

যাওয়াই যেন তাহাদের ধর্ম। বুদ্ধিতে তাহারা ক্ষীণ নহে। ধীশক্তিও তাহাদের প্রচুর—কেবল যে উদ্যম থাকিলে, উদ্দেশ্য থাকিলে, লক্ষ্য সম্বন্ধে চৈতন্য থাকিলে জীবন সার্থক হইয়া ওঠে তাহারই অভাব। এ বিষয়ে শ্রীকান্ত শরৎ-সাহিত্যের পুরুষগণের প্রতিনিধি এবং বাঙালী সমাজের প্রতীক। নূতন যুগের দ্বারা পূর্ববর্তী যুগের মানুষ রবীন্দ্রনাথও প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁহার অমিত রায় এই নূতন যুগের মানুষ।'৬ তবে ঊনবিংশ শতকের সমাজ-সংস্কার-মূলক আন্দোলনের মানবিকতার ধারাটি কিন্তু ঐ পরিবর্তনের খাত বেয়েই মিলিত হয়েছিল বিংশ শতকীয় চিন্তা-চেতনার সঙ্গে, তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় পল্লীসমাজের রমেশ, পথের দাবী'র সব্যসাচীর মধ্যে। বিংশ শতকে সমাজ-মানসের যে নতুন অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় তা মূলতঃ ঊনবিংশ শতকের আন্দোলন ও বিংশ শতকের সমাজ-আর্থনীতিক অবস্থার মিশ্র প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। এ ব্যাপারে অধিক বিশ্লেষণ এখানে বাহুল্য। এইটুকু বলা যায় যে, শরৎ-উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে সমাজ-মানসের প্রতিফলন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নারীজীবনের কোন্ কোন্ সমস্যাগুলি শরৎ-উপন্যাসে মুখ্যতঃ স্থান পেয়েছে. এবং সমস্যাগুলির সমাধানের ইঙ্গিতপ্রদানে শিল্পীমানসের ঝোঁক কোন্‌দিকে? বাল্য-প্রণয়ের সমস্যা, বিধবার প্রেম-সমস্যা, স্বামীর ঔদাসীন্য বা অত্যাচারের দরুণ বা অন্যকোন কারণে বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষের প্রতি প্রণয়জনিত সমস্যা, পতিতা নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের সমস্যা, চিরন্তন পাতিব্রত্য ও সতীত্ব-সংস্কারের সঙ্গে হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি শরৎ-উপন্যাসে উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে বিধবা-নারীর প্রেমসমস্যা এবং বৈধব্যসংস্কার ও হৃদয়ধর্মের দ্বন্দ্বই মুখ্য। কারণ এই সমস্যাটি আমাদের সমাজে যেমন বিদ্যাসাগরের কাল থেকে বহু তরঙ্গাঘাতের উদ্দীপক, তেমনি নারীব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে এটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে জড়িত আছে একদিকে আধুনিক মানবিকতার প্রশ্ন, অন্যদিকে প্রাচীন সংস্কার ও শাস্ত্রবিধির প্রশ্ন।

তাই শরৎচন্দ্র তাঁর কথাসাহিত্য এই প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দান করে যথার্থই আধুনিক সমাজ-মানসের অভীপ্সার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সমস্যাগুলি ভিন্নপ্রকৃতির হলেও অনেকক্ষেত্রে একই নারীর জীবনে একাধিক সমস্যা কেন্দ্রীভূত। যেমন 'পল্লীসমাজের' রমা, 'শ্রীকান্তের' রাজলক্ষ্মী, 'চন্দ্রনাথে'র সুলোচনা—এঁদের ক্ষেত্রে বাল্যপ্রণয় সমস্যা ও বিধবা নারীর প্রেমসমস্যার সংমিশ্রণ ঘটেছে একইপাত্রে। আবার 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীর সমস্যা প্রাথমিক পর্যায়ে সধবা নারীর হৃদয়ধর্মের সমস্যা, পরে তা বিধবার প্রেম-সমস্যায় রূপান্তরিত, 'দেবদাসে'র পার্বতীর সমস্যা বাল্যপ্রণয়ের সমস্যা, 'গৃহদাহে'র অচলার প্রেমসমস্যা আরো জটিল, 'শেষপ্রশ্নে'র কমলের সমস্যা ঠিক বিধবার সমস্যা বলতে দ্বিধা হয়, অন্ততঃপক্ষে শিবনাথের পর্যায় থেকে সে যখন অজিতকে আশ্রয় করে, 'দেনা-পাওনা'য় ষোড়শীর সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। নারীজীবনে প্রেম-সংক্রান্ত নানা সমস্যা যেমন শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে নারীর ব্যক্তিত্ববিধ্বংসী সমাজ-সংস্কারের নিষ্ঠুরতার দিকটিও উদ্‌ঘাটিত করেছেন। পণ্ডিতমশাই, বামুনের মেয়ে ও অরক্ষণীয়াতে এই সামাজিক নিষ্ঠুরতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতমশাই উপন্যাসে বৃন্দাবন ও তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী কুসুমের প্রত্যাশিত সুখী দাম্পত্যজীবন গ্রাম্যসংস্কার ও মিথ্যা অপবাদে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, বামুনের মেয়ে উপন্যাসে জ্ঞানদার প্রতি গোলোক চাটুয্যের নিষ্ঠুর কদর্য আচরণের মধ্যদিয়ে সমাজে নারীর অসহায়ত্বের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অরক্ষণীয়া উপন্যাসে দুর্গামণি তার কন্যা জ্ঞানদাকে নিয়ে সমাজে আমৃত্যু যে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেছে—তাতে সমাজের হৃদয়হীনতার চরমপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাই বলতে হয়, শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে সমাজের নির্যাতিতা-উপেক্ষিতা নারীর হৃদয়-রহস্য যেমন উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন, তেমনি সমাজপতিদের কদর্য হিংস্র রূপটাও প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর এ-ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতাই ছিল মূলধন। তিনি নিজেও সমাজের কাছে কম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করেননি। তাঁর জীবন-উপন্যাসের ৭ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ

প্রত্যয় সাহিত্যের উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছিল বলেই বোধ হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছিলেন যে, শরৎচন্দ্রের কারবার ফাঁকির কারবার নয়। বস্তুতঃ তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তা যে একটি বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল—সেটি হচ্ছে তাঁর অদম্য সত্যান্বেষা। এ বিষয়ে তাঁর অত্যন্ত আপনজন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন৮—'শরতের ভিতর সত্যের আকাঙ্ক্ষা যেমন তীব্র দেখিয়াছি, এমন অল্পই গোচর হয়। সত্যের অন্বেষণে নিজেকে রিক্ত করিতে তাহার দ্বিধা ছিল না; সত্যের অনুসন্ধানে নিজেকে অকপটে মুক্ত করিতে তাহার একবিন্দু বাধা হয় নাই। এইখানেই তাহার কারবারে ফাঁকি নাই।' তাঁর মতে এই সত্য কি? সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি—সবকিছুর মধ্যেই যা কালোপযোগী ও স্বাভাবিক—তাকেই তিনি সত্য বলে গ্রহণ করতেন, কোন শাশ্বত, চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধকে সত্য বলে স্বীকার করতেন না। তাঁর 'সত্যাশ্রয়ী' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন 'সত্যের কোন শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ, কাল ও পাত্রের সম্বন্ধ বা relation নিয়েই সত্যের যাচাই হয়। দেশ-কাল-পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধের সত্যজ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরিবর্তনের সঙ্গে অপরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তন বুদ্ধিপূর্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা।'৯ সত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যানে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীতে নিঃসন্দেহে সংস্কারমুক্ত, বস্তুবাদী সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। আর এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তিনি নারী-ব্যক্তিত্বের সত্যস্বরূপ যেমন অনুসন্ধান করেছেন, তেমনি সমাজের অসত্যের দিকেও অঙ্গুলি সংকেত করেছেন।

শরৎ-উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নটি বিচার করার সময় আর একটি প্রসঙ্গ একটু আলোচনা করা দরকার। প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের পরিণতিতে ('শেষপ্রশ্ন' বাদে) নারীর সমস্যাগুলি বিশেষ করে প্রেম-সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত খুব সুস্পষ্ট নয়; আবার যেখানে অনুভব্য, সেখানেও আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যেন শিল্পী প্রচলিত সমাজ-

আদর্শ ও প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই চলেছেন। তাই বিধবার প্রেম-সমস্যা শরৎ-উপন্যাসে মুখ্য স্থান পেলেও প্রত্যক্ষভাবে বিধবার বিবাহ দিয়ে নারীব্যক্তিত্বের সামাজিক স্বীকৃতি দান কোথাও লক্ষিত হয় না। এইজন্য অনেক সমালোচকই শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতার অভিযোগ এনেছেন, তাঁর সাহিত্য ভাবাবেগ সর্বস্ব, 'সেন্টিমেন্টাল' বলেও চিহ্নিত হয়েছে। ঐ সব বিরুদ্ধ সমালোচনার অংশ বিশেষ কিছু কিছু উদ্ধৃত হল—

'...... রাঢ় দেশীয় কুলীন ব্রাহ্মণের বহু অন্ধ সংস্কার তাঁর মজ্জার মধ্যে ছিল।... বিধবার পুনর্বিবাহের যৌক্তিকতায় তিনি পুরো-পুরি বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না, কারণ তাঁর এমন একটিও বই নেই যার কাহিনীবৃত্তের ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে বিধবার পুনরায় বিয়ে দেবার মত মনোবল তিনি সংগ্রহ করে উঠতে পেরেছেন দেখা যায়।... তিনি তাঁর একাধিক ভাষণে ও প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবাদের প্রতি নিষ্করুণতার সমালোচনা করেছেন, কিন্তু স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে অধিক উদারতা দেখিয়েছেন তারও কোন প্রমাণ নেই।' ১০

'শরৎচন্দ্র ... নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, ব্যক্তিকে সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত হৃদয়া-বেদন—অপচয়জনিত ক্ষোভেই গ্রন্থ সমাপ্তি করেছেন। ১১

'কোন কিছুর অস্বীকৃতি নেতিবাচক মনোভাব মাত্র। তার সঙ্গে চাই কোন কিছু পাবার আদর্শ। ক্ষমাহীন সমাজ ও প্রীতিহীন ধর্মের বিরুদ্ধে বিপ্লবের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন, কিন্তু তারও পরবর্তী রূপের পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন, তা তিনি দেন নি।' ১২

'We now see clearly enough, his limitations: he is not very rich in creative imagination, and his interests are not sufficiently wide. He often be-trays sentimentally, which is almost the reverse of realism.' ১৩

এছাড়া, তাঁর সমসাময়িক তো বটেই, এমন কি পরবর্তী কালের বহু সমালোচকই অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তাই

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে প্রগতিশীলতার আবরণে সত্যই কি শরৎ-উপন্যাস রক্ষণশীল ধ্যানধারণার পরিপোষক? তাঁর 'বড়-দিদি', 'পল্লীসমাজ', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', 'দেবদাস', 'বামুনের মেয়ে'—উপন্যাসের মাধবী, রমা, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী, পার্বতী, সন্ধ্যার প্রেম সামাজিক সংস্কার ও শুষ্ক প্রাণহীন আচারের বলি হয়েছে, সমাজের হৃদয়হীনতা, শাস্ত্রীয় রীতিনীতি ও সতীত্ব সংস্কার সম্বন্ধে তাদের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছে কিন্তু পরিণামে তারা নিজেরাই দগ্ধ হয়েছে, তবু অন্তরের সংস্কারকে ছুড়ে ফেলতে পারেনি। নিঃসন্দেহে ঐ সব উপন্যাসের পরিণাম বাহ্যতঃ নেতিবাচক মনোভাবেরই দ্যোতক। কিন্তু ঔপন্যাসিকের বাস্তবতাবোধ ও প্রগতিশীলতা এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে কীনা বিচার্য। সমকালীন সমাজপ্রেক্ষাপটের সীমাবদ্ধতাকে বিস্মৃত হয়ে, সকলপ্রকার সম্ভাব্যতার গণ্ডী অতিক্রম করে ঔপন্যাসিক যদি তাঁর উপন্যাসে একাধিক বিধবার বিবাহ দিতেন তাহলেই শিল্পের মুখ রক্ষা হত—এমন মনে করার কারণ নেই। প্রগতিশীলতা বিচারের সেটাই একমাত্র মাপকাঠি নয়। শিল্পীর মানস-সংগঠন ও তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসে প্রতিফলিত বিশেষ মনোভঙ্গীর এবং তৎকালীন সমাজ-পরিপেক্ষিতের নিরিখেই বাস্তবতাবোধের ও প্রগতিশীলতার বিচার হওয়া উচিত। এমনকি 'discrepency between intention and performance'-ও (G. Lukacs) বিচার্য। শরৎ-উপন্যাসের মধ্যে শিল্পীমানসের সংশয়, দ্বন্দ্ব ও বিভিন্ন চরিত্রের আচরণের সঙ্গতিহীনতা দুর্লক্ষ্য নয়, তবু সেই ত্রুটিগুলিকেই বড় করে দেখে সামগ্রিকভাবে উপন্যাসের সামাজিক মূল্যকে নস্যাৎ করার প্রবণতা আদৌ সঙ্গত নয়। প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন—

'Apparant inconsistencies in a writer's view of the world, reflected in his work, should never be treated dogmatically. The main thing—and it is no small thing— is whether the writer's view is able to include – or better, demands, a dynamic, complex, analytical rendering of social relation-

ships, or whether it leads to loss of perspective and historicity.' ১৪

আরও বিচার করতে হবে—ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতার দিকটি তুলে ধরেছেন কোন্ পদ্ধতিতে, সমাজে অনুস্যূত ধর্মীয় সংস্কারের মূঢ়তা—যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অন্তরায়-সে সম্বন্ধে উপন্যাসে আশুপ্রতিকারের ব্যবস্থা প্রদর্শিত না হলেও ঔপন্যাসিকের উত্থাপিত বিভিন্ন বিরুদ্ধ যুক্তিগুলির উদ্দেশ্য কি ? যদি সেই যুক্তিগুলি পাঠককে প্রচলিত সমাজবিধির অন্তঃসার-শূন্যতা সম্বন্ধে সজাগ করে দেয়, অমানবিক সমাজ-অনুশাসনের প্রতি যদি পাঠকমনে তীব্র ঘৃণা জন্মায় এবং তার ফলে ঐ সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করে—তবে নিঃসন্দেহে বলতে হবে যে, ঐ ঔপন্যাসিক সার্থক সমাজ-বাস্তববাদী। শরৎচন্দ্র তাঁর একাধিক উপন্যাসে প্রচলিত সমাজ, ধর্মীয় সংস্কারের নামে নারীনির্যাতন, সতীত্ব সংস্কারের মূল্যহীনতা ইত্যাদি সম্পর্কে বহুপ্রশ্ন তুলেছেন। চরিত্রহীনের কিরণময়ীর, শ্রীকান্তের (২য়) রাজলক্ষ্মী ও অভয়ার, শেষপ্রশ্নের কমলের মন্তব্যগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা সমাজে যে কীভাবে নানা সংস্কারের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, এই অবদমন যে একান্তভাবে পুরুষের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট, তা ঐ সব চরিত্রের সংলাপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারী-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য প্রকৃতপক্ষে সেইদিন প্রথম খর্বিত হয়েছে যখন পিতৃপ্রধান পরিবারবিশিষ্ট সমাজে সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ থেকে সে বঞ্চিত হয়ে স্থান পেয়েছে মাত্র গার্হস্থ্য পরি–পরিবেশের সঙ্কীর্ণ সীমানায়। রমণী তখন থেকেই কেবলমাত্র পুরুষের রমণের উপাদান মাত্র, সন্তান প্রজননের নিমিত্ত তার প্রয়োজন, সেবাধর্ম ও পাতিব্রত্যই তার একমাত্র নির্দ্দিষ্ট কর্তব্য। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস যথার্থই বলেছেন— 'মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়।··· শ্রমের প্রথম বিভাগ হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষের বিভাগ··· এবং প্রথম শ্রেণীর পীড়ন মেলে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীজাতির ওপর পীড়নের সঙ্গে।' ১৫ কাজেই নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার

অস্বীকৃতি কোন বিশেষ দৈশিক ও আকস্মিক ঘটনা নয়, বিশ্ব সমাজ-বিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই এর উদ্ভব। তাই সমাজে এর পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন তাৎক্ষণিক সূত্রপ্রদানও সম্ভব নয়। সামাজিক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বসহকারে যেদিন নারী নিজেকে যুক্ত করার উপযুক্ত সমাজ-পরিবেশ পাবে— সেদিনই তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব; সমাজে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রমূল্যও সে সেইদিনই লাভ করবে। এ সম্পর্কে এঙ্গেলসের আর একটি উক্তি স্মরণীয়— '...সামাজিক উৎপাদনের মধ্যে গোটা স্ত্রীজাতিকে আবার নিয়ে আসাই হচ্ছে তাদের মুক্তির প্রথম সর্ত, এবং এর জন্যই আবার দরকার হচ্ছে সমাজের অর্থনীতির একক হিসেবে ব্যক্তিগত পরিবারের যে গুণটি রয়েছে তার বিলোপ।' ১৬ আবার নারীর স্বাধীনপ্রেমের অধিকার, বিবাহে স্বামী নির্বাচনের অধিকার কখন স্বীকৃতি লাভ করবে সে সম্পর্কেও এঙ্গেলসের ঘোষনা ঐতিহাসিকভাবে সত্য—'বিবাহের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা সাধারণ-ভাবে তখনই কার্যকরী হতে পাবে, যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং তারই সৃষ্টি করা মালিকানা-সম্পর্ক বিলুপ্ত হয়ে সেইসব গৌণ অর্থনৈতিক হিসাবকে হটিয়ে দেয়, যেগুলি বিবাহের সঙ্গী নির্বাচনের উপর এত প্রভাব বিস্তার করে। তখন পরস্পর আকর্ষণ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকবে না।' ১৭

কাজেই একটি সাম্রাজ্যবাদশাসিত দেশে আধা-সামন্ত-তান্ত্রিক ও আধা-পুঁজিবাদী সমাজে অবস্থান করে শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে নারীমুক্তির দাবীকে সোচ্চার করে তুলতে পারেন, ঐ সমাজ-সৃষ্ট নারী জীবনের বিবিধ সমস্যার অন্তর্নিহিত কারণগুলিও নির্দেশ করতে পারেন, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্যই এই সমাজ-আর্থনীতিক কারণগুলির উচ্ছেদ প্রয়োজন—তার ইঙ্গিতও দিতে পারেন, কিন্তু সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদর্শন করবেন কিভাবে? সেটা একজন শিল্পীর পক্ষে আদৌ জরুরী নয়।

এতদসত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের শিল্পী-সত্তার দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। স্বয়ং লেখক একবার মন্তব্য করে-ছিলেন—'প্রতি সাহিত্য-সাধকের অন্তরেই পাশাপাশি বাস করে

দু'জনে; তার একজন হলো লেখক, সে করে সৃষ্টি, আর অন্যজন হলো সমালোচক, সে করে বিচার।' ১৮ শরৎ-মানসেও এই 'লেখক' ও 'সমালোচকে'র দ্বন্দ্ব ছিল; 'লেখক' এখানে সংস্কারমুক্ত হৃদয়বান মানবদরদী সত্তা, আর 'সমালোচক' হল সমাজের প্রাচীন মূল্যবোধে আস্থাশীল সত্তা। এই দুয়ের দ্বন্দ্বের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে।

বড়দিদির 'মাধবী' ও 'বড়দিদি' সত্তা, শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী ও পিয়ারী সত্তা, 'বৈষ্ণবী' কমললতা ও ঊষাঙ্গিনীর নারীসত্তা, দেনাপাওনার ষোড়শী ও অলকা সত্তার দ্বন্দ্বে শিল্পীর মানস-সংকটেরই প্রকাশ ঘটেছে। এছাড়া রমার রমেশের প্রতি আসক্তির অবদমন, কিরণময়ীর মস্তিষ্ক বিকৃতি, সাবিত্রীর আপন প্রণয়াস্পদ সতীশকে সরোজিনীর হাতে তুলে দেওয়া, পার্বতীর প্রৌঢ় ভুবন চৌধুরীকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ, সরযূর ভীরুতা, অচলার মনের দোলাচলবৃত্তি, শুভদার সর্বংসহা মূর্তি, অন্নদাদিদির পাতিব্রত্য; কুসুমের কৃচ্ছ্রতাসাধন ইত্যাদি শরৎ-উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত দুর্বল দিক। 'নববিধান' উপন্যাসে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শৈলেশ ও তার পুত্র সোমেনের জীবনাচরণে পরিবর্তন আপাতঃদৃষ্টিতে লেখকের আচার-সর্বস্ব হিন্দুয়ানীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বলেই মনে হয়। আবার 'শ্রীকান্তে'র (২য় পর্ব) অভয়া ও (৩য় পর্ব) কুশারী পরিবারে সুনন্দা, 'শেষপ্রশ্নে'র কমল বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না নারীর প্রতিনিধি। কোন কোন চরিত্র যেমন প্রাচীন সংস্কারের মূল্যহীনতা ও নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরলেও নিজেরাই শেষে সংস্কার ও চিরন্তন বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, আবার শেষোক্ত নারীরা যেন সমাজ-বিদ্রোহিণী, সংস্কারের শৃঙ্খল ছিন্ন করাতেই তাদের পরিতৃপ্তি। এই বিভিন্ন নারীচরিত্রের বিচিত্র আচরণও ঔপন্যাসিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব-সঞ্জাত। তাঁর এই স্ববিরোধ ও মানস-সংকটের মূলেও রয়েছে সমাজ-আর্থনীতিক কারণ। বিংশ শতকীয় বুর্জোয়া মানবিকতাবাদে বিশ্বাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে তীব্র প্রগতিশীলতা দেখা গেলেও তাদের মনের রশি বাঁধা ছিল প্রাচীন মূল্যবোধের খুঁটিতে। তাই যথাসম্ভব সংস্কারের

মাধ্যমে 'প্রাচীন' ও 'আধুনিক' কালের সামঞ্জস্যপ্রয়াসেই তাঁদের মধ্যে দেখা দিত সংকট। কেউ কেউ সেই টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নৈরাশ্যবাদকেই আশ্রয় করতেন; আবার কেউ যথাসম্ভব পিছন না ফিরে সামনের দিকেই মানস-বিচরণে প্রয়াসী ছিলেন। শিল্পী শরৎচন্দ্র অনেকাংশে এই শেষোক্ত শ্রেণীর। সমকালীন সমাজের ভিন্নমুখী চিন্তা ও চেতনার দ্বন্দ্বই শরৎচন্দ্রের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব, আবার সেইজন্যই তাঁর উপন্যাসে নারী–স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের সমস্যার নানাদিক উদ্ঘাটিত হলেও কোথাও কোথাও যেন শিল্পীর পশ্চাদ্‌গামিতা চোখে পড়ে। সমাজের প্রভাবকে স্বীকার করে শুধু প্রয়োজন মত সংস্কারের মাধ্যমে যে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি তাঁর দৃষ্টিতে সম্ভবতঃ ধরা পড়ে নি। তাই সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বের সমাধানের সূত্র তিনি এই-ভাবে দিয়েছেন—'সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হাত দিতে পারে না। কারণ, ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজের জন্য সংকুচিত হইতে পারে না। বরঞ্চ, সমাজকেই এই স্বাধীনতার স্থান যোগাইবার জন্য নিজেকে প্রসারিত করিতে হইবে।' ('সমাজ ধর্মের মূল্য') এই উক্তি থেকে বোঝা যায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর সমাজের হস্তক্ষেপ যে এক বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাভিত্তিক তা শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়নি। তিনি বলেছেন—'সামাজিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত হয় যে দিক দিয়া, তার সংস্কারও হওয়া চাই সেই দিক দিয়া; শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন যাঁহারা, সংস্কার করিবেন তাঁহারাই।' (সমাজধর্মের মূল্য) এই ধারণার উৎস কোথায়? শরৎ-মানসের দ্বন্দ্বই এই ধারনার সৃষ্টি। তাঁর চিন্তায় স্বচ্ছতার অভাব সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল: 'সংস্কার মানেই প্রতিষ্ঠিতের সহিত বিরোধ; এবং অত্যন্ত সংস্কারের চেষ্টাই চরম বিরোধ বা বিদ্রোহ।··· ···রাজশক্তির বিপক্ষে বিদ্রোহ করিয়া তাহার বলক্ষয় করিয়া তোলায় যেমন দেশের মঙ্গল নাই··· সমাজশক্তির সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। এই কথাটা কোন মতেই ভোলা চলে না যে, প্রতিবাদ এক বস্তু, কিন্তু বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। বিদ্রোহকে চরম প্রতিবাদ বলিয়া

কৈফিয়ত দেওয়া যায় না।……সমাজের অন্যায়, অসঙ্গতি, ভুলভ্রান্তি বিচার করিয়া সংশোধন করা যায়, কিন্তু তা না করিয়া শুধু নিজের ন্যায়-সঙ্গত অধিকারের বলে একা একা বা দুই চারিজন সঙ্গী লইয়া বিপ্লব বাধাইয়া দিয়া যে সমাজ-সংস্কারের সুফল পাওয়া যায়, তাহা ত কোন মতেই বলা যায় না।' (সমাজ-ধর্মের মূল্য)

শরৎচন্দ্র ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, সামাজিক অনুশাসন, আচরণ-বিধি ইত্যাদি সবকিছুরই মানবকল্যাণের জন্য কালোপযোগী পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে কোন কিছুই শাশ্বত ও অভ্রান্ত নয়। তবে প্রাচীনকালের মানব কল্যাণকর মূল্যবোধ-গুলিকে কোথাও অস্বীকার করেন নি।

পূর্বের আলোচনায় শরৎমানসের বিশ্লেষণ যেভাবে করা হ'ল তা থেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হতে পারে :

(ক) সমাজে নারী-ব্যক্তিত্বের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহী। সাহিত্যের মাধ্যমে নারীমুক্তি আন্দোলনের তিনি প্রধান হোতা। নারীজীবনের সমস্যাকে তিনি বিচার করেছেন গভীর সহানুভূতির সঙ্গে।

(খ) শাস্ত্রীয় আচার নয়, মানুষের হৃদয়ধর্মের মূল্যই গ্রাহ্য হওয়া উচিত বলে মনে করতেন। মনুষ্যত্বের বিচারে নারীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হওয়া উচিত।

(গ) কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের মানস-সংকট তাঁকেও সংক্রমিত করেছিল। তাই তাঁর প্রগতিশীল মনোভাবের অন্তরালে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি, মানব-কল্যাণকর মূল্যবোধগুলির প্রতি ছিল সুপ্ত আকর্ষণ।

(ঘ) ব্যক্তি-মানসের এই দ্বন্দ্বের জন্যই সমাজ-পরিবর্তনের কথায় তিনি সোচ্চার কখনও হতে পারেন নি। ক্ষতস্থানে আঘাত করে সমাজের চৈতন্য উদ্রেক করাই ছিল তাঁর উপন্যাস সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এইজন্য সমাজ-বিদ্রোহী হয়েও সমাজকে অস্বীকার যেমন করেননি, নারীর স্বাধীন-প্রেমে ও বিধবার পুন-র্বিবাহে অধিকার থাকা উচিত বলে মনে করলেও অধিকাংশ উপন্যাসে তাদের সে অধিকার প্রতিষ্ঠার সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান করে

দেননি, তাই ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে আপাতদৃষ্টিতে সমাজই জয়ী হয়েছে। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য মানবহৃদয়ের ঔদার্য ও তদনুযায়ী প্রচলিত সমাজ সম্প্রসারণের উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন; সমাজ—বিপ্লবের কথা সকল ক্ষেত্রে ভাবেননি।

(ঙ) তাঁর সমাজ বিদ্রোহের যথার্থ তাৎপর্য্য হল সমাজের অসত্যের বিরুদ্ধে, নারীব্যক্তিত্বের অসত্য মূল্যায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং মানব-হৃদয়ের সত্য-স্বরূপ উদ্ঘাটন।

এইবার আমরা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল তা অনুধাবন করার চেষ্টা করব। তিনি মনে করতেন যে, সাহিত্যিকরা প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-সংস্কারের ভূমিক গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি একবার সুমন্দ ভবনের জনৈকা মহিলাকে লেখা এক চিঠির শেষে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন—'উপসংহারে তোমাকে একটা কথা বলি, সমাজ-সংস্কারের কোন দুরভিসন্ধি আমার নাই। তাই বইয়ের মধ্যে আমার মানুষের দুঃখ-বেদনার বিবরণ আছে, সমস্যাও হয়ত আছে, কিন্তু সমাধান নেই, ও কাজ অপরের,' [১৯] সাহিত্যিক ও সাহিত্যের কাজ কি সে সম্পর্কেও তিনি বলেছেন—'সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনা-কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ।' [২০] তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—শরৎ-উপন্যাসে সমস্যার সমাধান না-থাকা লেখকের অক্ষমতা জনিত নয়, বরং তাই ছিল অভিপ্রেত। সমাজ-বাসনার প্রকাশ ঘটিয়ে, প্রচলিত মূল্যবোধ ও প্রাচীন সংস্কারের গোঁড়ামি সম্পর্কে ব্যক্তিমনে সংশয় জাগিয়ে মানুষের ভাবলোকে ও চিন্তায় পরিবর্তন আনাই ছিল তাঁর আসল উদ্দেশ্য, এই তো যথার্থ সমাজ—বাস্তববাদী সাহিত্যিকের দায়িত্ব। এই প্রসঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের মন্তব্য স্মরণীয়—

'I think however that the purpose must manifest from the situation and the action themseives without being expressly pointed out and that the author does not have to serve the reader on a platter the future historical resolution of the

social conflicts which he describes...... Thus the socialist problem novel, in my opinion, fully carries out its mission if by a faithful portrayal of the real conditions it dispels the dominant conventional illusions concerning them, shakes the optimism of the bourgeois world, and inevitably instils doubt as to the eternal validity of that which exists, without itself offering a direct solution of the problem involved, even without at times ostensibly taking sides.' (Letter to Minna Kautsky, 26 Nov' 1885) ২১

কাজেই শরৎচন্দ্রও যে তাঁর উপন্যাসে সমস্যার সমাধান সরাসরি দেননি, তাতে তাঁর বাস্তবতাবোধ ও প্রগতিশীলতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা নয়। বরং 'মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার বার্তা-টুকু' পৌঁছে দিতে পারাই তিনিও চরম সার্থকতা বলে মনে করতেন। সমাজে বঞ্চিত লাঞ্ছিত নারীর রুদ্ধ অন্তরবেদনা পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দিলে পাঠকের ভাবলোক সংক্ষুব্ধ হবে, বর্তমানের সামাজিক অনুশাসনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় জাগবে; তাতেই প্রস্তুত হবে অনাগত ভবিষ্যত সমাজ-মানসের পটভূমি—যেখানে সতীত্ব-সংস্কার অপেক্ষা বড় হয়ে দেখা দেবে নারীর পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মধ্যে এই আভাসটুকু দেবার চেষ্টাও করেছেন যে, একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব একই বস্তু নয়, সতীত্বের মহিমা প্রচার করা হয় কেবলমাত্র পুরুষের ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা রাখার জন্য। তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের স্বীকৃতিদান, বিধবার পুনর্বিবাহ বর্তমানে উপন্যাসে প্রদর্শিত হলেও নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ তা কিছুতেই মেনে নেবে না, বাস্তবে নারীর স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থাকবে। এও তো বাস্তব পরীক্ষিত সত্য-তা নইলে বহু পূর্বেই আরব্ধ রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের ঐ প্রয়াস সমাজ গ্রহণ করতে পারলো না কেন? এর জন্যই প্রয়োজন

ব্যাপক ভাবে সমাজ-মানসের পরিবর্তন ও তার সংস্কার-মুক্তি। সেই প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয় শরৎ-উপন্যাসে। আবার এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শরৎচন্দ্রের এই চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী খণ্ডিত, কারণ ব্যক্তি বা সমাজের ভাবজগৎ সমাজ-আর্থনীতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত, তা থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কাজেই সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি বা প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন না ঘটলে ঐ ভাবলোকের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়, বাহ্যিক ঘাত-প্রতিঘাতে কিছুটা সংশোধন মাত্র সম্ভব। সংস্কারের পরিবর্তে হৃদয়ধর্ম, অন্ধ আনুগত্যের পরিবর্তে যুক্তি, বিচার ইত্যাদি সেখানে স্থান পেতে পারে। তবু শরৎচন্দ্রকে এক কথায় প্রগতি-বিরোধী বা রক্ষণশীল লেখক রূপে চিহ্নিত করা ভুল। দৃষ্টিভঙ্গীর অসম্পূর্ণতা থাকলেও নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না। সমাজের কামনা-বাসনার কুশ্রী সত্যস্বরূপ উদ্ঘাটনেও তিনি কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

দুই

শরৎ-উপন্যাসে নারীর ব্যক্তি—স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নটি উপস্থাপিত হয়েছে মূলতঃ সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের সমস্যাকে কেন্দ্র করে। কোথাও তা বাল্যপ্রেমের সমস্যা, কোথাও বিধবার প্রেম-সমস্যা, আবার কোথাও সধবা নারীর পরপুরুষের প্রতি প্রেমের সমস্যা বা পতিতার অন্তরে উন্মেষিত প্রেমকে কেন্দ্র করে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের সমস্যা। ঐ সব সমস্যায় জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার মূলেও নারীচিত্তে দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বই প্রধান; একদিকে রয়েছে হৃদয়ধর্মজনিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সমাজধর্ম-সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ সংস্কার। শরৎ-উপন্যাসে নারীব্যক্তিত্বের জয়-পরাজয়ের মূলেও রয়েছে তীব্র সমাজ-শক্তির প্রভাব। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তি পরাজিত হয়েছে ঠিকই; আবার যেখানে জয়ী হয়েছে সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজের সামন্ত প্রভুরাই স্বীয় স্বার্থে সমাজ

শাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। 'চন্দ্রনাথ'-এ জমিদার মণিশঙ্কর সরযূকে যে ফিরিয়ে এনেছে বা 'শুভদা'য় জমিদার সুরেন্দ্র চৌধুরী ললনাকে (মালতীকে) যে বিবাহ করতে চেয়েছিল— তাতে তাদের মানবিকতা ও ঔদার্য অপেক্ষা সুবিধাবাদী শ্রেণী-চরিত্রই প্রকাশ পেয়েছে—যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু এইটুকু আমাদের বক্তব্য যে, নারীর ব্যক্তিত্বের সমস্যাকে কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্র একদিকে যেমন শাস্ত্রীয় আচার, সতীত্ব-সংস্কার, কৌলীন্যপ্রথা ইত্যাদির অমানবিক দিকগুলি তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে সামন্তশাসিত সমাজে অত্যাচারী জমিদারের শোষণ ও স্বেচ্ছাচারিতার স্বরূপটিও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

নারীর প্রেমভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় আপন অন্তরের বৈধব্য-সংস্কার অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে প্রধানত 'বড়দিদির' মাধবী, 'পল্লীসমাজ'এ রমা, 'শুভদা'য় ললনা, 'শ্রীকান্তে'র রাজলক্ষ্মী, 'পণ্ডিত মশাই'র কুসুম, 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী, অংশত কিরণময়ী, এবং 'শেষ প্রশ্নের' নীলিমা চরিত্রের মধ্যে। এছাড়া, বিধবার পদস্খলন-জনিত সমস্যা দেখা গেছে 'চন্দ্রনাথ'-এ সরযূ ও 'শ্রীকান্তে'র (৪র্থ পর্ব) কমললতার জীবনে। বৈধব্যসংস্কারে প্রত্যক্ষ আঘাত হেনেছে 'শেষপ্রশ্নে'র কমল। 'গৃহদাহে'র অচলার সমস্যা একটু পৃথক ধরণের—তার একমাত্র ব্যাখ্যা মেলে মনো-বিজ্ঞানে। এজাতীয় সমস্যায় নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিও জড়িত। নারী-জীবনে কৌলীন্য প্রথার মর্মান্তিক পরিণাম প্রদর্শিত হয়েছে 'দেনাপাওনা' ও 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে। বাল্যপ্রণয়ের সমস্যা দেখা দিয়েছে 'দেবদাসের' পার্বতীর জীবনে। 'দত্তা', 'নববিধান', 'পরিণীতা'র সমস্যা স্বতন্ত্র। এখন উপন্যাসগুলিতে নারীজীবনের সমস্যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে সমাধানে লেখকের কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে—তার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করবো।

'বড়দিদি' (১৯১৩) শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনে ভাগলপুরে বাসকালীন লেখা। তাই এর মধ্যে আবেগ-উচ্ছ্বাস হয়ত অনেক আছে, কিন্তু সমাজে আপন প্রেমের প্রতিষ্ঠায় নারীর যে দুর্দম শক্তি, যে ব্যক্তিত্ব থাকা দরকার—তা মাধবীর চরিত্রে নেই। উপন্যাসের

৩য় পরিঃ ঔপন্যাসিক মুমূর্ষু যোগেন্দ্রের মুখ দিয়ে স্ত্রী মাধবীকে সৎপথে থেকে বৈধব্য জীবন যাপন করার উপদেশ শুনিয়েছেন— যাতে স্ত্রীর পুণ্যে পরজন্মে আবার তাদের মিলন হয়। মৃত্যুপথ-যাত্রী স্বামীর এই উপদেশই হিন্দুনারীর অন্তরের সংস্কারকে আরও পুষ্ট করেছে। তাই সে সুরেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও শেষ পর্যন্ত তার কাছে 'বড়দিদি'ই রয়ে গেল, যখন বড়দিদি থেকে মাধবীতে রূপান্তরিত হ'ল তখন সুরেন্দ্র বিবাহিত শুধু নয়, পরলোকযাত্রী। এখানে প্রশ্ন—কেন মাধবী সুরেন্দ্রের কাছে আপন প্রেমের কথা পূর্বে প্রকাশ করেনি ? অথচ বাল্য সখী মনোরমাকে পত্রে তার আভাস দিয়েছে। বালবিধবার অন্তরে প্রেমের উন্মেষ ঘটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু সুরেন্দ্রকে তা না-জানানোর কারণ উপন্যাসে কিছুই আভাসিত হয়নি। এর মূল কারণ মাধবীর অন্তরস্থিত স্বামী-সংস্কার। প্রেমের যথাযথ মর্যাদা দিতে গেলে হিন্দু বিধবার পাতিব্রত্যের পবিত্রতা ও সংযম ক্ষুণ্ণ হয়—এই সংশয় প্রথম দিকে শরৎ-মানসে প্রবল ছিল। তাই মাধবীর প্রেম সার্থক হতে পারেনি।

এই উপন্যাসে আর একটি নারীচরিত্রের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র নারীজীবনের দুঃসহ অবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছেন—সে হচ্ছে সুরেন্দ্রের স্ত্রী শান্তি। জমিদার স্বামী ইয়ারদের সঙ্গে বাগান বাড়ীতে নাচ-গানে মশগুল থাকে, অন্দরমহলে অশ্রুমুখী স্ত্রী স্বামীসঙ্গবিহনে দিন কাটায়—এই হচ্ছে সামন্ত পরিবারের বধূদের করুণ অবস্থা। এই প্রসঙ্গে পূর্বে বঙ্কিম-অধ্যায়ে আলোচিত গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমরের কথা স্মরণে আসে, অবশ্য শান্তি ঠিক ভ্রমর নয়। কালগত ব্যবধান ও শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যহেতু এখানে শান্তির কণ্ঠে মৃদু অনুযোগ শুনি—'এর চেয়ে অপমান আমাদের আর কি আছে ?' এটা প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন উপেক্ষিতা পুরবাসিনী-দের সমাজের প্রতি প্রতিবাদ ছাড়া কিছু নয়। এছাড়া, জমিদার সুরেন্দ্রের ম্যানেজার মথুরানাথের প্রজাদের উপর অত্যাচার, বিধবার সম্পত্তি নিলাম করে নেওয়া ইত্যাদির মধ্যদিয়ে সামন্ত প্রভুদের শোষণের বাস্তব চিত্রটিও ফুটে উঠেছে। মাধবীর নিলাম হয়ে

যাওয়া বাড়ি ফেরত দেবার সংকল্পের মধ্যে জমিদার সুরেন্দ্রের মানবিকতা, না প্রেমিক সুরেন্দ্রের হৃদয়দৌবল্য, না পূর্বের গৃহকর্ত্রী বড়দিদির প্রতি গৃহশিক্ষকের কৃতজ্ঞতা ?—কোন্‌টা সক্রিয় ছিল—তা বিচার সাপেক্ষ। পরিশেষে বলা যায় যে, এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সমাজ-সমস্যার তিনটি বিষয় নির্দেশ করেছেন—বিধবার প্রেম-সমস্যা, ধনী জমিদার পরিবারের বধূদের অসহায়ত্ব ও সাধারণ মানুষের উপর জমিদারের শোষণ।

'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪) উপন্যাসে নারীর স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কুসুমকে নিয়ে। কুসুমের বিধবা মায়ের দুর্নাম রটায় কুসুমের ভাগ্যে জুটেছে বিড়ম্বনা। শ্বশুর পরিত্যক্তা কুসুমের আবার নাকি এক বৈরাগীর সঙ্গে কণ্ঠী বদল হয়েছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে বৈরাগীর মৃত্যু হলে তখন থেকেই সে নিজেকে বিধবা ব'লে মনে করে, যদিও তার বিবাহিত স্বামী বৃন্দাবন জীবিত। এত ঘটনা তার সাত বৎসর বয়সে ঘটেছে। বৃন্দাবনেরও দ্বিতীয়-বার বিবাহ হয়, কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রী একমাত্র পুত্র চরণকে রেখে মারা যায়। এরপর একদিন প্রাপ্তযৌবনা কুসুমকে বিপত্নীক বৃন্দাবন দেখতে পায় এবং সে তাকে নিয়ে আসার জন্যও মাকে বলে। এদিকে দাদার বাড়ীতে কুসুমও আর স্বস্তিতে থাকতে পারছে না। কাজেই উভয়ের মিলনে বাহ্যিক ক্ষেত্র, অন্ততঃ নিজেদের বিচারে, প্রস্তুত। তবে সুস্থভাবে সমাজে তারা মিলতে পারলো না কেন? কেন তাদের এত মূল্য দিতে হ'ল? বৈষ্ণব সমাজ তো অনেকখানি শাস্ত্রীয় সংস্কারমুক্ত। তবু হিন্দু-বিধবার মতই কুসুমের স্বকল্পিত বৈধব্য-বিশ্বাস, হিন্দুশাস্ত্র-শিক্ষালব্ধ অচারনিষ্ঠা এবং সর্বোপরি প্রচ্ছন্ন আত্মসম্ভ্রমবোধ বৃন্দাবনের সঙ্গে মিলনের পথে কুসুমের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। সবশেষে মাতৃহারা চরণের মাধ্যমে কুসুমের মধ্যে মাতৃত্বের উন্মেষ ঘটানো হয়েছে, তার কণ্ঠী বদলের ঘটনাও মিথ্যা প্রমাণ করতে হয়েছে—তবে চরণের মৃত্যুর পর কুসুম বৃন্দাবনের কাছে এসেছে। এ উপন্যাসের সমস্যা বাহ্যিক নয়, কুসুমের অন্তর্দ্বন্দ্বই বাধা। কুসুমের সংস্কার ছাড়াও সে ছিল স্বভাবে অভিমানিনী, তাই সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে সে শাশুড়ীর

দেওয়া সোনার বালা দু'টি দাদা কুঞ্জকে দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে। তার এই সাময়িক ভ্রান্তি সমস্যাকে জটিলতর করেছে। অবশ্য এর জন্য সে পরে অপরাধ স্বীকার করলেও আপন ব্যক্তিত্বের অপমান সে কখনও সহ্য করে নি। তাই তার কণ্ঠে বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নই প্রতিধ্বনিত বৃন্দাবনের প্রতি উক্তিতে—'আমার মা, স্বামী পুত্র, ঘরবাড়ী সব থাকতেও আজ আমি পরের গলগ্রহ, নিরাশ্রয়, আজ পর্যন্ত শ্বশুর বাড়ীর মুখ দেখতে পাইনি। অপরাধ আমার যত ভয়ানকই হোক, তবু ত আমি সে বাড়ির বৌ'। (৮ম পরিঃ), আবার যখন সে বলে—'তুমি ভেবেচ, ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশী কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প। আমি বরং এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসি কৌতুকের আর মাল-মসলা যুগিয়ে দেব না।' (৮ম পরিঃ), তখন আর তার ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। কুসুমের এই প্রতিবাদ সেদিনের সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ।

বৃন্দাবন ও তার মা সমাজের অন্ধসংস্কার থেকে অনেকখানি মুক্ত। বৃন্দাবন বলেছে যে, সে শাস্ত্র মানে কিন্তু মানুষের মনগড়া শাস্ত্র সে মানে না (১১ পরিঃ)। তাই কলেরার সময় প্রতিষ্ঠা করা পুকুরে কাপড়-চোপড়-ধোয়া সে বন্ধ করার পক্ষপাতী, সে বিশ্বাস করে না যে, ঐ পুকুরের জল দূষিত হয় না। অবশ্য সে-জন্য তাকে মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। গাঁয়ে সমাজপতিরা তাকে একঘরে করে রেখেছে, ছেলের অসুখে ডাক্তার আসতে দেয়নি, ছেলে সময়-মত চিকিৎসা না পেয়ে মারা গেছে, রূঢ় বাস্তব-অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে বৃন্দাবন উপলব্ধি করেছে—গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ কি? একদিকে সামন্ততান্ত্রিক শোষণজনিত দারিদ্র্য, কুসংস্কার, প্রকৃতশিক্ষার অভাব, অন্যদিকে দলাদলি, ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতা। গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ভিত্তি করেই যে নতুন নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠছে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক বৃন্দাবনের সংলাপে—'রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু, কিন্তু যারা আপনাদের মুখের অন্ন, পরনের বসন যোগায় সেই হতভাগা দরিদ্রের

এই সব গ্রামেই বাস। তাদিকেই দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁতলে থেঁতলে আপনাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরী হয়।' (১৫ পরিঃ) শোষণ-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার ত্রুটি কোথায় তা-ও বৃন্দাবন বলেছে তার বন্ধু কেশবকে; সে নিজে শিক্ষা-বিস্তারের একটি সুন্দর পরিকল্পনা করেছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গও ঠিক সেই সময় গ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার কথা ভাবছিলেন। শ্রদ্ধেয় গোপালকৃষ্ণ গোখেল ১৯১০ সালে এ-সম্পর্কে 'ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে' একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তবে ১৯২৭ সালেই কাউন্সিলে যথার্থভাবে 'রুরাল প্রাইমারী এডুকেশন্ বিল' আলোচিত ও গৃহীত হয়। যাহোক, এই সব মিলিয়ে সমাজ-বাস্তবতার এক অপূর্ব নিদর্শন এই 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসটি। তবে উপন্যাসের শেষে কুসুমকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনের গাঁ ছেড়ে চলে যাওয়াটা কেমন যেন খাপছাড়া মনে হয়। কুসুম শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে আসার পর বৃন্দাবন তাকে নিয়ে আবার সংসার জীবন শুরু করলে পাঠক স্বস্তিলাভ করতো, সমাজে কুসুমের ব্যক্তিত্বের সার্থক প্রতিষ্ঠাও প্রদর্শিত হত।

'পল্লীসমাজ' (১৯১৬) উপন্যাসে রমা-রমেশের মধ্যে যে প্রেম তা তারা বাল্যকাল থেকেই দু'জনেই জানত। রমেশের সঙ্গে রমার বিবাহ হয় নি কেবল গ্রাম্য দলাদলি, চক্রান্ত ও বংশ-মর্যাদার তারতম্যের দরুণ। কিন্তু তারপর বিধবা রমার অন্তরে যখন রমেশের প্রতি প্রেমের পুনরুন্মেষ ঘটলো তখন সে নিজেই সর্বেসর্বা, সে নিজে জমিদার। জমিদারশ্রেণীই তখন বাংলার গ্রামীণ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতো। তবে তাদের মিলনে বাধা কোথায় ছিল? বাধা এসেছে দু'দিক থেকে—রমার আভ্যন্তরীণ বৈধব্যসংস্কার ও সামন্তসুলভ মিথ্যা বংশমর্যাদার অহংকার, আবার বাহ্যিক বাধাও ছিল,—তারিণী ঘোষাল, বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলি, পরাণ হাজরা, ধর্মদাস মুখুজ্জে, ভৈরব আচার্য ইত্যাদি চরিত্রের কৃতঘ্নতা, স্বার্থান্ধতা ও পরশ্রীকাতরতার চক্রান্তের জালেও সে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই দ্বিবিধ বাধার সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তার স্বাভাবিক প্রণয়াবেগের। অবদমিত প্রেম শেষে

আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছে প্রতিহিংসার মধ্যদিয়ে। রমেশের জেলে যাওয়ার পর গ্রামে তার অনুপস্থিতিতেই রমা যেন তার মহত্ত্বের গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথের গোরার যেমন জেলে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল তার আত্মোপলব্ধির জন্য, এখানেও ঠিক তেমনি রমার উপলব্ধির জন্যই রমেশকে জেলে পাঠানো হয়েছে। ছয়মাস পর রমেশ যখন জেল থেকে ফিরে এল, রমার কণ্ঠে তখন শুনি আত্মনিবেদনের করুণ সুর; রমেশের কাছে সে ক্ষমাপ্রার্থী। তার সমস্ত সম্পত্তি রমেশকে দিয়ে ভাই যতীনকে তারই মত করে মানুষ করে তুলতে আবেদন করেছে। তারপর জ্যাঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর হাত ধরে নিজে কুঁয়াপুর থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে। কারণ, সংসারে তার যে স্থান নেই, তাই তাকে জ্যাঠাইমা 'ভগবানের পায়ের নীচে' নিয়ে গেছেন। 'কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনাদোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন!'—জ্যাঠাইমার এই প্রশ্নে বিধবা রমার ব্যর্থপ্রেমের প্রতি লেখকের সহানুভূতি নিশ্চয়ই ব্যঞ্জিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন—লেখক এঁদের মিলনাত্তক পরিণতি দেখালেন না কেন? স্বয়ং শরৎচন্দ্র একাধিকবার এ-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'পল্লীসমাজ' রচনার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন।২২ বাস্তবে রমা-রমেশের মিলন ঘটাতে পারবেন—এ আশা তিনি করেন নি। এতে কি শিল্পীর বাস্তবতাবোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছে? উত্তরে বলা যায় যে, এখানেও রমা-রমেশের বিবাহ দিলেই বরং অবাস্তব মনে হ'ত। কারণ, রমার চরিত্রে একনিষ্ঠ প্রণয়িনীর বলিষ্ঠ সংগ্রামী মনোভঙ্গী আদৌ ছিল না; পরে যা দেখা গেছে—তা স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা মাত্র। তাও দেখা যেতে না পারতো, যদি না দাদার পরিবারে তার আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হ'ত। এছাড়া, রমেশের মধ্যেও রমাকে এড়িয়ে চলার মনোভঙ্গী লক্ষ্য করা গেছে। কারণ রমেশ বুঝেছে রমাও সাধারণ মানুষের নিষ্ঠুর শোষক শ্রেণীর পক্ষাবলম্বী, এবং তার নিজের গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রধান প্রতিবন্ধক। কাজেই রমার এই স্বরূপ জানার পর উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আরো স্থায়ী হয়েছে।

জ্যেঠাইমা বিশ্বেশ্বরীর মধ্যেও সংস্কার মুক্তির ইঙ্গিত স্পষ্ট—তিনি প্রণয়পিপাসু বিধবা রমার দিক থেকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন নি, বরং লোভী নীচাশয় স্বপুত্র বেণী ঘোষালের মুখাগ্নি গ্রহণের আশঙ্কাতেই তার প্রতি ঘৃণায় তাকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন। বিশ্বেশ্বরী এখানে প্রকৃতই আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দীপ্তিময়ী। এছাড়া সমাজ-বাস্তবতার বিচারে—'পল্লীসমাজ' উপন্যাসখানি বিংশ শতকের প্রারম্ভে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ সংকট ও শোষিত মানুষের উপর চরম নিপীড়নের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। এক-দিকে নিজেদের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য জমিদারশ্রেণী মিথ্যা মামলা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে প্রজাদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালাচ্ছে, অন্যদিকে শোষিত সাধারণ মানুষ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে—শোষক ও শোষিত শ্রেণীর এই নতুন শ্রেণীবিন্যাসের দর্পণ হিসেবেও উপন্যাসখানি একটি সার্থক সৃষ্টি। তবে মনে রাখতে হবে যে, প্রচুর সমাজ-প্রগতির উপাদান পুঞ্জীভূত করলেই উপন্যাসের বাস্তবতা বৃদ্ধি পায় না। এবিষয়ে সমালোচকের উক্তি স্মরণীয়—'We should be wrong, however, to judge a novel by the amount of social and historical reality that it incorporates. It is not a quantitative matter.' ২৩ এবার চন্দ্রনাথ উপন্যাস আলোচনা করা যাক।

'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬) উপন্যাসে বাল্যপ্রণয়ের সমস্যা ও বিধবার প্রেমসমস্যা বস্তুতঃ একই নারীকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত, আবার সমস্যাজনিত জটিলতার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে অপর এক নারীকে। মা সুলোচনার পদস্খলনের সামাজিক অভিশাপ ভোগ করেছে মেয়ে সরযূ, তার স্বামী চন্দ্রনাথ তাকে পবিত্যাগ করেছে, তাতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত সমাজের উপরে ব্যক্তি জয়ী হয়েছে—সরযূ আবার চন্দ্রনাথের পরিবারে বধূ হয়েই ফিরে এসেছে, সামাজিক স্বীকৃতিও লাভ করেছে। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামন্ত প্রভুরাই সমাজের নিয়ন্তা, বিধি-বিধান, আচার-সংস্কার সব কিছুই

তাদের স্বার্থবাহী, তাই জমিদার মণিশঙ্করের সরযূকে ফিরিয়ে আনতে বাধে না। কিন্তু সরযূ যদি অন্য এক সাধারণ হিন্দু পরিবারের বধূ হ'ত, তবে তার ভাগ্যে কি ছিল বলা দুষ্কর। তাই তার সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের মধ্য দিয়ে জমিদারশ্রেণীর সামন্ততান্ত্রিক সুবিধাবাদই স্পষ্ট হয়েছে। মণিশঙ্করের উক্তি—'সমাজ আমি, সমাজ তুমি। এ গ্রামে আর কেউ নেই; যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি।' শরৎচন্দ্র এখানে একটি কঠোর সামাজিক সত্যকে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য সাধারণ পাঠক মিলনান্ত পরিণতিতেই স্বস্তিলাভ করে, তখন আর অন্য কিছুতে লক্ষ্য থাকে না।

কৈলাস খুড়োর চরিত্রটি বরং সেদিনের সমাজের প্রতিবাদী চরিত্র; তাঁর মত বৃদ্ধের সংস্কারমুক্ত ও সহানুভূতিশীল মানসিকতা আজকের যুবসমাজের কাছেও আদর্শস্বরূপ। তিনি সামাজিক ভয়কে, হরিদয়ালের শাসানিকে নির্দ্বিধায় উপেক্ষা করে নিরাশ্রয় সরযূকে যে আশ্রয় দিয়েছিলেন—এটা কম কথা নয়। হয়ত মনে হতে পারে যে, যার পরিবারে কেউ নেই, সামাজিক বন্ধনও যার নেই—তার পক্ষে এই ধরণের কাজ সহজসাধ্য। তবু কৈলাস খুড়োর মত হৃদয়বান চরিত্রের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র বোধ হয় এই আশ্বাসই দিতে চেয়েছেন যে, শোষণভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থায় শোষিত নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এই ধরণের কিছু লোক থাকেন, এঁরাই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-স্থল।

যদিও এই উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে ব্যক্তি জয়ী হয়েছে, তবু মনে হয় যেন যার ব্যক্তিত্ব স্বীকৃতি লাভ করলো—সেই সরযূর মধ্যে সংগ্রামশীল মনোভাব আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠা উচিত ছিল। সে যেন পরিস্থিতির দ্বারা পরিচালিত—যখন যেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাঁর সঙ্গে সে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। স্বামীর ঘরে ফিরে এল বটে, কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার সংগ্রামী মনোভঙ্গী কোথায়? ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন এই উপন্যাসে 'আধুনিক বিদ্রোহের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।' ২৪ এর আগে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ' গল্পের কুসুমের মধ্যেও আমরা কোন বিদ্রোহ দেখিনা, বরং সেখানে কুসুম নিজের

দুর্ভাগ্যকে সহজভাবে গ্রহণ করেছে—'কিছু আশ্চর্য মনে হইল না; এ ঘটনাও যেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মতো অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থিত হইল।' কুসুমের স্বামী হেমন্ত কিন্তু চন্দ্রনাথ অপেক্ষা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন—সে তার পিতা হরিহর মুখুজ্যের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছে যে, সে কুসুমকে পরিত্যাগ করবে না' কারণ সে জাত মানে না। সরযূ বা কুসুম কিন্তু 'Doll's House'—এর নোরা নয়,উভয়ের সমাজ-প্রেক্ষাপটও পৃথক; তাই নোরার বিদ্রোহ এদের মধ্যে আশা করা যায় না। বিংশ শতকের সামন্ত-শাসিত গ্রামীণ সমাজে নারীর অসহায়ত্বের যে চিত্রটি লেখক এখানে সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন—সেটাই সমাজ-বাস্তবতা; সেখানে নারীর স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য খর্বিত—সে সমাজে সরযূর বিদ্রোহিণী মূর্তি অবাস্তবতায় পর্যবসিত হ'ত।

'দেবদাস' (১৯১৭) যেমন বাল্যপ্রণয়ের সমস্যাসঙ্কুল, তেমনি মানব-দরদী শিল্পী এখানে এক বারবনিতার মধ্যে মানবিক হৃদয়ানুভূতির গভীরতার পরিমাপ করে নারীহৃদয়ের সত্যরূপের সন্ধান দিয়েছেন। প্রথমটিতে দেবদাস পার্বতীর সঙ্গে সম্পর্কিত, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে এসেছে চন্দ্রমুখী। এখানে কৌলীন্যপ্রথা, সামাজিক সংস্কার ও প্রচলিত নৈতিকতাই প্রেমের মাধ্যমে পার্বতীর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক। দেবদাসও এরজন্য দায়ী কম নয়, সে পিতার আদেশ অমান্য করতে পারে নি। তাই তার অবদমিত প্রেম তাকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে আত্মহননের পথে ঠেলে দিল। সেই তুলনায় পার্বতীর মানসিক বলিষ্ঠতা প্রশংসনীয়, বিগতযৌবন ও বিপত্নীক জমিদার ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাবের কথা শুনে সে সখী মনোরমাকে জানিয়েছে যে সে স্বয়ংবরা, তার স্বামীর নাম দেবদাস—ভুবন চৌধুরীর সঙ্গে তার আনুষ্ঠানিক বিবাহ হতে পারে কিন্তু দেবদাসই তার প্রকৃত স্বামী। দেবদাসের গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার পূর্বের রাতে পার্বতী দেবদাসের কাছে গোপনে তার শোবার ঘরে ঢুকেছিল অনিবার্য সামাজিক কলঙ্কের ভীতিকে উপেক্ষা করে। এমনকি বিয়ের পরেও তালসোনাপুর থেকে লেখা মনোরমার পত্রে দেবদাসের

দুরবস্থা জেনে পালকি করে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েও প্রচলিত সামাজিক বাধার বিরুদ্ধে পার্বতী পরোক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সে মনোরমাকে নির্দ্বিধায় বলেছে— 'নিজের জিনিস নিজে নিয়ে যাব—তাতে লজ্জা কি ?' (১৪ পরিঃ) কোন বিবাহিতা নারীর পক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্কশূন্য বাল্যকালের প্রণয়ীকে শ্বশুরবাড়ীতে নিয়ে রাখার সংকল্প আজকের দিনেও অকল্পনীয়। এত চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রেমনিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও পার্বতী যে কি করে ভুবন চৌধুরীর বাড়ীতে সপত্নীপুত্রদের নিয়ে নিপুণা গৃহিণীর পদে নিজেকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো !—তা সত্যই বিস্ময়কর। পার্বতীর অনুরূপ পরিস্থিতিতে হিন্দী ঔপন্যাসিক প্রেমচন্দের 'নির্মলা'র গভীর মনোযন্ত্রণা তুলনীয়। সেখানে দেবদাসের প্রতিরূপ অনুপস্থিত বলে সমাজ-বাস্তবতার ছবি এবং নারীমনের বেদনা আরো সত্যনিষ্ঠ। যাহোক, দেবদাস সম্পর্কিত তার আচরণ এবং বিবাহের পূর্বে মনোরমার সঙ্গে তার আলোচনায় একনিষ্ঠ প্রেমের সঙ্গে সতীত্বসংস্কারের পার্থক্যের ইঙ্গিত প্রদানের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র যেন সমকালীন সমাজে এ-সম্পর্কে নারীর চিন্তা-ভাবনাকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। পার্বতীর মনের দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কিত কালচেতনার তরঙ্গাঘাত তখন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ্ডীকে অতিক্রম করে সুদূর পল্লীঅঞ্চলকেও আন্দোলিত করতে শুরু করেছে। দেবদাস-পার্বতীর মিলন হয়নি বটে তবে পার্বতীর আচরণ যে ভবিষ্যতে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগমন—সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আবার 'দেবদাস' উপন্যাসেই সর্বপ্রথম শরৎচন্দ্র এক পতিতার চিত্র তুলে ধরে দেখাতে চাইলেন—'পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব—সে তো সতীত্বের চাইতেও বড়।' ১৫ চন্দ্রমুখী চরিত্র-পরিকল্পনার উপাদান যে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ সে কথাও একবার তিনি বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সামাজিক শুচিতার গণ্ডীর বাইরে পতিতালয়ের ক্লেদাক্ত পরিবেশের মধ্যেও মানবহৃদয়ের শুভ্রতা ও মানবিক অনুভূতি বিনষ্ট

হয় না—বরং সমাজই তাদের ঐ পথে ঠেলে দিয়ে ক্রমশঃ তাদের মনুষ্যত্বকে নিষ্পিষ্ট করে। শরৎচন্দ্র তাই বলেছেন—'বাইরের রূপটাই এদের আসল পরিচয় নয়, এরাও মানুষ, এদের হৃদয় আছে এবং হৃদয়ের যে সব সৎপ্রবৃত্তি, তাও এদের মরে যায় নি। আর কেন যে এরা এ পথে আসতে বাধ্য হয়েছে, সেজন্য দায়ী তো এরা নয়, দায়ী আমাদের সমাজ। এই হৃদয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে, আমাদের সংসারের সতীসাধ্বীদের চাইতে এরা কোন অংশে কম নয়।'২৭ এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্র অপার মমত্ববোধ ও সহানুভূতি নিয়েই চন্দ্রমুখীর হৃদয়ের সত্যস্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, এই সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়েছে যে, চন্দ্রমুখীরাও ভালবাসতে চায়, ভালবাসা পেতেও চায়। মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে তারা অকৃপণভাবে সেবার হাত বাড়িয়ে দিতে জানে। চন্দ্রমুখী তার বুভুক্ষু হৃদয় নিয়ে তাই দেবদাসকে বলেছিল—'কখনো তোমাকে সজ্ঞানে পাই নি, কখনো এমন করে হাত দুটি ধরে কথা বলতে পাই নি–একি তৃপ্তি!' (১৩ পরিঃ) দেবদাসের প্রতি তার ভালবাসা যৌনাবেগসম্ভূত নয়, বরং সেবার মধ্য দিয়ে তাকে সুস্থ করে নিজেও সুস্থ জীবন যাপনের জন্যই অশথ-ঝুরি গ্রামে ঘর বেঁধেছিল—আবার তালসোনাপুরে দেবদাসকে না পেয়ে কলকাতায় ক্ষেত্রমণির বাড়িতে এসে তারই প্রতীক্ষায় থেকে পানাসক্ত দেবদাসকে পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিরলস সেবায় তাঁকে বাঁচিয়েছে। সে জানতো তার সংস্পর্শে দেবদাস 'সুখ পাইবে, সেবা পাইবে, কিন্তু কখনো সম্মান পাইবে না।' (১৫ পরিঃ) তাই ভবিষ্যতে সেবার অধিকারটুকু প্রার্থনা করেই সে অশ্রুসজল চোখে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে—দেবদাসের সঙ্গে পশ্চিমে যাওয়ার জন্য আর পীড়াপীড়ি করেনি। শরৎচন্দ্র যথার্থই তাদের বলেছেন 'সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি' (১১ পরিঃ)। প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ্য যে, শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিক আলেকজাণ্ডার কুপ্রিন্ (১৮৭০-১৯৩৮) তাঁর 'এমা দ্য পিট' (Yama The Pit) উপন্যাসে গণিকা জীবনের বাস্তব চিত্র সহানু-ভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন; কুপ্রিণের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল শরৎচন্দ্রের মতই পতিতাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও সমবেদনাপূর্ণ। ২৮

শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখী বঙ্কিমের হীরা নয়, বঙ্কিমের হাতে হীরার চরিত্রচিত্রণে পাঠকের মনে ঘৃণা উদ্রিক্ত হয়, আর চন্দ্রমুখী জাগায় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি—তাই পতিতার চরিত্র-চিত্রণে শরৎচন্দ্র নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল, আবার কোন্ সমাজ-আর্থনীতিক কারণে নারী বিপথগামিনী হয়ে পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, তার আভাসও লেখক দিয়েছেন চন্দ্রমুখীর এই উক্তিটির মধ্যে : 'চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্ত বলে স্ত্রীলোকের যত অখ্যাতি, ততখানি অখ্যাতির তারা যোগ্য নয়। অখ্যাতি করতেও তোমরা, সুখ্যাতি করতেও তোমরা। তোমাদের যা বলবার অনায়াসে বল, কিন্তু তারা তা পারে না।··· তারপর অখ্যাতিটাই লোকের মুখে মুখে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।··· তারপর যদি কোন অশুভ মুহূর্তে তার বুকের ভেতরটা অসহ্য বেদনায় ছট্‌ফট্ করে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়··· তখন তোমরা চিৎকার করে বলে ওঠো—'কলঙ্কিনী ! ছিঃ ছিঃ !' যে সামন্ত-শাসিত সমাজে নারী পুরুষের ভোগ্য-পণ্যবিশেষ, যেখানে নারীর কোন মূল্যই নেই সেখানে চন্দ্রমুখীর এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সমাজে নারীর অসহায়ত্বের এই বাস্তব প্রতিরূপদান লেখকের সমাজ-বাস্তবতার পরিচায়ক। শরৎ-চন্দ্রকে জনৈক সমালোচক যথার্থই 'নারীর নিগৃহীত জীবনের বেদনামাধুরী অঙ্কনে সিদ্ধশিল্পী' বলে উল্লেখ করেছেন। ২৯

আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন; 'দেবদাসে' পতিতা নারীর চরিত্র-চিত্রণের পর না-কি রেঙ্গুন থেকে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখেছিলেন—'ওটার জন্য আমি লজ্জিত, ওটা immoral বেশ্যা চরিত্র আছেই, তাছাড়া আরও কি কি আছে বলে মনে হয়।··· ওটা ছাপা হয় তাও আমার ইচ্ছা নয়।' ৩০ কিন্তু রেঙ্গুনে থাকাকালীন শরৎচন্দ্র যে নারীর পতিতা-বৃত্তি অবলম্বনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রায় ছয়-সাত শত বাঙালি কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করে-ছিলেন—সে কথাও শরৎ-সাহিত্যের গবেষকগণের অজানা নয়। ৩১ এই দ্বন্দ্ব মূলতঃ শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার সঙ্গে সামাজিকসত্তার দ্বন্দ্ব।

সত্যান্বেষী শিল্পীসত্তা নারীহৃদয়ের সত্যরূপের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর প্রয়াস সমাজে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে—সে সম্পর্কে সংশয় জাগায় তাঁর মনে স্বাভাবিকভাবেই দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল। ঐ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র 'দেবদাসে' চন্দ্রমুখী চরিত্রের রূপায়ণে সার্থকভাবে নির্মম সমাজ-সত্যকেই নির্দেশ করে দিয়েছেন। এতে তাঁর প্রগতিশীলতা সুপ্রমাণিত।

'চরিত্রহীন' (১৯১৭) শরৎ-উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা এবং নানা কারণে এটি তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে শিল্পী-মানসের দ্বন্দ্ব যেমন প্রকট, তেমনি সেদিনের রক্ষণশীল সমাজও নানাভাবে এতে বিচলিত হয়েছিল। শিল্পী একদিকে সমাজে নারীর মূল্য, বিবাহ, প্রেম, ভালবাসা, সতীত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলে সমাজের সুপ্তচৈতন্যকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে চিরন্তন ধারণার মূলে আঘাত হেনেছেন, আবার অন্যদিকে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন চিরন্তনতার জয়গান গেয়ে। উপন্যাসে প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে মুখ্যতঃ দুটি নারীচরিত্রকে কেন্দ্র করে —বালবিধবা কুলত্যাগিনী মেসের ঝি সাবিত্রী ও স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা, শাশুড়ির দ্বারা নির্যাতিতা কিরণময়ী। স্বভাবধর্মে সাবিত্রী কিরণময়ীর সম্পূর্ণ বিপরীত – সাবিত্রী যেন প্রাচীন ভারতের আদর্শ-বতী সেবাপরায়ণা সদা হাস্যময়ী সর্বংসহা নারীর প্রতিভূ আর কিরণময়ী যেন আধুনিক সংস্কারমুক্ত ও স্বাধিকার-সচেতন নারী-সমাজের প্রতিনিধি। ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব এদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত। শেষে ব্যক্তিই সমাজানুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। প্রশ্ন ওঠে—তাহ'লে এই উপন্যাস কেন এত বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল ?

প্রচলিত সমাজে নারীর মূল্য, তার সতীত্ব ও বৈধব্যসংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে চিরাচরিত শাস্ত্রীয় ধারণার বিরুদ্ধে এ-উপন্যাস যে বলিষ্ঠ বক্তব্য-সমৃদ্ধ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রায় সমকালে রচিত শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটির বক্তব্যই এই উপন্যাসে কিরণময়ীর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। কিরণময়ীর কয়েকটি

মন্তব্যের এখানে উদ্ধৃতি দিলাম—'শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ সমস্তই গায়ের জোর আর চোখ রাঙ্গানি।··· কোন ধর্মগ্রন্থই কখনও অভ্রান্ত সত্য হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ, সুতরাং এতেও মিথ্যার অভাব নেই।··· সত্যের চেয়ে এরা (বেদ, শাস্ত্র) বড় নয়। সত্যের তুলনায় এদের কোন মূল্য নেই। জিদের বসে হোক, মমতায় হোক, সুদীর্ঘ দিনের সংস্কারে হোক, চোখ বুজে অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নেই।'···(২৫ পরিঃ)

'··· বিয়ের মন্ত্র কর্তব্যবুদ্ধি দিতে পারে, ভক্তি দিতে পারে, সহমরণে প্রবৃত্তি দিতে পারে, কিন্তু মাধুর্য দেওয়ার শক্তি ত তার নেই। সে শক্তি আছে শুধু ঐ প্রকৃতির হাতে' (২৭ পরিঃ)। এছাড়া, নারীর রূপ কি, সমাজে প্রেমের বৈধতা বিচারের মাপকাঠি কি হওয়া উচিত, ন্যায়-অন্যায় স্থিরীকরণের উপায় কি? কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের বিবাহ যদি সমাজ স্বীকার করে থাকে একালে তা সম্ভব নয় কেন?—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ও যুক্তি উত্থাপন করে কিরণময়ী প্রেম ও বিবাহ বিষয়ে নারীর স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের দাবীকে সোচ্চার করে তুলেছে। স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীল নীতিবেত্তা সমাজপতিরা এতে ক্ষুব্ধ হবেনই—বিশেষ করে যে উপন্যাসের সূচনাতেই রয়েছে এক কুলত্যাগিনী ঝি'র সঙ্গে সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকের প্রেমের চিত্র। তাই শরৎচন্দ্র প্রথমে উপন্যাসটির প্রকাশে যেমন বাধাপেয়েছিলেন, প্রকাশের পরেও তেমনি নানাভাবে আক্রমণের সম্মুখীন হ'ন, এবিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন—'প্রথম যখন চরিত্রহীন লিখি, তখন পাঁচ-ছ বছর ধরে গালা-গালির অন্ত ছিল না, তবে মনের মধ্যে এই ভরসা ছিল যে, সত্যি জিনিসটা আমি ধরেছিলুম।' ৩২

এখন দেখা প্রয়োজন—লেখক কোন্ সত্য এখানে তুলে ধরেছিলেন? সাবিত্রীর কথা প্রথমে ধরা যাক। সাবিত্রীর মত ভদ্রঘরের মেয়েরা কেন মেসের ঝি-গিরি করতে বাধ্য হয়—তা শিল্পী অত্যন্ত সংক্ষেপে, অথচ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন মোক্ষদার সংলাপে (৪০ পরিঃ দ্রঃ)। মোক্ষদা উপেন্দ্রকে বলেছে যে, সাবিত্রী আসল কুলীনের মেয়ে, ন'বছর বয়সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়ীতে থাকা

কালীন তার বড় ভগিনীপতি ভুবন মুখুজ্জে তাকে ভুলিয়ে বের করে নিয়ে এসে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যায়। তখন তার গতি কি? হিন্দু সমাজের দ্বার তার কাছে রুদ্ধ। ভদ্রঘরের মেয়েরা ঝি-গিরি করতে বা পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় কোন্ সামাজিক কারণে সেই সমাজ-সত্যটি এখানে প্রকাশিত। সে সতীশকে ভালবাসে, সতীশও তাকে ভালবাসে—কিন্তু সাবিত্রীর প্রেমের মধ্যে দেহজ কামোন্মত্ততা লক্ষ্য করা যায় না—সতীশকে সে ভোগ করতে চায় না; ত্যাগের মধ্যে, সেবার দ্বারা দূর থেকে তার হৃদয়ের উত্তাপটুকু অনুভব করেই সে খুশী।

কিরণময়ী দেশত্যাগ করে আরাকানে গেল কেন? সে আবাল্য বাপ-মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত, মামার বাড়ীতে মানুষ, দশ বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার পর শ্বশুর বাড়ীতে এসেও সে স্বামীর কাছে পেয়েছে শুধু ছাত্রীর মর্যাদা, শাশুড়ীর কাছে পেয়েছে ভৎ‍র্সনা আর নির্যাতন। স্বামীর ভালবাসা সে পায়নি, স্বামীকেও সে ভালবাসতে পারেনি। তাই মুমূর্ষু স্বামী শয্যাশায়ী থাকাকালীন অনঙ্গ ডাক্তারকে সে ভালবেসেছিল; কিন্তু অনঙ্গ ডাক্তারের অর্থ-লোলুপতা ও স্বার্থান্ধতা তাকে সে-পথ থেকে সরিয়ে এনেছে। তারপর উপেন্দ্রের প্রতি সে প্রণয়াসক্ত হয়েছে। কিন্তু উপেন্দ্র যেদিন কিরণময়ীকে দিবাকরের আসক্ত ভেবে তার ছোঁয়া খাবার খেতে ঘৃণা প্রকাশ করলো, তাকে কুলটা ভেবে দিবাকরকে কিরণ-ময়ীর বাড়ী থেকে চলে যেতে বললো—সেদিন উপেন্দ্রর প্রতি তার প্রণয় প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হল। আর কলকাতায় তার থাকা অসম্ভব ভেবেই ঝিয়ের পরামর্শে উপেন্দ্রর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই আরাকানের পথে পাড়ি দেয়। ঐ ঝি তাকে বলেছে যে, কুলত্যাগিনী বাঙালী নারীরা অনন্যোপায় হয়ে আরাকানে যায়, সেখানে তারা মনের সুখে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, স্বামীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিতা ও শ্বশুরবাড়ীতে নির্যাতিতা হয়েই সেদিনের বাঙালী কুলবধূরা অতৃপ্ত প্রেমবাসনার পরিতৃপ্তি ও সেই সঙ্গে জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার আশায় অসহায় ভাবে কুলত্যাগ করতে বাধ্য হত,—তার পর আর তাদের এসমাজে ফিরে আসার

কোন উপায় ছিল না। এখানেও শিল্পী কুলত্যাগের মূল সামাজিক কারণটি কি এবং সেই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তি কি হওয়া উচিত—সেই সত্যই তুলে ধরেছেন।

সাবিত্রী ও কিরণময়ী উভয়েই সুশিক্ষিতা ও প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। কিরণময়ীর মননশীলতা, অকাট্য যুক্তি প্রয়োগে নিপুণতা, আত্মসচেতনতা, সর্বোপরি তার অগ্নিশিখার মত তরঙ্গিত সৌন্দর্য পাঠককে হতচকিত করে দেয়। তবে সাবিত্রী সংস্কারাচ্ছন্ন. কিরণময়ী সংস্কারমুক্ত। উভয়ের ব্যক্তিত্বের সমস্যা প্রেমের সমস্যা। সাবিত্রীর ব্যক্তিত্ব সমাজে স্বীকৃতি লাভ না করার কারণ হয়ত তার অন্তরে বৈধব্যসংস্কার; কিন্তু কিরণময়ীর পরিণাম মিলনান্তক হল না কেন? সুদূর আরাকানে সে যদি দিবাকরকে নিয়ে ঘর বাঁধতো তাতে তো বাংলার হিন্দুসমাজের বলার কিছু ছিল না। কেনই বা তাকে ফিরিয়ে আনা হল? তার পরিণামই বা অমন হল কেন? পাঠকমনে এজাতীয় প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

ঐ সব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গেলে পূর্বে আলোচিত শরৎ-মানসের বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করতে হবে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাস রচনার লক্ষ্য কি ছিল—তাও অনুধাবন করা প্রয়োজন। শরৎচন্দ্র এটিকে 'Scientific, Psychological and Ethical Novel' বলে উল্লেখ করেছেন, এবং আরও বলেছিলেন '...যাতে এটা in the Strictest sense moral হয় তাই উপসংহার করব।' ৩৩ সুতরাং ব্যক্তির সমাজানুগত্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটানো লেখকের পূর্বপরিকল্পিত ছিল এবং এর দ্বারাই তিনি উপসংহারকে 'in the Strictest sense moral' করেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র যথার্থ সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রচলিত সমাজের অসার নৈতিকতার নিষ্ঠুর পরিণাম ব্যক্তির জীবনে যে কত ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে তা যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি নারীমনের গভীর তলদেশে অবদমিত, অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা যে নানাভাবে চরিতার্থতার পথ খুঁজে বেড়ায় সেটাও নির্দেশ করেছেন। আবার নারীর প্রেম যদি কেবল নীতিবিবর্জিত,

আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগসর্বস্ব হয়ে ওঠে, তার পরিণাম যে কি তাও তিনি দেখিয়েছেন কিরণময়ীর মাধ্যমে। সাবিত্রীর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন ভোগ নয়, ত্যাগধর্মী কল্যাণময় প্রেমই নৈতিক জয়লাভের উপযুক্ত। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী একনিষ্ঠ প্রেমে থাকে সংযম, তিতিক্ষা, আর ভোগসর্বস্ব প্রেমে থাকে উদ্দামতা, আত্মহননের প্রবৃত্তি। শরৎ–মানস প্রথমটির পরিপোষক। তাই 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শিল্পীর দৃষ্টিতে সাবিত্রী মহীয়সী। আবার সাবিত্রীর মধ্য দিয়ে ব্যক্তিমানসের উপর সমাজের অলঙ্ঘনীয়তাও তুলে ধরেছেন। এইখানেই শরৎ-মানসের পাশ্চাদগামিতা সুস্পষ্ট। যদিও টলস্টয়ের 'রেজারেকসন্' ও হার্বাট স্পেন্সারের সমাজ-দর্শন এই 'চরিত্রহীন' উপন্যাস রচনার প্রেরণার উৎস বলে কেউ কেউ মনে করেন, ৩৪ তবু ত্যাগের মাধ্যমেই প্রেমের পরিশুদ্ধি ঘটে— ভারতীয় ভাববাদী দর্শনের এই ঐতিহ্য তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় শাস্ত্র-পরিচালিত সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের প্রতীক উপেন্দ্র, প্রেমের মাধ্যমে আধুনিক সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় দুটি প্রবণতার দ্যোতক হল—সাবিত্রী ও কিরণময়ী। শিল্পী শরৎচন্দ্র সব্যসাচীর মত দুটিকেই এ উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে। প্রচলিত সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী অমানবিক নৈতিকতার অসারতা প্রমাণ করে সমাজ-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসী হয়েছেন কিরণময়ীর বক্তব্যের মাধ্যমে; আর নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীর প্রেমের আদর্শ কি হওয়া উচিত—তা-ই প্রদর্শিত হয়েছে সাবিত্রীর দ্বারা। উপেন্দ্রের চারিত্রিক বিবর্তন মূলতঃ নারীব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে সমাজের সহিষ্ণুতা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও সতীত্ব সংস্কারের রক্ষণশীলতা বর্জনেরই ইঙ্গিতবহ। সমাজে নারীর প্রেমের যথার্থ স্বীকৃতিদানে তাঁর কিছুটা দ্বিধা, এমনকি রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেলেও অত্যন্ত বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেদিন শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন' উপন্যাস রচনা করে সমাজের আচার-সর্বস্ব নৈতিকতাকে

আঘাত করেছিলেন। ভোগসর্বস্ব আত্মবিধ্বংসী প্রেমের কবল থেকে অনেক নারীকে যে তিনি বাঁচিয়েছিলেন তার প্রমাণও পাওয়া যায়। একবার 'উপাসনা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে কাশীর 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীর বাড়ীতে বাঙালীদের এক সভায় একটি ঘটনার উল্লেখ করে সমাজে 'চরিত্রহীনের' প্রভাবের কথা বলেছিলেন। কাশীর ঐ সভায় এক অল্পবয়স্কা বিধবা শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—'আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আপনি আমার গুরু।··· আপনার কিরণময়ীই সেই রাত্রে আমাকে বাঁচিয়েছিল।' ঐ বিধবা না-কি তার বাবার এক ছাত্রের সঙ্গে ঐ রাত্রে গৃহত্যাগে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তারপর 'চরিত্রহীন' পাঠ করে কিরণময়ীর পরিণাম জেনে সে নিজেকে সংযত করে। শরৎচন্দ্র তাই বলেছিলেন—'···সমালোচকেরা আমার চরিত্রহীন নিয়ে যাই বলুক না কেন, সে যে এমনিভাবে অন্ততঃ একটি মেয়েকেও রক্ষা করতে পেরেছে, সেইখানেই আমার বড় সান্ত্বনা।' ৩৫ সম্ভবতঃ এটি হচ্ছে উপন্যাসটির 'Ethical influence'। নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে ক্ষুণ্ণ হলেও আমাদের বহু প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের অচলায়তনের ভিত্তিমূলে যে বেশ নাড়া দিয়েছিল একথা অবশ্য স্বীকার্য।

শরৎচন্দ্র 'গৃহদাহ' (১৯২০) উপন্যাসের পরিকল্পনা করেন ১৯১৪ সালের প্রথমদিকে, গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১৩২৩ সনের মাঘ থেকে ১৩২৬ সনের মাঘ পর্যন্ত (মাঝে দু'চারটি সংখ্যা বাদে) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। 'চরিত্রহীন' উপন্যাস যেমন হিন্দুসমাজকে বিক্ষুব্ধ করেছিল, তেমনি গৃহদাহ প্রকাশের পর ব্রাহ্মসমাজ শরৎচন্দ্রের উপর এমন ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরীতে শরৎচন্দ্রের বই প্রবেশাধিকার পেত না।

নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নটির কখনো কখনো আমাদের প্রচলিত সমাজে যে জটিল দাম্পত্য-সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে—এই উপন্যাসে তারই ইঙ্গিত রয়েছে। সমাজ-বাস্তবতা (বাহ্যিক) অপেক্ষা মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতাই (Psychological Realism) এই উপন্যাসে মুখ্য, এ যাবৎ প্রায় সমস্ত শরৎ-সমালোচক

সেই দৃষ্টিতেই গ্রন্থখানির সমালোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। তা সত্ত্বেও একথা বলা নিশ্চয় অযৌক্তিক হবে না যে, ঐ মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতারও মূল ভিত্তি বা পটভূমিকা হল সমাজ-বাস্তবতা। ঔপন্যাসিকের ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক—আমাদের দেশের প্রচলিত বিবাহপ্রথা, তাতে নারীর মতামতের মূল্য, পরবর্তী পর্যায়ে নারীর ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতায় যাচাই হয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের পুনর্বিবেচনার অধিকারের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু বাস্তব সমস্যার প্রতিফলন এই উপন্যাসে পড়েছে। আমরা মূলতঃ ঐ সমাজ-বাস্তবতার মূল্যায়নেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো।

পুরুষের মনে বহুনারীকামিতা যদি থাকতে পারে, তবে নারীমনে বহুপুরুষকামিতার উন্মেষে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। পুরুষ-প্রধান ও সামন্ত-শাসিত সমাজে বাস্তব অনুকূল পরিবেশে, বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় পুরুষের ঐ কামনার প্রকাশে কোন বাধা ছিল না; কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তার প্রকাশের পথে আছে অনেক বাধা—স্বামীসংস্কার ও সতীত্ব-সংস্কারের জগদ্দল পাথর তার মনের উপর চাপানো আছে। কিন্তু নারীমনে স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে প্রেয় ও শ্রেয়ের দ্বন্দ্ব সব যুগেই মানুষের ব্যক্তি-জীবনে যে গভীর সংকট সৃষ্টি করতে পারে এটা বাস্তব সত্য। কোন কোন সমাজে সেই সংকট নিরসনের জন্য প্রাক্-বিবাহ ও বিবাহোত্তর পর্যায়ে নারীর স্বাধীন মতামতের যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়, আবার কোথাও দেওয়া হয় না, সেখানে নারী অসহায়। এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে বর্তমানে সীমিতভাবে কোথাও কোথাও নারীর স্বাধীন মতামতের গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও ব্যাপকভাবে সেই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত নারীরা এ দেশে অবহেলিতা, উপেক্ষিতা। কাজেই দাম্পত্য জীবনে নানা ধরণের সমস্যার উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলার মধ্যে নিখিলেশ ও সন্দীপের আকর্ষণ-বিকর্ষণের সমস্যা দেখিয়েছেন, অবশ্য সেখানে দাম্পত্য-সমস্যা উদ্ভবের পর্ব ও পটভূমিকা, এমন কি নিরসনের কারণও গৃহদাহের থেকে সম্পূর্ণ

ভিন্ন। গৃহদাহে অচলার মধ্যে সমস্যা দেখা গেছে মহিম ও সুরেশের প্রতি ভিন্নমুখী আকর্ষণ–বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে, আর সেই দ্বন্দ্বের সমাধান অচলা কোনোদিন করতে পারেনি। বরং সুরেশ স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেছে বলা যায়, তারপর অচলার কি হ'ল সেটা উপন্যাসের শেষে মোটেই স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। মহিম কলকাতা গেল, মৃণাল কেদারবাবুর হাত ধরে অচলার সন্ধানে বের হ'ল, অবশ্য মৃণাল বলেছে যে অচলার আশ্রম বা আশ্রয় কোথায় সে খবর তাকে দেবে।

অতএব অচলা যে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত তার আপন ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি তা বলাই বাহুল্য। উপন্যাসের প্রথমে দেখি সে সুশিক্ষিতা, স্বাধীনচেতা, আত্মসম্মানবোধ তার তীব্র। পিতা কেদারবাবুও তার স্বাধীন মতামতের গুরুত্ব দেন। কাজেই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পারিবেশিক প্রভাবজাত এবং জন্মসূত্রে অর্জিত। সুরেশ যে তার পিতার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে টাকার জোরে তার উপর স্বামীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে এই চিন্তা তার আত্মমর্যাদাকে আঘাত করেছে। তাই স্বনির্বাচিত প্রণয়ী মহিমকেই স্বামী হিসেবে বরণ করার জন্য সে কেদারবাবুর আদেশ পর্যন্ত অমান্য করেছে। এই পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও স্পষ্ট-বাদিতা প্রশংসনীয়। বিবাহের পরেই মহিমের গ্রামে যাওয়ার পর তার অন্তরে দেখা দিল দ্বন্দ্ব, আর সেই দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছে নানা বাহ্যিক ঘটনায়। স্ত্রীর প্রতি মহিমের নিস্পৃহ মনোভাব ও ঔদাসীন্য, মৃণালের মহিম সম্পর্কে গ্রাম্য রসিকতা, মহিমকে রান্না করে খাওয়ানোর আগ্রহাতিশয্য, মহিমের প্রতীক্ষায় বসে আছে এই কথা জানিয়ে মৃণালের চিঠি দেওয়া ইত্যাদি অচলার মানসিক সংকটকে বাড়িয়ে তুলেছে। এর সঙ্গে অবশ্যই তার মনে ছিল সুরেশের প্রতি সুপ্ত আকর্ষণ। অচলার এই মানসিক সংকট নিরসনের উপায় কি? সে পরপুরুষ সুরেশের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দিনের পর দিন থেকেছে—সেখান থেকেও সে মুক্ত হতে চেষ্টা করেনি,—এর পিছনে কোন্ সমাজ-বাস্তবতা ক্রিয়াশীল ছিল তা বিচার্য।

সংসারে মানুষ যে সবসময় সব বিষয়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তা নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। যেখানে সে ভুল সংশোধনের উপায় থাকে না, সেইখানেই ট্র্যাজেডি দেখা দিতে বাধ্য। অচলা দুই বন্ধুর মধ্যে প্রথমে সুরেশকে বর্জন করে মহিমকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করলো। তারপর নানা কারণে তার মনে হয়েছে যে, মহিমের সংসার করা তার পক্ষে অসম্ভব। লেখক তার মনের অবস্থার বর্ণনা এইভাবে দিয়েছেন—'সে স্বামীকে ভালবাসে না, অথচ ভুল করিয়া বিবাহ করিয়াছে, সারাজীবন সেই ভুলেরই দাসত্ব করার বিরুদ্ধে তাহার অশান্তচিত্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অহর্নিশি লড়াই করিতেছিল।' (১৯ পরিঃ) কিন্তু আমাদের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায়, তা হিন্দু হোক আর ব্রাহ্মই হোক—এ হেন বিবাহিতা নারীর পক্ষে এমতাবস্থায় আর কিছু করার নেই। তাই সম্ভবতঃ সুরেশের হাতে বন্দিনী অচলা মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয় নি, কারণ সে জানে রামবাবুরাই আমাদের সমাজ-নিয়ন্ত্রা। কেদার-বাবুরা ব্রাহ্ম হলেও মানসিকতায় তাঁরা রামবাবুদের থেকে কোন অংশে বেশী উদার নন, তাঁরাও এই দেশের সমাজেরই।. আবার মহিম যে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত সেও রক্ষণশীল। আমাদের দেশের কুলত্যাগিনীদের জন্য সমাজের সকল দ্বার রুদ্ধ। সুরেশের মৃত্যুর পর খবর পেয়ে মহিম এলে অচলা তাকে জিজ্ঞেস করেছে—'শুনেচি, বিলেত অঞ্চলে আমার মত হতভাগিনীদের জন্যে আশ্রম আছে, সেখানে কি হয় জানিনে, কিন্তু এদেশে কি তেমন কিছু— ?' (৪৪ পরিঃ) অচলার এই অসমাপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাধর্মী প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে সমাজের কাছে ঔপন্যাসিকেরই প্রশ্ন। তিনি সমাজের স্ত্রীজাতির জীবনের সমস্যার এই বাস্তব দিকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উপন্যাসের মধ্যে মৃণালের জীবনাদর্শের প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্ব নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই মনে হয় যে, উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যায় মহিম-অচলা-সুরেশ থাকা সত্ত্বেও মৃণালের অবতারণা ও তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় এবং ঔপন্যাসিকের সহানুভূতির মাত্রাধিক্য ঘটায় উপন্যাসের বাস্তবতাকে যেন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। নারীর প্রতি স্বাভাবিক

সহানুভূতি ও মমত্ববোধের জন্য তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, আমাদের সমাজে অচলার মত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এখানে অবশ্য শরৎচন্দ্র সমাজ-বাস্তববাদী। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সমাজে অচলার স্বীকৃতি থাকলে এমন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না নারীর এমন ট্র্যাজিক পরিণাম ঘটতো না। তাই অচলার পরিণাম জেনে—এই ট্র্যাজেডি কেন ঘটলো, কি হলে তার মীমাংসা হতে পারতো ইত্যাদি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই পাঠক মনে জাগে। নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির প্রশ্নে আমাদের সমাজের অনুরূপ সীমাবদ্ধতার বাস্তব দিকটি প্রতিফলিত হওয়ায় মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতা ছাড়াও সমাজ-বাস্তবতার মূল্যায়নে 'গৃহদাহ' উপন্যাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) উপন্যাসে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন কিভাবে বর্ণহিন্দুসমাজের কৌলীন্যপ্রথার নিষ্ঠুরতায় নারীর ব্যক্তিত্ব লাঞ্ছিত হয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব না থাকলেও ঐ বিশেষ সামাজিক সমস্যার বাস্তবচিত্র এত নিখুঁত, এত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পদ্ধতিতে পরিবেশনা বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে এই প্রথম। এর পূর্বে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে কিছুটা লক্ষ্য করা গেছে। এই উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন,—'এ সম্বন্ধে আমার অনেক ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স আছে, এই রকম একটা বই লিখতে ইচ্ছা করি।' ৩৬ পরে ১৩৩৭ সালে চন্দননগরে প্রবর্তক সংঘের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনাকালে শরৎচন্দ্র 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেন—'কৌলীন্যপ্রথাটা আমার বড় লেগেছিল। যাঁরা ব্রাহ্মণ বলে নিজেদের ভারি গৌরব বোধ করেন, আর ভাবেন—ব্রাহ্মণের রক্ত অবিমিশ্রভাবে বয়ে এসেছে, তাঁদের সেটা মস্ত ভুল ধারণা। ইংরাজীতে যাকে 'ব্লুব্লাড' বলে তা আর নেই। কৌলীন্য নিয়ে গোলমাল নিজের চোখে কত দেখেছি। ইতিহাসের কথা নয়, নিজে যা দেখেছি, তাই লিখেছি।' শরৎচন্দ্র তাই এই উপন্যাসে সন্ধ্যার বাবা প্রিয় মুখুজ্জের জন্ম-ইতিহাস উদ্ঘাটনের মাধ্যমে কৌলীন্যের মিথ্যা অহংকারকে যেমন ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছেন, তেমনি ভণ্ড বকধার্মিক কুশীদজীবী কুলীন সমাজ-পতি গোলোক চাটুজ্জের

কদর্য চেহারাটা প্রকাশ করে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই উপন্যাস প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল বর্ণ হিন্দুরা শরৎচন্দ্রকে নানাভাবে প্রচণ্ড আক্রমণ করে।

এখানে বিচার্য—নারীব্যক্তিত্বের সমস্যা কিভাবে দেখা দিয়েছে এবং ঔপন্যাসিক তার সমাধানের ইঙ্গিতই বা কিভাবে দিয়েছেন? এ উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্রগুলি হ'ল রাসমণি, জগদ্ধাত্রী, জ্ঞানদা, কালীতারা ও সন্ধ্যা। এদের মধ্যে রাসমণি ও জগদ্ধাত্রী টাইপ চরিত্র, গ্রামীণ সমাজের হিন্দু নারীর প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসই এদের চরিত্রের সম্বল। প্রৌঢ়া কালীতারা আপন জীবন অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছে যে, কৌলীন্যের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একদিন ত্রুটি ও অনাচারের উপর। তার ভিতরের কুৎসিত রূপটা সে নিজেই দেখেছিল যেদিন তার কুলীন স্বামী বাতে পঙ্গু হয়ে আসতে না পেরে হিরু নাপিতকে পাঠিয়েছিল তার স্ত্রীর কাছে, আর ঐ হিরু নাপিতের ঔরসেই প্রিয় মুখুজ্জের জন্ম হয়। সেই জন্য কালীতারা প্রাচীনা হয়েও হিন্দু ব্রাহ্মণদের জাতপাতের অহমিকা ও কৌলীন্যের গর্বের মিথ্যা স্বরূপ ধরতে পেরে বলেছিল—'এর যে কতখানি ভুয়ো সে যে আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না।··· মানুষে মানুষে ব্যবধানের এই যে মানুষের হাতে গড়া গণ্ডি, এ কখনো ভগবানের নিয়ম নয়। তাঁর প্রকাশ্য মিলনের মুক্ত সিংহদ্বারে মানুষে যতই কাঁটার উপর কাঁটা চাপায়, ততই গোপন গহ্বরে তার অত্যাচারের বেড়া অনাচারে শতচ্ছিদ্র হতে থাকে। তাদের মধ্যে দিয়ে তখন পাপ আর আবর্জনাই কেবল প্রবেশ করে।' (৩ পরিঃ)

বালবিধবা জ্ঞানদাও কালীতারার মতই কুলীন ব্রাহ্মণ ও প্রতাপশালী জমিদার গোলক চাটুজ্জের লালসার বলি হয়েছে। গোলকের সঙ্গে অবৈধ সহবাসে সে যখন সন্তানসম্ভবা, তখন গোলোক চেয়েছিল তার গর্ভপাত ঘটাতে। কিন্তু ভাবী সন্তানকে বাঁচাতে যাওয়ার জন্যই নিষ্ঠুর গোলক রাতের অন্ধকারে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার সেই রাতে প্রাণকৃষ্ণ মুখুজ্জের মেয়ে হরিমতীকে বিয়ে করেছে। জ্ঞানদা তখন অনাথা, আশ্রয়হীনা। এর মধ্য দিয়ে

শিল্পী শরৎচন্দ্র উচ্চবর্ণ হিন্দুসমাজের অমানবিক নিষ্ঠুরতার বাস্তবচিত্রই তুলে ধরেছেন। সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে : 'Saratchandra unmasks this devilish aspect of the village Society by his disclosures in novels like Arakshaneeya and Bamuner Meye and Shortstory like Anuradha.' ৩৬ (ক)

উপন্যাসের মূলসমস্যা দেখা গেছে প্রধানতঃ দুটি নারী চরিত্রে জ্ঞানদা ও সন্ধ্যা। জ্ঞানদা তার আপন দুর্ভাগ্যকে স্বীকার করে নিয়ে মাত্র পঞ্চাশটি টাকা সম্বল করে পথে বেরিয়েছে, কোথায় তার ঠাঁই হবে সে তা জানে না। সন্ধ্যার জীবনে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার নিজের বিবাহকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসে প্রথম থেকেই সন্ধ্যার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রী ও তার মেয়েকে সন্ধ্যার বাবা প্রিয় মুখুজ্জে ঠাঁই দেওয়ায় যখন রাসমণি ও গোলোক চাটুজ্জের দল তার বিরোধিতা করেছে—তখন সন্ধ্যা প্রতিবাদে মুখর। জগদ্ধাত্রীর কাছে গোলোক যখন সন্ধ্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয়, তখন প্রকাশ্যেই সে তার অনিচ্ছার কথা জানিয়েছে, এমনকি অরুণ যে গোলোককে কুকুর বেড়ালের সামিল মনে করে সেকথাও সন্ধ্যা নিজে গোলোককে জানাতে দ্বিধাবোধ করেনি। সে তার বাবার জনসেবাব্রতের সমর্থক। সন্ধ্যার এই জাতীয় মনোবল থাকা সত্ত্বেও আধুনিক মানসিকতা-সম্পন্ন বিলাতফেরত শিক্ষিত অরুণকে সে বিয়ে করতে পারেনা বলে জানিয়েছে। সে যে কুলীনের ঘরের মেয়ে—এই সংস্কারই তার সংকটের কারণ। সে অরুণকে তাদের বাড়ী যেতে নিষেধ করে দিয়ে বলেছে—'আভাসে ইঙ্গিতে তোমাকে কতবার জানিয়েছি সে কিছুতেই হয়না······বাবা রাজী হতে পারেন, মাও ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি ভুলতে পারিনে আমি কতবড় বামুনের মেয়ে।' অরুণকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে,—কিন্তু তার অন্তঃস্থিত মিথ্যা সংস্কারই বড় হয়ে দেখা দিল। ঠাকুরমার কাছে অনেক শুনেও তার সংস্কারের মোহ কাটেনি, প্রয়োজন হল তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। পরে বিয়ের পিঁড়িতে উঠে যখন গোলোক চাটুজ্জের

লোকের মুখে সে জানতে পারে যে, সে প্রকৃতই বামুনের মেয়ে নয়, নাপিতের মেয়ে, তখন তার আজন্মের কৌলীন্যের গর্ব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সন্ধ্যার পক্ষে তখন আর বিলেতফেরত সমাজচ্যুত অরুণকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার বাধা রইল না। যখন অরুণ সন্ধ্যাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল, তখন বাদ সাধলো সন্ধ্যার সংস্কার, এখন দেখা দিল অরুণের মধ্যে দ্বিধা। অরুণ তাই বলেছে—'আজ আমাকে ক্ষমা কর সন্ধ্যা,—আমাকে একটু ভাবতে দাও!'(৩গ পরিঃ)

এইখানে যদি অরুণ সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে রাজী হত, তাহলে আর সমস্যা থাকে না। পরে রাজী হল বটে, তখন সন্ধ্যা আপন ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে না দিয়ে নারীজীবনের বৃহত্তর প্রশ্নের সমাধানের সন্ধানে যাবার প্রস্তুতি নিয়েছে। প্রশ্ন জাগে-অরুণের ঐ দ্বিধার কি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল? যদিও উপ-ন্যাসের মধ্যে ঔপন্যাসিক তা স্পষ্ট করে বলেননি, তবু মনে হয় যেন অরুণের দ্বিধায় সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক সমাজপরিবেশে পুষ্ট আধুনিক শিক্ষিত উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্তের ভীরুতা ও সুবিধাবাদী মানসিকতাই ফুটে উঠেছে। সমাজের শাস্ত্রীয় নিষেধকে উপেক্ষা করে তারা বিলেতে শিক্ষা নিতে যায় কেবল ভাল সরকারী চাকুরী লাভ করে জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আশায়; আবার ফিরে আসার পর সমাজ যখন তাদের ম্লেচ্ছ বলে একঘরে করে রেখে দেয়, তখন কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে সমাজপতিদের বিধানই মেনে নেয়, তবু নিজেদের যুক্তি ও শিক্ষার আলোকে সমাজকে সংস্কারমুক্ত করার জন্য সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারে না। এই ধরণের নির্ঝঞ্ঝাট ভদ্রলোকদের প্রতিভূ হল অরুণ। তাহলে সে আগে স্বেচ্ছায় সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কেন? তার কারণ —তখন পরিস্থিতি এত জটিল ছিল না, গ্রামের জমিদার গোলোক চাটুজ্জের ষড়যন্ত্রেই যে সন্ধ্যার বিবাহ পণ্ড হয়েছে—সেটা তো অরুণ পরে জানলো। তাই তখন তার ভাববার সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। শরৎচন্দ্র খুব সূক্ষ্মভাবে এটি প্রকাশ করেছেন। এরপর অরুণ যখন আবার চিন্তাভাবনা করে রাজী হয়েছে, তখন সেটা সন্ধ্যার কাছে ভালবাসা বলে বিবেচিত হয় নি, অসহায় নারীর

প্রতি অনুকম্পা বলেই মনে করেছে। সন্ধ্যা সেই অনুকম্পায় তার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে না দিয়ে শান্ত কণ্ঠে, অথচ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিয়েছে—'সেদিন আমিও বড় উতলা হয়ে পড়েছিলাম অরুণদা, কিন্তু আজ আমারও মন স্থির হয়েছে। মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কিনা, আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্চি।··· পারো ত আমাদের ক্ষমা ক'রো।' (৩ য পরিঃ) এতে উপন্যাসের পরিণাম করুণ হলেও সন্ধ্যার ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রিয় মুখুজ্জে ও সন্ধ্যা সঙ্গে নিয়েছে জ্ঞানদাকে। এই তিনজনেই সমাজের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার বলি। তাই সন্ধ্যার ঐ মন্তব্য কুলীন হিন্দু-শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এখানে ব্যক্তি সন্ধ্যা যেন সমগ্র নারীসমাজের জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে জড়িত মৌলিক প্রশ্নটি নারী ব্যক্তিত্বের লাঞ্ছনাকারী পুরুষদের কাছে স্পষ্ট-ভাবে তুলে ধরেছে।

এই উপন্যাসের মধ্যে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ভাল, কি মন্দ-সে সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনার বাহুল্য নেই, অথচ ঔপন্যাসিক এমনভাবে ঐ সমাজের সমাজপতিদের গ্লানিময় কদর্য রূপটাকে তুলে ধরেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, তাদের অন্ধ সংস্কার ও ধর্মান্ধতার অন্যায় অনাচারের ফলে নারীর জীবন কত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে—তাতে পাঠকমনে নিঃসন্দেহে সমাজের ঐ সব আচার-আচরণ সম্পর্কে প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মায়। শরৎচন্দ্র এখানে শুধু মধ্য-যুগীয় সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি জাত-কুল ইত্যাদি বন্ধনগুলির অন্তঃসারশূন্যতাকেই দেখান নি, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গ্রামীণ ভূমিনির্ভর পুঁজির বাণিজ্যিক পুঁজিতে রূপান্তরের ফলে দেশে যে এক মিশ্র অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে, তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন সমাজপতি গোলোক চাটুজ্জের বিদেশে পাঁঠা ছাগলের রপ্তানীর ব্যবসা করা, আহম্মদ সাহেবের ব্যবসায় সুদে টাকা খাটানো ইত্যাদির চিত্র তুলে ধরে। এখানে শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যস্রষ্টা নন, ভবিষ্যত সমাজের দ্রষ্টা। পরিশেষে বলা যায় যে, 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে শরৎচন্দ্র সার্থক সমাজ-বাস্তববাদীর দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দিয়েছেন।

'দেনাপাওনা' (১৯২৩) উপন্যাস শরৎচন্দ্রের বাস্তব-সচেতনতার এক অপূর্ব নিদর্শন। এখানে মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতা এবং সমাজ-বাস্তবতার সার্থক সমন্বয় ঘটেছে। প্রথমটি নারীর স্বাভাবিক হৃদয়ধর্মের উদ্বোধনে ও দ্বিতীয়টি সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রস্তুতির চিত্র প্রদর্শনে রূপায়িত। এই উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' নাটকের চরিত্র পরিকল্পনার ত্রুটি নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যে পত্র দেন (৪ ফাল্গুন, ১৩৩৪), তা থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র কালচেতনাকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছিলেন। ঐ চিঠির উত্তরে শরৎচন্দ্রও তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, 'দেনাপাওনা' উপন্যাসটি লিখেছিলেন 'একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে', আর 'সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো' তাঁর ষোড়শী চরিত্র (পত্রঃ ফাল্গুন ২৬, ১৩৩৪)।

এখন এই ষোড়শী চরিত্রের মধ্যে নারীব্যক্তিত্বের কি সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেই সমস্যা রূপায়ণে ও পরিণাম প্রদর্শনে লেখক কতখানি বাস্তববাদী এবং ষোড়শীর মধ্যেই বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ কতখানি তীব্র তা বিচার্য। ষোড়শীর সমস্যা মূলতঃ তার ভৈরবী সত্তা ও স্বাভাবিক নারীসত্তার মধ্যে দ্বন্দ্বে। ভৈরবী ষোড়শী অত্যাচারী লম্পট জমিদার জীবানন্দের শান্তিকুঞ্জে পুরুষের কামোন্মত্ততা ও ভোগলালসায় ক্লিন্ন পরিবেশের মধ্যে তার সন্ন্যাস জীবনের কৃত্রিমতায় আবৃত স্বাভাবিক নারীত্বের পরিচয় লাভ করলো—ষোড়শীর অন্তরে অবদমিত অলকার সুপ্তিভঙ্গ হল। জীবানন্দ যে তার স্বামী—এই সত্য যে মুহূর্তে তার কাছে উদ্ঘাটিত হ'ল, তখনই তার ভৈরবীত্বে চিড় ধরলো। তাই সে অত্যাচারী নরপশুতুল্য অসুস্থ জীবানন্দকে সেই রাত্রে নিজহাতে ওষুধ দিয়ে, সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছে, পরের দিন সকালে মিথ্যা কথা বলে নিশ্চিত কয়েদ বাস থেকে তাকে রক্ষা করেছে। সমাজে এর পরিণাম যে কি ভয়াবহ, সে তা ভাল করেই জানতো। পরে সমাজ তাকে কুলটা আখ্যা দিয়ে ভৈরবীর পদ থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করেছে, তবু যা সত্য তাকেই সে নির্ভয়ে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে

অনুসরণ করে চলেছে। তার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সকলকে হতবাক করে দিয়েছে, পরিবর্তিত করেছে জীবানন্দকে। এক-কড়ির ভাষায়—'যেন কাটখোট্টা সেপাই,' তার বাবা তারাদাস চক্রবর্তীর চোখে সে 'রাই বাঘিনী', হৈমের চোখে 'ধুলোবালিমাখা খাপে ঢাকা ইস্পাতের তলোয়ার—যেমন সোজা, তেমনি কঠিন, তেমনি খাঁটি,' আবার প্রফুল্ল বলেছে—'বাপ্‌রে! মেয়েমানুষ ত নয়, যেন পুরুষের বাবা।' ব্যারিস্টার নির্মল বসুও তার পরিচয় পেয়েছে এক দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকার রাত্রিতে যখন ষোড়শী তাকে নিঃসংকোচে হাত ধরে মাঠের মাঝখানে নদী পার হতে সাহায্য করেছে, আর জীবানন্দ 'তাহার উপবাস-কঠিন দেহে, তাহার নিপীড়িত যৌবনের রুক্ষতায়, তাহার উৎসাদিত প্রবৃত্তির শুষ্কতায়, শূন্যতায়' এক অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত নারীরূপ প্রত্যক্ষ করেছিল। নারী-দেহলিপ্সু জীবানন্দও ষোড়শীর ব্যক্তিত্বের কাছে পরাজয় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে—'অলকা, আমাকে তুমি মাপ কর।··· জীবনে অনেক পাপ করেচি, তার আর আদি, অবধি নেই। আজ থেকে কেবলি মনে হচ্চে বুঝি সব দেনা মাথায় নিয়ে যেতে হবে।' (৬ পরিঃ) আবার অসহায় ভিখারীর মত সে বলেছে—'হয়ত আজও সময় আছে, হয়ত এখনো বাঁচতে পারি—নেবে আমার ভার অলকা?' (১৮ পরিঃ)

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—সামন্ততান্ত্রিক সমাজে একজন সামান্য নারীর ব্যক্তিত্বের কাছে প্রতাপশালী অত্যাচারী জমিদারের অনুশোচনা ও তার হৃদয় পরিবর্তন বাস্তবসম্মত হয়েছে কি? স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ষোড়শীর অলকাস্বরূপ উদ্ঘাটনের পর তার সঙ্গে জীবানন্দের সম্পর্ক আর প্রজা-জমিদার সম্পর্ক থাকছে না, বিবাহের রাত্রি থেকেই ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন দম্পতির তখন পরস্পরকে কাছে পাওয়ার বাসনা উভয়ের অন্তরে জাগাই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে অলকাকে বিবাহের নামে প্রবঞ্চনা করার জন্য জীবানন্দের মনের অনুশোচনা ও অন্তর্দাহ। কাজেই বাহ্যতঃ জীবানন্দ যতই শক্তিশালী ও বিত্তবান হোক-না-কেন—অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ষোড়শীর কাছে স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শরৎ-উপন্যাসের পুরুষ চরিত্র-গুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি—উচ্ছৃঙ্খল, আত্মভোলা, ছন্নছাড়া, উদাস, বহেমিয়ান টাইপ—তা জীবানন্দের চরিত্রেও দেখা যায়। দেবদাসের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের পিছনে একটা যুক্তি খাড়া করা যেতে পারে—ব্যর্থ প্রেমের হতাশা তাকে ঐ পথে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জীবানন্দের জীবনে তো ঐ ধরনের কোন কিছু ঘটেনি। সে তো অর্থলোভে অলকাকে বিয়ে করেছিল, আবার ঐ রাতেই তাকে ছেড়ে গোপনে পালিয়েও গিয়েছিল। কাজেই উচ্ছৃঙ্খলতা তার স্বভাবগত। আর দীর্ঘদিনের ঐ চারিত্রিক স্বভাব একটা রাতের ঘটনায় অলকাকে দেখে পরিবর্তিত হয়ে গেল—এটা বাস্তবে বিশ্বাস করা কঠিন। তাও সে আগেই ষোড়শী যে অলকা, তাঁর স্ত্রী—একথা জেনে তাকে সাদরে নিয়ে গেছে তা নয়, পাইক পাঠিয়ে জোর করে টাকা আদায়ের জন্যই নিয়ে গেছে। আসলে শরৎচন্দ্র হয়ত মনে করতেন যে, নারীর নিকষিত প্রেমের প্রভাব এত গভীর যে, এতে অসম্ভব সম্ভব হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গীই ষোড়শীর মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। আদর্শ হিসেবে যা হোক-না-কেন, বাস্তবে জীবানন্দের এই ভাবে আকস্মিক পরিবর্তন শিল্প-সঙ্গত নয়, ঔপন্যাসিক বাস্তবতাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ষোড়শীও জীবা-নন্দের নিষ্ঠুরতাকে সহজেই মাপ করেছে। উপন্যাসপাঠে মনে হয় যে, জীবানন্দকে এইভাবে মেনে নেওয়ার পিছনে ষোড়শীর ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতার সঙ্গে ছিল ফকির সাহেবের কাছ থেকে লব্ধ সত্যনিষ্ঠা ও মানব-ধর্মের শিক্ষা। এই শিক্ষাই তাকে শক্তি যুগিয়েছে অত্যাচারিত দরিদ্র প্রজাদের রক্ষা করার জন্য জমিদারদের বিরুদ্ধাচরণ করতে। তাই সে ভূমিজ দরিদ্র প্রজাদের জননী-স্বরূপা। কিন্তু এখানেও শরৎচন্দ্রের অন্যান্য নায়িকাদের মতই ষোড়শীর মধ্যে জেগেছে স্বামী-সংস্কার। স্বামী নিষ্ঠুর, চরিত্রহীন, প্রবঞ্চক হলেও হিন্দু স্ত্রীর কাছে সে মানস-দেবতা, স্বামীর কৃত-কর্মের বিচার হিন্দুনারীর সংস্কারবিরোধী। তাই অন্নদাদিদি, শুভদা প্রমুখেরা শিল্পী শরৎচন্দ্রের লেখনীতে সহিষ্ণুতা ও আদর্শ-নিষ্ঠায় ভাস্বর। হিন্দুনারীমনের এই সংস্কারের প্রতি শিল্পী

হৃদয়ের দুর্বলতাই ষোড়শীর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তা নইলে ষোড়শীর মত বুদ্ধিমতী, নির্ভিক ও বলিষ্ঠ মানসিকতাসম্পন্ন নারী কি করে অত সহজে অতি অল্প সময়ে জীবানন্দের মত নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে সেবা-শুশ্রূষায় বাঁচিয়ে তুলে তার সব অপরাধ, নিষ্ঠুরতাকে নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারলো ? এটা কি প্রচলিত সমাজের চিরন্তন স্বামী সংস্কারের প্রতি লেখকের প্রচ্ছন্ন অনুরাগের ইঙ্গিতবহ নয় ?

এই উপন্যাসে নারীব্যক্তিত্ব শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে কিনা দেখা যাক। ব্যক্তি ও সমাজের বাহ্যিক দ্বন্দ্বে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ষোড়শী তার আপন স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে জয়ী হয়েছে। জনার্দন, এককড়ি, তারাদাস, যোগেন প্রমুখ ব্যক্তিদের সকল রকম ষড়যন্ত্রকে সে ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাদের লোকবল-অর্থবল, ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা—কোন কিছুই ষোড়শীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। কিন্তু সে যেন আপনার কাছে আপনি পরাজিত, জীবানন্দের মুখ থেকে 'অলকা' শব্দ শুনে তার অবদমিত নারীধর্মের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অর্থাৎ তার পত্নীত্ব জাগলো ঠিকই, আবার সেই প্রবৃত্তি দুর্বার হয়ে উঠলো নির্মল-হৈমর দাম্পত্যজীবনের মাধুর্যের পরিচয় পেয়ে। তার মধ্যে সদ্যজাগ্রত অলকাসত্তা তাকে ভৈরবীর আসন থেকে দ্রুত নামিয়ে ষোড়শীসত্তার মিথ্যা আবরণ ছুঁড়ে ফেলে দিতে শিখিয়েছে ঐ নির্মল-হৈম; একথা সে নিজেই স্বীকার করেছে জীবানন্দের কাছে—'এই যে চণ্ডীগাঁয়ের ভৈরবীপদ, যা ভাগ করে নেবার লোভে আপনাদের ছেঁড়াছিঁড়ির অবধি নেই, যেজন্য কলঙ্কে দেশ আপনারা ছেয়ে দিলেন, সে যে- আজ জীর্ণবস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্ছি, সে শিক্ষা কোথায় পেয়েচি জানেন ? সে ওইখানে। মেয়েমানুষের কাছে এযে কত ফাঁকি কত মিথ্যে, সে কথা ওঁদের দেখেই বুঝতে পেরেছি।' (২২ পরিঃ) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, নির্মল-হৈমের দাম্পত্য-দৃষ্টান্ত ষোড়শীর অবরুদ্ধ নারীসত্তাকে জাগিয়েছিল—এই দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদা রক্ষিত হলেই সাহিত্যে বাস্তবতার অন্তঃসঙ্গতি রক্ষা পেত। অলকার প্রতি নির্মলের গোপন আসক্তির খবর বাস্তবতার ভিত্তিকে দুর্বল করেছে, সুতরাং উপন্যাসে শিল্পেরও হানি ঘটেছে। ষোড়শী ভৈরবী পদ ছাড়লো বটে,

কিন্তু অলকা হৈমর মত সংসারজীবনে আর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। স্বামী জীবানন্দকে স্পর্শ করায় চণ্ডীর পূজোয় আর অধিকার নেই—এই সংস্কারেই সে হৈমর ছেলের পূজো করেনি। আবার সে যে সন্ন্যাসিনী, তাই আর সংসারে জড়াতে চায় না একথাও সে জীবানন্দকে জানিয়েছে। তার মধ্যে একদিকে সন্ন্যাস-জীবনে লব্ধ বৈরাগ্য, অপরদিকে নারীর স্বাভাবিক হৃদয়ধর্ম—এই দুই বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত প্রথমটি জয়ী হয়েছে। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে অলকাসত্তা পরাজিত। তাই জীবানন্দ যখন বলেছে—'এখানে আমি বাঁচতে চাই, মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চাই। বাড়ী চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, ছেলেপুলে চাই··· আমার অনেক গেছে··· কিন্তু আর আমি লোকসান করতে পারব না' (২৫ পরিঃ), তখন ষোড়শীকে বলতে শুনি—'আমি ত সন্ন্যাসিনী।··· কিন্তু এর মধ্যে আমাকে তুমি জড়াতে চাইচ কেন? (২৫ পরিঃ)

একি ষোড়শীর বৈরাগ্য, না ক্লান্তি-অবসাদ? এখানে তো জীবানন্দ-অলকার মিলনমূলক পরিণামে কোন বাধা ছিল না। নির্মল-হৈমর মধুর দাম্পত্য-জীবনের মত যে-জীবন কাম্য ছিল—তা যখন হস্তগত, তখন তার প্রতি অনীহাপ্রদর্শনে ষোড়শীকে কি বাস্তবাতিশায়ী আদর্শবাদী বলে মনে হয় না? আপাতঃ দৃষ্টিতে তাই মনে হলেও এর একটা মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রায় কুড়ি বছর আগে বিয়ের রাতে সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে জীবানন্দ যে নিরুদ্দেশ হয়েছিল তারপর তাদের মধ্যে আর কোন যোগাযোগ ছিল না। অলকাও ষোড়শী নাম নিয়ে ভৈরবীর আচারসর্বস্ব শুষ্ক, কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন যাপন করেছে। ফলে তার যে-যৌবন নিরুদ্ধ হয়েছে - তার সাময়িক চকিত স্ফুরণ ঘটতে পারে কিন্তু প্রথম যৌবনের দীপ্তি, জৈবিক চাহিদা ও মানসিক উৎসাহ তখন আর আশা করা যায় না। তাই জীবানন্দ যখন ষোড়শীর হাত ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল—'সন্ন্যাসিনীর কি সুখ দুঃখ নেই? সে খুশী হয়, পৃথিবীতে এমন কি কিছু নেই?'—তখন ষোড়শীর উত্তরও অবসন্ন হৃদয়েরই দ্যোতক—'কিন্তু

সে তো আপনার হাতের মধ্যে নয়।' চলমান মানবজীবনে যৌবন যে ক্ষণস্থায়ী, এতো বাস্তব সত্য; উপরন্তু যদি সেই যৌবনের ধর্মকে স্বেচ্ছায় দিনের পর দিন নিষ্পিষ্ট করা হয়—তবে তো কথাই নেই। সুতরাং ষোড়শীর বৈরাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপহৃত যৌবনের অবসাদ। পরের দাম্পত্য জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য স্বামীপুত্র পরিবেষ্টিত সংসার জীবনের স্বাদ থেকে বঞ্চিত ও দীর্ঘদিনের সন্ন্যাসজীবনের কঠোর কৃচ্ছ্রতায় ক্লিষ্ট নারীমনে ঈর্ষাজনিত আকাঙ্ক্ষা জাগতে পারে এবং সেটা বাস্তব ও স্বাভাবিক; কিন্তু এক অভ্যস্ত জীবন-ধারা ছেড়ে সম্পূর্ণ বিপরীত অনভ্যস্ত সংসারজীবনে প্রবেশ করে গৃহিণীপনার সক্ষমতা বয়সের ধর্ম অনুযায়ী তখন আর থাকে না। ষোড়শীর পক্ষে হয়ত সম্ভব হত, যদি সে স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েও স্বাভাবিক গার্হস্থ্য পরিবেশেই থাকত। তা না থেকে যেহেতু সে ভৈরবী পদে অধিষ্ঠিত ছিল—তাই অন্য এক সংস্কার তার মধ্যে উপ্ত হয়েছে। দেবতার সেবায় উৎসর্গীকৃত যার জীবন, তার পক্ষে সংসারে প্রবেশ করে স্বামী নিয়ে ঘর করা পাপ বলে হিন্দু নারীদের বিশ্বাস। এই পাপবোধও ষোড়শীকে সংসারে আর প্রবেশ করতে দেয়নি বলে মনে হয়। তাই ষোড়শী অলকায় রূপান্তরিত হয়ে জীবানন্দকে সমস্ত সম্পত্তির স্বত্ব-স্বামীত্ব অর্পণ করে দুজনেই শৈবাল-দীঘিতে কুষ্ঠাশ্রমে সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেছে। তার পূর্বে যদিও নিজে রান্না করে জীবানন্দকে খাইয়েছে, পরনের কাপড়ের আঁচল দিয়ে হাত মুছিয়ে দিয়েছে, জীবানন্দের বুকের ওপর মাথা রেখে তার বুকের স্পন্দন অনুভব করেছে কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত সংসারজীবন সে আর ফিরে পায়নি।

অলকার এই ট্রাজেডিতে শিল্পীহৃদয় যে আহত হয়েছে এবং ঔপন্যাসিকের সহানুভূতি যে অলকার নারীত্বে অপেক্ষাকৃত বেশী বর্ষিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র এখানে বাহ্যতঃ নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন। সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ষোড়শীকে বিজয়িনীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু মনে হয় শুধুমাত্র নারীব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিতে যদি দেখাতেন তবে ষোড়শীকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলতেন। সে সুযোগও যথেষ্ট

ছিল। ষোড়শীর মধ্যে দ্বন্দ্ব একটু প্রবল করে তুলতে পারলে সমাজ—বাস্তবতা সার্থকভাবে ফুটে উঠতে পারতো। যে প্রজা-বাৎসল্য ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় কৃষকদের পক্ষ নিয়ে ষোড়শী দেখিয়েছিল, হঠাৎ শেষ সময়ে তাদের উত্তেজিত করে জীবানন্দের হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় তা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পরে প্রসঙ্গান্তরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে শুধু উল্লেখ্য যে, এই জাতীয় অবিমৃষ্যকারিতা দুর্বল ব্যক্তিত্বেরই লক্ষণ। এখানে ষোড়শীর সংগ্রামী মনোভাব অটুট রেখে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের সঠিক রূপদানের মাধ্যমে সমাজ-বাস্তবতা পরিস্ফুটনের কোন অসুবিধা ছিল না। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে রোমান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় সমাজ-বাস্তবতার প্রত্যাশিত মূল্য রক্ষিত হয়নি। তবে সমাজধর্মের মূঢ়তায় ও দুরপনেয় সংস্কারের অভিশাপে ক্রম অপচয়ের মধ্যদিয়ে নারীর স্বাভাবিক হৃদয়ধর্মের অকাল বিনষ্টি কিভাবে ঘটে উপন্যাসে এই বাস্তব দিকটি সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে।

শিল্পী শরৎচন্দ্রের বৈচিত্র্যময় জীবন-অভিজ্ঞতার নির্যাস পরিবেশিত হয়েছে সমগ্র **'শ্রীকান্ত'** উপন্যাসে। বিভিন্ন পর্বে (১ম পর্বঃ ১৯১৭, ২য় পর্বঃ ১৯১৮, ৩য় পর্বঃ ১৯২৭, ৪র্থ পর্বঃ ১৯৩৩) এই উপন্যাসখানি রচনার কালসীমা প্রায় তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনব্যাপী। স্বাভাবিকভাবেই এতে শিল্পীর সমাজ-সচেতনতার বিভিন্ন দিক ধরা পড়েছে। শরৎচন্দ্র নিজেও বলেছেন—'অনেক সামাজিক ইতিহাস ইহার ভবিষ্যত জঠরে প্রচ্ছন্ন আছে।' ৩৭ লেখক ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে নারীব্যক্তিত্বের লাঞ্ছনা ও নারী-নির্যাতনের বিবিধ দিক ও তজ্জনিত সমাজে নারীর করুণ অবস্থানের নির্মম সত্যরূপটি যেমন বিভিন্ন নারীচরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শাসন—ব্যবস্থার যৌথ শোষণে গ্রাম বাংলার শোচনীয় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চিত্রটিও এই উপন্যাসে উদ্ভাসিত। অন্নদাদিদি, নিরুদিদি, রাজ-পুরের গৌরী তেওয়ারীর দুটি মেয়ের কথা (একজন বিঠোরা গ্রামের বৌ), চট্টগ্রামের এক বাঙালী যুবক কর্তৃক প্রতারিত বর্মী

মেয়েটি, পোড়ামাটি গ্রামে কানাই বসাকের বিধবা স্ত্রীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কাহিনী, এমনকি নবীন ডোমের বউ মালতীর উপর নবীনের অত্যাচারের কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের অমানবিক নিষ্ঠুরতার বাস্তব দিকটি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। অন্যদিকে রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কমললতার মাধ্যমে নারীর প্রেম-সমস্যার বিভিন্ন রূপের পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র উপন্যাসটির অক্ষদণ্ড শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমকাহিনী-যার একপ্রান্তে রয়েছে অন্নদাদিদি, অন্যপ্রান্তে কমললতা। মাঝখানে প্রধানভাবে এসেছে অভয়া ও সুনন্দা। অন্নদাদিদির ব্যক্তিত্বের মধ্যে পাতিব্রত্যের যে নিষ্কলুষ রূপটি তুলে ধরা হয়েছে, পরোক্ষে তাই যেন মনে হয় অভয়া ছাড়া সব ক'টি নারীচরিত্রের চারিত্রিক শুচিতা রক্ষার সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে এবং সেইটাই ছিল ঔপন্যাসিকের মানস-প্রবণতার অনুকূল। অন্যান্য প্রায় সব উপন্যাসের মতই এক্ষেত্রেও তাই নারীর প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নিয়ে শরৎচন্দ্র নারীর ব্যক্তিত্বের নানা সমস্যাকে তুলে ধরেছেন, বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ-ভাবনার নানাদিকের উদ্ঘাটন করেছেন। কিন্তু অভয়া ছাড়া সকলের মধ্যেই ত্যাগ ও সেবাধর্মপুষ্ট ভারতীয় নারীর চিরন্তন প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখাটি যেন বহ্নিমান। শ্রীকান্তের মুখ দিয়ে লেখক একবার বলিয়েছেন—'আমার জীবনে আমি যে ক'টি বড় নারীচরিত্র দেখতে পেয়েচি, সবাই তারা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হয়ে আছেন।' (২য় পর্বঃ ১০ পরিঃ) দুঃখের দহনে পরিশুদ্ধ হয়ে যে চরিত্রটি সর্বপ্রথম 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে পাঠকের মনে রেখাপাত করে—সে অন্নদাদিদি, সমালোচকের ভাষায় হিন্দু-সতীত্বের 'ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি।' ৩৮ চিরন্তন হিন্দুনারীর পাতিব্রত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই অন্নদাদিদির জীবনে এনেছে দারিদ্র্য ও স্বামীর অত্যাচার, আবার অন্যদিকে সমাজ তাকে চিহ্নিত করেছে অসতী কুলটা রূপে।

প্রশ্ন জাগে —এইভাবে অন্নদাদিদি চরিত্রটিকে দেখানোর উদ্দেশ্য কি? এজাতীয় চরিত্র কি সমাজে সচরাচর দেখা যায়?

শরৎচন্দ্র নিজেই একবার কালিদাস রায়কে বলেছিলেন যে, এ চরিত্র তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ হলেও তিনিও ঐ একটি দেখেছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—'অন্নদাদিদির সমাগমের অনিবার্য হেতু ছিল কি? ৩৯ তখন স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে কেবল বলেছিলেন—'নিশ্চয়ই ছিল' এবং তারপর অন্নদাদিদির উদ্দেশে হাত জোড় করে নমস্কার করেছিলেন। এথেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অন্নদাদিদি জাতীয় নারীচরিত্রগুলি শিল্পীহৃদয়ের অনাবিল শ্রদ্ধার মণ্ডনে মণ্ডিত। অন্নদাদিদি চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীব্যক্তিত্বের সমস্যার এক বিশেষ দিক যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি সমাজে হিন্দু-আচারের ভ্রান্ত ও অন্ধ একদেশদর্শীতাকেও পাঠকের সামনে উন্মোচন করেছেন। সবসময় প্রচলিত সমাজবিধি লঙ্ঘনের প্রয়াস ও পরিকল্পনাই যে ব্যক্তিজীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে—তা নয়; নারী মনে সতীত্বসংস্কার ও পাতিব্রত্যের বিশ্বাস যে সমাজ জন্ম দিয়েছে, সেই সংস্কার ও বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়েও নারীর জীবনে ঐ সমাজেই দেখা দেয় সমস্যা। সমাজ-ধর্মের আনুগত্যের জন্যও সমাজের কাছে নারী পায় লাঞ্ছনা, কলঙ্ক ও অপবাদ। যা সত্য তা থাকে অপ্রকাশিত, আর মিথ্যাই সত্যের আবরণে সমাজের চোখে বড় হয়ে ওঠে—অন্নদাদিদি-চরিত্রের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র আমাদের সমাজে বিরলদৃষ্ট নারীর জীবনের এই সমস্যাকেই রূপ দিয়েছেন বলে মনে হয়। এটা তো তাঁর সূক্ষ্ম বাস্তব-সচেতনতারই পরিচায়ক।

এবার রাজলক্ষ্মী ও কমললতার প্রসঙ্গে আসা যাক। উভয়ের জীবনে দেখা দিয়েছে প্রেমের সমস্যা, তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটিও এর সঙ্গে জড়িত। রাজলক্ষ্মীর মনে সুপ্ত বাল্য-প্রণয় কুমার সাহেবের শিকার পার্টিতে সমাগত শ্রীকান্তকে চিনতে পারার পর যখন আত্মপ্রকাশ করল, তখন ঐ প্রণয়ের সমাজিক প্রতিষ্ঠার পথে যে বাধা তা মূলতঃ দয়িত-দয়িতার মানসিক বাধা, সমাজের বাহ্যিক বাধা নয়। এখানে একটা প্রশ্ন মনে জাগে—শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর কৈশোরপ্রেম পূর্বেই প্রথম যৌবনেই পরিণয়ে সার্থকতা লাভ করেনি কেন? ঔপন্যাসিক এবিষয়ে কোন ইঙ্গিত

দেননি। আবার যখন তাদের পরস্পর সাক্ষাত ঘটলো—তখন রাজলক্ষ্মী শুধু বিধবা নয়, বঙ্কুর মা। প্রকৃতপক্ষে বৈধব্যসংস্কার ও কৃত্রিম মাতৃত্বের মর্যাদাবোধই রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্তের সঙ্গে আর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে বাস্তবে মিলতে দেয়নি। মনে হয় যেন শিল্পীও মনেপ্রাণে তাদের বিবাহসূত্রে মিলন চাননি। তাই বঙ্কুকে মাঝে নিয়ে এসে হাজির করেছেন। তাহলে এদের প্রেম-কাহিনীকে বিচিত্র বন্ধুর পথে ঘুরিয়ে এত দীর্ঘায়ত করা হ'ল কেন? শরৎচন্দ্র বিধবানারীর প্রেমের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান, তাদের প্রেমের মর্যাদা রক্ষাতেও আগ্রহী, মানবিক দৃষ্টি দিয়েই তার মূল্যায়ন করতে উৎসুক। কিন্তু বিধবা-নারীর বিবাহের মাধ্যমে সামাজিক স্বীকৃতিদানের চিত্র উপন্যাসে তুলে ধরতে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন। শিল্পীমানসের এই দ্বন্দ্বই মূলতঃ শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর আচরণে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। রাজলক্ষ্মীর আর্থিক স্বয়ম্ভরতা এবং শ্রীকান্তের সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা উভয়ের মিলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারতো। শ্রীকান্ত গ্রামে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাজলক্ষ্মী তাকে শুশ্রূষা করতে এসেছিল। তখন গ্রামের ঠাকুরদা ও ডাক্তারবাবুর কাছে রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্ত স্ত্রী বলেই পরিচয়ও দিয়েছে। পাটনা বা গঙ্গামাটিতে বাসকালীন তাদের বাধা দেওয়ারও কেউ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজলক্ষ্মী শেষে শ্রীকান্তকে বলেছে: 'আমি তোমার দাসী, দাসীকে তার চেয়ে বেশি ভাববে না এই আমি চাই।··· আমি সে-যুগের মত তোমার দাসী হয়েই যেন থাকি, তোমার সেবাই যেন হয় আমার সব চেয়ে বড় কাজ।' (৪র্থ পর্বঃ ১২ পরিঃ) আবার শ্রীকান্তও বলেছে— 'রাজলক্ষ্মীকে ভালবাসিবার অধিকার সংসার আমাকে দেয় নাই; এই একাগ্র প্রেম, এই হাসি-কান্না, মান-অভিমান, এই ত্যাগ, এই নিবিড় মিলন—সমস্তই লোকচক্ষে যেমন ব্যর্থ, এই আসন্ন বিচ্ছেদের অসহ অন্তর্দাহও বাহিরের দৃষ্টিতে আজ তেমনি অর্থহীন।··· লোকের মধ্যে বাস করিয়া যে-লোক লোকাচার মানে নাই, বিদ্রোহ করিয়াছে, সে নালিশ করিবে গিয়া কাহার কাছে। এ সমস্যা শাশ্বত ও পুরাতন। সৃষ্টির দিন হইতে আজি পর্যন্ত, এই প্রশ্নই

বারংবার আবর্তিয়া চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতের গর্ভে যতদূর দৃষ্টি যায় ইহার সমাধান চোখে পড়ে না। ইহা অন্যায় অবাঞ্ছিত। তথাপি এত বড় সম্পদ, এত বড় ঐশ্বর্যই কি মানুষের আর আছে?' (৩য় পর্বঃ ১১ পরিঃ) শ্রীকান্তের এই দ্বন্দ্ব ও রাজলক্ষ্মীর মনের দুর্বলতা ঔপন্যাসিকের মানস-সংকটের প্রতিরূপ। তাই তাদের সম্পর্কটা যেভাবে প্রদর্শিত হয়েছে তা যেন রহস্যাবৃত, বাস্তবে এর নজির মেলা কঠিন। রাজলক্ষ্মীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও শেষপর্যন্ত প্রাচীন সংস্কারের অধীনস্থ হয়েছে।

কমললতাকে উপন্যাসে বলা হয়েছে 'গোধূলি আকাশে নানা রঙের ছবি,' তার জীবনটাকে তুলনা করা হয়েছে 'প্রাচীন বৈষ্ণবকবিচিত্তের অশ্রুজলের গান'-এর সঙ্গে (৪র্থ পর্বঃ ৯ পরিঃ)। শ্রীকান্ত তার প্রেমে দেখেছে 'মুক্তি, মর্যাদা, আর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ'—তার প্রেম রাজলক্ষ্মীর প্রেমের মত আচ্ছন্ন করে রাখে না। সে নিজেও প্রেমের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীকান্তকে বলেছে—'প্রেমের বাস্তবতা নিয়ে তোমরা পুরুষের দল যখন বড়াই করতে থাকো, তখন ভাবি আমাদের জাত যে আলাদা। তোমাদের ও আমাদের ভালবাসার প্রকৃতিই যে বিভিন্ন। তোমরা চাও বিস্তার, আমরা চাই গভীরতা, তোমরা চাও উল্লাস, আমরা চাই শান্তি··· ভালবাসার নেশাকে আমরা অন্তরে ভয় করি, ওর মত্ততায় আমাদের বুকের কাঁপন থামেনা।' (৪র্থ পর্বঃ ৭পরিঃ) পুরুষের ও নারীর প্রেমের প্রকৃতিগত এই পার্থক্য সে উপলব্ধি করেছে তার তিক্ত জীবন-অভিজ্ঞতায় বহু মূল্য দিয়ে। সতেরো বৎসর বয়সে বিধবা হয়ে বাবার কাছে কলকাতায় থাকাকালীন বাড়ীর সরকার মন্মথের সঙ্গে তার প্রণয়-সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সন্তান সম্ভবাও হয়। কিন্তু সেই মন্মথই যখন তার ভাইপো যতীনের উপর নিজের দোষ চাপিয়ে যতীনকে আত্মঘাতী করে ঊষাঙ্গিনীর (কমললতার) বাবার কাছে বিশহাজার টাকা দাবী করলো তাকে বৈষ্ণব আচারে বিয়ে করার জন্য, তখন তার কাছে সমাজের পুরুষের হৃদয়হীনতা আর অস্পষ্ট রইলো না। সে তখন ঠাকুরের প্রসাদী মালা (যা মন্মথর গলায় দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল) ঠাকুরের

পাদপদ্মেই ফিরিয়ে দিয়ে বৃন্দাবনধামে যাত্রা করেছে। কাজেই ঊষাঙ্গিনীর বৈষ্ণবী কমললতায় রূপান্তরের মূলে ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের উচ্ছৃঙ্খল পুরুষের ভোগলালসার মত্ততা, ঘৃণ্য অর্থলিপ্সা ও নিষ্ঠুর প্রতারণার বাস্তবতা। আর ঐ বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাকে বোধ হয় সংযত করেছে একান্তভাবে গহরের কাছে যেতে। নারীর স্বাভাবিক হৃদয়ধর্মানুযায়ী গহরকে সে ভালবেসেছে ঠিকই, কিন্তু তাকে কাছে পেতে তার শঙ্কা হয়। গহরের মরণকালে তার সেবা করেই সে অন্তরের সাধ মিটিয়েছে। তারই জন্য অশুচি বলে আশ্রমের ঠাকুরঘরে যাওয়া পর্যন্ত তার নিষেধ, তবু পুরুষের প্রেমের নেশার ভয় তার কাটেনি। তাই শ্রীকান্তকে সে বলেছে— 'আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ করো না গোঁসাই, এই তোমার কছে আমার প্রার্থনা।' (৪র্থ পর্বঃ ১৪ পরিঃ) এখানে কমললতার স্বাতন্ত্র্যবোধ সুস্পষ্ট, সে আপন ব্যক্তিত্বের মর্যাদাকে কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি। শ্রীকান্ত যখন গহরের টাকার বাক্সটা তাকে দিতে গেল, সে তা না নিয়ে বলেছে—'আমি ভিখিরি, টাকা নিয়ে আমি কি করবো বলো ত?··· টাকা আমারো ত একদিন ছিল গো, কি কাজে লাগলো? ·· অপরের টাকা নিতে যাব কেন?' (৪র্থ পর্বঃ ১৩ পরিঃ) পুরুষকে ভালবেসেও তার সাহচর্য এড়িয়ে চলা ও অন্যের অর্থগ্রহণ না-করার মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতাই ফুটে উঠেছে। অনেক সমালোচক কমল-লতার প্রেমে বৈষ্ণবীয় আধ্যাত্মিক রসের অনুসন্ধান করেছেন, এমন কি এই চরিত্রপরিকল্পনা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল' উপন্যাস-পাঠের প্রভাব-সঞ্জাত বলেও মনে করেন। ৪০ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র কমললতার ঐ আসক্তিবিহীন সংযত প্রেম ও বৈষ্ণবাচরণের মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর প্রেমের লাঞ্ছনার পরিণামের এক বিশেষ রূপকেই মূর্ত করে তুলেছেন। আর কমললতার এই পরিণামও তার চরিত্রানুগ হয়েছে এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। তাই কমললতার বেদনায় সহৃদয় পাঠক

পীড়িত হয়, সর্বত্যাগী গহরের জন্য অশ্রু সংবরণ দুষ্কর হয়ে ওঠে, আর সেই সঙ্গে যে সমাজ ঊষাঙ্গিনীকে কমললতায় রূপান্তরিত করেছে তার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগে। এখানেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা।

প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষের কুৎসিত ভালবাসার অভিজ্ঞতার দহনে দগ্ধ হয়ে কমললতা যেমন বৈরাগ্যের আধারে আপন কামনাশূন্য প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়েছে, তেমনি অভয়ার মধ্যে দেখি নারীর জীবনে পাতিব্রত্য ও সতীত্বসংস্কারের মূল্য কত অর্থহীন। ঐ সংস্কারের বশবর্তী হয়েই অভয়া প্রথমে রোহিণীকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর অনুসন্ধানে বর্মায় গেছে। জাহাজে শ্রীকান্তকে সে বলেছে - 'শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছুই চাইনে। তিনি বেঁচে থাকলেই হ'ল। ...আমি ভয় করিনে—আমি সতীন নিয়ে খুব ঘর করতে পারব।' (২য় পর্ব ৪র্থ পরিঃ) শ্রীকান্ত জানিয়েছে যে, অভয়ার স্বামী এক বর্মী মেয়েকে বিয়ে করে ঘরসংসার করছে। তার ঠিকানা যোগাড় করে দিলে স্বামীর কাছে ফিরে যাবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় অভয়া সাশ্রুনয়নে বলেছে —'না গেলে আমার উপায় কি বলুন?' এতক্ষণ পর্যন্ত অভয়া আমাদের সেই সুপরিচিতা পতিগতপ্রাণা বাঙালী বধূ। কিন্তু সে যখন তার স্বামীর কাছে পত্নীত্বের দাবী নিয়ে এসে দাঁড়াল, তখন তার ভাগ্যে জুটলো গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, বেত্রাঘাত ও শেষে বিতাড়ন। তার ডানহাতে বেতের দাগে চামড়া কেটে যাওয়ার চিহ্ন দেখিয়ে সে বলেছে – 'শ্রীকান্তবাবু, আমার সতীধর্মের এ সামান্য একটু পুরস্কার। ......আমি যে স্ত্রী হয়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এত দূরে এসে তাঁর শান্তিভঙ্গ করেচি মেয়েমানুষের এতবড় স্পর্ধা পুরুষমানুষে সইতে পারেনা। এ সেই শাস্তি।' (২য় পর্ব ১০ পরিঃ) এখানে অভয়ার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও অধিকার-সচেতনতার উন্মেষ ঘটেছে, তাই তার জিজ্ঞাসা—'স্বামী যখন শুধুমাত্র একগোছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কিনা,... ? ...যার স্বামী এতবড় অপরাধ করেচে তার

স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকাই তার নারীজন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই—সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই?' (২য় পর্ব ১০ পরিঃ)

সে প্রশ্ন করেছে—সব ধর্মেই এই অবিচারের প্রতিকার আছে, তবে আমাদের হিন্দুধর্মেই বা থাকবে না কেন? অভয়ার এইসব প্রশ্ন হিন্দু-বিবাহ অনুষ্ঠানের অসারতা ও সতীত্ব সংস্কারের মূঢ়তার শোচনীয় পরিণামকেই প্রকট করে তুলেছে, এবং এও ইঙ্গিত দিয়েছে যে, নারীব্যক্তিত্বের যথাযথ মর্যাদা অর্জন করতে হলে ঐ সংস্কার থেকে মুক্তি প্রয়োজন। বিবাহিত স্বামীর অত্যাচার সহ্য করে সামান্য একটা গণিকার মত তার কাছে পড়ে থাকতে সে রাজী নয়। সে সমাজের চোখে সতীত্ব বজায় রাখার নাম করে নিজের জীবনকে পঙ্গু করে দিতে চায়নি, রোহিণীকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। এই অভয়াকেও রাজলক্ষ্মী চোখে না দেখে দূর থেকে তার অন্তরস্থিত বহ্নিশিখার আভাস পেয়ে শতসহস্র নমস্কার জানিয়েছে। শ্রীকান্তও অভয়ার ব্যক্তিত্বকে শুধু শ্রদ্ধাই জানায়নি, তার স্বাতন্ত্র্যবোধ ও যুক্তিসিদ্ধ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করে বলেছে—'অভয়া শুধু তাহার মতটাকে মাত্র ভাল প্রমাণ করিবার জন্যই কথা কাটাকাটি করিত না—সে তাহার নিজের কাজটাকে সবলে জয়ী করিবার জন্যই যেন যুদ্ধ করিত।' (২য় পর্বঃ ১১ পরিঃ) তাসত্ত্বেও শ্রীকান্ত অভয়ার কাজকে যেন মনেপ্রাণে সমর্থন করতে পারেনি, তার আজন্মের সংস্কারের বশবর্তী হয়েই সে আর বর্মায় অভয়ার বাড়ীর দিকে সহজে যেতে চাইত না। তার কেবলই মনে হয়েছে—'আমার অন্নদাদিদি একাজ করিতেন না।' (২য় পর্ব ১১পরিঃ) শ্রীকান্তের এই দ্বিধা ঔপন্যাসিকের মানসিক দ্বন্দ্বেরই দ্যোতক। অভয়ার যে সমস্যা-সে

তো বিধবা নারীর প্রেমের সমস্যা নয়, সধবা নারীর দাম্পত্যসমস্যা। বিধবার প্রেমের মর্যাদা দিলেও শরৎচন্দ্র বাস্তবে বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে যেমন দ্বিধাগ্রস্ত, তেমনি সধবা নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহের ক্ষেত্রেও যেন সঙ্কুচিত। তাই অভয়া যেমন রোহিণীকে বিবাহ না করে প্রেম-নির্ভর দাম্পত্য জীবন শুরু করেছে, তেমনি 'শেষপ্রশ্নে'র কমলও শিবনাথকে ছেড়ে অজিতকে নিয়ে শুধু ভালবাসার ভিত্তিতে ঘর বাঁধতে চেয়েছে, বিয়ে করতে চায়নি।

এখন প্রশ্ন হল —'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের বিভিন্ন পর্বে অন্নদা-দিদি, অভয়া, কমললতা ও সার্বিকভাবে রাজলক্ষ্মী—এঁদের প্রত্যেকের পরিণাম একই শিল্পীর হাতে ভিন্ন হল কেন? এই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে লেখক কোন্ সমাজ-সত্যকে প্রকাশ করেছেন? চরিত্রগুলির যেভাবে বিশ্লেষণ করেছি, তাতে আপাতঃ-দৃষ্টিতে মনে হয় অভয়া সকলের থেকে স্বতন্ত্র। পূর্বে বলা হয়েছে যে, শরৎচন্দ্র অন্নদাদিদির মধ্যে দেখিয়েছেন কিভাবে প্রচলিত সমাজ—সৃষ্ট নারীমনের সতীত্ব সংস্কারের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়েও নারীর ব্যক্তিত্ব ঐ সমাজেরই দ্বারা লাঞ্ছিত হয়, আর অভয়ার মধ্যে দেখি সেই লাঞ্ছিত নারীই সমাজের প্রতি বিদ্রোহিণী হয়ে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর। মূলতঃ এরা উভয়েই নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে শিল্পী-মানসের চিন্তনের দুটি স্তর। বর্তমানে প্রচলিত বিশ্বাসের শুধু অস্বীকৃতি এখানে নেই, ভবিষ্যতের কাম্য বিবাহ-প্রথা ও দাম্পত্য জীবনের ভিত্তির ইঙ্গিতও অভয়ার উক্তিতে মেলে। রাজলক্ষ্মী ও কমললতার মধ্যেও শরৎচন্দ্র হিন্দুসমাজে কৌলীন্য-প্রথানুযায়ী শাস্ত্রীয় বিবাহ অনুষ্ঠানের নিষ্ঠুর প্রতারণা এবং পুরুষ-প্রধান সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের অমানবিক আচরণ নারী-ব্যক্তিত্বকে যে কত অধঃপাতিত করতে পারে—তাই তুলে ধরেছেন। কাজেই প্রত্যেকটি চরিত্রের মাধ্যমে শিল্পী নারী-ব্যক্তিত্বের সমস্যার বিভিন্ন দিক যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে ব্যক্তির অসহায়ত্ব এবং সমাজের হৃদয়হীনতা এখানে স্পষ্ট। রাজলক্ষ্মী—শ্রীকান্তের বা কমললতা-গহরের মিলন হল কিনা—এটা বড় কথা নয়, প্রধান বিচার্য হল—ঐ চরিত্রগুলি

জীবনে যে যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা ভোগ করেছে তার জন্য দায়ী কে—পাঠক সেটা উপলব্ধি করেছে কি, করেনি। সে বিচারে শরৎচন্দ্র সার্থক বাস্তববাদী, কারণ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের পাঠক মাত্রেরই মনে ঐ সব ভাগ্য-বিড়ম্বিতা নারীদের প্রতি সহানুভূতি না জেগে পারে না এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত সমাজ-বিধির প্রতি বিতৃষ্ণায় সাময়িকভাবে হলেও তাঁদের মন ভরে ওঠে।

আপন অন্তরের মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণের অমানবিকতার দ্বন্দ্বেই সুনন্দার ব্যক্তিত্বের সমস্যার সূত্রপাত। সে সম্ভ্রান্ত কুশারী পরিবারের বধূ, মিহির-পুরের শিবু তর্কালঙ্কারের কন্যা এবং টোলের অধ্যাপক যদুনাথ ন্যায়রত্নের স্ত্রী। শাস্ত্রীয় পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে। সে সুশিক্ষিতা ও গৃহকর্মে নিপুণা। হিন্দুরমণীর সংকীর্ণ সংস্কার ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে বলেই স্বামীর অবর্তমানে শ্রীকান্তের মত অনাত্মীয়, অপরিচিত অতিথির আপ্যায়নে সে নিঃশঙ্ক। সে আচারপরায়ণ, কিন্তু সাধারণ কুলবধূর রক্ষণশীলতা তার মধ্যে দেখা যায় না। তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিবারের সংঘর্ষ দেখা দেয় কানাই বসাকের বিধবা ও নাবালক পুত্রের অন্যায়ভাবে দখল করা সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার প্রশ্নে। এই নিয়ে সমগ্র পরিবারের সঙ্গে সে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। অবশ্যম্ভাবী দারিদ্র্যের ভীতি তাকে নিরস্ত করতে পারেনি, দুধের ছেলে বিনুকে দুধ খেতে দিতে পারেনি বলে তার মনে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখা দেয় নি; বরং সে বলেছে যে, বিনুকে দুধ না খেয়ে বেঁচে থাকার শিক্ষাই সে দিতে চায়, তবু বড় জায়ের পাঠানো গাই-বাছুর সে নেয়নি। সামন্তশাসিত সমাজে শোষক শ্রেণীর পরিবারেরই একজন, বিশেষ করে সেই পরিবারের বধূ, শোষিতের পক্ষ অবলম্বন করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তখনকার দিনে কম কথা নয়। স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে সুনন্দার বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব বুঝি বাস্তবে সম্ভাব্যতার গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে—মানবিকবোধে উদ্দীপ্ত এই বিদ্রোহাত্মক চেতনা সুনন্দা কোথা থেকে পেল? স্মরণ রাখা প্রয়োজন—যে-ধর্মজ্ঞান তার জীবনের প্রধান অবলম্বন, তা শাস্ত্রলব্ধ হলেও তার মূল ভিত্তি

ছিল ন্যায়বোধ ও মানবিকতা। শাস্ত্রজ্ঞ ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও তো আমরা এই ধর্মকেই লক্ষ্য করেছি, সেই ধর্মই তাঁকে সমাজের নিষ্ঠুর রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাই সুনন্দার মধ্যে যদি তা দেখি তবে অস্বাভাবিক মনে হবে কেন? এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের মধ্যেই সুনন্দা সম্পর্কে লেখকের যে মত শ্রীকান্তের মুখ দিয়ে শুনি, তা হল এই—'অনেকে মনে করবেন ইহা অদ্ভুত;··· এ সকল কেবল গল্পেই চলে। তাঁহারা বলিবেন, আমরাও বাঙ্গালী, বাংলাদেশেরই মানুষ, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ ঘরে এমন হয় তাহা ত কখনো দেখি নাই।··· কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু ইহাই বলিতে পারি, আমিও এদেশেরই মানুষ এবং একটির অধিক সুনন্দা এদেশে আমারও চোখে পড়ে নাই। তত্রাচ ইহা সত্য।' (৩য় পর্বঃ ৮পরিঃ) সুনন্দার ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সত্যই পাঠককে বিস্ময়াভিভূত করে, আর শ্রীকান্ত তথা শরৎচন্দ্রও তার কাছ থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতা অর্জনের ও নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সুনির্দ্দিষ্ট পথের ইঙ্গিত পেয়েছেন। শ্রীকান্ত তাই বলেছে যে, নারীজাতির মুক্তি যে 'কোথায় এবং কিরূপে হয়, সুনন্দার ভগ্নগৃহের ছিন্ন আসনখানিতে বসিয়া আজ নিঃশব্দে এবং নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিলাম।' (৩য় পর্বঃ ৮পরিঃ) উপন্যাসের মধ্যে সুনন্দার ব্যক্তিত্বই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে, এবং এই কাহিনীব মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র আরও দেখিয়েছেন কিভাবে গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষ শোষণক্লিষ্ট হয়ে ক্রমশঃ সর্বস্বান্ত হয়। আর লেখকের সহানুভূতি যে শোষিত মানুষের পক্ষে তা এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠায় তাঁর বাস্তবতাবোধ ও প্রগতিশীলতা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

শেষ প্রশ্ন (১৯৩১): 'নারীর মূল্য (১৯২৪) প্রবন্ধের বক্তব্য-নির্ভর উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'শেষপ্রশ্ন'। সমাজে নারীজীবনের নানা সমস্যার উত্থাপন, সেই সমস্যার কারণ ও তা নিরসনের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী কি হওয়া উচিত ইত্যাদির স্পষ্টতর প্রকাশই এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। যদিও প্রায় সমস্ত উপন্যাসের মধ্যেই শরৎচন্দ্র নারীব্যক্তিত্বের সমস্যার কোন-না-কোন দিক তুলে ধরেছেন, তবু আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই

উপন্যাসের কমল যেন অভয়া-রাজলক্ষ্মী কিরণময়ীদের অন্তরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভেরই সমন্বিত মানবী মূর্তি। সমাজের বিরুদ্ধে যে রোষাগ্নি ঐ সব চরিত্রের অন্তরে কেবল ধূমায়িত ছিল—তাই কমলের মধ্যে সম্মিলিত হয়ে যেন তীব্র বিদ্রোহাত্মক মনোভাব প্রকাশে শক্তি সঞ্চার করেছে। কমলের অভিযোগ কিছুটা তাদের মতো হলেও কমল স্বতন্ত্র। তার সেই স্বাতন্ত্র্য শুধু নিজের জীবনাচরণে বা জীবনদৃষ্টিতে নয়, জীবনে উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করার মধ্যেও তা স্পষ্ট। হরেন্দ্রের এই উক্তিতে তার প্রমাণ মেলে—'ওর বলার মধ্যে কি যে একটা সুনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হতে থাকে যে, মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে পেয়েচে। শিক্ষা দ্বারা নয়, অনুভব-উপলব্ধি দিয়ে নয়, যেন চোখ দিয়ে অর্থটাকে সোজা দেখতে পাচ্চে।' (২৩ পরিঃ)

'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'পথের দাবী'–উপন্যাসের মত 'শেষ-প্রশ্ন'ও সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী উপন্যাস। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশের সময় (১৩৩৪ শ্রাবণ থেকে নিয়মিতভাবে ১৩৩৮ বৈশাখ পর্যন্ত) থেকেই ঐ গ্রন্থের পক্ষে-বিপক্ষে নানা সমালোচনা বের হয়। বিপক্ষের সমালোচকগণ সংবাদপত্রে কার্টুন ছবি এঁকে 'শেষশ্রাদ্ধ' নামে প্রবন্ধ লিখে শরৎচন্দ্রকে যেমন আক্রমণ করেন, আবার সমর্থক-গণও অসংখ্য অভিনন্দন পাঠান। একটি মেয়ে শরৎচন্দ্রকে লিখে-ছিলেন যে, তাঁর যথেষ্ট টাকা থাকলে এই বই ছাপিয়ে বিনামূল্যে বাইবেলের মত বিতরণ করতেন।' ৪১ 'পরিচয়' পত্রিকায় (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৮) নীরেন্দ্রনাথ রায় 'শেষপ্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, 'শেষপ্রশ্নে তাঁহার সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় নাই বলিলে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না। পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায়, ইহার মধ্যে এমন একটি চরিত্র বা ঘটনা নাই, যাহা তাঁহার শিল্পীমনকে উদ্বোধিত করিয়াছে। ...আসল কথা, আমাদের দেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা শরৎচন্দ্রের ভাবপ্রবণ অন্তরকে পীড়িত করিয়াছে—'শেষপ্রশ্ন' এই পীড়নের তীব্র প্রতিঘাত; শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় ইহা রচিত নহে।'৪১(ক) অনেক আধুনিক সমালোচকের মতেও এই উপন্যাস শরৎচন্দ্রের

সর্বাপেক্ষা দুর্বলসৃষ্টি, এতে শরৎচন্দ্রের ঈপ্সিত 'intellect-এর বলকারক আহার্য সার্থকভাবে পরিবেশিত হয় নি।' ৪২

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের শিল্পমূল্যের সার্থকতা পৃথকভাবে বিচার্য, আমরা এখানে শুধু নারী স্বাধীনতা ও নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় কমলের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির বাস্তবতা এবং আমাদের সমাজে তার কার্যকারিতা সম্ভব কিনা—সেইটুকু পরিমাপ করার চেষ্টা করবো। সেই সঙ্গে ঐ প্রশ্নগুলির সমাধানে ঔপন্যাসিকের মানসভঙ্গীটি পরিস্ফুটনে সচেষ্ট হব। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন যে, লেখক নিজেই একটি পত্রে স্বীকার করেছেন যে এ উপন্যাস সৃষ্টির পিছনে তাঁর দুটি উদ্দেশ্য ছিল—'সামাজিক অনেক প্রশ্নের উত্থাপন' ও 'অতি আধুনিক সাহিত্য' সৃষ্টির রূপ-রেখার ইঙ্গিত প্রদান। ৪৩ এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের সামাজিক বাস্তব পটভূমিকাও স্মরণীয়। একদিকে 'কল্লোল' (১৯২৩ মে প্রথম প্রকাশ) ও 'কালিকলম' পত্রিকায় নবীন লেখকদের ফ্রয়েডীয় চেতনাসমৃদ্ধ, বিকৃত ভোগতৃষ্ণা ও যৌনাবেদনমূলক রচনা প্রকাশিত হচ্ছিল, অন্যদিকে মহিলাদের নেতৃত্বে সমাজে নারীমুক্তি আন্দোলন বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্বার হয়ে উঠেছিল। ঢাকায় শ্রীমতী লীলানাগের নেতৃত্বে মহিলারা অবরোধ প্রথার বিলোপ ও হিন্দুর সম্পত্তি উত্তরাধিকারের আইন পরিবর্তনের দাবী তোলেন। ঐ সময় নানা সংস্কারমূলক কাজের জন্য ঢাকায় 'দীপালি সংঘ' (১৯২৭) নামে নারীসমিতি গঠিত হয়। ৪৪ 'বিচিত্রা'য় (১৩৩৫ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায়) অনুরূপাদেবী অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে ও সার্ব-জনীন শিক্ষার দাবীতে প্রবন্ধ লেখেন, আইনসভায় মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা আইনানুগ করা হয় ইত্যাদি ঘটনা দেশে নারীস্বাধীনতা আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করেছিল। আবার ঐ একই সময়ে ঐ আন্দোলনের বিরোধিতায় সমাজের রক্ষণশীল প্রাচীন-পন্থীরাও তাদের 'শুদ্ধি আন্দোলন' জোরদার করে ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের ঊষর-অবক্ষয়ী বৈশিষ্ট্যগুলির সংরক্ষণে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের সভায় শরৎচন্দ্র নিজেও উপস্থিত ছিলেন। চন্দননগরে 'প্রবর্তক সংঘের কর্মীদের সঙ্গে

আলোচনা' প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেখানে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—'যাঁরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস মাটি খুঁড়ে, পাথর খুঁড়ে বার করছেন, আর বলছেন—এই দেখ, আমাদের এই ছিল ঐ ছিল—আমি তাঁদের কথায় খুশী হই না।··· আমার কথা পুরাণ জিনিস নিয়ে গৌরব করে কাজ হবে না। নূতন গড়ে তোল।··· আমরা বলি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন খুব বড়··· এতই যদি বড় তো ছোট হয়ে যাচ্ছি কেন?··· আমার বইখানা (শেষপ্রশ্ন) শেষ হয়ে গেলে দেখবেন, তাতে এই সব মতের আলোচনা করেছি।' প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় শরৎচন্দ্রের ঐ মন্তব্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন—'আপনার লেখার মধ্যে যে বাস্তবতার পরিচয় পাই – ধ্বংসনীতিরও মধ্য দিয়ে সেইরকম একটা পজিটিভ কিছুর সন্ধান আপনাকে দিতে হবে 'শেষপ্রশ্নে'র পরেও আপনাকে লেখনী ধরতে হবে।' এইসব ঘটনার উল্লেখ করা হল কেবলমাত্র 'শেষপ্রশ্ন' উপন্যাস রচনার পিছনে লেখকের মনে কোন্ বাস্তব সমাজ-পটভূমি ক্রিয়াশীল ছিল তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

উপন্যাসের প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র কমল। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, সে-ই ঔপন্যাসিকের মতের প্রবক্তা আর অক্ষয়-অবিনাশ প্রমুখেরা সনাতন আদর্শ ও ঐতিহ্যানুরাগী। কমল ছাড়া নারীচরিত্রের মধ্যে রয়েছে মনোরমা, বেলা ও নীলিমা। বেলা ও নীলিমার জীবনেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। তারাও কমলকে দেখে নিজেদের নারীস্বরূপ চিনতে পেরেছে। আশুবাবু কমলের প্রতি স্নেহপরায়ণ, এমনকি উপন্যাসের শেষের দিকে অক্ষয়বাবুর রক্ষণ-শীলতা ও তাঁর কমল-বিরোধিতার প্রাখর্য ক্রমে ম্লান হয়ে এসেছে, তাই তাঁর বাড়ীতে কমল না যাওয়ায় তিনি অনুযোগ করেন, এমন কি আগ্রা থেকে চলে যাওয়ার সময় কমলকে পত্র দিতে অনুরোধ করেন। মোট কথা, একমাত্র রাজেন ছাড়া সকলকেই কমল তার তার্কিক মন নিয়ে প্রভাবিত করেছে। এখন কমলের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির সামাজিক মূল্য কতখানি, তা বিচার করবো।

কমলের প্রশ্নগুলি মূলতঃ একনিষ্ঠ প্রেম, বিবাহ, বৈধব্য–

সংস্কার, সংযম-বৈরাগ্যসাধনা-ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি সংক্রান্ত এবং নারী-মুক্তির পন্থা সম্পর্কিত। কমলের স্বভাব সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে—'প্রাচীন যাকিছু তার পরেই তার প্রবল বিতৃষ্ণা, নাড়া দিয়ে ভেঙ্গে ফেলাই যেন তার Passion.' (২৩ পরিঃ)। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের অনুস্যূত ঐ জাতীয় মূল্যবোধগুলিকে কমল শুষ্ক, মূল্যহীন বলে মনে করে। প্রেমের একনিষ্ঠায় সে বিশ্বাস করে না, বিবাহের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও তার কোন আস্থা নেই। বৈধব্যসংস্কারের নামে সংযম তার কাছে আত্ম-পীড়ন, সে মনে করে এতে 'আত্মনিগ্রহের উগ্রদম্ভে আধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হয়ে আসে' (১৩ পরিঃ); কমলের মতে—সংসারত্যাগ ও বৈরাগ্যসাধনা সাজে তাদেরই যারা প্রাচুর্যের মধ্যে আছে, অভাব অনটনক্লিষ্ট দেশে ত্যাগের কথা বলা আত্মপ্রবঞ্চনা। অতীত তার কাছে মৃত; সামনে এগিয়ে চলাই একমাত্র সত্য—আবার সে ক্ষণ-বাদীও, তাই ক্ষণিকের সুখও তার কাছে মূল্যহীন নয়। এই জাতীয় চরম আত্মসুখবাদ (Hedonism) প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় ভাববাদেরই একটি বিশেষ প্রবণতা। আমাদের সমাজে হতাশাক্লিষ্ট বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে এই প্রবণতা যে সংক্রমিত করেছিল তার পরিচয় কল্লোল-কালি-কলমযুগে দুর্লক্ষ্য নয়। কমলকে ঐ প্রজন্মের প্রতিভূ বলা চলে। ধ্বংসাত্মক মনোভাব ছিল তাদের মধ্যে প্রকট। আপাতঃদৃষ্টিতে কমলকে আধুনিককালের প্রগতিশীল মননের অধিকারী বলে মনে হলেও সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, শরৎচন্দ্র যেন জোর করে তর্কের খাতিরেই কমলকে দিয়ে ঐ সব বিপ্লবাত্মক কথা বলিয়েছেন। কমলের কথা ও কাজে যেমন অসঙ্গতি প্রচুর, তেমনি শেষপ্রশ্নের বক্তব্য ও একই বিষয়ে শরৎচন্দ্রের অন্য রচনার বক্তব্যে স্ববিরোধিতাও দেখা যায়। সেইজন্য বলতে হয়—কমল তর্কের জন্যই তর্ক করেছে, তার মতের সামাজিক উপযোগিতা ও প্রয়োগ-সম্ভাব্যতা কতখানি সেদিকে কমলের বা তার স্রষ্টার আদৌ ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

প্রেম-বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কগুলি চিরকাল অপরিবর্তিত থাকে না, সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও পরিবর্তনশীল—

একথা বস্তুবাদী বিজ্ঞানে সত্য। কিন্তু কোন এক বিশেষ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সমস্ত সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কগুলি এমনভাবে স্থিরীকৃত হয়—যাতে ঐ সমাজের স্থিতিশীলতা ও সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের স্থায়িত্বে কোন বিঘ্ন না ঘটে। কোন ব্যক্তিবিশেষের আত্ম-সুখান্বেষণে তা স্বতঃই পরিবর্তিত হতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের ঐ ধরণের প্রয়াসকে প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যবোধ বলা চলে না, বরং তা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। পাশ্চাত্যের সব সমাজ ব্যবস্থায়,—ধনতান্ত্রিক বা সমাজ-তান্ত্রিক যা হোক না কেন—যেখানে প্রেম ও বিবাহের ক্ষেত্রে নারী-স্বাধীনতা স্বীকৃত সেখানেও দাম্পত্য-সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন-না-কোন ন্যূনতম বন্ধন থাকে এবং সেটাই সামাজিক সুস্থতার লক্ষণ। বল্গাহীনভাবে ব্যক্তির তাৎক্ষণিক খেয়ালখুশীর ওপর প্রেম ও দাম্পত্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া কোন সমাজ-ব্যবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাই কমলের ঐ মতবাদ সামাজিক মূল্য-বিহীন।

কমলের প্রচারিত আদর্শের সঙ্গে তার নিজের জীবনাচরণের সঙ্গতি কতখানি রক্ষিত হয়েছে তাও বিচার্য। হরেনের ভাষায় কমলের আকৃতিটা প্রাচ্যের, প্রকৃতিটা প্রতীচ্যের। কিন্তু প্রকৃতিতেও সে যে প্রাচ্যাভিমুখী তার পরিচয় উপন্যাসে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বৈধব্য-সংস্কারের বিরুদ্ধে সে নানা যুক্তি দেখিয়েছে, কিন্তু নিজেই সে স্বীকার করেছে যে, তার প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে সে একবেলা হবিষ্যান্ন খায়। উপন্যাসের মধ্যে লেখকও একজায়গায় মন্তব্য করেছেন—'যুক্তি ও তর্কের ছলনায় কমল মুখে যাই বলুক না কেন, বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে তাহার এই কঠোর আত্মসংযম অজিতের অভিভূত মুগ্ধচক্ষে মাধুর্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হইয়া উঠিল, ...' (১০ পরিঃ) কমল আত্মসংযমের বিরোধী, এটাকে সে আত্মপীড়ন বলেছে, কিন্তু তার মধ্যেও সংযমের কাঠিন্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তার মুখে শুনি—'পুরুষের ভোগের বস্তু যারা, আমি তাদের জাত নই।' (২১ পরিঃ) আরও তার সংযমের পরিচয় পাই যখন সে হরেনের ব্রহ্মচর্যের প্রতি কটাক্ষ করে একই ঘরে তার সঙ্গে রাত্রিযাপনের প্রস্তাব দিতে সাহসী হয়। কমল যেভাবে তর্ক

করেছে তাতে আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে, হৃদয়ধর্ম অপেক্ষা মননশীলতা ও যুক্তিই তার কাছে বড়, কিন্তু শেষে সে নিজেই হৃদয়-ধর্মের কাছে পরাজয় স্বীকার করে অজিতকে বলেছে—'জোরে কাজ নেই, বরঞ্চ তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, অত নিষ্ঠুর আমি নই।' কমল চরিত্রের এই সব অসঙ্গতি সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। কাজেই তার আপাতঃমধুর যুক্তিগুলি অন্তঃসারশূন্য কথার সমষ্টিমাত্র।

নারীমুক্তির পন্থা সম্পর্কে কমল কি বলেছে? সে তার বাবার কাছে শুনেছিল যে, পৃথিবীর ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দিয়েছিল তাদের মনিবরাই, তাদের হয়ে লড়াই করেছিল মনিবের জাতেরাই। তাই কমল আশুবাবুকে বলেছে—'আজকের দিনেও ইম্যানসিপেশনের জন্যে যত কোঁদলই মেয়েরা করিনে কেন দেবার আসল মালিক যে আপনারা,—আমরা মেয়েরা নই,··· বিশ্বের এমনিই নিয়ম, শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্বলকে ত্রাণ করে। তেমনি নারীর মুক্তি আজও শুধু পুরুষেরাই দিতে পারে। দায়িত্ব ত তাদেরই।' (২৪ পরিঃ) বস্তুবাদী বিজ্ঞানের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই মত সম্পূর্ণ গ্রাহ্য নয়; দুই বিপরীত বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বে নতুন শক্তির উন্মেষেই ঐ দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে ঠিকই, কিন্তু শক্তিমানেরাই দুর্বল শ্রেণীকে মুক্তি দেবে, তবে তারা মুক্তিলাভ করবে—এতত্ত্বের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। দুর্বল শ্রেণীকেও আত্মসচেতন হয়ে প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হতে হবে, শক্তি অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে; শক্তিমান তখনই দুর্বলশ্রেণীকে মুক্তি দেবে যখন আর তাদের পক্ষে নির্দিষ্ট এক বিশেষ পরিস্থিতিতে দুর্বার সংগ্রামের মুখে অপরকে বশীভূত করে রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। পুরুষপ্রধান সমাজে নারীমুক্তির আন্দোলনে নিঃসন্দেহে পুরুষের একাংশের ঔদার্য ও মানবিকতা সহায়কশক্তি হিসেবে দেখা দিতে পারে, কিন্তু মূলতঃ নারীজাতিকে শিক্ষার দ্বারা নিজেদের আত্মসচেতন করে তুলতে হবে, প্রাচীন সংস্কার থেকে ধীরে ধীরে নিজেদের মুক্ত

করতে হবে এবং সর্বোপরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় নিজেদের উদ্যোগী হতে হবে ও সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে নিজেদের একান্তভাবে যুক্ত করতে হবে—তবেই তাদের মুক্তি আসা সম্ভব। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে নীলিমার আবেগপ্রবণ ও অসেচতন উক্তিটি অপেক্ষাকৃত বাস্তব বলে মনে হয়— '...এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না—মরে। (২৪ পরিঃ) কমলের মত অপেক্ষা এই মতের বাস্তবভিত্তি যেন বহুল পরিমাণে বিজ্ঞানসম্মত।

প্রাচীন ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি—যা কমল এগিয়ে চলার নীতি হিসেবে প্রচার করেছে—তা-ও সঠিক নয়। বিশ্বের প্রত্যেক দেশ এবং জাতি সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হয় অতীতকে অস্বীকার করে নয়, তার সঠিক মূল্যায়ন করেই। আবার জাতীয় সংকটকালে প্রাচীন ঐতিহ্য অনেক ক্ষেত্রে জাতির মনে আনে সংগ্রামের প্রেরণা। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্য-প্রবাহ জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির তলদেশে অন্তঃসলিলা থেকে জাতিকে নব নব উন্মেষশালী করে তোলে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ঐতিহ্যের প্রভাব দ্বিবিধ—ঋণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক (Negative বা Destructive) ও ধনাত্মক বা গঠনাত্মক (Positive বা Creative)। ভবিষ্যত সমাজগঠনে ঐতিহ্যের গঠনাত্মক প্রভাবের কার্যকারিতা অনস্বীকার্য, এবং ঐ কারণেই কোন সমাজের জনমানসকে হঠাৎ প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে বিযুক্ত করা অবাস্তব পরিকল্পনা। সমালোচকের মতে— 'হাজার হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হতে থাকা একটি সমাজের পুরাতত্ত্বের বৃত্ত, প্রতীক মূল্যবোধ শ্রেয়ের আশ্রয় ইত্যাদি থেকে জনমানসকে বিচ্যুত করা এক অবাস্তব অভাবনীয় প্রস্তাব। সম্ভবত সেজন্য সহস্র বছর ধরে সামাজিক মনোভূমি কর্ষণ করার প্রয়োজন হবে।' ৪৫

উপরে বিশ্লেষিত কমলের স্ববিরোধিতা মূলতঃ শিল্পীমানসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ। শরৎচন্দ্র একসময় 'বঙ্গবাণী'র প্রধান সচিব কুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরীকে কথাপ্রসঙ্গে

বলেছিলেন—'দেখ, অনেকে বলে আমি কন্‌জারভেটিভ। খুব অন্যায় বলে তা নয়। আমি ভেবে দেখেছি, আমার মনের কোণে সত্যিই এক গোঁড়া কন্‌জারভেটিভ লুকিয়ে আছে।··· আমি যখন সংস্কার বা প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি দিই, তা যে কেবল যুক্তি দেবার জন্যই দিই, তা কিন্তু নয়।······ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখেছি, যখনই আমার মনের কোণে সেই কন্‌জারভেটিভটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখনই আমি দুর্বল হয়ে পড়ি।' ঔপন্যাসিকের এই স্বীকারোক্তির আলোকে বিচার করলে কমলের স্ব-বিরোধের কারণ নিরূপণ সহজ হয়ে পড়ে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কমলের আক্রমণাত্মক যুক্তিগুলি লেখকের মনের তাৎক্ষণিক এক বিশেষ ক্ষোভের প্রকাশ মাত্র। এগুলির সামাজিক মূল্য ও বাস্তবে প্রয়োগ-সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁর মনেও যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তিনি নিজেও জানতেন যে, সমাজ-মানসের গভীরে দীর্ঘদিন ধরে ক্রম-সঞ্চীয়মান যে সংস্কার রয়েছে, তাকে সহজে নির্মূল করা যায় না। তাই কলকাতায় বাসকালীন তিনি একদিন ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়কে কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন—'মানুষের আচরণ নির্ভর করে কার উপর বেশী? সমাজের কাছে শিক্ষা পেয়ে যা আমরা মনের মধ্যে গড়ে তুলি সেই সংস্কার? না, মানুষের আদিম প্রকৃতি, যার আধার হচ্ছে তার দেহের তাড়না? কোন্‌টা? দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, যদিও 'এবিষয়ে সঠিক মত নির্ণয় করা কঠিন তবু 'শিক্ষা থেকে, সমাজ থেকে, পিতৃপুরুষের কাছ থেকে যে, সংস্কারকে আমরা গড়ে তুলি, তার শিকড় অগভীর নয়।' কমল তাই বাহ্যতঃ কথায় যতখানি সংস্কারমুক্ত, আচরণে ততখানি হতে পারেনি, হওয়া সম্ভবও নয়। সেদিনের বাংলার সমাজে এজাতীয় নারীচরিত্রের অস্তিত্ব—কল্পনাও অবাস্তব, তাই বোধ হয় কেবলমাত্র সমকালীন সমাজের গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুপ্রধানদের 'শুদ্ধি আন্দোলন'কে কঠোর আঘাত হানার উদ্দেশ্যেই শরৎচন্দ্র কমলকে ইচ্ছা করেই বাংলার হিন্দু-সমাজভুক্ত করেননি, এমনকি উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমিও সরিয়ে নিয়ে গেছেন সুদূর আগ্রার এক বাঙালী-অধ্যুষিত পল্লীতে। কমলের সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের

তর্কবহুল তাত্ত্বিক সংলাপের একঘেয়েমি উপন্যাসের কাহিনীকে যেমন দুর্বল করে দিয়েছে, কমল চরিত্রটিও তেমনি বাস্তব জীবন-বহির্ভূত এক বায়বীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে। কাজেই যে উপন্যাসে কাহিনী দুর্বল, প্রধান চরিত্রও অবাস্তব, সেখানে সমাজ-বাস্তবতা সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে না।

নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নারীমুক্তির প্রশ্নে কমলের যুক্তি-গুলির অসারতা পূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি। প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় শরৎচন্দ্রকে যে বলেছিলেন—'শেষপ্রশ্নের পরেও আপনাকে লেখনী ধরতে হবে' – তা প্রকৃতই তিনি ধরে-ছিলেন। শেষপ্রশ্নের পরে 'বিপ্রদাস'এ (১৯৩৫) এসে লেখকের মানসিকতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বন্দনা চরিত্রের পরিণাম প্রদর্শনে। আবাল্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে মানুষ হলেও শেষে পুরুতের মুখে উচ্চারিত মন্ত্রের সম্মোহনী শক্তিতে বন্দনার দেহের প্রতিটি রক্তকণা নাকি বদলে গেছে, মুখুজ্জে পরিবারের পারিবারিক ঐতিহ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে সে শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিয়ে মন্দিরের রাধাগোবিন্দজীর সেবার ভার গ্রহণ করেছে। শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্নে' শেষরক্ষা করতে পারেননি, তাই 'বিপ্রদাসে' যেন বন্দনার মাধ্যমে প্রশ্নের জবাব দিলেন। কমলের প্রশ্নগুলির প্রতি লেখকের প্রকৃত মানস-ভঙ্গীটি এখানে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে এতক্ষণ কমল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও তার চরিত্রে নানা অসঙ্গতি নিয়ে মূলতঃ আলোচনা করা হল। সমকালীন দেশের বাস্তব পরিস্থিতি-জনিত সাময়িক বিক্ষোভই যে এই ধরণের চরিত্র সৃষ্টিতে শিল্পী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—সে-কথাও উল্লেখ করেছি। তবু 'কমলের সামাজিক অধিষ্ঠান নিরূপণের সময় শরৎচন্দ্র কতটা কালসচেতন ছিলেন—তা বলা কঠিন' ৪৬ বলে যে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন তা নিতান্ত অমূলক নয়। কমলের কথা ও কাজের মধ্যে যে অসঙ্গতির বাহুল্য লক্ষ্য করা গেছে তার মুল নিহিত রয়েছে শিল্পী-মানসের গভীরে। শরৎচন্দ্র যে তাঁর উপন্যাসের কোথাও কোথাও নারীর সংস্কারমুক্তির ক্ষেত্রে আন্তর-স্বভাবে নিজেই

দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন—তাও আমরা ভূমিকায় আলোচনা করেছি। এক-দিকে শিল্পীর সেই দোদুল্যমান মানসিকতা, অন্যদিকে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন কমলের বাহ্যিক বিদ্রোহী মনোভাব—এই দুয়ের সংমিশ্রণে এ উপন্যাসে সমাজ-বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে সামনে রেখে এতক্ষণ যে সমস্ত উপন্যাসের বিশ্লেষণ করা হল তার প্রায় কোনটিতেই নারীর স্বাধীনতা, বিশেষ করে তাদের স্বাধীনপ্রেমের অধিকার সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেনি, বরং প্রচলিত সামাজিক বিধানকেই শেষপর্যন্ত তারা মেনে নিয়েছে। এতে মনে হতে পারে যে, ঔপ-ন্যাসিক বোধ হয় নারীমনের আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিরূপদানে ব্যর্থ হয়েছেন, এবং তার ফলে সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-বোধ সমাজ শাসনে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বিধবা নারীর মনে প্রেমের সঞ্চার ঘটিয়েছেন, কিন্তু বিধবা-বিবাহ উপন্যাসে প্রদর্শিত হয়নি। আমরা এই অধ্যায়ের সূচনায় আলোচনা করেছি যে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য কি ছিল এবং সে ব্যাপারে তাঁর সীমাবদ্ধতা কতটুকু। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ক্ষতস্থানটুকু নির্দেশ করে তিনি পাঠকমনে আলোড়ন সৃষ্টি করতেই চেয়েছিলেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী প্রচলিত ধারণা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ-গুলির ক্ষতিকারক দিকগুলির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে কোন সমস্যার ভালমন্দ বিচার করে তাৎক্ষণিক কোন সমাধান উপন্যাসের মধ্যে নির্দেশ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সামাজিক সমস্যার সমাধানের উপযুক্ত সমাজ-পটভূমি যদি না থাকে, সমস্যা-সৃষ্টির মৌল কারণগুলি সম্বন্ধে যদি ব্যাপকভাবে মানুষ সচেতন না হয় বা তারা সেই কারণগুলির উৎসাদনে যদি আগ্রহ প্রকাশ না করে, তবে যে-ভাবেই সমাধান করে দেওয়া হোক-না-কেন, তা কখনই সমাজ-গ্রাহ্য হতে পারে না এবং সাহিত্যে তা অবাস্তব বলে মনে হবে। এই সত্যটি শরৎচন্দ্র যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধে তাই শরৎচন্দ্র লিখেছেন—

'... আমি কোনদিন কোন ছলেই নিজের ব্যক্তিগত অভিমত

জোর করে কোথাও গুঁজে দেবার চেষ্টা করিনি। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি ব্যক্তিবিশেষের জীবন-সমস্যার আমি শুধু বেদনার বিবরণ, দুঃখের কাহিনী, অবিচারের মর্মান্তিক জ্বালার ইতিহাস, অভিজ্ঞতার পাতার উপরে পাতা কল্পনার কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছি—এইখানেই আমার সাহিত্য রচনার সীমারেখা।··· সেই জন্যেই লেখার মধ্যে আমার সমস্যা আছে, সমাধান নেই; প্রশ্ন আছে, তার উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এ আমার চিরদিনের বিশ্বাস যে, সমাধানের দায়িত্ব কর্মীর, সাহিত্যের নয়। কোথায় কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, বর্তমান কালে কোন্‌ পরিবর্তন উপযোগী, এবং কোন্‌টার সময় আজও আসেনি, সে বিচারের ভার আমি সংস্কারকের উপর রেখেই নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নিয়েছি।'

উপন্যাস সৃষ্টির পিছনে শরৎচন্দ্রের কোন্‌ মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল—এখানে তা স্পষ্ট। সামন্তশাসিত ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কার-নির্দেশিত সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য বজায় রাখার প্রয়াস যে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নানাভাবে খর্ব করে—শরৎচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। কোথাও কৌলীন্যসংস্কার ও বংশমর্যাদার মিথ্যা অহংকার, কোথাও বা সতীত্ব-সংস্কার ও বৈধব্যসংস্কার, কোথাও আবার ধর্মের শুষ্কআচার-কৃচ্ছ্রসাধনের নামে নারীর স্বাভাবিক হৃদয়ধর্মের অবদমনে কিভাবে নারীব্যক্তিত্ব লাঞ্ছিত হয় শরৎ-উপন্যাসে তা শিল্পী-হৃদয়ের সহানুভূতির রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। তবে শিল্পীর মনে যে কোন দ্বন্দ্ব আদৌ ছিল না, তা নয়। এ বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করেছি। সমাজের সবকিছুকেই নস্যাৎ করে দেওয়ার কথা শরৎচন্দ্রের চিন্তায় যেমন ছিল না, আবার প্রচলিত রীতিনীতির সব কিছুই অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত, চিরন্তন—একথাও তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাই প্রচলিত সমাজের মানবকল্যাণকর মূল্যবোধগুলির প্রতি যেমন তাঁর সংরক্ষণী মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা গেছে, আবার অমানবিক সংস্কার-আচার-অনুষ্ঠানগুলির ভিত্তিমূলে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হানতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। নারীর সতীত্বকে তিনি

কথনই উপেক্ষা করেননি, কিন্তু সতীত্ব–সংস্কার অপেক্ষা নারীর মনুষ্যত্বই তাঁর দৃষ্টিতে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীন পারিবারিক সম্পর্ক, ভ্রাতৃপ্রেম ইত্যাদির বিলোপ তিনি চাননি-একথা সত্য, কিন্তু যেখানে এগুলি মনুষ্যত্বের বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে তার অপসারণ তিনি কামনা করেছেন। তবে ঐ সবকিছু সামাজিক মূল্যবোধ এক বিশেষ সমাজ–ব্যবস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ঐগুলির পরিবর্তন অসম্ভব। তাই শিল্পী যতই সংবেদনশীল ও লাঞ্ছিত মানবাত্মার মুক্তিকামী হন-না-কেন— সমাজ-আর্থনীতিক সম্পর্কের পরিবর্তনের ভাবনা ছাড়া তাঁর সাহিত্যে অসঙ্গতি দেখা দিতে বাধ্য। তবে কি সেই সাহিত্যের কোন মূল্য নেই? লেনিন টলস্টয়ের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে, উচ্চমানের অথবা ধ্রুপদী সাহিত্য কোন-না-কোন ভাবে সমাজ–বিপ্লবকে প্রভাবিত বা ত্বরান্বিত করেই করে। টলস্টয়ের সাহিত্যেও কিছু পরিমানে রক্ষণশীলতা ও সংস্কার-পরায়ণতা থাকা সত্ত্বেও লেনিন তাঁর সাহিত্যকে রুশ বিপ্লবের দর্পণ বলে অভিহিত করেছিলেন। শরৎ–সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গেও সমালোচক মন্তব্য করেছেন—'The Social import of Saratchandra is too clear to be missed. But it is not in a straight line, it is in a Zig-Zag, it has progressive bend as well as retrograde motion. Saratchandra is very often forward–looking but he is sometimes conservative.... This admixture of progressivism and conventionalism in one and the same person is a sign of middle-class vaccillation and since Saratchandra is a faithful exponent of the middle-class temperament in his literature he can not overcome this weakness. To rise above class limitations is beyond the power of a first–rate genius even. Variableness is

implicit in the very nature of a middle class writer.' ৪৬(ক) অধিকাংশক্ষেত্রে সামাজিক ঐতিহ্যকে আশ্রয় করার প্রবণতা লক্ষিত হলেও শরৎ-উপন্যাস প্রকৃতপক্ষে যথার্থ মানব-স্বীকৃতির সাহিত্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূজার উপাচার। নির্যাতিত, লাঞ্ছিত নারীর মর্মবেদনা ও বিক্ষোভকে সেখানে এমন-ভাবে পরিবেশন করেছেন – যাতে সত্যই মনে হয় প্রচলিত সমাজের নারী-সম্পর্কিত সমস্ত সামাজিক অনুশাসনগুলি ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন; আবার শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে নারীপুরুষের প্রেম-সম্পর্ক ও দাম্পত্য-সম্পর্কের কালোপযোগী পরিবর্তনের প্রয়োজনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। অবক্ষয়ী সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধেই মূলতঃ তাঁর প্রতিবাদ। সেই বিচারে তাঁর প্রগতিশীলতা ও বাস্তব-তাবোধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। শরৎ–সাহিত্য তাই ভবিষ্যতের নতুন সমাজ-গঠনে মানসিক প্রস্তুতির সহায়ক।

॥ তিন ॥

কথাসাহিত্য স্বভাবসূত্রেই সমাজসম্পৃক্ত। কথাসাহি-ত্যিকের অন্যতম কর্তব্য যেহেতু সমকালীন সমাজ-বাসনার বাঙ্ময় প্রকাশ, তাই তাঁদের দৃষ্টিতে সমাজের সমস্যা বিম্বিত হবে,—এটাই স্বাভাবিক। কোন কথা সাহিত্যিক যদি নিছক কলাকৈবল্যবাদী হন তাহলেও এই কথা অস্বীকার্য নয়। শরৎচন্দ্র 'আর্টের জন্য আর্ট' মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, ৪৭ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিধা-গ্রস্ততা থাকলেও তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা ছিল সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের শোষণ ও সংস্কারের মূঢ়তায় মানবিকতার অবনমন-জনিত শিল্পীহৃদয়ের সুতীব্র বেদনাবোধ। প্রতিটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সমস্যার মূলে থাকে অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক কারণ। তাই ঔপন্যাসিক যখন সমাজ-সমস্যামূলক উপন্যাস রচনা করেন, তখন স্বাভাবিকভাবে তাঁর দৃষ্টি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঐদিকে প্রসারিত না-হয়ে পারে না। শরৎচন্দ্রের মত হৃদয়বান ও দরদী শিল্পীর ক্ষেত্রেও এ নিয়ম সত্য। এমনকি রবীন্দ্রনাথও একসময়

বলেছিলেন— 'Politics are so wholly against my nature; and yet, belonging to an unfortunate country, born to an abnormal situation, we find it so difficult to avoid their out-bursts.' ৪৮ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণে সমস্যা-জর্জর একটি পরাধীন দেশের সচেতন সামাজিক হিসেবে পরাধীনতার যে-জ্বালা শরৎচন্দ্র অন্তরে অনুভব করেছিলেন, তারই ফলশ্রুতি তাঁর রাজনৈতিক ভাবনায়। তাঁর স্বদেশচেতনা ও রাষ্ট্রচিন্তার উন্মেষে বিশেষ কোন তাত্ত্বিক অনুশীলন ছিল না, বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিই এর উৎস। সেইজন্য তাঁর বহু উপন্যাসে একদিকে তিনি দেখিয়েছেন প্রাচীন সংস্কারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও ধর্মের মূঢ়তা কিভাবে মনুষ্যত্বের বিনষ্টি ঘটায়, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনা-দারিদ্র্য-অসহায়ত্বের মূলে যে চরম অর্থনৈতিক শোষণ রয়েছে তা-ও স্পষ্ট তুলে ধরেছেন। বস্তুতঃ তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি ও স্বদেশচিন্তা ছিল পরস্পর পরিপূরক। তিনি মনে করতেন যে, পরাধীন দেশের সাহিত্যিকের অবশ্য কর্তব্য স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য লেখনী ধারণ করা। সে-কর্তব্য তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন।

বর্তমানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে হয়ত শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনায় নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্দেশ করা যেতে পারে, কিন্তু তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমির কথা স্মরণে রেখেই তাঁর চিন্ত-চেতনার গতিপ্রকৃতি ও সক্রিয়তার মূল্যায়ন করাই সমীচীন। শরৎচন্দ্রের যথার্থ রাজনৈতিক উপন্যাস একমাত্র 'পথের দাবী'; এছাড়া 'পল্লীসমাজ', 'বামুনের মেয়ে', 'দেনা-পাওনা', 'শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব', 'বিপ্রদাস'—এ সামান্য কিছুটা জমিদারী শোষণ ও অত্যাচারে কৃষকদের অবস্থা, ব্রিটিশ শাসনে আইন আদালতের নামে বিচারের প্রহসন ও সাম্রাজ্যবাদীদের ধনলিপ্সার বীভৎস চেহারা ইত্যাদির বাস্তবচিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। পল্লীসমাজ ও দেনাপাওনায় প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের চিত্র আছে, 'বিপ্রদাসে' রয়েছে কৃষকদের সভা ও শোভাযাত্রার ইঙ্গিত। আমরা প্রথমে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনার

স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেবার চেষ্টা করবো। মুখ্যতঃ 'পথের দাবী'র বিশ্লেষণে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয় মিলবে।

বিংশশতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক বিশেষ পর্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেস দলে যোগ দেন এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদে আসীন হন (১৯২১), ক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য হন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৯০৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বর্মায় প্রবাসী। কাজেই ১৯০৪-৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলনের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে ও তার পরে রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে ও জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ আন্দোলন দেখা দেয়—তখনও তিনি রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে দূরেই ছিলেন। কিন্তু মানসিক দিক থেকে তিনি যে সর্বদা এসবের নৈকট্য অনুভব করতেন তার পরিচয় পাই তাঁর নানা প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে। ব্রিটিশের বঙ্গভঙ্গ প্রয়াসকে একদিন 'unsettled' করার জন্য তিনি বাংলার তরুণ-যুবসম্প্রদায়কে অভিনন্দিত করেছিলেন ('তরুণের বিদ্রোহ' দ্রঃ), আবার জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইটহুড্' ত্যাগ করলে শরৎচন্দ্র যে কত আনন্দিত হয়েছিলেন তার আভাস পাওয়া যায় লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার অমল হোমকে লেখা (১৬-৮-১৯১৯) একটি পত্রে। পত্রের একাংশ এখানে উদ্ধৃত হতে পারে ঃ

'ইংরেজের মারমূর্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে।··· দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর, কতটা পশু হতে পারে তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো।··· আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবারে একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।··· আজ আমাদের বুক দশ হাত কিনা বলুন।' ৪৯ রবীন্দ্রনাথ যেমন নাইটহুড্ বর্জন করেছিলেন, তেমনি শরৎচন্দ্রও ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে সূর্যসেনের নেতৃত্বে

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্বর্ধনা সভা বর্জন করে বলেন—'আজ কিছু গ্রহণ করতে কিন্তু আমি অক্ষম। ব্যক্তিগত সম্মানের দিন এ নয়, আনন্দের এ সময় নয়।··· দেশের কথা মনে করলে ব্যথা চাপতে পারিনে।' ৫০ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করলেও ১৯২১-এর পূর্বের পর্বকে শরৎচন্দ্রের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রস্তুতি-পর্ব বলা যায়। ১৯২১ সালের পর থেকে তিনি কংগ্রেসের চরমপন্থীদের দলে ছিলেন; অবশ্য মাঝে ১৯২২ সালে গয়া-কংগ্রেসে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বে দেশবন্ধুর অসহযোগকারীদের আইনসভায় যোগদানের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বিক্ষুব্ধ হয়ে শরৎচন্দ্র পদত্যাগ পত্র পেশ করেন, কিন্তু তা গৃহীত হয়নি। দেশবন্ধুর স্বরাজদল গঠনের ব্যাপারে তিনি তাঁকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি নিজে 'Forward' এবং 'বাংলার কথা' পত্রিকার জন্য দেশবন্ধুর অনুরোধে অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হন। ব্যক্তিগতভাবে দেশবন্ধুর উপরই তাঁর সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল, আর সুভাষচন্দ্র ছিলেন তাঁর স্নেহভাজন। তাই দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তিনি হতাশ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন—'আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ। আজ তিনি নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া এই কথাই মনে হইতেছে, কি হইবে আর কাজ করিয়া? তাঁহার সব আদেশই কি আমাদের মনঃপূত হইত? হায়রে, রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গেছে' (মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৩২)।

দেশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতাই ছিল তাঁর কাম্য। তাই ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে 'ডোমিনিয়ন ষ্টাটাস'-এর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হন, তাঁর সেই ক্ষোভের প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯২৯ সালে রংপুরে বঙ্গীয় যুবসম্মিলনীর সভাপতির আসন থেকে প্রদত্ত ভাষণে ('তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধ দ্রঃ)। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার জন্যই কংগ্রেসের একজন হয়েও তার মত ও পথকে অনেক সময় তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারেননি। নানা বিপ্লবীসংস্থার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

তার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি নিজেই বলেছেন—'দেখ, সন্ত্রাস-মূলক আন্দোলনকে আমি সমর্থন করি না সত্য, কিন্তু তবুও কি এই বিপ্লবীদের উপর আমার একটু সহানুভূতি আছে। আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য যে যে-পথেই কাজ করুক-না-কেন, আমি সকলকেই শ্রদ্ধা করি। সেই জন্যই আমি এঁদের খোঁজ-খবরও রাখি এবং নিজের সাধ্যমত কিছু কিছু সাহায্যও করে থাকি।'৫১ গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও তিনি অনেকক্ষেত্রে গান্ধীজীর বিরোধিতা করেছেন। স্বরাজলাভে চরকা-কাটার কার্যকারিতায় তিনি আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। এ-সম্বন্ধে তিনি গান্ধীজীকে বলেছিলেন,—I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers, and not by spiders.'

অহেতুক রক্তপাতে তাঁর অনীহা ছিল, কিন্তু প্রয়োজনে হিংসার পথ অবলম্বনেও তাঁর দ্বিধা ছিল না। চৌরীচৌরায় সত্যাগ্রহীরা সিপাহীদের আক্রমণ করলে রক্তপাত ঘটে এবং তাতে গান্ধীজী ও তাঁর অহিংসনীতিতে পুরোপুরি আস্থাবান অনুগামীরা দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন ('বারদৌলী হল্ট')। শরৎচন্দ্র গান্ধীজীর ঐ সিদ্ধান্তকে ভুল ও চরম ক্ষতিকর বলে মন্তব্য করেছিলেন। 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধে তাই তাঁকে বলতে শুনি—'কোথায় কোন এক অজানা পল্লী চৌরিচৌরায় হলো রক্তপাত, মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ করে। দেশের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আকাশ কুসুমের মত এক মুহূর্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল।'৫২ ১৯২৭ সালে মান্দালয় জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সম্বর্ধনা জানানোর ব্যাপারেও তিনি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং নিজেই হাওড়ায় এক সভার আয়োজন করে তাঁদের সম্বর্ধিত করতে গিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন—'কংগ্রেসের কাজ করতে করতে যারা ধরা পড়লো, রাজবন্দী হল, আজ কংগ্রেস তাদের বরণ করবে না কেন? সম্বর্ধনা জানাবে না কেন? গভর্ণমেন্ট তাদের রেভেলিউশনারি বলেছে বলে?... গভর্ণমেন্ট কি হবে আমাদের conscience keeper? আমাদের

নীতিবুদ্ধি কি আমরা identify করব গভর্ণমেন্টের নীতিবুদ্ধির সঙ্গে? By no means, we must receive them and congratulate them openly and wholeheartedly.' ৫৩ বস্তুতঃ কংগ্রেসের ইংরেজ-তোষণ-নীতি ও আপোষকামী মনোভাব শরৎচন্দ্র কোনোদিন পছন্দ করেননি।

দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের ঈপ্সিত রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল দেশের পূর্ণস্বাধীনতা লাভ—এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পন্থা পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে – এই বাস্তব দিকটিও তাঁর দৃষ্টিতে স্বচ্ছ ছিল। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র অহিংস আন্দোলনের ভয়েই স্বাধীনতা দিয়ে চলে যাবে—এ অসম্ভব চিন্তা তাঁর মনে কোনোদিন প্রশ্রয় পায়নি। তিনি জানতেন, – 'স্বাধীনতা শুধু কেবল একটা নাম মাত্র ত নয়। দাতার দক্ষিণ হস্তের দানেই ত একে ভিক্ষের মত পাওয়া যায় না,—এর মূল্য দিতে হয়।' ('তরুণের বিদ্রোহ' দ্রঃ) আর এর মূল্য দিতে পারে দেশের যুবশক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, এমন কি তাঁদের অর্থ, অস্ত্র শস্ত্র দিয়েও সাহায্য করতেন। কিন্তু বিপ্লবের নামে অসহিষ্ণু আবেগসর্বস্বতা সম্পর্কে তিনি তরুণ-সমাজকে সতর্ক করে বলেছিলেন, '… ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়,… নইলে অসহিষ্ণু অভিলাষ ও কল্পনার আতিশয্যে তোমাদের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দেবে না।… যারা মনে করে জগতে আর সব কিছুরই আয়োজনের প্রয়োজন, শুধু বিপ্লবেরই কিছু চাই না—ওটা শুরু করে দিলেই চলে যায়, তারা আর যত-কিছুই জানুক, বিপ্লব-তত্ত্বের কোন সংবাদই জানে না' (তরুণের বিদ্রোহ)। এই মন্তব্যে অন্তত এটুকু স্পষ্ট যে, বিপ্লবতত্ত্ব সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের যথেষ্ট ঔৎসুক্য ছিল এবং বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর সমর্থন নিছক ভাবাবেগপ্রসূত নয়। অহিংস পন্থায় শরৎচন্দ্রের আপত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি বলতে দ্বিধা করেননি,—'নিরুপদ্রব শান্তির জন্যই বা এত ব্যাকুল হওয়া কেন?… ইংরাজ নিরুপদ্রব পথে রাজ্য স্থাপন করে নাই, এবং রক্তপাতেও সংকোচবোধ করে নাই, তখন আমাদেরই শুধু

নিরুপদ্রবপন্থী থাকিতে হইবে এত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করি কিসের জন্য ?' ('মহাত্মাজী' প্রবন্ধ)।

সমাজ-বিপ্লবের সাফল্য যে উপযুক্ত বাস্তব পরিস্থিতি, শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী রণকৌশল পরিবর্তনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল শরৎচন্দ্র তা বুঝেছিলেন এবং এর জন্যই বিপ্লবীদের সহিষ্ণুতা ও প্রাক্-প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন। তিনি লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' বা বিপ্লব-সম্বন্ধীয় অন্য কোন গ্রন্থ পড়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই, তবে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে কিছু মার্কসীয় সাহিত্য, লেনিন-সম্পর্কিত গ্রন্থ ও ট্রটস্কীর কিছু রচনা যে ছিল—তা জানা গেছে।৫৪ জাতীয় কংগ্রেসের মুখপাত্র গান্ধীজী যে ভারতীয় ধনিক-বণিকদেরই স্বার্থরক্ষক এই উক্তি একজন গান্ধীভক্তের পক্ষে গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে স্বীকৃতি পেয়েছে : 'তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজম্‌কে, তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে ? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলেনা' ('বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ)।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমাজের কোন্ কোন্ শ্রেণীর ভূমিকার উপর তিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতেন ? আমাদের মনে হয়, শরৎচন্দ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৯২৪ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্মেলনের প্রাক্-পর্বে তিনি দেশবন্ধুকে বলেছিলেন—'অসহযোগ আন্দোলনের সার্থকতা তো জনসাধারণ, অর্থাৎ 'মাস'-এর জন্য ? কিন্তু ঐ 'মাস' পদার্থটির প্রতি আমার অতিরিক্ত শ্রদ্ধা নেই। একদিনের উত্তেজনায় এরা হঠাৎ কিছু একটা করে ফেলতেও পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের সহিষ্ণুতা এদের নেই। সেবার দলে দলে এরা জেলে গিয়েছিল, কিন্তু দলে দলে ক্ষমা চেয়ে ফিরেও এসেছিল। যারা আসেনি, তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা। তাই আমার সমস্ত আবেদন-নিবেদন এদের কাছে। ত্যাগের দ্বারা কেউ কোনদিন যদি দেশ স্বাধীন করতে পারে তো, শুধু এরাই পারবে।'৫৫ এর পূর্বে ১৯২২ সালে হাওড়া

জেলা-কংগ্রেস-কমিটির সভাপতির পদ পরিত্যাগের সময় মন্তব্য করেছিলেন :‘…আর জনসাধারণ? সে তো সর্বথা ভদ্রলোকেরই অনুগমন করে।’ (‘আমার কথা’ প্রবন্ধ) প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃত্ব বরাবর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দিয়ে এসেছিল। এই বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই শরৎচন্দ্র তাদের উপর বেশী আস্থা রেখেছিলেন বলে মনে হয়।

‘পথের দাবী’তে ফয়ের মাঠের শ্রমিক-সভায় রামদাস তলোয়ারকারের মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলিয়েছেন, ‘ভাই বঞ্চিতের দল! তোমাদের কাছে আমার মিনতি—আমাদের তোমরা অবিশ্বাস করো না! শিক্ষিত বলে, ভদ্রবংশের বলে, কারখানায় দিনমজুরি করিনে বলে আমাদের সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের সর্বনাশ তোমরা নিজেরাই করো না। তোমাদের ঘুম ভাঙ্গাবার প্রথম শঙ্খধ্বনি সর্বদেশে সর্বকালে আমরাই করে এসেছি।’ (১৭ পরিঃ) আবার ডাক্তার ওরফে সব্যসাচীর উক্তি—‘আমার কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র-সন্তানদের নিয়ে।’ (২৬ পরিঃ) এইসব ক্ষেত্রে দেশবন্ধুর কাছে শরৎচন্দ্রের উক্ত বক্তব্যের প্রতিধ্বনিই যেন শুনতে পাই। রামদাস তলোয়ারকারের কথা – ‘তোমাদের ঘুম ভাঙ্গাবার প্রথম শঙ্খধ্বনি সর্বদেশে সর্বকালে আমরাই করে এসেছি’—আসলে স্রষ্টা শরৎচন্দ্রেরই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমাজ-বিপ্লবের সূচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। একথা ঠিক যে, শরৎচন্দ্র কংগ্রেস-নেতৃত্বের অনেকের চেয়ে প্রগতিশীল এবং সংগ্রামী চেতনার অধিকারী; তবু জনগণ বা ‘মাস’-এর প্রতি তাঁর তির্যক মনোভঙ্গীতে বোঝা যায় যে, তিনিও শ্রেণীচেতনার ঊর্ধে উঠতে পারেন নি, হয়ত সম্ভবও ছিল না।

এরপর সমাজ-বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীকেই তিনি গুরুত্ব দান করতেন। ভারতবর্ষে শিল্পোন্নয়নের গতি খুব মন্থর হলেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সামন্ত-শোষণের ফলে ভূমিহীন কৃষক-সম্প্রদায় ও ক্ষেতমজুররাই জীবিকার জন্য কলেকারখানায় এসে শ্রমিক-শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। ‘মহেশ’ গল্পের গফুর চরিত্র সেই

ইতিহাস-সত্যের ইঙ্গিতবহ। রুশবিপ্লবের ইতিহাস শরৎচন্দ্র অবগত ছিলেন। সেখানকার শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা জেনে ও ভারতে বোম্বাইয়ের সূতাকল-শ্রমিকদের 'রাওলাত বিলের' বিরুদ্ধে ধর্মঘটে (১৯১৯) অংশগ্রহণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে শরৎচন্দ্র তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাসে শ্রমিক আন্দোলনে যথার্থই সমর্থন জানিয়েছিলেন। এর পূর্বে ১৯২০ সালে সারা-ভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। ১৯২৫ সালে কলকাতায় 'ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টি'র উদ্ভব। এই সব ঘটনা নিঃসন্দেহে শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি নিজেও হাওড়া পৌরসভার ধাঙড়দের ধর্মঘট সমর্থন করেন, এমনকি এর জন্য জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদও ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তবে কৃষকসমাজের সংগ্রামশীল ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। বিভিন্ন উপন্যাসে অবশ্য (পল্লীসমাজ, দেনাপাওনা, জাগরণ) নিপীড়িত কৃষকশ্রেণীর প্রতিরোধের চিত্র আছে। তবু 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর মুখে যখন শুনি—'নিরীহ চাষাভুষোর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই, ভারতী, কোনো দেশেই তারা স্বাধীনতার কাজে যোগ দেয় না। বরঞ্চ বাধা দেয়। তাদের উত্তেজিত করার মত পণ্ডশ্রমের সময় নেই আমার।... তারা স্বাধীনতা চায় না, যে শান্তি অক্ষম, অশক্তের—সেই পঙ্গুর জড়ত্বই তাদের ঢের বেশি কামনার বস্তু।' (২৬ পরিঃ)—তখন মনে হয় যে, শরৎচন্দ্র বোধ হয় সমকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্যায়ে কৃষক সম্প্রদায়কে সহায়ক শক্তি হিসেবে পাওয়ার আশা ত্যাগ করেছিলেন। কৃষকসমাজের কথা অবশ্য বাদ দেননি। শশী-কবির উক্তি—'এ উপদেশও কখনো ভুলব না যে, আইডিয়ার জন্য সর্বস্ব দিতে পারে শুধু শিক্ষিত ভদ্রসন্তান, অশিক্ষিত কৃষকেরা পারে না'... তখন সব্যসাচী (ডাক্তার) বলেছে—'কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয় কবি, মানবের গতি এইখানেই নিশ্চয় হয়ে থাকবে না। কৃষকের দিনও একদিন আসবে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ-অকল্যাণের ভার সমর্পণ করতে হবে।' (৩১ পরিঃ) সুতরাং কৃষকদের সংগ্রামী ভূমিকার দিকেও শরৎচন্দ্রের

লক্ষ্য ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে দেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করাই ছিল তাঁর আশু লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে যে শক্তি সমকালীন সমাজে অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে সামিল হতে পারে বলে তাঁর মনে হয়েছে—তাদের সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শ্রমিক-কৃষক যুগ্ম-আন্দোলনের উপর মার্কস্-এঙ্গেলস্ জোর দিয়েছেন। 'ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম, ১৮৪৮ হতে ১৮৫০' গ্রন্থে মার্কস্ ফরাসী দেশে ১৮৪৮ সালে বিপ্লবের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—'বিপ্লবের গতিপ্রবাহ প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যবর্তী জাতির অধিকাংশ জনসমষ্টিকে, কৃষক ও পেতি-বুর্জোয়াকে, যতদিন পর্যন্ত ঐ সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে উত্থিত না করে তুলছে এবং তাদের মুখপাত্রস্বরূপ প্রলে-তারিয়েতের সঙ্গে তাদের সংযুক্ত হতে বাধা না করছে, ততদিন ফরাসী শ্রমিকেরা এক পা ও অগ্রসর হতে পারে না, বুর্জোয়া-ব্যবস্থার কেশ স্পর্শ করতে পারে না।' অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিপ্লবের স্তরভেদে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর রূপও বদলায়। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে ও বিপ্লবের গণতান্ত্রিক স্তরে শ্রমিকশ্রেণীকে মৈত্রী স্থাপন করতে হবে ধনী, মাঝারী, গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর—সকল শ্রেণীর কৃষকের সঙ্গে।

শ্রমিক-সংগঠন ও শ্রমিক-অন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গড়ে তোলার ব্যাপারে কোন প্রয়াস শরৎ-সাহিত্যে লক্ষিত হয় না। এর কারণ কি হতে পারে—তা নিরূপণ করার প্রয়াসী না হয়ে এড়িয়ে যাওয়া সমীচীন বলে মনে করি না। উপরে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর গুরুত্ব সম্পর্কে তত্ত্বগত দিকের যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, হয়ত তা যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে ঠিকভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ শরৎচন্দ্রের ছিল না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বৃহত্তর বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে যে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল, সে-কথা তো শরৎচন্দ্রের অজানা থাকার কথা নয়। ঐ পর্বের বাংলার কৃষক বিদ্রোহের কিছু তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে ৫৬ :-

ক) দীর্ঘ প্রায় ৪০ বৎসর ধরে (১৭৬০-১৮০০) রংপুর, রাজসাহী, বগুড়া, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় কৃষকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় সন্ন্যাসী ও ফকির-বিদ্রোহ হয়।

খ) ১৭৮২-৮৩ সালে ইজারাদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরের কৃষকেরা বিদ্রোহ করে।

গ) ১৭৮৫ সালে বাঁকুড়ায় জঙ্গী কৃষকেরা কোম্পানীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে।

ঘ) ১৭৮৯-৮১ সালে ইংরেজ শাসন ও স্থানীয় জমিদারদের মিলিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে বীরভুম ও বাঁকুড়ার কৃষকেবা ব্যাপক বিদ্রোহ করে এবং কোম্পানীর কুঠি ও জমিদারদের গোলা লুণ্ঠন করে।

ঙ) ১৭৯৯-এর চোয়াড় বিদ্রোহ (বাঁকুড়া, বীরভুম), ১৮০৬-১৬ সালে 'বগড়ীর নায়েক বিদ্রোহ' (মেদিনীপুরে সশস্ত্র বিদ্রোহ), ১৮২১-এর হাজং বিদ্রোহ (সুসং পরগণা), ১৮৩১-এর ওয়াহাবী আন্দোলন (বারাসত সহরকে কেন্দ্র করে মুসলমান কৃষকদের বিদ্রোহ), ১৮৩৮-৪৭ সালের ফরাজী আন্দোলন (ফরিদপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের আন্দালন), ১৮৬০-এর নীল বিদ্রোহ, ১৮৬১ সালে সুন্দরবন অঞ্চলে রহিমউল্লার নেতৃত্বে কৃষকদের ডেনিস হেলির অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ, ১৮৭২-৭৩ সালে পাবনা ও বগুড়ার কৃষক বিদ্রোহ, ১৮৪৪ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরার কুকি বিদ্রোহ ইত্যাদি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলার কৃষকেরা বিভিন্ন সময় সংগঠিতভাবে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল।

বিংশ শতাব্দীতেও যখন শরৎচন্দ্র সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে যখন বিদগ্ধ এবং বর্মা থেকে ফিরে কলকাতায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যসাধনায় মগ্ন, তখনও দেশের বিভিন্নস্থানে কৃষকেরা যে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন তার প্রমাণ পাই ১৯১৭-১৮ সালে চম্পারণে (বিহার) নীলচাষীদের আন্দোলন, ১৯২০-২২ সালে তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর জেলায় ও

চৌরিচৌরায় জমিদারী জুলুমের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ আন্দোলনে; এমনকি ১৯২৮ সালে বারদৌলিতে (গুজরাট ভূমিকর-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেস যে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করে তা কৃষকদেরই সক্রিয়তায় সার্থক হয়েছিল। ৫৭ পরবর্তীকালে আরও অনেক কৃষক-আন্দোলন হয়েছে—যা স্বাধীনতা-সংগ্রামকেই নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করেছে। কৃষকশ্রেণীর মধ্যে এই ধরনের প্রতিরোধ-স্পৃহা ও তাদের সংগ্রামী ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই দেশের স্বাধীনতা ও কৃষকের মুক্তির জন্য রাজনৈতিক চেতনা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে তাদের ভূমিবিপ্লব ও কৃষিবিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই ১৯৩৬ সালে ১১ই এপ্রিল 'সারা ভারত কৃষক সভা' গঠিত হয় এবং ১৯৩৭ সালের ২৭শে মার্চ গড়ে ওঠে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'। এই সব ঘটনা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র অবহিত ছিলেন না—তা অচিন্তনীয়। তবে কৃষক-সমস্যা তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেও কৃষকদের সংগ্রামী ভূমিকার প্রতি ক্ষেত্রবিশেষে উপ্সা প্রকাশ করলেন কেন? অথচ ব্যক্তিজীবনে যে শরৎচন্দ্র নিজে কৃষকদের বহু সংগ্রামের সাথী ছিলেন, তাদের দুঃখে-শোকে, আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তার প্রমাণও প্রচুর। এই প্রসঙ্গে সামতাবেড়ের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদার মোহিনী ঘোষালের শিবোত্তর জমি দখলের ঘটনায় কৃষকদের পক্ষে শরৎচন্দ্রের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই সময় শরৎচন্দ্র এক পত্রে লিখেছিলেন, ৫৮—'বড় জমিদারের কাছে পার আছে, কিন্তু স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র পত্তনীদারের চাপ দুর্বিষহ। ২/৪ বিঘে ছিল বহুকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান, কিন্তু ২/৪ বছরের নতুন পত্তনীদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো,—লেগে গেলাম। খবর দিলাম যে আমি হাতে নিলে তা ছাড়িনে। তার পরে ফৌজদারী।' তাঁর ব্যক্তিজীবনের এইসব অভিজ্ঞতাই হয়ত 'পল্লীসমাজে'র রমেশ ও 'দেনাপাওনা'য় ষোড়শী চরিত্রের মধ্যে কৃষক-আন্দোলনের পক্ষ-অবলম্বনে শক্তি সঞ্চার করেছে। কৃষক-প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের জন্য 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে বৃন্দাবন ও তার বন্ধু কেশবের প্রয়াসে

শিল্পীর সচেতন মানস-প্রতিফলন সুস্পষ্ট। অবশ্য তিনি শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর চিন্তায় পৌঁছতে পারেন নি। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী যে খুব স্বচ্ছ ছিল না – সে-অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নয়। শ্রমিক ও কৃষক উভয় শ্রেণীর সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ও সহানুভূতিশীল ছিলেন, শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলায় উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু উভয় শ্রেণীর মৈত্রীবন্ধনের গুরুত্ব আদৌ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। এইখানে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনার সীমা-বদ্ধতা স্পষ্ট।

দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে পুরুষের সংগ্রামের সাথী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণও অপরিহার্য। তিনি সেবিষয়ে সচেতন ছিলেন। এবিষয়ে ঐতিহাসিকের সাক্ষ্য— 'স্বদেশী-আন্দোলনের সূচনাতেই নারীসমাজ এই আন্দোলনে বিশেষভাবে রসদ জোগাইতে লাগিয়া গেলেন। তখনও কিন্তু প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে নারীর যোগদান তেমন শুরু হয় নাই। ঐ সময় তাঁরা প্রধানতঃ নিজ নিজ গৃহে, মহল্লায় বা পল্লীতে সমবেত হইয়া স্বদেশী-দ্রব্য প্রচলনের সংকল্প গ্রহণ করিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার জেমো-কান্দীতে এই দিনে (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫) পাঁচ শতাধিক মহিলা আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর ভবনে সমবেত হইয়া তাঁহার রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' শ্রবণ করেন এবং অরন্ধন পালন দ্বারা প্রত্যেকে স্বদেশী গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কলিকাতায় এবং বঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ও নারীগণ পুরুষের সঙ্গে সমভাবে স্বদেশীব্রত পালনে উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন।' ৫৯ ১৯০৯–১০ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জেমস ম্যাকডোনাল্ড সস্ত্রীক ভারত পর্যটনে এলে ম্যাকডোনাল্ড-পত্নী বঙ্গদেশে নারীদের অবস্থা ও তাঁদের রাষ্ট্রচেতনা সম্পর্কে রচিত একটি প্রবন্ধে লেখেন—

'... One feels there is a tremendous movement going on amongst the women .. This movement seems to be spreading as much amongst the women as amongst the men...... The women are craving for education, and to take some part in

the movement of affairs. Take for instance the Swadeshi Movement. This could not have succeeded in the way it has done without women.' ৬০ (The Modern Review for August, 1910)

শরৎচন্দ্রও দেশবন্ধুর সহায়তায় কলকাতায় 'নারীকর্ম-মন্দির' নামে একটি নারীসমিতিকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ৬১ তাঁর 'স্বরাজ-সাধনায় নারী' প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'পথের দাবী'তে অপূর্ব সুমিত্রাকে বলেছে যে, দেশের সেবা করার অধিকার স্ত্রী-পুরুষের সমান হলেও উভয়ের কার্য-ক্ষেত্র এক হওয়া উচিত নয়, 'নারী গৃহের মধ্যে; শুদ্ধান্তপুরে স্বামী-পুত্রের সেবার মধ্য দিয়েই' সার্থকতা লাভ করতে পারে, বাইরে পুরুষের সঙ্গে ভিড় করলে কোন কাজ হবে না। সুমিত্রা তার উত্তরে বলেছে—'অপূর্ববাবু,··· এর মধ্যে এতটুকু সত্য নেই।··· যাকে আপনি নারীর বাইরে এসে ভিড় করা বলছেন, সে যদি কখনো ঘটে, তখনি দেশের কাজ হবে, নইলে পুরুষের ভিড়ে শুকনো বালির মত সমস্ত ঝরে ঝরে পড়বে, কোনদিন জমাট বাঁধবে না।' সুমিত্রার এই উক্তি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মতেরই প্রতিফলন। পূর্বে উল্লিখিত 'স্বরাজ সাধনায় নারী' এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ ছাড়া ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে একবার শরৎচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন—'অনেক পণ্ডিত বলেন, মেয়েরা কঠিন কাজে পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে না। 'কনষ্টিটিউশনালি তারা নাকি 'আনফিট'। আচ্ছা, এতবড় একটা বানানো কথা সত্য বলে তোমরা মানতে চাও? মেয়েদের ঘোমটা পরিয়ে হেঁসেলে ঢুকিয়ে রেখে মূর্খ নারীকে হঠাৎ একদিন বার করলে পথ চলতে। বন্ধুর পথে পারলো না সে তোমার সঙ্গে একই তালে পা ফেলতে, তখন তুমি ফতোয়া দিয়ে দিলে—মেয়েরা কঠিন কাজ পারবেনা, তারা 'কনষ্টিটিউশনালি আনফিট'।' ৬২ নারী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এই ধরণের বিরূপ মনোভাবকে তিনি সমাজে পুরুষের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার অপকৌশল বলে মনে

করতেন। তাই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক শরৎচন্দ্র পথের-দাবী সংগঠনের সভানেত্রী হিসেবে সুমিত্রাকে চিত্রিত করে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীর ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অবশ্য একথাও ঠিক যে, সুমিত্রা ও ভারতী প্রকৃতির দিক থেকে অনেকাংশে রোমান্টিক।

শরৎচন্দ্রের শিক্ষাভাবনা যেহেতু রাজনীতিসম্পৃক্ত এবং এই ভাবনা তাঁর মনে উদ্রিক্ত হয় এক বিশেষ বিতর্কমূলক ঐতিহাসিক পটভূমিকায়—তাই সে-সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা দরকার। জাতীয় আন্দোলনের এক বিশেষ স্তরে অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গহিসেবে গান্ধীজী সরকারী স্কুল-কলেজ ও ইংরেজী শিক্ষা বর্জনের আহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর এই চিন্তাধারার বিরোধিতায় 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি রচনা করে কলকাতার এক জনসভায় (১৫ই আগষ্ট ১৯২১) পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উগ্র স্বাদেশিকতার সংকীর্ণতা ও ছুঁৎমার্গী-স্বভাব পরিহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ভারতের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের উপলব্ধির জন্যই যে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আয়ত্তীকরণ অপরিহার্য—একথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ঐ একই রচনায় পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নিষ্ঠুর বীভৎস স্বরূপটিকেও উদ্ঘাটন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন অনেকেই কবির ঐ প্রবন্ধের বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রও ঐ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধের প্রতিবাদে, গান্ধীজীর আহ্বানের সপক্ষে 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধটি রচনা করেন। কয়েকদিন পর প্রবন্ধটি গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে (১৩২৮) পাঠ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের শিক্ষাভাবনায় মৌলিক কোন পার্থক্য নেই, উভয়েই পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। পার্থক্য যে-টুকু, তা মূলতঃ শিক্ষাদান পদ্ধতিসম্পর্কিত। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় তত্ত্বগত দিকটি প্রধান, আবার তা আন্তর্জাতিক ভাবনায় সমৃদ্ধ; পক্ষান্তরে শরৎচন্দ্র এটিকে বিচার করেছেন অত্যন্ত আটপৌরে পদ্ধতিতে জাতির ব্যবহারিক প্রয়োজনের দৃষ্টি-

ভঙ্গী নিয়ে। প্রবন্ধটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

—'কি পদার্থ বিদ্যা, কি রসায়নশাস্ত্র, কি ধনবিজ্ঞান-এ সকল পশ্চিমি বিদ্যে শেখবার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করছে? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যার উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভান করার ওপর, শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের ওপর।……'

'বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই, আর কারও নয়—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি নিজের সর্বনাশের জন্যেই তৈরি করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে।'

'বিদ্যার জাত নেই একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে culture জিনিষটারও জাত নেই একথা কিছুতেই সত্য নয়।'

'বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়; শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দুটো আলাদা জিনিষ। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জন করা নয়। এমনও হতে পারে বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতঃদৃষ্টিতে কথাটা উল্‌টো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়।'

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু তিনি এটা বুঝেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পিত শিক্ষা-পরিকল্পনা মূলতঃ তাদেরই স্বার্থবহ এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজ-নীতির তারতম্য-হেতু শিক্ষার উদ্দেশ্যও তাই পৃথক। তিনি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে শিক্ষাকে মিলিয়ে দেখেছিলেন। তাই ছাত্রদের রাজনীতিক কর্তব্য সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন,—'ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যা-বস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেবার দেশের স্বাধীনতা—পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে।… বয়স কখনও দেশের

ডাক থেকে কাউকে আটক রাখতে পারে না।······একজামিনে পাস করা দরকার – এ তার চেয়েও বড় দরকার।' ৬৩

এতক্ষণের আলোচনা থেকে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনার যে-স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হল তা সংক্ষেপে সূত্রাকারে এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে—

১) ১৯২১ সালে দেশবন্ধুর আহ্বানে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে শরৎচন্দ্র প্রথমাবধি বামপন্থী অংশের সঙ্গেই ছিলেন, এবং গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও তাঁর কর্মনীতির অনেক কিছুই গ্রহণ করেন নি। স্বরাজ-লাভে গান্ধীজীর চরকা-নীতিকে তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না।

২) স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা, এবং সেজন্য হিংসাত্মক বৈপ্লবিক কার্যক্রমেও তাঁর উৎসাহ ছিল। কংগ্রেসের আপোষকামী মনোভাব তাঁর কাছে ছিল অসহ্য।

৩) সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপ যেমন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষা-নীতির স্বরূপও তিনি উদ্ঘাটন করেছিলেন। সেদিনের ভারতের মূল দ্বন্দ্ব যে কি—তাও তাঁর অগোচর ছিল না। তাই শ্রেণী-সংগ্রাম কি রূপ নেবে, জন-গণের সংগ্রামের নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে, সেই সংগ্রামের সহায়ক শক্তি কারা—সে-সম্পর্কেও তিনি চিন্তা করতেন, যদিও তাঁর চিন্তায় সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা ছিল বলে মনে হতে পারে।

৪) শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক সংগঠন যে দেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রস্তুতিক্ষেত্র—তাও শরৎচন্দ্র স্পষ্ট অনুধাবন করেছিলেন। এর সঙ্গে ছাত্র ও মহিলাদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে তিনি মনে করতেন। কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে দেশের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গেও তিনি সহযোগিতা করতেন। তবে তিনি কৃষকসমাজের ভূমিকার উপর তেমন গুরুত্ব দেন নি, যদিও অন্যান্য কিছু উপন্যাসে কৃষকশ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমে

তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের চিত্র তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে জনৈক সমালোচকের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এই পর্বের উপসংহারে বলা যায়ঃ

'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক মতবাদের ভিতর স্বদেশীযুগের বীরপন্থী ক্ষাত্রতেজের প্রকাশ তাই অতি সুস্পষ্ট। তাঁর লেখনী-মুখে স্বদেশীযুগের এই বীরবাণী অনবদ্যভাবে রূপলাভ করেছে। অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন শরৎচন্দ্রের শিল্পীমানসকে-উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি; তার কারণ তিনি ছিলেন বাংলার সংস্কৃতির ও রাজনৈতিক ধারার বাহক ও উপাসক।' ৬৪

চার

॥ পথের দাবী (১৯২৬) ॥

'পথের দাবী' শরৎচন্দ্রের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার শ্রেষ্ঠ দলিল। সমালোচকের মতে 'পথের দাবী নামকরণের মধ্যে শরৎ-চন্দ্রের জীবনবেদের সংক্ষিপ্তসার রহিয়াছে। পথের দাবীর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানিয়া লইতে হইবে। প্রাচীন আচার বা সামাজিক নিয়ম এই অধিকারকে মানিয়া লইতে চাহে না বলিয়াই তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রয়োজন ...' ৬৫। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়ে'র মতই 'পথের দাবী'ও সমাজে আলোড়ন-সৃষ্টি-কারী উপন্যাস; অবশ্য 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাস, পথের দাবীর (১৯২৬) অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র দেশে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের পর্বে জাতীয়ভাবনার স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন 'আনন্দমঠে'। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বিপ্লবী আন্দোলনের 'বিভীষিকাময় পন্থার' তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন 'চার অধ্যায়ে'। এই দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে শরৎচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের উপযোগী বৈপ্লবিক পন্থার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন পথের দাবীতে। তাই এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের (১৭ই ভাদ্র ১৩৩৩, ৩১শে আগষ্ট, ১৯২৫) সঙ্গে সঙ্গে রাজ-

দ্রোহাত্মক অপরাধে ব্রিটিশসরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। বাজেয়াপ্ত করার সরকারী নির্দেশ-নামায় বলা হয়েছিল— '...... the said book contains words which bring or attempt to bring into hatred or contempt and excite disaffection towards the Government established by law in British India, the publication of which is punishable under section 124A of the Indian Penal Code.' ৬৬ শরৎচন্দ্রের বৈপ্লবিক চিন্তার বলিষ্ঠতা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে তাঁর আপোষহীন সংগ্রামী মনোভঙ্গীর প্রামাণ্য সাক্ষ্য হিসেবে উপরে উদ্ধৃত সরকারী ভাষ্যই যথেষ্ট। এ উপন্যাস একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকারের ভীতির কারণ, তেমনি ব্যাপকভাবে বাংলার যুব-সম্প্রদায়ের কাছে সংগ্রামের উদ্দীপনার উৎস হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার উক্তিতে তার প্রমাণ পাই ৬৭ – 'আমার পড়া শেষ হলে আরও কয়েকজন বন্ধু পড়েন। আমরা সবাই আলোচনা করি। সে সময় আমরা দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের মানসিক দৃঢ়তা বেড়েছিল।' 'পথের দাবী' রচনা করেই শরৎচন্দ্র শুধু ক্ষান্ত থাকেন নি; রবীন্দ্রনাথ যখন অনুরুদ্ধ হয়েও সরকারী বাজেয়াপ্তকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অস্বীকার করলেন, তখনও তিনি হতাশ হননি। বরং আরো বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। জীবন মাইতি, শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় ('শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' গ্রন্থের লেখক) প্রমুখকে বার্ণ কোম্পানী ও চটকলগুলির শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন। বঙ্কিম মুখার্জী, সন্তোষ মিত্র, পান্না মিত্র, সুধাংশু চৌধুরী, আব্দুল মোমিন প্রমুখ সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তায় বিশ্বাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে কোলকাতায় অক্রুর দত্ত লেনে এক অফিস খুললেন। এখান থেকেই বঙ্কিম মুখার্জীর সম্পাদনায় 'New light' নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়। 'পথের দাবী' প্রকাশের পর বিক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ-ও এর

প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,— '...বইখানি উত্তেজক।... তুমি যদি কাগজে রাজ-বিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে-কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক-বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে।' ৬৮ রাজনৈতিক মননশীলতায় শরৎচন্দ্রের ঝোঁক সম্ভবতঃ সমাজবাদের দিকেই ছিল। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের সুষ্ঠু অধ্যয়ন ও অনুশীলনের উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখনও তৈরী হয়নি 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর গ্রামের বৈষ্ণবদের মঠে ডাকাতদলকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে জ্যেঠতুত দাদার শোচনীয় অবস্থার বর্ণনায় দেখি – সব্যসাচীর ঐ দাদা আহত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় সব্যসাচীকে (শৈলকে) বলেছিলেন '... রাজত্ব করার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটি প্রাণীও রাখেনি তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিস নে।' (১৮ পরিঃ) তাঁর মৃত্যুকালীন এই নির্দেশই সব্যসাচীর পরবর্তী জীবনে বিপ্লবের পথের পাথেয়, আর সেই সঙ্গে তার বুকে ছিল প্রচণ্ড ইংরেজ-বিদ্বেষ ও দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য অত্যুগ্র বাসনা। দেশের বিভিন্ন বিপ্লবীদের চরিত্র থেকে নেওয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সমন্বিতরূপ যে সব্যসাচী, সেটা সুবিদিত, ৬৯ কিন্তু এটা অস্বীকার করা যায় না যে, সব্যসাচীর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে তার স্রষ্টার মনের অভীপ্সা সুপ্রকাশিত। সেই অভীপ্সার মূল কথাটি হল দেশের ও দেশবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ।

শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক সংগঠনের সম্পর্কে বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম সুস্পষ্ট বক্তব্য উচ্চারিত হল। রুশ-বিপ্লবের পর ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যখন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদের অনুপ্রবেশের প্রতিরোধে পৃথিবীর পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অতন্দ্রপ্রহরায় নিযুক্ত, যখন ভারতে বলশেভিজ্‌মের প্রচার ও প্রসার বন্ধে ব্রিটিশ সরকার কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪)

দায়ের করেছে, সেই পরিস্থিতিতে যে-কোন-ভাবে বৈপ্লবিক মতবাদের প্রচার নিঃসন্দেহে অসীম সাহসিকতা ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। দেশে যখন কমিউনিষ্ট আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিরও যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থা—দেশের এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সাহিত্যের মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজ-বিপ্লবের তাৎপর্য তুলে ধরার জন্যই শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী কথাশিল্পী রূপে অভিনন্দনযোগ্য। পথের দাবীর ঐতিহাসিক মূল্যও সেই দৃষ্টিকোন থেকে বিচার্য। সব্যসাচীসহ সমস্ত চরিত্র-গুলির আবেগ-আতিশয্য, উপন্যাসের মধ্যে বিপ্লবীদের পরিকল্পিত কার্যক্রমের প্রয়োগ-প্রচেষ্টার অভাব ও পরিণামে 'পথের দাবী' সংগঠনের অবলুপ্তি হয়ত ত্রুটি হিসেবে সমালোচিত হতে পারে, তবু এর মধ্যে প্রতিফলিত লেখকের অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয়-মুক্তির সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করা চলে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপকে নগ্নভাবে তুলে ধরে একদিকে যেমন তিনি দেশবাসীর মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদ্রেক করেছেন, তেমনি স্বাধীনতা যোদ্ধাদের কোন্ পথে চলতে হবে তার নির্দেশও দিয়েছেন।

এখন 'পথের দাবী'তে উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রশ্নগুলির বাস্তব-ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। লেখক উপন্যাসের মধ্যে ঐ প্রশ্নগুলির উত্থাপন ও বিশ্লেষণ করেছেন মূলতঃ সুব্যসাচী ওরফে ডাক্তারের সংলাপের মধ্য দিয়ে। ভারত বহুদিন ধরে বহু জাতির শাসন-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের মত নিষ্ঠুর মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী শোষণ আর কোনদিন ভারতবাসীর ভাগ্যে জোটেনি। ভারতে মুসলমানদের শাসনের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের তুলনা প্রসঙ্গে সব্যসাচী তাই বলেছে— '…আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানের হাতেও এদেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এতবড় পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা, এই এদের মূলধন।' (১৮ পরিঃ)

…'লজ্জাহীন উলঙ্গ স্বার্থ এবং পশুশক্তির একান্ত প্রাধান্যই

এর মূলমন্ত্র। সভ্যতার নাম দিয়ে তুর্বল, অক্ষমের বিরুদ্ধে এতবড় মুষল মানুষের বুদ্ধি আর ইতিপূর্বে আবিষ্কার করেনি। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখ, ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা কোন তুর্বল জাতিই আজ আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি।' (২৬ পরিঃ) এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বীভৎস বিশ্বগ্রাসী রূপটি পুরোপুরি যে ধরা পড়েছিল—তা প্রকাশ পেয়েছে। আর ঐ শোষণই যে ভারতবাসীর নৈতিক ও অর্থনৈতিক তুরবস্থার কারণ—তাও তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তাই 'ডোমিনিয়ন স্টাটাস'-এর পরিবর্তে পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই কামনা করেছিলেন। আর কংগ্রেস-পরিচালিত আবেদন নিবেদন-ভিত্তিক আন্দোলনের গতানুগতিকতায় যে সে-স্বাধীনতা লাভ করা যায় না তাও তিনি সব্যসাচীকে দিয়ে বলিয়েছেন—'ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই'···স্বাধীনতা স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কার্য, আনন্দ এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই ত স্বাধীনতা,··· তার চেয়ে বড় গৌরব মানবজন্মের আর নেই।' (২৬ পরিঃ)

'··· বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তাঁরা চান, তার কতটুকু আসল, কতটুকু মেকী··· তার কিছুই আমি জানিনে। বিদেশী গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙ্গিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেছি, আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দেমাতরমের দিব্যি করে বলছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব।···এযে কি প্রার্থনা, এবং কি এর স্বরূপ সে আমার বুদ্ধির অতীত।' (৩১ পরিঃ) এই শেষের উদ্ধৃতিটিতে আপোষকামী আন্দোলনের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্লেষাত্মক কটাক্ষ লক্ষণীয়। তিনি পূর্ণস্বাধীনতার পরিবর্তে শাসনসংস্কারের পক্ষপাতী আদৌ ছিলেন না, কারণ 'সংস্কার মানে মেরামত—উচ্ছেদ নয়। গুরুভারে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ হয়ে উঠেছে তাকেই সুসহ করা; যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে কৌশল বোধ

হয় তারই নাম শাসনসংস্কার।' (৩১ পরিঃ) ১৩৩৭ সালে চন্দননগরে প্রবর্তক-সংঘের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনাকালেও শরৎচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন—'পুরান জিনিসটার পোষাক বদলে নেওয়া আমি চাই না।' পথের দাবীতে বুঝিয়েছি—সংস্কার জিনিসটার মানে কি। ওটা ভাল কিছু নয়।··· যেমন গভর্ণমেন্টের শাসনসংস্কার-রিফর্মশ-আর একদল যারা রিভলিউশন চাইছে—রিভলিউশন মানে অন্য কিছু নয়, একটা আমূল পরিবর্তন। আমাদের বৃদ্ধের দল এটা চান না, তাঁরা চান রিফর্মস অর্থাৎ মেরামত করা। আমার মনে হয়—মেরামত করে জিনিসটা ভাল হয় না। যা আছে তারই পরমায়ু বাড়িয়ে তোলা হয়।'

দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে শরৎচন্দ্র ছিলেন একান্তভাবে বৈপ্লবিক পন্থার পক্ষপাতী, আর সেই বিপ্লব মানে শুধু 'কাটাকাটি রক্তারক্তি নয়। বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন।' (২৬ পরিঃ) তবে ঐ আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তির ধ্বংসসাধন ও সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার নব-রূপায়ণ। শোষকশ্রেণী আর শোষিতশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষও তাই তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে; কারণ 'মানুষের চলবার পথ মানুষে কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না।' (২৫ পরিঃ) যখন শোষকশ্রেণীর প্রচারিত 'শান্তির বাণী'র ধোঁকাবাজি নিরন্ন লাঞ্ছিত মানুষের কাছে ধরা পড়ে যায়, সব্যসাচী বলেছে যে, তখনই রাজশক্তি তার মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে অর্থবল, সৈন্যবল, অস্ত্রবল সব কিছু নিয়ে নিরন্ন মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেয়। তাই 'বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়, এই তার বর, এই তার অভিশাপ।' (২৫ পরিঃ) এই প্রসঙ্গে সব্যসাচী যে ফরাসী, হাংগেরি, রাশিয়ার বিপ্লবের উল্লেখ করেছে তা মূলতঃ শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক বিশ্ববীক্ষার নিদর্শন। 'মহামানবের মুক্তিসাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবার' (২৫ পরিঃ) যে-স্বপ্ন সব্যসাচী দেখেছিল তাও লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল শরৎচন্দ্রের অন্তরের কামনার বহিঃপ্রকাশ। যদিও এই প্রকাশভঙ্গী কিছুটা

রোমান্টিকতায় আপ্লুত, তবু তাঁর মানসপ্রবণতাটুকু এর মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রশক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে সব্যসাচীর সংলাপে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে-যুগে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে যুক্ত থেকেও শরৎচন্দ্রের এই উপলব্ধি নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। মার্কসীয় তত্ত্বে রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল না হলেও কিছুটা যে সঙ্গতিপূর্ণ তা বোধহয় বলা যায়। রাষ্ট্র যে শোষণের যন্ত্র, তা তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিলেন–আইন, আদালত সৈন্যসামন্ত সব কিছুই শোষকশ্রেণীর স্বার্থবহ। এই সত্য 'পথের দাবী'তে অপূর্ব তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছিল। অপূর্বর মা বলেছেন যে, স্বদেশীআমলে একবার অপূর্বর বিক্রমে তার বাবার চাকরি যাবার উপক্রম হয়েছিল, বর্মায় ষ্টেশনে অপূর্ব ফিরিঙ্গিদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিল, ষ্টেশনমাস্টারের কাছে আবেদন করেও সেখানে সে পেয়েছে তিরস্কার, বিনাদোষে ইংরেজের আদালতে তার কুড়িটাকা জরিমানা হয়েছে, ফয়ার-মাঠে পুলিশ শ্রমিকদের সভা পণ্ড করে দিয়েছে—এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির নৃশংসতা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবু অপূর্বর মধ্যে বিপ্লব সম্বন্ধে যে দ্বিধা তা মূলতঃ সেদিনের শিক্ষিত বিত্তবান বাঙালি যুবকের মানস–সংকট। আবার বুর্জোয়া মানবতাবাদী দেশপ্রেমিকদের বৈশিষ্ট্যও অপূর্বর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

দেশের স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক পন্থার নির্দেশ ছাড়াও ঐ বিপ্লবের মূলচালিকাশক্তি কারা শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে সেকথাও বলেছেন। সমাজবিপ্লবে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা যেভাবে তিনি নির্দেশ করেছেন—তা হয়ত বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী-সম্মত নয়, তবু বাংলা উপন্যাসে সমাজ-বিপ্লবে শ্রমিক-শ্রেণীর ভূমিকার তাৎপর্য শরৎচন্দ্রই প্রথম তুলে ধরলেন। ভারতী অপূর্বকে নিয়ে শ্রমিকদের বস্তিতে গেছে, সাধ্যমত তাদের শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু অর্থনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে কিছু পাইয়ে দিয়ে যে তাদের মৌলিক সমস্যার সমাধান করা যায় না, এর

জন্য প্রয়োজন সমাজ-বিপ্লব—সে-কথা সব্যসাচীকে দিয়ে লেখক স্পষ্টই বলিয়েছেন—

'তোমাকে বলাই ভাল ভারতী, জনকতক কুলিমজুরের ভালো করার জন্যে পথের দাবী আমি সৃষ্টি করিনি।'···

···'এমন করে এদের ভালো করা যায় না,—এদের ভালো করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যেই আমার 'পথের দাবী'র সৃষ্টি।··· যে মুর্খ একথা জানেনা, শুধু মজুরীর কম-বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্বনাশ করে, দেশেরও করে।' (২৫ পরিঃ) শ্রমিক-আন্দোলনকে বৈপ্লবিক স্তরে উন্নীত করে এবং শ্রমিকদের চেতনার মানকে বাড়িয়ে বিপ্লবের পথে তাদের পরিচালনা করার পরিকল্পনা এখানে স্পষ্ট। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর এই স্বচ্ছতা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রগতিশীলতার দ্যোতক। সমকালীন ভারতের অনেক ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যেও শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে এত স্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। ১৯২০ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও সংস্কারপন্থী নেতৃবর্গ যে শ্রমিক ধর্মঘটের বিরোধী ছিলেন, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৭ সালের সম্মেলনে উপস্থাপিত সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতিতে-'আলোচ্য সময়ের মধ্যে কার্যনির্বাহক সমিতি কোনও ধর্মঘটের অনুমোদন করেন নাই।' ৭০ সংস্কারপন্থী শ্রমিক-নেতাদের এই কার্যকলাপে প্রয়াত কমিউনিষ্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সেদিন বলেছিলেন— 'শ্রমিক সংগঠনের নাম দিয়ে শ্রমিকদিগকে দাবিয়ে রাখাই এদের কাজ। আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণ অজ্ঞান ও অশিক্ষিত বলে আপনাদের মধ্য হতে লোক দাঁড় করাতে পারছে না। এ সুযোগ পেয়েই তথাকথিত স্বার্থপর শ্রমিক-নেতৃগণ শ্রমিকদের মধ্যে স্থান করে নিতে পেরেছে। কিন্তু তাদের এ নষ্টামি আর কিছুতেই করতে দেওয়া উচিত নয়।'৭১ ঐসব নেতাদের তুলনায় শরৎচন্দ্রের চিন্তায় শ্রমিক আন্দোলনের বৈপ্লবিক তাৎপর্য্য যে বহু পূর্বেই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল তার প্রামাণ্য দলিল এই 'পথের দাবী' উপন্যাস।

সমাজে শ্রমের ভূমিকা সম্পর্কেও শরৎচন্দ্র কমারমাঠে রামদাসের বক্তৃতায় বলিয়েছেন—'বিনাশ্রমে সংসারে কিছুই উৎপন্ন হয় না—তাই, শ্রমিকও তাই তোমাদেরই মত মালিক—ঠিক তোমাদের মতই সকল বস্তু, সকল কারখানার অধিকারী।' (১৭ পরিঃ) শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে রামদাস আরও বলেছে—'শুধু একবার, যদি তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে, তোমরাও মানুষ, তোমরা যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন ওজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না—তাহলে এই গোটাকতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু,··· এযে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই মতবাদ নেই, হিন্দু নেই,—মুসলমান নেই, জৈন, শিখ কোন কিছুই নেই,—আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক!··· অক্ষম, দুর্বল, মূর্খ দুর্নীতিপরায়ণ তোমরাই যে তাদের বিলাস-ব্যসনের একমাত্র পাদ-পীঠ।' (১৭ পরিঃ) এই উক্তির মধ্যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মূল কারণ ও তার সমাধানের পথের ইঙ্গিত যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি শোষিত নিপীড়িত মানুষের প্রতি ঔপন্যাসিকের মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা সুপ্রকাশিত। অপূর্বকে নিয়ে ভারতী শ্রমিকদের বস্তিতে গিয়ে তাদের সচেতন করার জন্য বলেছে—'তোমরা ছাড়া কি এতবড় কারখানা একদিন চলে? তোমরাই ত এর সত্যিকারের মালিক,········· একবার সবাই এক হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে বলতো, এ নির্যাতন আমরা আর সইব না, কেমন তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে দেখি। কেবল একটিবার তোমাদের সত্যিকার জোরটুকু তোমরা চেয়ে দেখতে শেখো,··· ওদের কাছে তোমাদের বহু টাকা পাওনা—তাই কেবল কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিতে হবে।' (১৫ পরিঃ) এই সমস্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সমাজ-বিপ্লবের প্রয়োজনে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও সচেতনতার এবং শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে সুশিক্ষিত করে তাদের বিপ্লবের পথে পরিচালনা করার গুরুত্ব

শরৎচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র নারীর স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অর্জনের দাবীর সমর্থক যেমন ছিলেন, তেমনি দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নারী-সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের অপরিহার্যতাও যে তাঁর দৃষ্টিতে স্বচ্ছভাবে ধরা পড়েছিল—পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। এখানে এ-সম্পর্কে পুনরুল্লেখ না ক'রে শুধু এইটুকু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, পথের দাবীর সভানেত্রী হিসেবে সুমিত্রার পরিচিতি ও শ্রমিকদের মধ্যে ভারতীর কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্রের এবিষয়ে ইতিবাচক মনোভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে। নারীদের জীবন গৃহের মধ্যে, শুদ্ধান্তঃপুরে স্বামী-পুত্রের সেবার মধ্য দিয়েই সার্থক হয়ে ওঠে—অপূর্বর এই ধারণার প্রতিবাদ করে তাই ভারতীকে বলতে শুনি—'যারা কোনদিন দেশের কাজ করেনি, এ তাদের কথা; দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থ যা'দের ঢের বড়, এ তা'দের কথা এর মধ্যে এতটুকু সত্য নেই।'

স্বদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মূলতঃ শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনার নির্যাস হলেও শোষিত-মানুষের মুক্তি কামনায় তাঁর চিন্তা সুদূরপ্রসারী। জাতীয় ভাবনা প্রাধান্য পেলেও সেখানে তা সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিকতা-বর্জিত নয়। সারা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় যে দুটিমাত্র শ্রেণী – শোষক আর শোষিত শ্রেণী–রয়েছে, তা লেখক রামদাস তলওয়ারকরের বক্তৃতায় বলিয়েছেন। শোষক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূল লক্ষ্য যে স্বীয় স্বার্থে পরজাতি পীড়ন ও অন্যদেশ লুণ্ঠন তাও স্পষ্টভাবে 'তরুণের বিদ্রোহ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন—'বণিকবৃত্তিই এখন মুখ্যতঃ রাজনীতি। শোষণের জন্যেই শাসন। ······দশ পনের বছর পূর্বে যে জগৎ-ব্যাপী সংগ্রাম হয়ে গেল, তার গোড়াতেও ছিল ঐ এক কথা—ঐ বাজার ও খদ্দের নিয়ে দোকানদারের কাড়াকাড়ি।' শরৎচন্দ্রের এই আটপৌরে মন্তব্যটির মধ্যে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও তার পরিণামে বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার ইঙ্গিত রয়েছে। শোষক-শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থাকলেও স্বার্থের খাতিরে তারা যেমন সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়, বিশ্বের পুঁজিবাদীরা তখন যেমন আন্তর্জাতিক

মিলনমঞ্চে একত্রিত হয়, ঠিক বিশ্বের শোষিত শ্রেণীরও শোষণমুক্তির সংগ্রামে একাত্ম হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা যে কার্লমার্ক্‌স বলেছিলেন, শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তেও তারই আভাস রয়েছে। রামদাস তার বক্তৃতায় শ্রমিকশ্রেণীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছে—শোষিতের 'দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই,—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই,······আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক, আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক।' (দ্রঃ Working Men of All Countries, Unite'—Marx-Engels) অপূর্বও একবার রামদাসকে বলেছে—'শুধু কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন যুগে যে-কেউ জন্মভূমিকে তার স্বাধীন করবার চেষ্টা করেচে, তাকে আপনার নয় বলবার সাধ্য আর যার থাক আমার নেই।' (৭ পরিঃ) অপূর্বর মত দোদুল্যমানচিত্ত যুবকেরও এই আবেগমিশ্রিত মন্তব্যে বিশ্বের সমস্ত দেশের শোষিত মানুষের মুক্তিকামী স্বাধীনতা যোদ্ধাদের প্রতি তার হৃদয়ের যে অনিঃশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়েছে, তা কোন দৈশিক সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে প্রতিহত হয়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সব্যসাচীকে সন্ত্রাসবাদী বলা সমীচীন নয়, সে বিপ্লবী। কেননা সে অহেতুক নরহত্যা ঘৃণা করে, তাই সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করে সন্ত্রাসসৃষ্টির সে বিরোধী। সে বিশ্বাস করেনা যে, ব্যক্তিবিশেষকে হত্যা করে কোন দেশের স্বাধীনতা লাভ করা যায়। তাই তার মুখে শুনি–'কর্মচারীরা রাজার ভৃত্য, মাইনে পায়, হুকুম পালন করে। একজন যায় আর একজন আসে। ······সেইজন্যে তাদের আঘাত করাকে রাজশক্তির মূলে আঘাত করা বলে আত্মবঞ্চনা করে। এতবড় মারাত্মক ব্যর্থতা আর নেই।' (১২ পরিঃ) সব্যসাচীর এই উপলব্ধি যথার্থ বিপ্লবীর অভিজ্ঞতা প্রসূত। বিপ্লবের সাফল্যের জন্যই সে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংগ্রামী নেতাদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছিল। শেষে ভারতী যখন তাকে জিজ্ঞেস করে–'দেশের আয়োজন যার নিষ্ফল হয়ে যায়, বিদেশের আয়োজনে তার কি হয়, দাদা?' তখন সব্যসাচীর মুখে শুনি—'উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় বিধাতার রাজপথ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একে

রুদ্ধ রাখবার চক্রান্ত মানুষের হাতের নাগাল ডিঙ্গিয়ে গেছে। এখন এক প্রান্তের অগ্ন্যুৎপাত অপরপ্রান্তে স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে আনবেই আনবে ভারতী, সে তাণ্ডব দেশ-বিদেশের গণ্ডী মানবে না।' (৩১ পরিঃ) এখানে শোষিত সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার আভাস আরো স্পষ্ট। এই বক্তব্যকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের প্রকাশক কিছুতেই বলা যায় না। ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে সাহায্যের জন্য সেদিন বহু ভারতীয় নেতা বিদেশের সহযোগিতায় তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন—এটাও ইতিহাস-সম্মত। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগের কথা, রাসবিহারী বসুর জাপানযাত্রা ইত্যাদি ঘটনা তার প্রমাণ। কাজেই সব্যসাচীর কার্যক্রমে অবাস্তব কিছু নেই।

সমাজ-বিপ্লবের জন্য বিপ্লবী সংগঠন, গোপনীয়তা, কঠোর শৃঙ্খলা, শ্রমিক-সংহতি ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও শ্রমিকের নিজস্ব সংস্কৃতির যে একান্ত প্রয়োজন-তাও শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'তে উল্লেখ করেছেন। সব্যসাচী শশী কবিকে বিপ্লবের গান লেখার জন্য উৎসাহিত করে বলেছে—'কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ পুরাতন—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে ধ্বংস হয়ে যাক,—আর কিছু না পারো, শশি, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে দাও—এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই।' (২৭ পরিঃ) শিল্পী কবিরা 'দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ধারাকে মালার মত গেঁথে রাখে' বলেই সব্যসাচী শশী কবিকে রাজনীতির চেয়ে বড় বলে আখ্যাত করেছে। সব্যসাচী বলেছে যে, শোষিত মানুষের সুখ-দুঃখের বর্ণনা দিলেই শ্রমজীবী মানুষের সাহিত্য হয়ে ওঠে না, তাদের সাহিত্য তারাই সৃষ্টি করবে। ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের জন্য, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য চাই সমাজ-বিপ্লবের গান, শশী কবিকে সেই গান রচনার নির্দেশই সব্যসাচী দিয়েছে। লেনিনের মতে শিল্পীর কর্তব্য জীবনের 'elemental force গুলোকে ব্যক্ত করা, সব্যসাচী যেন শিল্পী-সাহিত্যিকের ঐ কর্তব্য

সম্বন্ধে শশীকে সচেতন করে দিয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে শরৎচন্দ্র কংগ্রেস পরিচালিত গতানুগতিক ও আপোষকামী আন্দোলনে মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেননি কোথাও, কিন্তু সংগ্রামের প্রকৃতি ও স্তর অনুযায়ী সহিংস আন্দোলন যে অপরিহার্য—এমত তিনি প্রচার করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্র ও ভাষণের মধ্যে। 'পথের দাবী' উপন্যাসেও সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথাই আবার ঘোষিত হয়েছে। ভারতী ও অপূর্বর সঙ্গে সব্যসাচীর বিতর্কমূলক সংলাপের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র ঔপনিবেশিক দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে সহিংস ও অহিংস উভয় ধরনের আন্দোলনেরই প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদেরও একাংশের মনে বৈপ্লবিক পন্থার সমর্থনে যে দোদুল্যমানতা দেখা গিয়েছিল—তার বাস্তব চিত্রটিও তাঁর রচনায় উপস্থিত।

'পথের দাবী' সমিতি শেষপর্যন্ত ভেঙ্গে গেল কেন? পাঠকমনে এপ্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। মনে হতে পারে যে, লেখক শেষ পর্যন্ত হয়ত বিপ্লবপন্থা সম্পর্কে তাঁর মত পরিবর্তন করে-ছিলেন, তাই উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে বিপ্লবীদের গুপ্তসমিতি তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু তাই যদি হত, তবে সব্যসাচীকেও পরিণামে মিত্র-পরিজন-পরিত্যক্ত, ক্লান্ত, হতাশাগ্রস্ত নায়ক হিসেবে চিত্রিত করে সুমিত্রার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করাতেন। উপন্যাসের শেষে সব্যসাচীর মধ্যে যে মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও আপন কর্তব্যকার্যে অবিচল নিষ্ঠা আমরা লক্ষ্য করেছি, তাতে ঔপন্যাসিকের মত পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত নেই, বরং সব্যসাচী এক ভয়ানক দুর্যোগপূর্ণ 'রাত্রির সূচীভেদ্য আঁধারে পিচ্ছিল পথহীন পথে' সুমিত্রার অশ্রুপ্লাবিত চক্ষের সম্মুখেই হীরা সিং-এর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে 'জ্যামেকা ক্যার' বাঁচাতে বার হয়েছে। তার দৃঢ়বিশ্বাস পৃথিবীর একপ্রান্তের অগ্ন্যুৎপাত অপর প্রান্তে স্ফুলিঙ্গ আনবেই। কাজেই 'পথের দাবী'র সমাপ্তিতে

লেখকের বিপ্লববাদে মোহমুক্তি ঘটেছে—এ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নয়। বরং বিপ্লবের জন্য আরও সাংগঠনিক প্রস্তুতি, দেশে উপযুক্ত বাস্তব পরিস্থিতি ও দেশের জনগণের উপযুক্ত সচেতনতা যে একান্ত অপরিহার্য—তারই জন্য সব্যসাচীর নিরলস প্রয়াস ও প্রতীক্ষায় লেখকের গভীর বাস্তব সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছে বলা যায়।

'পথের দাবী'র শিল্পমূল্য পৃথকভাবে বিচার্য। এখানে শুধু বিশ্লেষণ করেছি যে, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা সার্থকভাবে এই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা, এবং দেশের সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতিই বা কতখানি ফুটে উঠেছে। সেই বিচারে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রাজনীতিগতভাবে স্বদেশের স্বাধীনতা-লাভে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার পরিচয় এই উপন্যাসে যেমন সুস্পষ্ট এবং সেই সঙ্গে সমকালীন দেশের যুবমানসের অস্থিরতা ও আদর্শবোধে উদ্দীপ্ত হওয়ার আবেগ সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শোষণে জাতির সার্বিক অধঃপতন ও পরাধীনতার জ্বালা-যন্ত্রণাকে সুসহ করে নেওয়ার জন্য কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনমূলক অহিংস ও আপোষকামী আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা নগ্নভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। টলস্টয়ের সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন লিখেছিলেন—

'The exposure of capitalism and of the calamities it inflicts on the masses was combined with a wholly apathetic attitude to the worldwide struggle for emancipation waged by the international Socialist proletariat.

The contradictions in Tolstoy's views are not contradictions inherent in his personal views alone, but are a reflection of the extremely complex contradictory conditions. Social influences and historical traditions which determined the Psychology of various classes and various sections of Russian Society in the post-reform, but pre-revolutionery era.

That is why a correct appraisal of Tolstoy can be made only from the viewpoint of the class which has proved......that it is destined to be the leader in the struggle for the people's liberty and for the emancipation of the masses from exploitation......' ৭২ টলষ্টয়ের চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা ও স্ববিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য রুশবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য ক্ষেত্রপ্রস্তুত করেছিল, তাই লেনিন পুনরায় বলেছিলেন—'...he succeeded in conveying with remarkable force the moods of the large masses that are oppressed by the present system, in depicting their condition and expressing their spontaneous feelings of protest and anger. ৭৩ অনুরূপভাবে আমরা বলতে পারি শরৎচন্দ্রের চিন্তায় কিছু স্ববিরোধিতা থাকলেও তিনি তাঁর সাহিত্যে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস রূপ এবং তার ভয়াবহ পরিণাম চিত্রিত করেছেন। ব্রিটিশের পাশব শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শোষিত ভারতবাসীর মুক্তিসংগ্রামকে বিশ্বের সমাজবাদী মেহনতী মানুষের শোষণমুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলেও অভিহিত করেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনায় যতটুকুই সীমাবদ্ধতা বা অস্বচ্ছতা থাকুক-না-কেন, সমকালীন সামাজিক পটভূমিকার নিরিখে বিচার করলে 'পথের দাবী'তে তিনি যথেষ্ট প্রগতিশীলতা, বাস্তব-সচেতনতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত প্রশ্নে সেদিন সব্যসাচীর মাধ্যমে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন আজকের ভারতবর্ষেও ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনায় তার অনুসৃতির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়নি—একথা বললেও বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না

পাঁচ

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস বাংলার পল্লীজীবন-কেন্দ্রিক। স্বভাবতই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির শোষণে জর্জরিত দরিদ্র মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রতিচ্ছবি শরৎ-উপন্যাসে শিল্পী-হৃদয়ের সহানুভূতিযোগে অঙ্কিত হয়েছে। পল্লীসমাজ, দেনাপাওনা, শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব, বামুনের মেয়ে, বিপ্রদাসের প্রথমাংশ, জাগরণ (অসমাপ্ত) ইত্যাদি উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শোষণের বাস্তবচিত্র আছে। সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক-আন্দোলনের ইঙ্গিতও মেলে। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে গ্রামের ভূ-স্বামী-মহাজনের নিষ্ঠুর শোষণে কৃষকশ্রেণী ক্রমে নিঃস্ব ভূমিহীন খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে এবং ঐসব শোষক জমিদার-মহাজনেরা শোষণের অর্থকে শিল্পে খাটিয়ে বাণিজ্যিক পুঁজিতে রূপান্তরিত করছে। শরৎ-উপন্যাসের দৃষ্টান্ত থেকে এবিষয়ে তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতার কয়েকটি ছবি তুলে দেওয়া হল: 'প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অনেকেরই এককোঁটা জমি-জায়গা নাই; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে এবং পরের জমিতে 'জন' খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। দু'দিন কাজ না পাইলে কিংবা অসুখে-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই সপরিবারে উপবাস করে। ······মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয় এবং সুদের হার এত অধিক যে, একবার যে-কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়াকর্মের দায়েই হোক বা অনাবৃষ্টি অতি-বৃষ্টির জন্যই হোক, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারেনা। প্রতিবৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়। এবিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই অবস্থা।' (পল্লী সমাজ: (১৫ পরিঃ)

'সে (ষোড়শী) দেখিল চণ্ডীগড়ের ইহারাই একপ্রকার আদিম অধিবাসী এবং একদিন সকলেই ইহারা গৃহস্থ কৃষক ছিল; কিন্তু আজ অধিকাংশই ভূমিহীন—পরের ক্ষেতে মজুরী করিয়া বহু দুঃখে দিনপাত করে। সমস্ত জমিজমা হয় জনার্দন, না হয় জমিদারের কর্মচারী স্বনামে-বেনামে গিলিয়া খাইয়াছে।' (দেনাপাওনা ১৭ পরিঃ)

'...বেচারীরা ঘরগুলিকে প্রাণপণে ছোট করিতে ত্রুটি করে নাই, তথাপি এত ক্ষুদ্র গৃহও যথেষ্ট খড় দিয়া ছাইবার মত খড় এই সোনার বাঙ্গলা দেশে তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। এক ছটাক জমি-জায়গা প্রায় কাহারও নাই,... পথের কুকুর যেমন জন্মিয়া গোটা কয়েক বৎসর যেমন তেমন ভাবে জীবিত থাকিয়া কোথায় কি করিয়া মরে তাহার যেমন কোন হিসাব কেহ কখন রাখে না, এই হতভাগ্য মানুষগুলোরও ইহার অধিক দেশের কাছে এক-বিন্দু দাবী দাওয়া নাই।... এই হচ্ছে দেশের সত্যিকার ছবি।' (শ্রীকান্ত ৩য়, ৪ পরিঃ)

'তেত্রিশ কোটি নর-নারীর কণ্ঠ চাপিয়া বিদেশীয় শাসনতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শুদ্ধমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল, তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে...' (শ্রীকান্ত ৩য়, ১২ পরিঃ)

লেখক দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। 'পথের দাবী'র ডাক্তারের মুখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা আছে—'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয় পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা ত শক্ত নয় বোন!' (২৮ পরিঃ) 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে লেখক সামন্তশ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, চক্রান্ত ও গ্রাম্য দলাদলির নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন। সেই সূত্রে এসেছে সাধারণ মানুষের নির্যাতনের কথা। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও আছে। রুশ বিপ্লবের পর এবং তারই প্রেরণায় ভারতে রাজনীতির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। 'পল্লী সমাজ' রচনার সময় ভারতের মাটিতে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা পুরোপুরি দানা বেঁধে না উঠলেও এ উপন্যাসে তার আভাস রয়েছে। সমালোচকের মতে—'শরৎচন্দ্র আপন প্রতিভাবলেই যে ভাবে তলার শ্রেণীর শোষিত অসহায় মানুষকে সংঘবদ্ধ ও

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী করিয়া তুলিলেন, তাহা একধরনের সমাজতান্ত্রিক ধারণাই বলা চলে।' ৭৪ রমেশের পাশে হিন্দু-মুসলমান নিঃস্ব গ্রামীণ মানুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। একশ' বিঘার জলার বাঁধ নিয়ে সংঘর্ষ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। রমেশ কেবল কৃষকদের উৎসাহিত করেনি, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে জমিদারের বেতনভুক লাঠিয়াল আকবর ও তার দুই ছেলেকে লাঠির ঘায়ে জখম করেছে। তবু আকবর রমেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা ডায়েরি করতে চায়নি। দুষ্ট কলুর ছেলে বেণীর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। মিথ্যা মামলায় রমেশের জেল হওয়ার পর হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের ঐক্য আরও দৃঢ় হয়েছে, রমার বাড়ীর দুর্গোৎসব-বর্জন তার প্রমাণ। সনাতন হাজরা বেণী ঘোষালের শাসানিকে উপেক্ষা করেছে। একটা ছোট নালা নিয়ে কৈলাশ নাপিত আর সেখ মতিলালের পুরনো বিবাদ রমেশের মধ্যস্থতায় মীমাংসা হয়েছে। ইংরেজের আইনের চেয়ে পঞ্চায়েতী প্রশাসনের দিকে লেখকের পক্ষপাত এথেকেই বোঝা যায়।

'দেনাপাওনা' উপন্যাসেও দরিদ্র কৃষক-প্রজার উপর মহাজন-ভূস্বামী গোষ্ঠীর অত্যাচারের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের প্রথমেই লেখকের বর্ণনা— 'একদিন যথার্থই সমস্ত চণ্ডীগড় গ্রামে দেবতার সম্পত্তি ছিল; কিন্তু আজ মন্দির সংলগ্নমাত্র কয়েক বিঘা ভূমি ভিন্ন সমস্তই মানুষে ছিনাইয়া লইয়াছে।' জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মদ্যপ, টাকার জন্য নারীর সতীত্ব নষ্ট করতেও দ্বিধা করে না, লেখকের ভাষায়—'ইহার ধর্ম নাই, পুণ্য নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই—এ নির্মম, এ পাষাণ। ইহার মুহূর্তের প্রয়োজনের কাছেও কাহারও কোন মূল্য, কোন মর্যাদা নাই!' (২য় পরিঃ) এ হেন জমিদারের দোসর গোমস্তা এককড়ি নন্দী, জনার্দন্ রায়, সর্বেশ্বর শিরোমণি, যোগেন ভট্টাচার্য প্রমুখ। তাঁরা ভৈরবীর পদ থেকে ষোড়শীর অপসারণ চায়। অন্যদিকে সাগর সর্দার ও হরিহর সমেত সকল দরিদ্র প্রজা ষোড়শীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সাগরের উক্তি—'জমিদারের পাইক-পিয়াদা বহুৎ আছে তাও জানি, গরীব বলে আমাদের দুঃখও তারা কম

দেয়নি, সেও মনে আছে—ছোটলোক আমরা নিজেদের জন্যে ভাবিনে, কিন্তু তোমার হুকুম হ'লে মা ভৈরবীর গায়ে হাত দেবার শোধ দিতে পারি। গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে ওই হুজুরকেই রাতারাতি মায়ের স্থানে বলি দিতে পারি মা…।' (১২ পরিঃ) ষোড়শীকে পাছে কেউ অত্যাচার করে সেই আশঙ্কায় সাগর-হরিহর রাতে তার ঘর পাহারা দেয়। কিন্তু সংগ্রামে উদ্যত মানুষগুলিকে অসহায় অবস্থায় রেখে ষোড়শী কেন শৈবালদীঘি চলে গেল? কেনই বা সে পরিণামে হৈমর বাবা জনার্দন রায়কে জনগণের রোষাগ্নি থেকে উদ্ধার করতে ছুটে এসেছে? এসব প্রশ্ন জাগে কিন্তু উত্তর মেলে না। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে প্রতিরোধ আন্দোলন সার্থক না-হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পল্লী সমাজের রমেশের মধ্যে যে হিতবাদী ফিউডাল যুবকের চিত্র পাই, তার অনুরূপ মানসিক দৃঢ়তা এবং নেতৃত্ব দেবার শক্তি দেনাপাওনার ষোড়শীতে ছিল না। বহুপূর্ব থেকেই তার মনে দ্বন্দ্ব দেখা গেছে— একদিকে জমিদার-মহাজন প্রপীড়িত সর্বহারা ভূমিজ সম্প্রদায়ের প্রতি তার অকৃত্রিম স্নেহবাৎসল্য, অন্যদিকে অত্যাচারী দুশ্চরিত্র জমিদার স্বামী জীবানন্দের প্রতি সুপ্ত অনুকম্পামিশ্রিত আকর্ষণ। এই দুয়ের দ্বন্দ্বে বিচলিত হয়ে ষোড়শী সাগর সর্দারকে একসময় বলেছিল—'কিন্তু তোরা ত আমার প্রজা নয়, মা চণ্ডীর প্রজা। আমার মত মায়ের দাসী কত হয়ে গেছে, কত হবে। তার জন্যে তোরা কেনই বা ঘরদোর ছেড়ে যাবি, কেনই বা উপদ্রব অশান্তি ঘটাবি। এমন ত হ'তে পারে, আমার নিজেরই আর এ-সমস্ত ভাল লাগচে না।… আশ্চর্য কি সাগর? মানুষের মন কি বদলায় না?' (১২ পরিঃ) শরৎচন্দ্র একসময় জমিদার ও প্রজা নিয়ে এমন একটা উপন্যাস লিখতে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হন,[৭৫] যাতে দেখান হয় যেন জমিদার ভাল হলে প্রজারা সুখে থাকে। কিন্তু রমা আর জীবানন্দ ছাড়া শরৎ-উপন্যাসে আর কোন জমিদার চরিত্র প্রথমে নিষ্ঠুর, পরিণামে প্রজাবৎসল ও হিতৈষী হ'য়ে ওঠেনি। তবে রমেশ বা রমা কেউ শ্রেণীচ্যুত হতে পেরেছে—শরৎচন্দ্র দেখাননি। অবশ্য শরৎচন্দ্র বেণী ঘোষাল,

জনার্দন রায়, গোলোক চাটুজ্জে, 'জাগরণ'-এর আলেখ্য রায়, 'মহেশ' গল্পের শিবচরণ বাবু প্রমুখের পরিবর্তনও দেখাননি, বরং তাদের নিষ্ঠুর কদর্য মূর্তিগুলো এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যাতে পাঠক-মনে বিরূপতার সঞ্চার হয়।

জীবানন্দ ষোড়শীর প্রজাদের কেড়ে নেওয়া জমিগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে, মাঠের জল নিকাশের সাঁকো তৈরী করে দিয়েছে, মন্দিরের একটা ভাল বিলি-ব্যবস্থা করতে উৎসুক—যাতে কোন অব্যবস্থা না হয়। ৭৬ এমন কি আখের চাষ ও গুড়ের কারখানা করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণের মাঠ বিক্রি করার অপরাধে সে নিজেই নিজের এবং জনার্দন রায়ের বিরুদ্ধে প্রজাদের দিয়ে আদালতে নালিশ করিয়েছে। স্বয়ং কালেক্টর সাহেব সরেজমিনে তদন্তে আসবেন—এতে জনার্দন রায় ও জীবানন্দের কয়েদ নিশ্চিত, তাই জনার্দন রায়কে জীবানন্দ বলেছে— '···আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি, সে হবার নয়। কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণ এ শুধু তাদের অন্ন বস্ত্রের কথা নয়, তাদের সাতপুরুষের চাষ-আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক।··· চিরদিন তাদের প্রতিই অত্যাচার হয়ে আসচে, আর হতে আমি দেব না।' (২৭ পরিঃ) শেষে জনার্দন রায় সকন্যা-সপত্নী ষোড়শীর কাছে আত্মসমর্পণ করায় ষোড়শী সাগরকে মকদ্দমা তুলে নিতে রাজী করিয়ে ছুটে এসেছে জীবানন্দের কাছে—হৈমর বাবাকে বাঁচাতে। অর্থাৎ প্রজাবিদ্রোহের সম্ভাবনা একেবারে বানচাল হয়ে গেল। জীবানন্দের এই ক্রম-বিবর্তন উপন্যাসের মধ্যে খুব একটা যুক্তি-নির্ভর কার্য-কারণসূত্রে বর্ণিত না হওয়ায় সম্পূর্ণ আকস্মিক মনে হয়েছে। তাই শিল্প হিসেবে এটা ত্রুটিপূর্ণ। পুরুষানুক্রমে কৃষকদের ঋণশোধ করার প্রতিশ্রুতিও অতিরিক্ত আদর্শবাদী সিদ্ধান্ত। বাস্তবের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। দীর্ঘদিন পর-স্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রীর মিলন-ইচ্ছার মনোবৈজ্ঞানিক বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়ায় নিঃসন্দেহে বাস্তবতার একটি বৃহত্তর সম্ভাবনা এখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ৩য় পর্বে দেখি, রাজলক্ষ্মী বীরভূম

জেলার গঙ্গামাটি গ্রামের পত্তনি কিনেছে। শ্রীকান্তকে নিয়ে রাজলক্ষ্মীর সেখানে যাবার পথে বজ্রানন্দ নামে জনৈক যুবা দেশ-সেবক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। ঐ সাধুই রাজলক্ষ্মীকে বলেছেন—'এই সব দরিদ্র দুর্ভাগাগুলোকে তোমরা ফেলে চলে গেছ বলেই এদের দুঃখ কষ্ট এমন চতুর্গুণ হয়ে উঠেচে।··· দেশের রাজা যদি দেশেই বাস করে দেশের দুঃখদৈন্য বোধকরি এমন কানায় কানায় ভর্তি হয়ে ওঠে না। আর এই কানায় কানায় বলতে যে কি বোঝায় তোমাদের শহরবাসের সর্বপ্রকার আহার-বিহারের যোগান দেবার অভাব এবং অপব্যয়টা যে কি, এ যদি একবার চোখ মেলে দেখতে পার দিদি ···' (৪ পরিঃ) এখানে লেখক বজ্রানন্দের মুখ দিয়ে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণটি স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। পোড়ামাটি গ্রামে কুশারী পরিবারের বিদ্রোহিণী বধূ সুনন্দা কানাই বসাকের বিধবা ও নাবালক ছেলের সমস্ত সম্পত্তি মিথ্যা দেনার দায়ে আত্মসাৎ করার প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং পরিণামে রাজলক্ষ্মীর সালিশিতে তার মীমাংসা হয়েছে, বিধবা জমি ফিরে পেয়েছে। লেখক অবশ্য রাজলক্ষ্মীকে অত্যাচারী পত্তনিদার হিসেবে তুলে ধরেন নি, অতি সংক্ষেপে কুশারী মশায়ের নিষ্ঠুরতাই চিত্রিত করেছেন— 'প্রজার রক্তশোষণ করা ছাড়া আর তাঁদের কোন করণীয় নেই' (৭ পরিঃ)।

এই উপন্যাসেই দেশে রেলপথ বিস্তারের চিত্র রয়েছে। গ্রামের দিকে নতুন রেলপথ নির্মাণের জন্য কোম্পানির তাঁবু পড়েছে। শ্রীকান্তের জবানিতে লেখকের মনোভাব— 'এই যে সমাজ হইতে, গৃহ হইতে, সর্বপ্রকারের স্বাভাবিক বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লোকগুলাকে কেবলমাত্র উদয়াস্ত মাটি-কাটার জন্যই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ট্রাকের উপর জমা করা হইয়াছে, এইখানেই তাহাদের মানব-হৃদয়বৃত্তি বলিয়া আর কোথাও কিছু বাকী নাই। শুধু মাটি কাটা, শুধু মজুরী। সভ্যমানুষ একথা বোধ হয় ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।' (১১ পরিঃ) সামন্ততান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শোষণ সম্মিলিতভাবে শোষিত

মানুষকে ধীরে ধীরে অমানুষ পর্যায়ে অবনমিত করেছে। এই রেলপথ প্রচলন দেশের পক্ষে যেমন আশীর্বাদ, তেমনি অভিশাপও। শরৎচন্দ্র তাই বলেছেন—'কর্তারা আছেন শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে।' (১২ পরিঃ) আবার ঐ রেলপথই নতুন এক সর্বহারাশ্রেণী সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ স্মরণীয়ঃ- 'রেল চলাচলের আশু ও চলতি প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যা দরকার সে সব শিল্প ব্যবস্থা না করে বিপুল এক দেশের ওপর রেলপথের জাল বিস্তার চালু রাখা যাবে না এবং তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে শিল্পের এমন সব শাখায় যন্ত্রশিল্পের প্রয়োগ, রেলপথের সঙ্গে যার আশু সম্পর্ক নেই। তাই এই রেলপথই হবে ভারতে সত্যকার আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত।' ৭৭ ভবিষ্যতের সমাজবিপ্লবে শিল্প-শ্রমিক হবে প্রধান সহায়ক। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'তে সেই ইঙ্গিত আছে। সুতরাং ভারতে ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ ভূমি-নির্ভর অর্থ-নীতির বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সঞ্চালনের (transmission) ফলে নব-বিকাশমান শিল্পসমূহে যে আধুনিক শিল্পশ্রমিক জন্ম নেবে—এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণা অস্বচ্ছ ছিল না। কার্ল মার্ক্সের আর একটি উক্তি উদ্ধারযোগ্য— 'ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলণ্ডকে, একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবন-মূলক—পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।' ৭৮ 'বামুনের মেয়ে' উপ-ন্যাসের জমিদার গোলক চাটুজ্জে দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল-ভেড়া চালানের গোপন ব্যবসা করে, আহম্মদ সাহেবের গরু চালানের ব্যবসায় চড়া সুদে টাকা খাটাতে আগ্রহী। 'দেনা-পাওনা'র জমিদার জীবানন্দও মাদ্রাজী সাহেবকে গুড়ের কারখানা করতে দক্ষিণের মাঠ বিক্রী করে দিয়েছিল। এগুলি সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বাণিজ্যিক পুঁজিতে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত।

সবশেষে, 'বিপ্রদাস' ও অসমাপ্ত 'জাগরণ' উপন্যাসে কৃষক-আন্দোলনের যে ইঙ্গিত রয়েছে তারও উল্লেখ প্রয়োজন। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'কৃষাণ-

মজুরের মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছে জমিদার বংশেরই দ্বিজদাস আর জমিদারদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছে বিপ্রদাসের স্ত্রী সতী- 'জমিদার হয়ে যারা প্রজার রক্ত শুষে খায়, এই তাদের নীতি। নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য এদের কোন লজ্জাবোধ নেই।' (তত্র পরিঃ) তবে দ্বিজদাস ব্যক্তিপুরুষ হিসেবে অপদার্থ। দাদার আশ্রয়ে অন্নপুষ্ট হয়ে সাময়িক আবেগ-বাহুল্যে দাদারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অর্থহীন। একটা মিছিল পরিচালনার পর তার রাজনৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। এখানেই চরিত্র-সৃষ্টির ব্যর্থতা। দেশের কাজ, প্রজাদের মঙ্গলসাধন ইত্যাদির পরিবর্তে পরে দেখি জমিদারী রক্ষার জন্য সে শশধরের সঙ্গে মামলায় নেমেছে, পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা করতেই বৌদি সতীর শ্রাদ্ধে বিপুল অর্থব্যয় করেছে, বন্দনাকে বিবাহ করে মুখুজ্জে পরিবারের ভাঙ্গন রোধ করে অন্তরে তৃপ্তিলাভ করেছে। দ্বিজদাস চরিত্রটির এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেই সমালোচক মন্তব্য করেছেন—'রাজনৈতিক দিক হইতে এই উপন্যাসের রাজনৈতিক সম্ভাবনাময় চরিত্র দ্বিজদাসকে শরৎচন্দ্র হৃদয়-বৃত্তে আবর্তিত করিতে গিয়া চরিত্রটির সত্যই অধঃপতন ঘটাইয়াছেন।' ৭৯ তবে উপন্যাসে চিত্রিত ঐ মিছিলটি ছিল শ্রমিক-কৃষাণের মিলিত শোভাযাত্রা। মিছিলে শ্লোগানও ছিল 'বল ভারতমাতার জয়, 'বল কৃষাণ-মজুরের জয়......।' এখানে রেলের লাইনের কুলিরা কৃষক-সমাবেশে যোগ দিয়েছে। উপন্যাসের বিষয়বস্তুর দিক থেকে ব্যাপারটা গৌণ, কিন্তু শরৎমানসে সমাজ-বাস্তবতার আত্মীকরণ-প্রয়াস উপলব্ধিতে উল্লেখযোগ্য।

'জাগরণ' একটি অসমাপ্ত উপন্যাস; এটি অনিয়মিত অথচ ধারাবাহিকভাবে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ থেকে বৈশাখ, ১৩৩২ পর্যন্ত মোট নয়টি পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এর স্বল্প পরিসরে অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকায় অমরনাথের (ডাকনাম বটুকদেব) নেতৃত্বে শোষিত কৃষকসমাজ যে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য সংগঠিত হচ্ছে—তার ইঙ্গিত রয়েছে। জমিদারের ম্যানেজারের কথায় জানা যায়, কৃষকেরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে, অমরপুরের হাটে বিলাতি

কাপড় বিক্রী একেবারে বন্ধ, ফলে জমিদারীর আয় কমেছে। কমলকিরণ এই আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করেছে—'কতকগুলো স্বদেশী ছাপমারা প্যাট্রিয়টের পেশাই হয়ে দাঁড়িয়েছে জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেওয়া। বলশেভিক প্রোপাগাণ্ডা ও তাদের টাকাই হচ্ছে এর মূলে।··· গোড়াতেই বিশেষ একটু সচেতন না হলে সম্পত্তি হাত ছাড়া হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়,······' (৭ পরিঃ) বৃদ্ধ সাহেব-জমিদার মিঃ আর এম রে বলেছেন—'··· শিক্ষার গুণে হোক, সময়ের গুণে হোক, জমিদারের অত্যাচারের ফলে হোক, দেশের প্রজাদের মধ্যে যদি এত বড় পরিবর্তনই এসে থাকে, জমিদার তারা চায় না, দুদিন আগে হোক, পরে হোক, তাদের যেতেই হবে, তোমরা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।' (৭ পরিঃ) তিরিশের দশকে আমাদের দেশেও যে সমাজ-বদলের নানা কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল, শরৎচন্দ্র তার সারসত্য উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯১৭ সালের পর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গণ-আন্দোলন দেখা যায়। ১৯১৮-১৯ সালে এদেশের গণ-আন্দোলন সম্পর্কে জনৈক বিদেশী ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন—'The strikes in 1918 and the beginning of 1919 brought into active struggle every section of the population in the towns and adjacent rural areas. The peasant disturbances which had not calmed down since the war, flared up again with renewed force.' ৮০ ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে দক্ষিণ ভারতে 'মপলা কৃষক বিদ্রোহ' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—এই বিদ্রোহ দমনে জমিদার-মহাজনেরা ব্রিটিশের সঙ্গে যোগ দেয়। এই মালাবার উপকূলেই ব্রিটিশ আমলে কমপক্ষে ত্রিশবার কৃষকেরা বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিল। এছাড়া, বাংলাদেশে কৃষক-আন্দোলনও এই সময় যথেষ্ট তীব্রতা লাভ করে।

'জাগরণ' উপন্যাসে 'বলশেভিক প্রোপাগাণ্ডা'র উল্লেখের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র সেই ইতিহাস-সচেতনতার পরিচয়ই দিয়েছেন। এখানে একটি সমালোচনা উদ্ধারযোগ্য—'জাগরণ-এর রাজনৈতিক

উপন্যাসরূপে গড়িয়া উঠা অবশ্যই অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তবু লিখিত অংশের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করিলে এই উপন্যাসখানিতেও হৃদয়-মাধুর্যের ক্রমপ্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে রাজনৈতিক কর্মী ও ব্রাহ্মণ অধ্যাপক অমরনাথের কেন্দ্রে জমিদার-নন্দিনী আধুনিকা আলেখ্যের ও তাহার বান্ধবী ইন্দুর মন যেভাবে আবর্তিত হইতে শুরু করিয়াছিল তাহাতে শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক আবেগ হৃদয়বোধে আচ্ছন্ন হইয়া যাইত কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।' ৮১ তবে একথা স্বীকার্য যে, অমরনাথের ঠাকুরদাদা, নিমাই ভট্টাচার্যের সংলাপে লেখক নতুন দিনের আগমনবার্তা শুনিয়েছেন। বৃদ্ধ নিমাই ভট্টাচার্য জমিদার-কন্যা আলেখ্যকে বলেছেন—'আমি বুড়ো হয়েছি, সেদিন চোখে দেখে যাবার আমার সময় হবে না, কিন্তু একথা তুমি নিশ্চয় জেনো দিদি, অক্ষম অকর্মন্য বলে আজ যাদের তোমরা বিচারের ভান করছ, তাদেরই ছেলেপুলেদের কাছে আর একদিন তোমাদেরই কর্মপটুতার জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন মনুষ্যত্বের আদালতে কেবল জমিদারির মালিক বলেই আরজি পেশ করা চলবে না।... এরা কাঁধ মিলিয়ে দ্রুতবেগে যেদিকে চলেছে, আমি শুধু তার দিকেই তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।... জগতের বুদ্ধিমানরা এতকাল তাদের আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, আজ হঠাৎ তাদের ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম ভেঙ্গে গেছে। পেট না ভরলে আর যে তারা নীতির বচন এবং পুরানো আইন-কানুনের চোখ-রাঙানিতে থামবে এমন ত ভরসা হয় না দিদি।' (৪ পরিঃ) সমাজ-সচেতন শিল্পী হিসেবে পরাধীন দেশের শোষিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তিনি দরদ দিয়ে বুঝেছিলেন। সমালোচকের উক্তি যথার্থ—'তাদের দুঃখ-তাপসহা জীবনের অভিজ্ঞতাকে আত্মগত করার প্রয়াস তিনি কখনও বিস্মৃত হননি, বরং তাদের জেগে ওঠার সাড়া, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, এমন কি সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের সংকল্প ও চিত্র উপন্যাসে 'চিত্রিত হয়েছে।' ৮২ একজন সমাজ-বিপ্লবের তাত্ত্বিক ও রূপকারের মতে—'খাঁটি বিপ্লবী তাকেই বলা যায় যে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের সঙ্গে নিজ স্বার্থ মিলিয়ে দিতে চায় এবং কার্যত তাদের সঙ্গে একাত্মতা' অনুভব করে।' ৮৩

শরৎচন্দ্র অন্তর দিয়ে দরিদ্র মানুষের—কৃষক-শ্রমিকদের সমস্যা যথাসাধ্য বুঝতে চেষ্টা করেছেন। বর্মায় মিস্ত্রিপাড়ায় বাস, মজুর বস্তিতে দাতব্য হোমিওপ্যাথি, অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন, জমিদারের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষ্যদান, গ্রাম্য বিরোধে সালিশী প্রভৃতির কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র নানা প্রসঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের দুঃখে সহমর্মী হয়েছেন, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, এমনকি অভ্যুত্থানকেও স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু পল্লীসমাজ, বামুনের মেয়ে এবং আরো দু'একটি উপন্যাস ছাড়া কোথাও কৃষক বা শ্রমিক কেন্দ্রীয় চরিত্র, এমন কি পার্শ্ব নায়কও হয়ে উঠতে পারেনি। যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ১৮৮৫-র পূর্বেই বাংলা নাটকে দেখা গেছে, নির্যাতিত কৃষকের পক্ষে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লড়েছে মধ্যবিত্ত যুবক নবীনমাধব, তারই পার্শ্বনায়ক হয়েছে তোরাপ। অর্ধশতাব্দীর পরেও কেনই বা বাংলা উপন্যাসে সেই আদর্শ অনুসৃত হ'ল না? প্রেম বনাম বিবাহকে নিয়ে যে পারিবারিক জীবনের নৈতিক সমস্যা ও সামাজিক ভারসাম্যের বিচলন, সেদিকেই ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মত বিদগ্ধ ঔপন্যাসিকরাও প্রেমের ত্রিভুজ সমস্যা নিয়ে যত ভেবেছেন, বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতা তাঁদের শিল্প-চেতনাকে ততটা টানেনি। শরৎচন্দ্রও এর ব্যতিক্রম নন।

'কোন শিল্পী যদি সত্যই মহৎ শিল্পী হন, তাঁর রচনায় অন্ততঃ (সমাজ-বিপ্লবের) কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক প্রতিবিম্বিত হবেই।'৮৪ উপন্যাসের প্রধান বিষয়রূপে মধ্যবিত্ত মানসিকতার সীমা মোটামুটি শরৎচন্দ্রও রক্ষা করেছেন; তবে ১৯২১ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বাংলার সমাজ, বিশেষতঃ পল্লীসমাজ যে নানা ভাঙ্গা গড়া এবং অন্তঃসংঘাতের মধ্য দিয়ে রূপ নিচ্ছিল, শরৎচন্দ্র সেই পরিবর্তমান বাঙালী সমাজের সার্থক উপন্যাস-শিল্পী। তিনি হয়ত নতুন রাজনৈতিক সত্যকে বা শ্রমিক-নেতৃত্বকে কোন উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন নি, তবু পুরনো আদর্শ, পুরনো মূল্যবোধের তুচ্ছতা, অন্তঃসার-শূন্যতাকে তার বস্তুগত স্বরূপে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

জমিদার-মহাজন শাসিত আমাদের সামন্তসমাজের বিরুদ্ধে অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি যে সমাজের স্থিতাবস্থার বিপক্ষে-এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সজাগ জীবনশিল্পীমাত্রই তাঁর চারপাশে সৃজ্যমান নতুন সমাজবাস্তবকে শিল্পে স্বীকৃতি দেন। ৮৫ শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সাধনায় পরিবর্তমান সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে আত্মগত সামঞ্জস্যস্থাপনের নিরলস প্রয়াস দেখা যায়। সমাজ-বাস্তবতার শিল্প-রূপায়ণে তিনি যতটুকু সার্থক, তার মূল্য অল্প নয়, কিন্তু যেখানে তাঁর আদর্শ এবং শিল্পের চরিত্রে সেই আদর্শ-প্রয়োগের অসামঞ্জস্য, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ সমালোচকের মতে যেখানে তিনি ব্যর্থ, সেখানেও তাঁর আন্তরিক আবেগ, সমবেদনা সমাজ পরিবর্তনের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। উপরিপাওনা হিসেবে শরৎ-উপন্যাসের এই ফল-শ্রুতিও উপভোগ্য।

প্রসঙ্গ-নির্দেশ

১. অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় : 'শরৎ ও সমাজ-ক্রান্তি', 'শরৎসম্পুট' গ্রন্থ, পৃঃ ৪৯ দ্রঃ

১(ক) ডঃ অজিতকুমার ঘোষ : শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার, পৃ ৫৬৪-৬৫

২. শ্রী সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় : পুনর্মূল্যায়নে শরৎচন্দ্র, পৃ.৯৪ থেকে সংগৃহীত।

৩. 'নারীর মূল্য', 'যমুনা' পত্রিকায় ১৩২০ সালে বৈশাখ থেকে আশ্বিন (শ্রাবণ বাদে) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, এটি 'অনিলাদেবী' ছদ্মনামে লিখেছিলেন। প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ ১৮মার্চ, ১৯২৪ (১৩৩১ সাল)।

৪. শ্রী তারাপদ সাঁতরা 'সামতাবেড়ের শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে তালিকা দ্রঃ।

৫. শ্রী গোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র (২য় খণ্ড), পৃ.৭৬

৬. অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী : বাংলা সাহিত্যের নরনারী, পৃ.১৩৯.

৭. ৭ ভাদ্র, ১৩২৬, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে শরৎচন্দ্র লেখেন-'……আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস।' (মিহির আচার্য সম্পাদিত 'শতবর্ষের আলোকে শরৎ-চন্দ্র' পৃ ৪৩ দ্রঃ)

৮. সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক, পৃ ৯৬

৯, শরৎরচনাবলী (জ.শ সং) ৩য় খণ্ড, পৃ ৪৮০, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯ মালিকান্দা অভয়াশ্রমে প্রদত্ত অভিভাষণ দ্রঃ

১০ শ্রী নারায়ণ চৌধুরী : কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, ১৯৭৫

১১. ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার, পৃ.৬

১২. ডঃ ভবানীগোপাল সান্যাল : শরৎচন্দ্রের সাহিত্য তত্ত্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা-সাহিত্য পত্রিকা (৪র্থ বর্ষ), ১৯৭৬-৭৭ থেকে সংগৃহীত।

১৩. Kazi Abdul Odud : Contemporary Indian Litera-ture – 'Collection of Essays'

১৪. Geoge Lukacs : The Meaning of Contemporary Realism, P-82

১৫-১৭. মার্ক্স-এঙ্গেল্স রচনাসংকলন, ২য় খণ্ড ১ম অংশ, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ২১৪-২২, ২৩০ ও ২৩৬

১৮-২০. শরৎ-রচনাবলী (জ.শ.সং) ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা যথাক্রমে ৬২৬, ৫৬৬ ও ৫৩৫

২১. Marx-Engels : On Literature and Art, P-88

২২. 'সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধ ও বাঙ্গালা সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ, ৩০ আগষ্ট, ১৯২৩ দ্রঃ, শরৎ রচনাবলী (জ. শ. সং) ৫খণ্ড, পৃঃ ৫৪৩

২৩. Graham Haugh : An Essay on Criticism, P-114

২৪. ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (৫ম সংস্করণ) পৃঃ ২৩৭

২৫–২৭. শ্রীগোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র (২য় খণ্ড) পৃঃ ২০৩ ও ২০৫

২৮. ডঃ অজিতকুমার ঘোষ : শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য-বিচার পৃঃ ৪৯০

২৯. ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'শরৎচন্দ্র ও নারীর মূল্য' প্রবন্ধ দ্রঃ 'চতুষ্কোণ' শরৎ-শতবার্ষিকী সংখ্যায় (বৈশাখ, ১৩৮২) প্রকাশিত।

৩০-৩২. শ্রীগোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র (১ম খণ্ড) পৃঃ যথাক্রমে ৭১, ৮৪ ও ২১২, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৪ আগষ্ট, ১৯১৯ সালে লেখা পত্রটিও দ্রষ্টব্য।

৩৩. প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা পত্র (জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) দ্রঃ, পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের 'বিশ্বসাহিত্য ও শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের পৃঃ ৪৭৭ থেকে সংগৃহীত।

৩৪ পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য : বিশ্বসাহিত্য ও শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৪২১

৩৫-৩৬. শ্রীগোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র (২য় খণ্ড) পৃঃ ২২২-২৫ ও শরৎচন্দ্র (১ম) পৃ ২১৬

৩৬ (ক). Sri Narayan Choudhuri : Saratchandra Chatterjee : His Life and Literature, P-74

৩৭. 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা পত্র (৭ ডিসেম্বর, ১৯১৫) দ্রঃ

৩৮. অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ; শরৎ-সাহিত্যে সমাজ-ধর্মের রূপ, পৃঃ ২৪

৩৯. শ্রী গোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র (১য়) পৃঃ ১০৩

৪০ ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'কমলিনী ও কমললতা' প্রবন্ধ দ্রঃ ('চতুষ্কোণ' শরৎচন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪২) অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য পরিবেশিত 'শনিবারের চিঠির (কার্তিক, ১৩৭৫) তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাইকমল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১৩৪১-এ, কিন্তু তার পূর্বে ১৩৩৬ সালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে তারাশঙ্করকে গল্প দিতে অনুরোধ করায় তিনি 'স্বৈরিণী' নামে যে গল্প পাঠান, তা-ই অচিন্ত্যকুমার নাম পরিবর্তন করে 'রাইকমল' নামে ১৩৩৬-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার

কল্লোলে প্রকাশ করেন। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' ৪র্থ পর্ব 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৮, ফাল্গুন থেকে ১৩৩৯-এর মাঘ মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, কমললতার কাহিনী এসেছে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ সংখ্যা থেকে। এছাড়া, কমললতা চরিত্র সৃষ্টির পূর্বে শরৎচন্দ্র 'রাই-কমল' পড়েছিলেন এবং তাঁর মুগ্ধতার কথা শৈলজানন্দকে জানিয়ে 'রাইকমলে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেন।

৪১. শ্রী গোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র (১ম) পৃঃ ৩১৪

৪১ (ক). শ্রী হিরণকুমার সান্যাল : পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র, পৃঃ ২৪-২৫

৪২. ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্র পুনর্বিচার, পৃঃ ১১৬

৪৩. 'বেণু' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে লেখা পত্র (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮) দ্রষ্টব্য।

৪৪. ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র : 'শেষপ্রশ্ন—তর্ক ও শিল্প', 'শরৎ-সাহিত্য পাঠের ভূমিকা' পৃঃ ২২০-২৬ দ্রঃ

৪৫-৪৬. ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার : 'শেষপ্রশ্ন-এর প্রশ্ন' (শরৎ-সম্পুট পৃঃ ৫৮৯-৯১ দ্রঃ)

৪৬ (ক). Sri Narayan Choudhuri : Saratchandra Chatterjee : His Life and Nature, P. 85, 86

৪৭. ১৩৩১ সালে মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সভার অভিভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—'আর্টের জন্য আর্ট' একথা আমি পূর্বেও কখনও বলিনি, আজও বলিনে। এর যথার্থ তাৎপর্য আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।'

৪৮. ৬ই মে, ১৯২১ এনড্রুজকে রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্র দ্রঃ

৪৯. 'চতুষ্কোণ' শরৎচন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা (বৈশাখ, ১৩৪২) পৃঃ ১২৪ দ্রঃ

৫০. শ্রী সুনীল দাস : শরৎ-সম্বর্ধনা' প্রবন্ধ, 'শরৎ-সম্পুট' গ্রন্থের পৃঃ ১৫১ দ্রঃ

৫১. শ্রীগোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র (১ম) পৃঃ ২২৮

৫২. শরৎচন্দ্রের অপর একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'... এত বড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না?

হবেই ত। রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে—সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে? ……নন্ ভায়ওলেন্স খুব noble idea কিন্তু achievement of freedom is nobler—hundred times nobler.' (শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন পৃঃ ২৮ দ্রঃ)

৫৩. শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন পৃঃ ৬৩ দ্রঃ

৫৪. শ্রী তারাপদ সাঁতরা : 'সামতাবেড়ের শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ দ্রঃ শরৎ-চন্দ্রের গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে ছিল—
1) Lenin by Valerin Marcu. (2) The Civil War in France by Karl Marx, (3) The Bolshevik Theory by R. W. Postgate, (4) Socialism by O. D. Skelton, (5) Lenin by Trotsky, (6) The Soci. alist' (A Magazine of International Socialism) Edited by S. A. Dange, Vol.—1 No. 2, 1923

৫৫. শ্রীগোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র (২য়) পৃঃ ৬৬-৬৭ দ্রঃ

৫৬. তথ্যগুলি 'নন্দন' (বৈশাখ, ১৩৪৪) পত্রিকায় (পৃঃ ১১৫-১২) প্রকাশিত 'বঙ্গদেশের কৃষক-বিদ্রোহ' প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

৫৭. মুহম্মদ আবদুল্লা রসুল : 'বর্তমান কৃষক সংগঠনের পটভূমিকা প্রবন্ধ দ্রঃ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ 'নন্দন' পত্রিকায় প্রকাশিত)

৫৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী, পৃঃ ১৮০

৫৯ ও ৬০. যোগেশচন্দ্র বাগল : জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী, পৃ. ৭ ও ১৫ দ্রঃ।

৬১. শ্রী নেপাল মজুমদার : 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা' প্রবন্ধ দ্রঃ

৬২. শ্রী গোপালচন্দ্র রায় : শরৎচন্দ্র (২য়) পৃ.৪৯১

৬৩. শরৎ-রচনাবলী (জ.শ.সং) ৩য় খণ্ড, পৃ.৪৮২ : 'যুবসঙ্ঘ' দ্রঃ

৬৪. নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য : শরৎচন্দ্র ও তাঁর সমকাল ('শরৎ-সম্পুট' পৃ.৩৮ দ্রঃ)

৬৫. ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : শরৎচন্দ্র, পৃঃ ৯৮

৬৬ Govt. Notification No. 193 P Dt. 4. 1. 1927

৬৭. শ্রী সরোজ মুখার্জ্জী : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'গণশক্তি' ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ দ্রঃ

৬৮. রবীন্দ্রনাথের পত্র, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা : চতুর্দশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন), ১৩৪৩, পৃঃ ১৮৮ দ্রঃ

৬৯. শ্রী সরোজ মুখার্জ্জী : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধায় প্রবন্ধ দ্রঃ সব্যসাচীর শক্তি ও সাহসিকতার উপাদান যতীন মুখার্জ্জীর, খুঁড়িয়ে চলার কায়দা ডাঃ যদুগোপাল মুখার্জ্জীর, নানাদেশ ঘুরে বৈপ্লবিক সংগঠন করার ব্যাপারে রাসবিহারী বসু ও এম, এন, রায়ের, নানা দেশের ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি লাভের ঘটনা ডঃ ভূপেন্দ্র দত্ত ও তারকনাথ দাসের জীবনী থেকে নেওয়া।

৭০. রজনীপাম দত্ত : আজিকার ভারত পৃঃ ২৪০

৭১. মুজফ্‌ফর আহমদ : প্রবন্ধ সংকলন, পৃ ২২

৭২-৭৩ V. I. Lenin : On Literature and Art' P. 53-54

৭৪. ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের চিন্তাজগৎ ও তাঁহার সাহিত্য, পৃ ২২৩

৭৫. ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত 'শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা' পৃঃ ১১৭ দ্রঃ, বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—'জমিদারীপ্রথা যখন যাচ্ছেই না, তখন জমিদার ভাল হলে প্রজাদের যে মঙ্গল, তারা যে সুখে থাকে সেটাই দেখাবেন।'— ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়ের 'শরৎচন্দ্র : রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রীয় সংস্রব' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৭৬. এই প্রসঙ্গে জনগণের অছিতত্ত্ব (Trustee Theory) স্মরণীয়। মহাত্মা গান্ধী মনে করতেন, ধনীরা দেশের সম্পদের অছি। হৃদয় পরিবর্তনের দ্বারা তাঁরা একদিন মুনাফার সঞ্চয়ে বীতস্পৃহ হয়ে বঞ্চিত সর্বহারার মধ্যে তাদের—অর্থাৎ দেশের—সম্পদ বণ্টন করে দেবে। এই অছি-তত্ত্ব জীবানন্দের ঋণশোধ এবং রমেশের পল্লী-উন্নয়নের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

৭৭-৭৮. 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যত ফলাফল' : মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌স রচনা-সংকলন, ১ম খণ্ড ২য় অংশ পৃঃ ১৭

৭৯. ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের চিন্তাজগৎ ও তাঁহার সাহিত্য, পৃঃ ২২৬-২৭

৮০. V. V. Balabushevich & A. M. Dyakov : 'A. Contemporary History of India' P. 80

৮১. ডঃ শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় : শরৎচন্দ্রের চিন্তাজগৎ ও তাঁহার সাহিত্য, পৃঃ ২২৬

৮২. ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার : 'শরৎচন্দ্র : শ্রেয়সের সন্ধানে' পৃঃ ২৭

৮৩. মাও-সে-তুং : শিল্প ও সাহিত্য প্রসঙ্গে, পৃঃ ১২

৮৪. ভি. আই লেনিন : 'লিও টলস্টয়—রুশ-বিপ্লবের দর্পণ' প্রবন্ধ দ্রঃ

৮৫. Graham Haugh : An essay on criticism, P. 118

Note : 'Can we imagine a novel, that was entirely false to historical and social reality and was yet a coherent and self-consistent work of art ?'

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার : সামগ্রিক মূল্যায়ন

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক রূপনির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্র—অবশ্য তাঁর প্রস্তুতিক্ষেত্র বহুপূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল। বঙ্কিম-চন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশের মধ্যদিয়েই বাংলা-উপন্যাসের সূচনা এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্র-শরৎ—প্রতিভার সৃষ্টি-প্রাচুর্যে তা অনেকবার নতুনপথে বাঁক নিয়েছে। উক্ত তিন প্রতিভাধর ঔপন্যাসিক বাংলা উপন্যাসে যুগন্ধর-স্রষ্টা। সমাজ-বাস্তবতার নিরিখে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-গুলির কয়েকটি বিশেষ দিকের বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে তিনজন শিল্পীরই রচনা-স্বাতন্ত্র্য পৃথক পৃথক ভাবে পূর্বের অধ্যায়গুলিতে নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে—ঐ তিন যুগস্রষ্টার একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক ও সমীচীন হবে মনে করি। যদিও শিল্প হিসেবে উপন্যাস আধুনিককালের সৃষ্টি, তবু 'আধুনিকতা'র ধারণাই আপেক্ষিক। রিচার্ডসনের 'পামেলা'র আধুনিকতা ডিকেন্সের যুগে অচল; আবার 'আধুনিক' হেনরি জেমসের পাশে স্কট-ডিকেন্স-হার্ডি অবশ্যই 'পুরনো'। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের কালগত ব্যবধানও তাঁদের উপন্যাসের 'আধুনিকতা' বিচারে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম ঔপন্যাসিকের আধুনিকতার যে দ্যুতি পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের রচিত উপন্যাসে তা ম্লান হয়ে যেতে পারে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তুলনামূলক আলোচনার, সময় এই বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তা ছাড়া, সমাজ-বাস্তবতা বলতে আমরা সাধারণভাবে সমাজ-সচেতনতাই বুঝিয়েছি; অবশ্য সমাজ-বাস্তববাদী সাহিত্যিকের ঐ সচেতনতার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীটি এমন ভাবে পরিস্ফুট হওয়া চাই—যাতে তিনি সংরক্ষণপন্থী, না প্রগতিবাদী—তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তদনুযায়ী সমাজ-অভীপ্সারও রূপায়ণ ঘটে। সামাজিক পরিস্থিতিও পরিবর্তনশীল। তাই সামাজিক জটিলতা, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বের বাস্তব প্রকৃতি ইত্যাদি সর্বদা এক থাকে না। আবার যে সাহিত্যিক তা উপলব্ধি করেন তাঁর মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী যেমন দেশের বাস্তব পরিস্থিতিনির্ভর, আবার কিছুটা ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রিত। সেইজন্য বিশেষ সাহিত্যিকের

দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারের সময় তাঁর সমসাময়িক দেশের কালগত পট-ভূমিকা ও ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার কথা অবশ্যই স্মরণীয়।

বাংলা উপন্যাস সৃষ্টির মূলে পাশ্চাত্যসাহিত্যের প্রভাব, বাংলার নবজাগরণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ইত্যাদি সামাজিক ঘটনা যে ক্রিয়াশীল ছিল তা সর্বজনবিদিত। নবজাগরণের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ব্যক্তির আত্মসচেতনতা। আর ব্যক্তিচরিত্রের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটানোই উপন্যাস সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে ব্যক্তির মুক্তিসংগ্রামের মহাকাব্য হল উপন্যাস। তাই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে ও ব্যক্তির মুক্তিপ্রয়াসে ঔপন্যাসিকের মানস-প্রবণতা কোন্ দিকে সেটাও বিচার্য। বাংলার নবজাগরণের সময় ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বের প্রধান দিক ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং যুক্তিবাদের সঙ্গে প্রাচীন সংস্কার ও সমাজানুগত্যের দ্বন্দ্ব—এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বাজাত্যবোধ—উগ্র ও নরমপন্থী। ঊনবিংশ শতকে প্রাচীন ও নবীনের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। আবার রবীন্দ্রনাথও উপন্যাস রচনা শুরু করেন ঐ ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে। উভয়ের মানসিকতায় তাই নবজাগরণের প্রভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু উভয়ের সাহিত্যে তার প্রতিফলনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্যের কারণ তাঁদের স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তিত্ব ও শৈল্পিক প্রতিভার ভিন্নতা। জনৈক সমালোচকের মতে নবজাগরণের কালে এদেশে মূলতঃ দুটি দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকরী ছিল—একটি প্রাচ্যাভিমুখী, অন্যটি পাশ্চাত্যাভিমুখী।[১] পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল মূলতঃ প্রাচ্যাভিমুখী, অন্যদিকে ঔপনিষদিক আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট মানসিকতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পাশ্চাত্যাভিমুখী। এই পাশ্চাত্যাভিমুখীনতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের স্বীকৃতি ও সংস্কারমুক্তি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম সার্থকভাবে তাঁর উপন্যাসের মধ্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্যের রূপদান করেন এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এসে তা আরো পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চিরাচরিত নীতিশাস্ত্র ও ঔচিত্যবোধের

দ্বারা ব্যক্তির কার্যকলাপকে বিচার করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসে শৈবলিনী-কুন্দনন্দিনী-রোহিণীর প্রায়শ্চিত্ত বা মৃত্যু প্রদর্শিত হয়েছে, ব্যক্তির নির্বিচার সমাজানুগত্য তাঁর দৃষ্টিতে শ্রেয় এবং কল্যাণকর। রবীন্দ্রনাথও সমাজকে কোথাও অস্বীকার করেন নি, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবোধ যে স্বাভাবিক—এর স্বীকৃতি রবীন্দ্র-উপন্যাসে স্পষ্ট। অবশ্য সেই স্বাতন্ত্র্য সঙ্কীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতার রূপভেদ নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বা তীব্রভাবে কোথাও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি সত্য, কিন্তু প্রয়োজনে তা যে করা যেতে পারে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সমাজের উদারতা, সংস্কার-মুক্তি ও সম্প্রসারণ যে একান্ত প্রয়োজন—সে-কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ঐ চিন্তা অবশ্য অনেকাংশে ভাববাদী দর্শন-পুষ্ট—এ বিষয়ে যথাস্থানে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তবু এটা স্বীকার করতে হবে যে, বঙ্কিম-চন্দ্রের কুন্দ বা রোহিণীর মত পরিণাম বিনোদিনীর ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ হয়ত বিনোদিনীকে কাশীবাসিনী করেছেন, কিন্তু তাকে ন্যায়-নীতির চাবুকে জর্জরিত করেন নি; বরং বিধবা রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বাস্তবসম্মত তাই তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্র আরও একধাপ এগিয়েছেন। তিনি তাঁর উপন্যাসে প্রায় প্রতিটি নারীচরিত্রের মুখ দিয়ে প্রচলিত সমাজের সংস্কারের মূঢ়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। তাই নব-জাগরণের প্রভাব যে প্রত্যেকের স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী তাদের মধ্যে পৃথকভাবে কার্যকরী হয়েছিল, তা বোঝা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কালে জাতীয়তাবোধের উন্মেষের অন্যতম প্রধান বাহন ছিল ধর্ম। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের পরে আমাদের স্বাজাত্যবোধ অনেকাংশে হিন্দু-পুনরুত্থানবাদের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। মুসলিম স্বাজাত্যবোধ তারই প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া। তাই তখন হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাবোধ ছিল অচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত। পরাধীন জাতির হৃত সম্বিৎ পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে ও আত্মসচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জাতির গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ইতিহাস-চর্চার আবশ্যকতা তখন অনুভূত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের

অধিকাংশ উপন্যাসের ('বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ছাড়া) কাহিনীর মধ্যে ইতিহাস-কথার অবতারণার পিছনে ঐ মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল। 'বাঙ্গালার কলংক' (১৮৮৪, বঙ্গাব্দ ১২৯১) প্রবন্ধের সারকথা 'মৃণালিনী' (১৮৬৯, বঙ্গাব্দ ১২৭৬) উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত হয়েই প্রথম বাঙালী পাঠকের ভাবনাকে উদ্বোধিত করে। প্রায় সকল বঙ্কিম-সমালোচকের মতে—বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মূলতঃ রোমান্স-রচয়িতা। এই রোমান্সের মধ্যে সাধারণতঃ প্রাধান্য পায় ঔপন্যাসিকের কল্পনার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় আলোকিত ইতিহাস-কথা ও অতিলৌকিকতা। বঙ্কিম-উপন্যাসে ঐ দুটিই বিদ্যমান। সেই রোমান্সের আলোছায়ার মধ্যেই গৌড়ের স্বর্ণযুগ, পাঠান আমলের বাংলার শ্রীবৃদ্ধি, খণ্ডগিরি-উদয়গিরির লুপ্ত গৌরব, দেশ-মাতা যা ছিলেন, যা হয়েছেন এবং যা হবেন—তার ছবি কোথাও বেদনা, কোথাও গাঢ় অনুরাগের রঙে রঞ্জিত।

অপর পক্ষে, রবীন্দ্র-উপন্যাস-পাঠকের ('রাজর্ষি' ও 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ছাড়া) দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সমকালের সমাজ-পটভূমিতে, কখনও আবার তা পাঠককে ভবিষ্যতের ভাবনায় ভাবিয়ে তোলে। যেখানে তাঁর কল্পনা রোমান্সাশ্রয়ী, সেখানে কবি-কল্পনা তাঁর সহায়—গদ্যের অপরূপ বাণীলাবণ্যে রোমান্সের ভাব-পরিমণ্ডল আদর্শায়িত। সেখানে প্রতাপের শিভাল্‌রির চেয়ে বড় বসন্তরায়ের 'মানুষের ধর্ম'। শরৎচন্দ্র তো তাঁর উপন্যাসে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে কেবল অতীত ইতিহাসের গৌরব স্মরণ করলেই বর্তমানের সমস্যা মিটবে না, জাতির অগ্রগতি বরং তাতে ব্যাহত হয়। এব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে মনে হয়, রবীন্দ্র-নাথ ও শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্র যেন কিছুটা পিছন ফিরে তাকিয়েছেন। তিনি সমকালীন দেশের বাস্তব সমস্যা থেকে যেন পাঠকের দৃষ্টিকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সরিয়ে নিয়ে গেছেন। বঙ্কিম-চন্দ্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুগ-মানসপ্রবণতা দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন, তদানীন্তন দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত স্বদেশ-প্রেমিক ও সাহিত্য-সেবীদের প্রধান কর্তব্য ছিল জাতির ইতিহাস-কথার গৌরবময় দিকগুলির স্মৃতিচারণ। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র ঐ

যুগবৈশিষ্ট্যকেই তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। অনৈক বঙ্কিম-সমালোচক এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন – 'বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সমাজ-মানুষের ভবিষ্যত অনিশ্চিত, তাহার বর্তমান অস্বীকৃত, কিন্তু তাহার অতীত নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল। সুতরাং অতীতের চেতনা (যদি ইহাতে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়) তাহাকে ভবিষ্যত গড়ার অনুপ্রেরণায় আন্দোলিত করিতে পারে। এই চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যজীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিল।' ২

বঙ্কিম-উপন্যাসে ঐ ইতিহাস-চেতনার প্রাধান্যের জন্যই সমাজ-পটভূমিও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। সেই তুলনায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যে তাঁদের উপন্যাসে আধুনিক সমাজের বাস্তব পরিবেশকেই চিত্রিত করেছেন—এতে কোন সন্দেহ নেই। আবার চরিত্র ও তার পরিবেশ নির্বাচনেও তাঁরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারাই অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান চরিত্রগুলি এসেছে মূলতঃ উচ্চবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায় থেকে এবং সেইজন্য তাদের প্রত্যেকের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতাগুলি তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রতাপ-চন্দ্রশেখর-নগেন্দ্রনাথ-শচীন্দ্র-গোবিন্দলাল প্রমুখেরা সকলেই ঐ শ্রেণীর প্রতিভূ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসের পরিবেশ হিসেবে বেছে নিয়েছেন প্রধানতঃ আধুনিক নাগরিক সমাজ–পরিবেশকে, কিন্তু চরিত্রগুলি বিত্তবান পরিবারভুক্ত হলেও প্রায় সকলেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন, মননশীল ও যুক্তিবাদী। তাই তারা প্রত্যেকে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধগুলি যুক্তিগ্রাহ্য কিনা—তা তারা যাচাই করার পক্ষপাতী, নির্বিচারে সব কিছুকে মেনে নিতে তারা রাজী নয়। আবার কালগত পটভূমির বিচারে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রানুসারী; কিন্তু শরৎ-উপন্যাসের পরিবেশ প্রধানতঃ গ্রামীণ পরিবেশ, আর চরিত্রগুলিও অধিকাংশই মধ্যবিত্ত-নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। শরৎচন্দ্রকে শোষিত, নিপীড়িত মানুষের বেদনার রূপকার বলা হলেও তাঁর উপন্যাসের মুখ্যচরিত্রগুলি শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত নয়, অনেকে গ্রাম বাংলার ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত পরিবারের মানুষ। তবে

বঙ্কিম-উপন্যাসে চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব গৌণ, বাইরের ঘটনার সংঘাতেই তারা যেন বিচলিত। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বই মুখ্য—আর সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্যোতক হিসেবে দেখা দিয়েছে বাহ্যিক ঘটনা। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বঙ্কিম-উপন্যাস মুখ্যতঃ বহির্ঘটনা-নির্ভর, আর রবীন্দ্র-শরৎ-উপন্যাস প্রধানতঃ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণভিত্তিক।

এখানে উল্লেখ্য যে. তিন ঔপন্যাসিকের সমাজচিন্তাও স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এবিষয়ে রক্ষণশীল, প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রাচীন সমাজ-সম্পর্কগুলির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল। সেগুলিকে কালোপযোগী করার অভিপ্রায়ে তিনি কিছুটা সংস্কারের হয়ত পক্ষপাতী, কিন্তু সম্পূর্ণ অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে নতুন সমাজ সম্পর্কের প্রবর্তনের একান্ত বিরোধী ছিলেন। সেইজন্য 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মত উপন্যাসেও ব্যক্তির নির্বিচার সমাজানুগত্যই প্রদর্শিত। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সামঞ্জস্য প্রয়াসী; তবে তাঁর এই সামঞ্জস্য প্রয়াসের মূল প্রেরণা ছিল অকৃত্রিম মানবপ্রেম ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ। ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে তিনি ছিলেন পুরোপুরি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে। সমাজ যদি সেখানে বাধা সৃষ্টি করে, রবীন্দ্রনাথ তখন প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্র-অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি যে, রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তা ছিল ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, সমগ্র বিশ্বের মানব-সমাজই তাঁর চিন্তায় প্রাধান্যলাভ করেছিল। বিশ্বমানবের লাঞ্ছনা-বঞ্চনায় তিনি বারবার ক্ষুব্ধ হয়েছেন, দ্বিধাহীনভাবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। তাই বঙ্কিম অপেক্ষা এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল ও অধিক সমাজ-সচেতন। শরৎচন্দ্রের সমাজ-চিন্তা রবীন্দ্রনাথের মত এত ব্যাপক ও গভীর না হলেও তিনি চরিত্রগুলির সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজব্যবস্থার রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার ইত্যাদি খুঁটিনাটির এমন বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব-বিকাশ ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন যে

অপরিহার্য—পাঠক যেন সহজেই তা উপলব্ধি করেন। শরৎ-উপ-ন্যাসে প্রচলিত সমাজের ত্রুটি সম্পর্কে এই আভাসদান নিঃসন্দেহে শিল্পী-মানসের প্রাগ্রসরতার লক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র তো প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা সংরক্ষণের পক্ষপাতী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, উভয়েই সমাজ-শাসনে ব্যক্তির পীড়নে ক্ষুব্ধ। ধনী-নির্ধনের বৈষম্যহেতু সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন ঠিকই কিন্তু এগুলি যে প্রচলিত সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও উৎপাদন-ব্যবস্থা বা উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের শোষণের অবসান না হলে যে শোষিত মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়, ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের অনুকূল পরি-স্থিতিও উদ্ভব হতে পারে না—এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা সম্ভবতঃ কারও ছিল না। কেন তাঁদের মনে সে ধারণা স্বচ্ছভাবে গড়ে উঠতে পারেনি—সে-বিষয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অধ্যায়ে যথাসম্ভব আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে দেশের আশু রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রত্যেকেই সচেতন ছিলেন এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কী ভূমিকা পালন করেছেন তাও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বিশেষ করে নারীর স্বাধীন প্রেমে অধিকারের প্রশ্নটি বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-উপন্যাসে যেভাবে উপ-স্থাপিত হয়েছে, তার তুলনামূলক বিচারে কে কতখানি সমাজ-প্রগতি অঙ্গীকার করেছেন ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তার স্বীকৃতি আছে। সেই সূত্রে তিন ঔপন্যাসিকের প্রতিভূস্থানীয় উপন্যাসগুলির পৃথক বিশ্লেষণ আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। ঐ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম পর্যায়ে স্টুয়ার্ট মিলের সাম্যনীতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার দাবীকে তুলে ধরেছিলেন, তাঁর উপন্যাসেও তার প্রতি-ফলন লক্ষ্য করি। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে হিতবাদী যুবক বঙ্কিম-চন্দ্র স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছেন, কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' নারীর

স্বাধীন প্রেমে অধিকার ও বিধবার পুনর্বিবাহ সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা স্পষ্ট। যদিও সেখানে নগেন্দ্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন?' (২৫ পরি:), তবু ঐ পরিচ্ছেদে শ্রীশচন্দ্রের ব্যঙ্গপূর্ণ পত্রের উত্তরে নগেন্দ্রনাথের যে বক্তব্য তাতে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রের সঙ্গে বিধবা কুন্দের বিবাহকে কুন্দের দিক থেকে বিচার না করে পুরুষের বহুবিবাহের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছিলেন। তাই নগেন্দ্র আবার বলেছে—'আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি?' যাহোক এখানে সূর্যমুখীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খর্ব হয়েছে, কুন্দের ভীরু প্রেমের পরিণতিতে এসেছে মৃত্যু। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের অবস্থা সূর্যমুখী অপেক্ষা শোচনীয়, আবার রোহিণী আত্মঘাতিনী হয় নি, তাকে হত্যা করা হয়েছে। শৈবলিনীকে দিয়ে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন প্রতাপকে ভোলাবার জন্য। একমাত্র শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহ হয়েছে, তাও সন্ন্যাসীর আগমন, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করতে হয়েছে। আবার বিবাহের পর শচীন্দ্রকে স্ব-সমাজ ত্যাগ করে ভবানীনগরে গিয়ে বাস করতে হয়েছে (রজনী ৫ম খণ্ড ৪র্থ পরি: দ্রঃ)।

দেখা যাচ্ছে, নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন প্রেমে অধিকারের সমস্যা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে উত্থাপন করলেও স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ঐ সমস্যার নেতিবাচক সমাধানের ইঙ্গিতই দিয়েছেন। তৎকালীন উচ্চশিক্ষিত রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিক সংকট এখানে স্পষ্ট। বঙ্কিম নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর পরবর্তী জীবনে মিলের (Stewart Mill) প্রভাব একেবারে ছিল না, বরং কোঁৎ-এর Positivism বা প্রত্যক্ষবাদের তিনি ভক্ত হয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষবাদের মূল কথা হল সমাজানুগত্য ও সমাজ-সংরক্ষণ, প্রত্যক্ষবাদে সমাজ-বিপ্লবের কোন স্থান নেই। একদিকে এই প্রত্যক্ষবাদ, অন্যদিকে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনের প্রভাব—উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত বঙ্কিম-মানসের স্থির সিদ্ধান্ত হচ্ছে—স্বামীর সেবা,

সুখ-সাধন ও ধর্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম।' (ধর্মতত্ত্ব ২৩ অধ্যায়) নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ ছিলেন রক্ষণশীল। সমকালীন বাংলার সমাজে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল উপন্যাস-সাহিত্যে তার বাস্তব চিত্রটুকু তুলে ধরায় তাঁর কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার্য, কিন্তু ব্যক্তিগত রুচিবোধে নীতি-নিষ্ঠার আত্যন্তিকতা; পাপবোধ ও রক্ষণশীল মনোভঙ্গীর দরুণ তা এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যেন নারীর স্বাধীন প্রেম সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর—এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষে। এই নিবন্ধের রবীন্দ্র-অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়নি বলে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর সহজাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ পরিপুষ্টিলাভ করে পাশ্চাত্যের সমাজ-অভিজ্ঞতায়। তাই ব্যক্তি হিসেবে নারীর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নারীর স্বাতন্ত্র্যের তিনি স্বীকৃতি জানিয়েছেন, এমন কি নারীর স্বাধীন প্রেমের অধিকারের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তাই তাঁর নারীচরিত্রগুলি ব্যক্তিত্বের প্রাখর্যে ও তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধে সমুজ্জ্বল। নারীর প্রেমের নানা সমস্যা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁরই বিভিন্ন উপন্যাসে। নারীর চিত্তে প্রেমের উন্মেষ রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে পাপ বা কামোন্মত্ততা নয়, বরং এটা স্বাভাবিক অপ্রতিরোধ্য এক জৈব প্রবৃত্তি। এই দিকে ঐ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নারীর প্রেমচিত্র রূপায়ণে তিনি যথার্থই বাস্তববাদী শিল্পী। কিন্তু তাঁর উপন্যাসে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রেম আদর্শায়িত। তাঁর অনেক উপন্যাসে নারীর প্রেমকে বাস্তবাতিশায়ী আদর্শলোকের সামগ্রী বলে মনে হয়েছে। বিনোদিনীর প্রেম এর দৃষ্টান্ত। তবে 'গোরা' ও 'চতুরঙ্গে' তিনি কিছুটা বলিষ্ঠ বাস্তববাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। ললিতা-সুচরিতা,—বিনয় রীতিমত প্রচলিত সামাজিক বিধি-নিষেধের বাঁধন ছেঁড়ায় উন্মুখ। 'চতুরঙ্গে' বিধবা দামিনী শ্রীবিলাসকে বিবাহ করেছে। কিন্তু লেখকের দ্বিধা সেখানে স্পষ্ট। এদের মিলন সামাজিক

স্বীকৃতি লাভ করবে কিনা লেখক-মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল, তাই স্বল্পদিনের মধ্যেই দামিনীর বুকের ব্যথায় মৃত্যু ঘটলো। একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, দামিনীর বুকের ব্যথায় ঔপন্যাসিকের মনের দ্বিধাই ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'যোগাযোগে'ও কুমু রীতিমত বিদ্রোহিণী, কিন্তু সেও শেষপর্যন্ত চিরন্তন স্বামীসংস্কারের কাছেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে বিমলার নবোন্মেষিত স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সন্দীপের প্রতি তার প্রেমকে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক এবং উচ্ছৃঙ্খলতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। এ-প্রেমে কল্যাণ নেই। নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিখিলের কাছে বিমলা ফিরে এসেছে।

প্রশ্ন জাগে—নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনপ্রেমে অধিকারের প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায়? কোন্ দিক দিয়ে বঙ্কিম অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথ প্রাগ্রসর? প্রথমতঃ বঙ্কিমচন্দ্র সার্বিক সমাজানুগত্যের প্রবক্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধী; অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোপুরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতিদান তাঁর উপন্যাসের আধুনিকতার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ প্রেমের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীও উভয়ের সম্পূর্ণ পৃথক। বঙ্কিম-দৃষ্টিতে প্রেম অসংযত রূপমোহ, কামোন্মাদনা ও আত্মসুখের উপায় মাত্র, রবীন্দ্রনাথের মতে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও অপ্রতিরোধ্য জৈব প্রবৃত্তি এবং নারীর স্বাধীন প্রেমে অধিকার নারীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার সোপান। তৃতীয়তঃ বঙ্কিম-উপন্যাসের নীতিপ্রচারপ্রবণতা থেকে রবীন্দ্র-উপন্যাস সম্পূর্ণ মুক্ত, বরং রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাঁর উপন্যাসে নারীর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও নারীর আভ্যন্তরীণ-সংস্কার কী ভাবে বাধা সৃষ্টি করে তা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুর মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে নারীর বন্ধন-মুক্তি ঘটলেও নবোদ্ভূত ধনতন্ত্রে আবার তার বন্দীত্ব অপরিহার্য। মধুসূদন ঐ ধনতন্ত্র তথা বণিকতন্ত্রের প্রতিনিধি। সবশেষে বলা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কুন্দনন্দিনীর ভীরুতা, রোহিণীর প্রগলভতা রবীন্দ্রনাথের

বিনোদিনী, ললিতা, দামিনী, বিমলা, কুমু, এলা প্রমুখের মধ্যে দেখিনা। এরা প্রত্যেকেই আত্মসচেতন, এদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রখর। প্রচলিত নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করলেও প্রায় প্রত্যেকেই আপন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। তাই বিপ্রদাস যখন কুমুকে বলেছে—'তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন্ স্পর্ধায়,' তখন কুমু জবাব দেয়—'এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোয়ানো যায় না।' তবে সমাজে নারীর স্থান কি হওয়া উচিত, নারী ও পুরুষের সমানাধিকার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি পরিমাণে স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্র-মানসে যে দ্বিধা ছিল তা রবীন্দ্র-অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের মধ্যে নারীমুক্তির সমর্থন যেমন থাকে, তেমনি আবার এসম্পর্কে দোদুল্যমানতাও লক্ষ্য করা যায়। কারণ প্রাচীন সমাজ থেকে অর্জিত মূল্যবোধগুলির প্রভাব থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রম নন। সেইজন্য 'স্ত্রীশিক্ষা' (১৩২১', 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' (১৩৩২), তারও পূর্বে রচিত 'রমাবাঈ-এর বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র-প্রবন্ধ' (১২৯৬) ইত্যাদিতে তাঁর দ্বিধাগ্রস্ততার সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। উপন্যাসেও যে তাঁর ঐ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটবে—তাতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। এসব সত্ত্বেও তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অনেক বেশী প্রগতিশীল ও বাস্তববাদী তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সমাজ-সচেতনতার ও নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রানুগ। নারীর প্রেম-সমস্যার বিভিন্ন দিক শরৎ উপন্যাসেও পরিবেশিত হয়েছে। তবে সমাজে নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কিভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছে ও বিশ্বের প্রায় প্রতিটি সমাজে নারীর মূল্য কিভাবে বিচার করা হয়ে থাকে—একান্তভাবে এ-সম্পর্কে গভীর অনুশীলন ও অধ্যয়নের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের উপ-লব্ধির গভীরতা প্রশংসনীয়। তাঁর 'নারীর মূল্য' গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তাই এই বিশেষ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের সমাজ-সচেতনতা আরও ব্যাপক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গভীর মননশীলতা ও তাত্ত্বিকতা শরৎ-উপন্যাসে একেবারে অনুপস্থিত। 'শেষপ্রশ্ন'

উপন্যাসে intellect'-এর বলকারক আহার্য পরিবেশন করতে গিয়েও তিনি যে শেষরক্ষা করতে পারেননি—সেকথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মত নারীর প্রেম-সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত, অনেকক্ষেত্রে প্রচলিত সংস্কারের কাছেই তিনি চরিত্রকে নতি স্বীকার করিয়েছেন। রমা-রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রী-কমললতার বৈধব্য-প্রেম সার্থকতা লাভ করেনি, কিরণময়ীর পরিণামে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে, পার্বতীও বাল্য-প্রণয়ী দেবদাসের সঙ্গে মিলতে পারেনি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনীর মত তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়নি। পার্বতীর মনে দেবদাসের স্মৃতি অম্লান এবং প্রকাশ্যে তার স্বীকৃতিও আছে। তথাকথিত অবৈধ প্রেমচিত্র রূপায়ণে শরৎচন্দ্রের বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়। কিরণময়ী, অভয়া, কমল তো রীতিমত সমাজ-বিদ্রোহিণী। এদের কথা বাদ দিলেও যেসব নারীচরিত্রের প্রেম সার্থকতা লাভ করেনি, সে-ক্ষেত্রেও শরৎচন্দ্র কাহিনীকে এমনভাবে পরিবেশন করেছেন, যাতে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পাঠক-চিত্ত সহজেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং চরিত্রগুলির মুখে এমনভাবে সমাজ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—যাতে তার আবেদন তীব্রতর হয়। এদিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধ অবশ্যই স্বীকার্য। প্রচলিত সমাজে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিনষ্টির মূলে যে-সব সামাজিক সমস্যা আছে—যেমন বৈধব্য-সংস্কার, সতীত্ব-সংস্কার, ধর্মীয় মূঢ়তা, অশিক্ষা, কৌলীন্য-সংস্কার, পণপ্রথা ইত্যাদি সব কিছু সম্পর্কেই যে শরৎচন্দ্র সচেতন ছিলেন—তাঁর উপন্যাসে সে পরিচয় মেলে।

ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার ইঙ্গিতও শরৎ-উপন্যাসে অনেক-ক্ষেত্রে স্পষ্ট। সমাজের ক্ষতস্থানে আঘাত করাই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল—সে-দিক দিয়েও তিনি সম্পূর্ণ সার্থক। সংক্ষেপে বলা যায় যে, নারীব্যক্তিত্বের প্রতি শরৎচন্দ্রের একান্ত পক্ষপাতিত্ব, প্রেম-চিত্র রূপায়ণে বিদ্রোহাত্মক রীতি, পাঠকের সহানুভূতি অর্জনক্ষম পরিবেশন কুশলতায় ও সর্বোপরি ভাষার সারল্যে সাধারণ পাঠক-সমাজে শরৎ-উপন্যাসের আবেদন অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী।

তবে বাংলা উপন্যাসে আধুনিক বাস্তবতা ও মনস্তাত্ত্বিকতার প্রথম প্রবর্তনার কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথেরই, শরৎচন্দ্র সেই ধারাকেই সম্প্রসারিত করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাস্তবতা ও আধুনিকতা শব্দ দুটি আপেক্ষিক—তা নিত্য পরিবর্তনশীল কালের পটভূমিকায় বিচার্য। কাজেই সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের কথা না থাকলেই যে, কোন সাহিত্যিকের সাহিত্য অবাস্তব ও প্রগতি বিরোধী হবে একথা ঠিক নয়। দেখতে হবে, ঐ সাহিত্যে যুগচেতনার প্রকাশ কতখানি ঘটেছে এবং এতে লেখকের সহানুভূতির সায় কোন্ দিকে।

এই তিনজন ঔপন্যাসিকেরই প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশচেতনা ও রাজনৈতিক ভাবসমৃদ্ধ উপন্যাসের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা,' 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' এবং শরৎচন্দ্রের অন্যান্য অনেক উপন্যাসে স্বদেশচেতনার কিছুটা প্রাসঙ্গিকভাবে পরোক্ষ প্রতিফলন ঘটলেও মুখ্যতঃ 'পথের দাবী' উপন্যাসের মধ্যেই ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক ভাবনার বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়। অবার প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের সংশ্লিষ্ট উপন্যাসগুলি আলোচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণের সময় তাঁদের স্ব স্ব পত্রাদি-ভাষণ–প্রবন্ধাবলীর সাহায্যে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র কোনদিন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নি, রবীন্দ্রনাথও কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হন নি, কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্তরকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। শরৎচন্দ্র সক্রিয়ভাবেই রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে নিজে যুক্ত ছিলেন। দেশ ও কালগত বাস্তব পটভূমির পবিবর্তনশীলতার কথা স্মরণে রেখেই প্রত্যেকের স্বদেশচিন্তার যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের মূলে ছিল ধর্মীয় প্রেরণা, হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রবক্তা হিসেবে তাঁর দৃষ্টিতে দেশপ্রেম ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, দেশরক্ষা 'ঈশ্বরোদ্দিষ্ট' কর্ম, স্বদেশ তাঁর দৃষ্টিতে মাতৃকাদেবী। 'আনন্দমঠে'র মাতৃমূর্তি স্বদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতেরই দ্যোতক। তারপর রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলাসাহিত্যে জাতীয়

ভাবনা ও স্বদেশচেতনাকে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে উদার মানবিকতার প্রশস্তক্ষেত্রে শুধু মুক্তি দেননি—তাকে আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত করেছেন। উগ্র স্বাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তিনি আজীবন বিরোধিতা করেছেন। জাতীয় অনৈক্যই যে জাতীয় সমস্যার মূল—এটা তাঁর দৃষ্টিতে স্বচ্ছভাবে ধরা পড়েছিল। শরৎচন্দ্রও এই ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতাভিত্তিক উদার জাতীয়ভাবনার উত্তরসাধক।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে' ইউরোপীয় 'প্যাট্রিয়টিজিমের' পররাজ্যালুণ্ঠনের নীতিকে ধিক্কার জানিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ব্রিটিশবিরোধিতা তাঁর মধ্যে কখনও প্রকট হয়ে দেখা দেয়নি, বরং 'বঙ্গদর্শনে'র পত্রসূচনায় (বৈশাখ, ১২৭৯) বলা হয়েছিল—'...আমরা ইংরাজী বা ইংবাজের দ্বেষক নহি।' পুরোপুরি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিবর্তে কিছুটা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার অর্জনই ছিল সমকালীন বাঙালী শিক্ষিত বিত্তবান শ্রেণীর কাম্য। এটা নিতান্তই প্রগতি-বিরোধী সুবিধাবাদী মনোভঙ্গী। বঙ্কিমের মধ্যেও ঐ ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তাই সমাজ-বিপ্লব তাঁর দৃষ্টিতে রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ ও অন্যায়, তাঁর মতে বিপ্লবীরা আত্মঘাতী। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ইউরোপীয় 'ন্যাশনালিজমে'র অনুকারী উগ্র স্বাদেশিকতার বিষময় দিকটি যেমন তুলে ধরেছিলেন, তেমনি তাদের সাম্রাজ্যবাদী বীভৎস রূপটিও দ্বিধাহীনভাবে উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। বঙ্কিম ও তাঁর সমকালীন চিন্তানায়কদের মত রবীন্দ্রমানসে ইংরেজ সরকারের প্রতি কোন মোহ ছিল না। তিনি সেইজন্য কংগ্রেস পরিচালিত আবেদন-নিবেদনমূলক আন্দোলনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত। শরৎচন্দ্রের মধ্যে ঐ সাম্রাজ্যবাদ-বিরাধিতা আরও বৈপ্লবিক চিন্তাসমৃদ্ধ। কারণ তিনি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে বিপ্লবপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌল পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েই জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মসূচীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপযোগী বলে মনে করেছিলেন, যেমন চরকা অন্দোলন, অসহযোগ আন্দো-

লন, বয়কট আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ইত্যাদি। কিন্তু শরৎচন্দ্র দেশের আশু প্রয়োজনের দিকটা বিবেচনা করেই বোধ হয় সমাজ-বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ব্যক্তির চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নয়ন এবং গঠনমূলক গ্রামীণ সমবায়-ভিত্তিক কর্মসূচীতে। বিপ্লবপন্থাকে তিনি মনে করতেন এক ব্যক্তিত্ব বিধ্বংসী অকল্যাণকর পথ। শরৎচন্দ্র বিচার করেছেন রাজনৈতিক ও স্বাদেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে, রবীন্দ্রনাথ বিচার করেছেন মানবতাবাদের দার্শনিক দৃষ্টিতে। তাই একজনের হাতে সৃষ্টি হয়েছে 'পথের দাবী' অন্যজন সৃষ্টি করেছেন 'চার-অধ্যায়'। কিন্তু উভয়েই দেশ ও জাতির স্বাধীনতালাভে ছিলেন সদা উন্মুখ এবং সেক্ষেত্রে উভয়েই স্ব স্ব মত ও পথে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা করে গেছেন। এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের বাস্তবতাবোধ ও ইতিহাসচেতনায় অতিরিক্ত নৈতিক আদর্শবাদের সংমিশ্রণ ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চেতনা ও রাজনৈতিক ভাবনার উৎস তাঁর সুতীব্র মানবপ্রেম, মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনাই তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করেছে শাসক ও শোষক শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ। জনৈক বস্তুবাদী রবীন্দ্র-সমালোচকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—'মানুষকে মানুষ হিসেবে উন্নত করবার জন্য যে আদর্শবাদের প্রয়োজন হয়, তা কোন বস্তুবাদী অস্বীকার করে না, বা বস্তুবাদের সঙ্গে সেই আদর্শবাদের কোন বিরোধিতা নেই। রবীন্দ্রনাথ ভাববাদের দিক থেকে হলেও সেই আদর্শপরায়ণতার জয়ধ্বনি করেছেন। বস্তুবাদী না হলেও তাঁর মন ছিল বাস্তবতায় স্পর্শকাতর······।' ৩

দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র তিনজন ঔপন্যাসিকই তাঁদের স্ব স্ব উপন্যাসে প্রসঙ্গক্রমে অল্প বিস্তর তুলে ধরেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ নিরূপণে বা সমাধানের ইঙ্গিতদানে তিনজনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে মন্বন্তরের বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন, কিন্তু তা যে যৌথভাবে সামন্তবাদী ও ঔপনিবেশিক শোষণের অপরিহার্য ফলশ্রুতি—সে-ইঙ্গিত কোথাও দেননি। বরং 'সাম্যে'র চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ হিসেবে তাদের অজ্ঞতা, বিবাহ-প্রবৃত্তি, জন-

সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদিকে নির্দেশ করেছেন, এমনকি সভ্যতার ক্রম-বিকাশের জন্যই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বজায় রাখার অনুকূলে রায় দিয়েছিলেন। 'সাম্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' ইত্যাদিতে কিছু প্রগতিশীল ভাবনা থাকলেও সামগ্রিক বিচারে সেগুলি তাৎক্ষণিক আবেগপ্রসূত বলে মনে হয়। কারণ তিনি নিজেই 'সাম্য' 'ভুলে ভরা' বলে মন্তব্য করেছিলেন। প্রজাপীড়ন ও গণ-বিক্ষোভের চিত্র বঙ্কিম-উপন্যাসে একেবারেই অনুপস্থিত, বরং তিনি যে সে-গুলি পছন্দ করতেন না—তার প্রমাণ আছে। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ গ্রন্থটিকে তিনি উদ্দেশ্যমূলক বলে নিন্দা করেছিলেন এবং সে-সময় 'বঙ্গদর্শন' (ভাদ্র, ১২৮০) পত্রিকায় ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল—'নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কুপ্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর—যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে-সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।' মীর মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' গ্রন্থ প্রকাশের পরও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বঙ্গদর্শন' (ভাদ্র, ১২৮০) পত্রিকায় ঐ গ্রন্থ প্রচারের বিরোধিতা করে লিখেছিলেন—'আমরা পাবনা জেলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিস্প্রয়োজন। আমরা পরামর্শ দিই যে, এসময়ে এগ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্ত্তব্য।' এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্কীর্ণতা এবং প্রগতি-বিরোধী মনোভাবের প্রকাশ গোপন নেই। জনৈক সমালোচক 'উনবিংশ শতকের বাংলায় বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা' প্রসঙ্গে আলোচনার উপসংহারে মন্তব্য করেছেন—'বঙ্কিম-সাহিত্য উনবিংশ-শতাব্দীর বিপ্লবী শ্রেণীর সংগ্রামকে শুধু যে সহায়তা করেনি, ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে যে অক্ষম হয়েছে তাই নয়—রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পতত্ত্ব, দর্শন—সর্ববিষয়ে এ সাহিত্য পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল প্রগতির, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের। অত্যন্ত সচেতনভাবে এই সাহিত্য বিজ্ঞান-বাদের র‍্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে হাত মিলিয়েছিল, সামাজিক

কুসংস্কারের সঙ্গে রাজনীতির উপর স্থান দিয়েছিল ধর্মতত্ত্বকে,…' ৪ পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে সহনশীল সহৃদয় সামাজিক মানুষ। দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূলে যে ধনীর সীমাহীন ধনলিপ্সা—সেটা তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং দেশীয় মহাজন ও জমিদার গোষ্ঠীর শোষণই যে সাধারণ মানুষের শোচনীয় অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী—তা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 'গোরা' উপন্যাসে চরঘোষপুরের প্রজাদের উপর অত্যাচারেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর করে তুলেছিলেন গোরাকে। ব্যক্তিজীবনে রবীন্দ্রনাথ নিজেও নানাধরণের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণে যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—সে-কথা রবীন্দ্র-অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতাটুকুও স্মরণীয়। সমাজের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কটিব বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্বচ্ছ ছিল বলে মনে হয় না, থাকাও সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রেও ভাববাদী দর্শনজাত উদারনৈতিক আদর্শবাদই প্রাধান্য পেয়েছে। তাই রাষ্ট্র কাঠামো যাই থাকুক না কেন, যৌথভাবে চেষ্টা করলে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা যায় বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। আবার তিনি সম্পত্তির সামাজিকীকরণের বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, ব্যক্তিগত মালিকানা সামাজিক উন্নতির জন্যই প্রয়োজন, তবে ধনী-নির্ধনে বৈষম্য ও ধনীর আগ্রাসী মনোভাবকে তিনি ক্ষতিকর মনে কবতেন। রবীন্দ্র-মানসে এই স্ববিরোধী চিন্তা সত্ত্বেও তিনি সামাজিক-রাষ্ট্রিক সমস্যাগুলি ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তার সমাধানেও যে ব্রতী হয়েছিলেন—একথা মনে রাখতে হবে।

শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যে, জমিদার-মহাজন ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের শোষণই দেশের মানুষকে রক্তশূন্য পাণ্ডুর করে তুলেছে। তাই তিনি সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় আরও সরব। সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমেই যে শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠা করা যায়—সে-কথা দ্বিধাহীনভাবে স্পষ্টভাষায় বাংলা কথাসাহিত্যের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রই প্রচার

করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই মতবাদের দলিল 'পথের দাবী' উপন্যাস। রবীন্দ্র-চেতনায় যে সংস্কার-প্রবণতা ছিল—শরৎচন্দ্রে তা বৈপ্লবিক ভাবনায় মণ্ডিত; এখানে প্রাচীনের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সমাজ গঠনের অভীপ্সা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ একান্ত-ভাবে সংঘর্ষ সৃষ্টিকারী বিপ্লবপন্থার বিরোধী, শরৎচন্দ্রে সমাজ-বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠুর শোষক শ্রেণীকে, মনুষ্যত্বের শত্রু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অমানবিক আচরণকে ধিক্কার জানিয়েছেন; আর শরৎচন্দ্র তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে উৎসাহিত করেছেন। বিপ্লবের পথেই স্বাধীনতার রক্তকমল ছিনিয়ে আনার তিনি পক্ষপাতী। স্বাদেশিকতা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র যেন একটু বেশী বস্তুনিষ্ঠ। উভয়েই নিঃসন্দেহে প্রগতিবাদী, জাতীয় মুক্তি তথা সামগ্রিকভাবে মনুষ্যত্বের মুক্তি কামনাই উভয়ের মধ্যে প্রধানভাবে দেখা দিয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অত্যাচারীর হৃদয় পরিবর্তন ও বিবেকের উন্মেষ ঘটানোর জন্য নৈতিকতার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আর শরৎচন্দ্র সমাজকাঠামো পরিবর্তনে উৎসুক।

প্রসঙ্গ-নির্দেশ

১. ডঃ সত্যব্রত দে : রবীন্দ্র-উপন্যাস-সমীক্ষা, পৃঃ ৭৫

২. ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার : বঙ্কিম-মানস, পৃঃ ৫২

৩. ভবানী সেন : 'একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী' প্রবন্ধ দ্রঃ ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্যবিতর্ক' গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২ থেকে সংগৃহীত। প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্র গুপ্ত' ছদ্মনামে লেখা।

৪. নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ('দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার প্রাক্তন সহযোগী সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম)। ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত মার্কসবাদী সাহিত্যবিতর্ক' গ্রন্থ, পৃঃ ১৪৭

নির্দেশিকা

[এই নির্দেশিকায় প্রাক্-বঙ্কিম পর্বের বিশদ আলোচিত গ্রন্থসমূহ, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির নাম বা চরিত্র সন্নিবিষ্ট হয়নি। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কিছু শব্দ, উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকা, প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থকার, গ্রন্থ ইত্যাদির নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে]

ক contd....

গ

ঘ

চ

জ

ট

ঠ

ড

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ছিল	হবে
৮	১৮	১৭৪০ খ্রীঃ	১৭১৯ খ্রীঃ
,,	৩০	প্রমুখেরা	প্রমুখ
৫৪	'তিন'	ফুলমনি	ফুলমণি
১২৬	৯	উনিশতকের	উনিশ শতকের
২১৩	১১	'রাজর্ষি' (১২৯১) ও বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১২৯৮)	বউ ঠাকুরাণীর হাট (১২৮৯) ও রাজর্ষি (১১৯৩)
২৩১	২৬	প্রমুখেরা	প্রমুখ
২৩২	১০	হল ? না	হল না ?
৩৯০	৮ (ঘ)	১৭৮৯-৮১	১৭৮৯-৯১